সে নহি সে নহি

চাণক্য সেন

ক্লাসিক প্রেস
৩।১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা

রচনাকাল : জানুয়ারী ১৯৬১— এপ্রিল ১৯৬২

রচনাস্থান : নয়াদিল্লী ও পহেলগাম।

এ উপন্যাস ১৯৬১ সালের বৈশাখ থেকে পুরো একবৎসর "প্রবাসী" পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে বহুলাংশে পরিমার্জিত হয়েছে।

উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্রবিন্যাসে তামিল বন্ধুদের কাছে সাহায্য পেয়েছি। তামিলনাদে ভ্রমণ করবার সময়ে এবং পরে তাঁরা তামিল সাহিত্য কাব্য, সমাজ ও জীবনদর্শন বুঝতে সাহায্য করেছেন। উপন্যাসের তামিল-প্রসঙ্গ দুজন বন্ধুকে ইংরেজী তর্জমায় পড়ে শুনিয়েছি। মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় ও সমাজ সম্বন্ধে নিজস্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে সাহায্য করেছেন কয়েকজন সুহৃদ। উপন্যাসের বিন্যাস সম্বন্ধে মূল্যবান আলোচনা করেছেন "প্রবাসী"র শ্রীসুধীর কুমার চৌধুরী, তদীয় পত্নী শ্রীমতী সীতা দেবী, এবং শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক কবি নীরেন্দ্রনাথ রায়। এবারও পাণ্ডুলিপি সযত্নে পাঠ ও সংশোধন করেছেন বন্ধুবর শ্রীফণীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

যাঁদের নাম করা হ'ল, ও হ'ল না, তাঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

নয়াদিল্লী,
৩১শে অক্টোবর, ১৯৬২

চাণক্য সেন

বিদগ্ধ পাঠকমহলে 'সে নহি সে নহি' সাহিত্যিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। উপন্যাসের সমালোচনা করেছেন কয়েকজন পণ্ডিত ও মননশীল সাহিত্যিক। তাঁদের কাছে গ্রন্থকার কৃতজ্ঞ। তৃতীয় সংস্করণে উপন্যাস পুনরায় মার্জিত ও সংশোধিত হয়েছে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত ও লেখককে পত্রযোগে জানান সমালোচনা, এই কার্যে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। চতুর্থ মুদ্রণটি সর্বাংশে তৃতীয় সংস্করণের অনুরূপ, ভ্রম-সংশোধন ভিন্ন কোথাও কোন পরিবর্তন করা হয়নি।

—গ্রন্থকার

শিবাজী ও শ্যামশ্রী-কে

ছোট-থাকা ও বড়-হওয়ার সন্ধি-বয়সে

শীতের দাপটে দিল্লী শহর যখন লেজ-গোটান কুকুরের মতো জড়োসড়ো তখন নামল বৃষ্টি, আকাশ জুড়ে ঘনিয়ে এল বিষণ্ণ কালো মেঘ, উত্তর আর পশ্চিম থেকে হাড়কাঁপুনে নির্মম হাওয়া। এ নয় সেই বর্ষাকালের মেঘ, যা ঐ আসে ওই অতি ভৈরব হরষে, আসে ক্লান্তিহর মন-মাতান কান্তিতে; এ হচ্ছে গগন-চুম্বী হিমালয়ের আসল চেহারার তুহিন পরিচয়। বরফ ঝরছে ক'দিন ধরে হিমগিরির পাদদেশে পাহাড়ী জনপদে—কাশ্মীরে হাওয়াই জাহাজ যাওয়া বন্ধ, কুলু উপত্যকা, সিমলা, আলমোড়া ঢাকা পড়েছে বরফের শ্বেত আস্তরণে। দিল্লীর নিম্নতম তাপ চল্লিশের নীচে নেমে এসেছিল, কিন্তু রোদ ছিল ঝকঝকে, আকাশ নীল। বাগানে মৌসুমী ফুলের নানা-বর্ণ জৌলুস; পার্কে, রাস্তার চৌমাথায় গোল-চক্রে সারা দুপুর রৌদ্র-বিলাসী মানুষের অলস ভিড়। এ হিমেল শীতের নেশা আছে, আকর্ষণ আছে। শহুরে মানুষ চায় নীলাকাশ, কড়া রদ্দুর শীত, আর গ্রামের চাষী খোঁজে মেঘের কৃষ্ণ-ছায়া, যে মেঘ আনবে বৃষ্টি, গমের ক্ষেতে ফসল বাড়বে, সোনালি হয়ে উঠবে মাঠ শীতের শেষে। তাই তুহিন শীতে একদিন, বিধাতা বিরূপ না হলে, আকাশে কালো মেঘ জমে; বৃষ্টি নামে। একবার নামলে সহজে যেতে চায় না। দিনের পর দিন আকাশ অবিরত কাঁদে, কনকনে হাওয়া পাগলের মতো দাপাদাপি করে। শহুরে মানুষ শেষ-সম্বল শীত-বস্ত্রের বর্ম ধারণ করে, চাষীর মুখে ফোটে হাসি। উঁচু মানের বাংলো ও ফ্ল্যাটে বৈদ্যুতিক আগুন জ্বলে; নয় ত বসবার ঘরে ফায়ার-প্লেসে কয়লা। উত্তীর্ণ-সন্ধ্যায় আগুন ঘিরে খোস-গল্প করেন দপ্তর-ফেরৎ ড্রেসিংগাউন-আবৃত সাহেব, শীতবস্ত্রে সুরক্ষিতা মেমসাব, ছেলেমেয়ে; নয় ত আগুনের উত্তাপে রক্তপ্রবাহ ঠিক রেখে সাহেব চোখ বুলিয়ে যান বয়ে-আনা জরুরী ফাইলে। কেরাণীরা সন্ধ্যা নামতে আহার সেরে লেপের নিচে আশ্রয় নেয়। তাপ-নিয়ন্ত্রিত হোটেলে ওভারকোটপরা দেশী-বিদেশী স্ত্রী-পুরুষ ভিড় জমায়, হুইস্কি পান করে, বিলিতী কায়দায় নাচে, ক্যাবারে দেখে।

ফিরোজ শা রোডের যে বাড়ীটায় সাবিত্রী আম্মা বাস করেন, অথবা প্রবাস, তা তৈরী হয়েছিল ইংরেজ আমলে, স্বাধীনতার আগে। সেকালের সেণ্ট্রাল

অ্যাসেম্বলির মেম্বারদের জন্যে। বড় কম্পাউণ্ডের তিন দিক ঘেরা একটানা একতলা পাঁচটি বাংলো, একের সঙ্গে অন্যের সংযোগ প্রশস্ত ঘোরান বারান্দা। বাগান করেছে সরকারী মালী, তাই যে-পরিমাণ সার দিয়েছে ততটা ফুল ফোটে নি। সাত দিন অবিরাম বর্ষণে সে-বাগান নিস্তেজ, বিষণ্ণ; ফিকে-সবুজ ঘাস জলে ভেজা, পিচ-ঢালা রাস্তার ঢালুতে বৃষ্টির জল। সাবিত্রী আম্মার বাংলোয় দু'খানা প্রশস্ত শোবার ঘর, বড় রান্নাঘর, ভেতরে প্রকাণ্ড বারান্দা, একপাশে তৃতীয় আধো-অন্ধকার অতিরিক্ত ঘর। তার পর বাঁধান উঠোন। উঠোনের একদিকে স্নানের ঘর, বাইরের পায়খানা, কয়লা, কাঠ আর ঘুঁটে রাখবার ছোট্ট ঘর; অপর দিকে বেশ বড় একখানা ঘর, অতিথি বা কর্মচারীর জন্যে নির্দিষ্ট। উঠোনের পশ্চিমপ্রান্তে এক সারি কলাগাছ, একটা ডালিম গাছ, এক গুচ্ছ নয়নতারার বন। পূব দিকে তুলসী, জবা ও গাঁদা ফুলের গাছ।

সাবিত্রী আম্মার ঘুম ভেঙ্গেছে, রোজ যেমন ভাঙ্গে, ভোর না হতে, পাঁচটা বাজবার আগে।

সামনের বারান্দায়, যেখানটায় বাংলোর প্রবেশ দ্বার, তার সঙ্গে সরু সতরঞ্চি-ঢাকা করিডর সোজা গেছে পেছনের বারান্দা পর্যন্ত। ঢুকেই বাঁ হাতে যে বড় ঘরটা, সাবিত্রী আম্মা সেখানে কাজ করেন, শয়ন করেন। ডানলোপিলো বিছান সরকারী পালঙ্কে ধব্‌ধবে সাদা বিছানা। একপাশে বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিলে রাশি রাশি কাগজ, কিতাব, চিঠিপত্র, লিখবার সরঞ্জাম। দেয়াল বরাবর তিনটি সেল্‌ফে সাজান বই। টেবিলের একপাশে গদি-আঁটা চেয়ার, সাবিত্রী আম্মার নিজের; অন্য পাশে খানচারেক গদিহীন বেতের চেয়ার। পালঙ্কের পাশে আরাম-কেদারা।

দ্বিতীয় বড় শয়নঘরটা এখন খালি। ওটা সাবিত্রী আম্মার স্বামীর ঘর, কদাপি যখন তিনি দিল্লী আসেন, অথবা তাঁর একমাত্র কন্যা সরোজার, যখন তার এখানে থাকার ইচ্ছে হয়। দু'খানা পালঙ্ক এ ঘরটায়, কাছাকাছি নয়, বেশ একটু ব্যবধানে। দুটো কাঠের আলমারী, এক কোণে রেক্সিন-বাঁধান সোফা-সেট, মাঝখানে গোল টেবিল। এ ঘরের পাশে যে অতিরিক্ত ঘর, সাবিত্রী আম্মার চাকর তা ব্যবহার করে। দক্ষিণ থেকে আনা রামস্বামী।

যেহেতু সাবিত্রী আম্মা দীর্ঘকাল গান্ধীর শিষ্যা ছিলেন, তাই উষার আগে নিদ্রাভঙ্গ তাঁর প্রাচীন অভ্যেস। এককালে, আগের কালে, রজনীর শেষ

যামে শয্যাত্যাগ ক'রে চরকায় সুতো কাটতেন। এখনও, এই পরিণত বয়সেও, নিদ্রা ভাঙ্গে আন্ধকার না যেতে, কিন্তু চরকা আর কাটেন না ; সে কাল আর নেই। বিছানায় বসে শঙ্করাচার্যের শিবস্তোত্র পাঠ করেন, তারপর রামস্বামীকে তুলে দেন বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজিয়ে। সংবাদপত্র পাঠ করে স্নানে যান ; স্নান সেরে পূজায় বসেন। সাবিত্রী আম্মা শৈব, শিবপূজা করেন, গঙ্গা-পূজা করেন। আরতি করেন গুণ গুণ মন্ত্র গেয়ে। রামস্বামী ধূপ জ্বেলে দেয়, চন্দন বেঁটে দেয়। পূজা সেরে কুমকুমের জ্বলন্ত ফোঁটা পরেন সাবিত্রী আম্মা কুঞ্চিত গৌর কপালে।

পূজান্তে রামস্বামী প্রাতঃরাশ নিয়ে আসে। ইডলীর সঙ্গে নারকেল ও সরষের চাটনি। আর আনে ফুটন্ত তাজা কফি। দু' গ্লাস কফি পান করেন সাবিত্রী আম্মা। চারখানা বড় বড় নরম ইডলী। তারপর ফিরে আসেন নিজের ঘরে। তাঁর ফিরবার আগে রামস্বামী ঘর সাফ করে রাখে, কোনও রকম নোংরা বা বিশৃঙ্খলা সাবিত্রী আম্মা সহ্য করেন না। সাবিত্রী আম্মা ঝকঝকে ঘর দেখে প্রসন্ন হয়ে দরজা খুলে বাইরে আসেন। বাগানে আধঘণ্টা পায়চারি করেন ; দেখা হলে প্রতিবেশীদের সঙ্গে দু' একটা কথাবার্তা হয়। আধপাকা কোঁকড়া ভেজা চুল পিঠে ছড়িয়ে দেন ; দামী মোটা সিল্কের রঙিন শাড়ীতে এখনও তাঁকে সুন্দর দেখায়। একে একে লোক আসতে থাকে প্রাচীর-ঘেরা পাঁচ-বাংলোর ফাটক খুলে। কেউ বা গাড়ীতে, কেউ বা পায়ে হেঁটে। সাবিত্রী আম্মা লক্ষ্য করেন কারা কোন্ বাংলোর বাইরের বারান্দায় চেয়ারে আসন নেয়। দেখতে পান, কেউ কেউ তাঁর দরজার সামনে বসে গেছে। কোনও দিন আসে পরিচিত লোক, কোনও দিন অপরিচিত।

প্রাতঃভ্রমণ শেষ হলে সাবিত্রী আম্মা ঘরে ফেরেন। বারান্দায় এসে জোর হাতে অপেক্ষমাণ ব্যক্তিদের নমস্কার করেন। ঘরে ঢুকে বসেন টেবিলের একদিকে সংরক্ষিত আসনে। রামস্বামী এসে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের স্বাক্ষরিত নামের কার্ড বা টুক্‌রো কাগজ উপস্থিত করে। আগে একবার সবগুলিকে দেখে নেন সাবিত্রী আম্মা ; তার পর প্রথমাগতের ডাক পরে। এই ভাবে সাবিত্রী আম্মার দৈনন্দিন কর্মজীবন শুরু হয়।

সাবিত্রী আম্মা লোকসভার সদস্যা, প্রবীণা কংগ্রেস নেত্রী।

আজ বৃষ্টি-পচা শীতের সকালে ঘুম ভাঙলেও সাবিত্রী আম্মা শয্যাত্যাগ করেন নি। গত রাত্রে উপমন্ত্রী ঊর্মিলা থাপরের গৃহে নিমন্ত্রণ ছিল, ফেরবার সময় মনে হচ্ছিল জ্বর-জ্বর গা, রাত্রি কেটেছে অপূর্ণ নিদ্রায়। প্রভাতে ঘুম-ভাঙা দেহে একটু একটু ব্যথা, মাথা ভার। সুতরাং স্নান চলবে না। চলবে না সকাল বেলাকার পায়চারি। বাইরে সারারাত বর্ষণের পরেও টিপ্‌টিপ্‌ বৃষ্টি। পূজা করতেই হবে, কিন্তু তার দেরি আছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সাবিত্রী আম্মা আনমনে সুর করে আবৃত্তি করলেন, "দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে···।" বুঝলেন গলাটা ধরে আছে, সামান্য ব্যথাও লাগল। ধরা গলায় গেয়ে চললেন, "নমস্তেতু গঙ্গে তরঙ্গে ভুজঙ্গে···।" স্তোত্র শেস করে শুধু আওড়াতে লাগলেন, শিব, শিব, হর, হর, শিব-শিব-হর···।"

শুনতে পেলেন রামস্বামী উঠে স্নান করল, ষ্টোভ জ্বেলে কফি বানাল। এবার উঠে সাবিত্রী আম্মা দরজা খুললেন। গরম জামা গায়ে চাপিয়ে শুয়েছিলেন, উঠবার সময় তুসের আলোয়ানে দেহ সংরক্ষিত করলেন। বাঁ হাঁটুতে বছরখানেক একটা ব্যথা, আজ বেড়েছে। উঠতে গিয়ে লাগল। একবার মুখবিকৃতি করে সাবিত্রী আম্মা মৃদু হাসলেন। বয়সের দাবী। তেষট্টি অতিক্রান্ত হয়েছে। মাথার অর্ধেক চুল পেকেছে। গায়ের চামড়ায় ভাঁজ। ভাঁজ পড়েছে কপালে, গালে, চোখের নীচে, গলায়। দেহে মেদের প্রাদুর্ভাব। বুকে একটা মৃদু ব্যথা বোধ করে হাত রাখলেন। জোরে নিঃশ্বাস নিলেন, ভাবলেন, ব্যথাটা হাল্‌কা, ঠাণ্ডা লাগার ব্যথা।

রামস্বামী গরম কফি নিয়ে এল ; সাগ্রহে দু' গ্লাস পান করলেন। বললেন, "জ্বর-জ্বর লাগছে, আজ আর স্নান করব না।"

রামস্বামী টাকরায় জিভ লাগিয়ে ক্ষোভসূচক আওয়াজ করল। বলল, "ডাক্তারকে টেলিফোন করে দি?"

"সে হবে'খন। তুমি পূজার ব্যবস্থা কর।"

রামস্বামী জানাল, তা সে করে রেখেছে।

সাবিত্রী আম্মা স্নানঘরে গেলেন। প্রশস্ত স্নানঘর, শয়নঘরের সঙ্গে। আলনার শাড়ী-জামা রামস্বামী সযত্নে গুছিয়ে রাখে। সরকারী ড্রেসিং-টেবিলটা সাবিত্রী আম্মা স্নানঘরে স্থাপন করেছেন। বড় আয়নায় নিজেকে সম্পূর্ণ দেখতে পান। দেখলেন, গ্লানি ও নিদ্রাহীনতায় মুখখানা ক্লান্ত, চোখের নীচে কালি। শাড়ী-জামা ত্যাগ করতে গিয়ে বিষন্ন হাসি পেল। কি দেহ

কি হয়েছে ! ক্ষয়ের পথে এগিয়ে চলেছে, একদিন, হয় ত যে-কোনদিন, একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাবে। হঠাৎ সেই অনেককালের পুরনো চিন্তাটা ঝিলিক দিয়ে উঠল : তখন ? তখন আমি কোথায় থাকব ? এই 'আমি' সাবিত্রী আম্মাকে বহুদিন জ্বালিয়েছে, আজ আর জ্বালায় না। আজ শুধু এক-একবার মনের আকাশে পড়ন্ত তারার মত ঝিলিক দেয়। সাবিত্রী আম্মা জানেন, এখুনি সে বিদায় নেবে। অথচ এই 'আমি' একদিন তাঁকে বিদ্রোহের পথে টেনে এনেছিল। বিদ্রোহের জ্বালায় অতি সংরক্ষণশীল সাবেকী ঘরের মেয়ে ও বধূ হয়েও স্বাধীনতা-সংগ্রামের জনপথে বেরিয়ে এসেছিলেন। সৌন্দর্য তাঁর বহুজন-প্রশংসিত ছিল। নিজের দেহ দেখে নিজেই আশ্চর্য হতেন। সেই সঙ্গে মনে ছিল অপরিমিত তেজ, ভীষণ জ্বালা ! সেই অতি সুন্দর দেহের আজ এই মেদবহুল, জরাক্রান্ত পরিণতি। সে তেজও নেই, জ্বালাও শেষ হয়ে এসেছে। সেদিন আর দেরি নেই যেদিন এ দেহটাও থাকবে না। "বাসাংসি জীর্ণানি…" মনে মনে আওড়ালেন সাবিত্রী আম্মা। আমি থাকব না, শুধু আমার আত্মা থাকবে, অবিনশ্বর, যার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, দেহ নেই, প্রাণ নেই, যে ব্যথায় কাঁদে না, ভালবাসায় কাঁদে না ; যে বিদ্রোহী নয়, যার জ্বালা নেই, সংগ্রাম নেই, মুক্তি নেই। অব্যক্ত ব্যথায় চোখ জ্বালা করল সাবিত্রী আম্মার। শাড়ী বদলে স্নানঘরের বাইরে এলেন। সোজা চলে গেলেন পূজার ঘরে।

পূজা সমাপ্ত করে সাবিত্রী আম্মা যখন শোবার ঘরে ফিরলেন, বর্ষণ ক্ষান্ত হয়েছে, পাতলা মেঘের জাল ভেদ করে সূর্যের ম্লান সঙ্কুচিত রশ্মি দেখা দিয়েছে। দেয়ালে বড় ঘড়িতে আটটা বাজতে দেরি নেই। বাইরে এসে দরজা খুলে বারান্দায় দাঁড়াতে সর্বশরীর শীতে কেঁপে উঠল, দেহ অসুস্থ লাগল। বুঝলেন, একটু জ্বর এসেছে। ঘরে ফিরে টেলিফোন করলেন ডাক্তার চৌধুরীকে। দিল্লীর দক্ষিণ-ভারতীয় সমাজে তামিল, তেলুগু চিকিৎসক বেশ ক'জন থাকা সত্ত্বেও, তাঁর জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ।

ডাক্তার চৌধুরীর কাছ থেকে অনতিবিলম্বে পরিদর্শনের আশ্বাস পেয়ে সাবিত্রী আম্মা বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

রামস্বামীকে ডেকে বললেন, "ডাক্তার চৌধুরী একটু পরে আসছেন। আমার বোধ হয় জ্বর এসেছে।"

কপাল চাপড়ে রামস্বামী জানাল, কাল এই ঠাণ্ডার মধ্যে বাইরে যাওয়া তাঁর একেবারে উচিত হয় নি ; সে বার বার বারণ করেছিল। ঠাণ্ডা লেগে

জর হয়েছে, এখন একা একা সে কি করবে ভগবান জানেন! সাবিত্রী আম্মা ক্লান্ত হেসে বললেন, তার কথা না শুনে অন্যায় করেছেন। কিন্তু সামান্য জর নিয়ে অত ভাবনার কারণ নেই। তবে আজ আর তিনি লোকসভায় যাচ্ছেন না, অন্ততঃ এবেলা ত নয়ই। আর দেখা করতে কেউ যদি আসে, সে যেন বলে দেয়, যেন বুঝিয়ে বিনয়ের সঙ্গে বলে, আজ তিনি অসুস্থ, কারুর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়।

কথাগুলি বলতে বলতে কেমন ক্লান্ত লাগল, সাবিত্রী আম্মা চোখ বুজলেন।

রামস্বামী কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ঘরখানা আরও পরিষ্কার করে গুছাল। সাবিত্রী আম্মা তার কর্মের সশব্দ প্রমাণ পেলেন, সে যে অবিরাম গত রাত্রের অনুচিত বহির্গমনের জন্য বিড় বিড় করে খেদ জানাচ্ছে তাও শুনতে পেলেন। চোখ বুজে নিঃশব্দে শুয়ে থাকতে ভাল লাগছিল, কিন্তু মন তাঁর অলস ছিল না। লোকসভায় উপস্থিতি সহজে তিনি বন্ধ করেন না, নিষ্ঠাবান সদস্যদের মধ্যে অন্যতমা বলে তাঁর সুনাম। চোখ বুজে ভেবে নিলেন লোকসভায় আজ কি কি কাজ, অনুপস্থিতি ক্ষতিকর হবে কি না। প্রধানমন্ত্রী বোম্বাই গেছেন, সুতরাং বৈদেশিক নীতি নিয়ে বড় কিছু হবার সম্ভাবনা নেই। চারটে সরকারী বিল উত্থাপিত হবার কথা, কোনটাতেই সাবিত্রী আম্মার বিশেষ উৎসাহ নেই। লক্ষ্ণৌতে গতকাল ছাত্রদের ওপর পুলিস লাঠি আর কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করেছে; বিপক্ষ দলগুলি নিশ্চয় কিছু হৈ চৈ করবেন, কিন্তু স্পীকার তাঁদের মুলতুবী প্রস্তাব অবশ্যই গ্রাহ্য করবেন না। দুটো কমিটি মিটিং রয়েছে অপরাহ্ণে, না গেলে সাবিত্রী আম্মার অস্বস্তি লাগবে, কিন্তু খুব কিছু ক্ষতি হবে না; একটাতে তাঁর বক্তব্য তিনি পেশ করেছেন, অন্যটাতে করার সময় এখনও আছে। নারী শ্রমিকদের বেতন নিয়ে বেসরকারী যে প্রস্তাবটা কাল উঠবে তা নিয়ে তার বলবার আছে, সেজন্যে তৈরী হবার তাগিদ রয়েছে; বইপত্র, সরকারী একগাদা রিপোর্ট নিয়ে এসেছেন, পড়তে হবে, অথচ মাথাটা ব্যথা করছে, ভারী হয়ে আছে।

হঠাৎ মনে পড়ল চন্দ্রকান্ত দুবে ও ভগৎ সিং দুগ্‌গলের আসবার কথা এগারোটায় দিল্লীতে ভারত-আরব মৈত্রী সঙ্ঘ উদ্‌ঘাটনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে। তিনি এই নব-স্থাপিত সঙ্ঘের ভাইসপ্রেসিডেন্ট। একবার ভাবলেন, টেলিফোনে বারণ করে দেওয়া যাক, পরক্ষণে মনে হ'ল, আগে ডাক্তার চৌধুরী আসুন, যদি ওষুধ খেয়ে শরীরটা সহজে চাঙ্গা হয় তাহলে বারণ করবার দরকার হবে না।

শুনতে পেলেন রামস্বামী দু'একজন সাক্ষাৎকারীকে বিদায় দিচ্ছে; ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে, অপূর্ব উচ্চারণে জানাচ্ছে, সাবিত্রী আম্মা অসুস্থ, আজ দেখা হবে না, দু'চার দিন পর টেলিফোন করে সময় জেনে নিয়ে তবে আসবেন।

হঠাৎ সাবিত্রী আম্মার মন সজাগ হয়ে উঠল। রামস্বামীকে ডাকলেন।

"একটি মেয়ে এসেছিল?"

"না তো!"

"ক'টা বেজেছে? ও, সাড়ে আট। একটু পরেই সে আসবে।"

"ঠিক আছে। ভাগিয়ে দেব।"

"না, না। তাকে ভাগিয়ে দিয়ো না। বাঙ্গালী মেয়ে। নামটা হচ্ছে—হাঁ, রায়, মিস রায়। তাকে ভেতরে নিয়ে এসো।"

রামস্বামী বিরক্ত হ'ল। বিড় বিড় করে বলল, আজ কথা বেশী বললে জ্বর বাড়বে, তাতে বিপদ তো তারই বেশী; কিন্তু গরীব নগণ্য মানুষ সে, তার কথার কি দাম আছে?

সাবিত্রী আম্মা মৃদু হেসে বললেন, "আগে জিজ্ঞেস করে নিয়ো নাম। অন্য কাউকে এনে ঢুকিয়ো না।"

টেবিল থেকে যে বইখানা তুলে নিয়ে সাবিত্রী আম্মা পড়তে চেষ্টা করলেন, ভারতবর্ষে নারী-শ্রমিকদের কর্মব্যবস্থার ওপর বছর পনের আগে তৈরী সেটা এক সরকারী রিপোর্ট। পড়ায় মন বসল না, চোখ বুজে এল, বুঝি-বা একটু ঘুমিয়েই পড়লেন। হঠাৎ তন্দ্রা কেটে গেল, শুনতে পেলেন মোটর-গাড়ীর শব্দ, সে গাড়ী এসে থামল তাঁর বাংলোর পাশে। ভাবলেন বুঝি ডাক্তার। কিন্তু পরক্ষণে নারীকণ্ঠ কানে এল। শুনতে পেলেন, রামস্বামীর প্রশ্নের উত্তরে কোন মহিলা নাম জানালেন, মিস রায়। রামস্বামী বললে, সাবিত্রী আম্মা অসুস্থ। উত্তর হ'ল, তা হলে আজ থাক, আমি আর একদিন আসব। রামস্বামী বলল, আম্মা তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন, কিন্তু তিনি যেন বেশী সময় না নেন; ডাক্তার আম্মাকে বেশী কথা বলতে বারণ করেছেন। হাসি পেল সাবিত্রী আম্মার। রামস্বামী চিরদিন এমন করে থাকে। তাঁকে দেখাশোনা করার দায়িত্ব যেন তার নিজের।

রিপোর্ট সরিয়ে রেখে সাবিত্রী আম্মা উঠে বসলেন, সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল দর্শনপ্রার্থিনী। জোড়-হাতে নমস্কার করল। সাবিত্রী আম্মা হেসে বললেন, "আসুন, এই চেয়ারটায় বসুন।"

"আপনার শরীর ভালো নেই," আস্তে আস্তে সে বলল, "আজ না হয় আমি চলেই যেতুম! আপনি ভালো হলে আবার আসতুম।. কিন্তু আপনার চাকর বললে, আপনি আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।"

"ঠিকই বলেছে।" ম্লান মুখে ক্লান্ত হেসে বললেন সাবিত্রী আম্মা। "একটু জ্বর হয়েছে, এমন কিছু ব্যাধি নয়। বয়স বেড়েছে তাই অল্পে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। ছোটোখাটো জ্বরে চুপ করে শুয়ে থাকার চেয়ে মনোমত কারুর সঙ্গে গল্প করতে ভালো লাগে।"

"তা লাগে।" নবাগতা বলে হেসে ফেলল, "আমিও অসুখ হলে একা শুয়ে থাকতে পারি নে। কেমন একটা অস্বস্তিকর আতঙ্ক হয়।"

শব্দ করে হেসে উঠলেন সাবিত্রী আম্মা। যেন বারো বছরের ছোট্ট মেয়ে। হাসতে হাসতে বললেন, "তাই নাকি? আমারও ঠিক অমনি হ'ত বুড়ী হবার আগে। এখন আর হয় না। অসুখ হলেই ভয় হ'ত বুঝি মরে যাব। এখন মরবার ভয় চলে গেছে।" শেষ কথাগুলি বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন সাবিত্রী আম্মা।

নবাগতা বিব্রত হ'ল। বুঝল, এঁকে বেশীক্ষণ আটকে রাখা অনুচিত হবে। অথচ কাজের কথা তুলতে অস্বস্তি লাগল। হয় ত ইনি একটু হাল্‌কা গল্প করতে চান, কাজের কথা তুলতে চান না।

তাকে নীরব দেখে সাবিত্রী আম্মা বললেন,"বেঁচে থাকাটা বড় রহস্যময়, না?"

"খুব।" মৃদু স্বরে সে উচ্চারণ করল?

"যখন মরবার কথা ভাবতে ভয়ানক ভয় হ'ত," সাবিত্রী আম্মা বললেন, "তখন ভাবতুম, জীবনকে বুঝি বড় ভালোবাসি। বড় বেশী মূল্যবান মনে হ'ত জীবনকে, ভাবতুম কত কিছু করতে হবে। এখন মরতে ভয় নেই। কাজকর্ম সব যেন শেষ হয়ে গেছে।"

"ভয়কে জয় করলেন কি করে?"

"জয় করিনি তো!" সামান্য হেসে বললেন সাবিত্রী আম্মা। "এমনি চলে গেছে।" একটু থেমে, "আপনি ছেলেমানুষ, তায় বৈজ্ঞানিক। অনেক বছর বিদেশে কেটেছে। তবু একদিন বুঝবেন, ভারতবর্ষে হিন্দু হয়ে জন্মাবার কতগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট্য আছে।"

"এখনই যে একেবারে বুঝি নে তা নয়।"

"আপনি যে পথে চলুন, কতগুলি উপলব্ধি আপনার হবেই। অবশ্য যদি

আপনি মননশীল হন, আপনার মন অনুভূতিশীল হয়। তার একটা হ'ল এই যা বলছিলাম, জীবন ও মৃত্যুর মিতালি। বয়স বার্ধক্যের কোঠায় চলে গেলে কোথা থেকে কে এসে আপনাকে বলে দেবে, তুমি বেঁচে আছ আর তুমি মরে গেছ, এর মধ্যে ব্যবধান খুব বেশী নয়।"

সে নীরবে শুনল।

"এই দেখুন, কি সব বাজে বকছি," সলজ্জ হাসির সঙ্গে বললেন সাবিত্রী আম্মা। "বুড়ো হলে এমনই হয়, কথাবার্তার ঠিক থাকে না।"

"না, না, এ কি বলছেন আপনি ?"

"যাক গে এসব কথা।" হঠাৎ গম্ভীর হলেন সাবিত্রী আম্মা। কপালে চারটি দৃঢ় কুঞ্চন পড়ল। গালের দু'প্রান্তে দুটি ছোট মাংসপিণ্ড জমল। চোখ দুটি কোমল জ্যোতিতে ভরে উঠল।

"কাজের কথা বলি। আপনার প্লান আমি পড়েছি।"

সে আগ্রহে নীরব রইল।

"শুধু পড়িনি, কারুর কারুর সঙ্গে আলোচনাও করেছি।"

"কি মনে হ'ল আপনার ?"

"আমার ত প্রথম দিন শুনেই খানিকটা ভালো লেগেছিল। পড়ে আরও বুঝলাম আপনার উদ্দেশ্য, আপনার সমস্যা।"

"আপনার সমর্থন আছে ত ?"

"না থাকলেও কিছু ক্ষতি হ'ত না, তবে আছে। আপনাকে সাহায্য করতে পারলে আমি সুখী হব।"

"অনেক সৌভাগ্য আমার! সরকারী সহায়তা পাওয়া যাবে ?"

"যতোটুকু বুঝতে পারছি, সরকারী সাহায্য পাওয়া আপনার অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। অবশ্যি, মন্ত্রীর কাছে আপনি যাবেন, এবং তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান দেখাবেন।"

"এবং দ্বার-উদ্ঘাটনে তাঁকে পৌরোহিত্য করবার অনুরোধ করব ?"

"দরকার বুঝলে করবেন বৈকি।" গম্ভীর গলায় জবাব দিলেন সাবিত্রী আম্মা। "জানেন তো, এদেশে কোন্ রাজপুরুষ আপনার প্রতিষ্ঠান উদ্ঘাটন করলেন তাই দিয়ে সংবাদপত্রগুলি তার মূল্য বিচার করবে।"

দু'জনেই একটু হাসলেন। সাবিত্রী আম্মা আবার বললেন, "আপনার কাছে আমার কয়েকটা জ্ঞাতব্য বিষয় রয়েছে এই প্ল্যান বিষয়ে।"

"বলুন।"

"আপনি উচ্চতর বৈজ্ঞানিক গবেষণার কেন্দ্র খুলতে চান। বলছেন, বাড়ী-ঘর নিয়ে পনের লক্ষ টাকা লাগবে। টাকা আপনি সংগ্রহ করতে পারবেন?"

"অসম্ভব হবে না। টাকা বা গবেষণার যন্ত্রপাতি, লেবরেটরী সরঞ্জাম মোটামুটি জোগাড় হয়েই আছে। অর্থাৎ, নির্ভরযোগ্য আশ্বাস আমরা পেয়েছি।"

"আমরা কে কে? আপনার সঙ্গে আর কেউ আছেন নাকি?"

নবাগতা হঠাৎ নীরব হ'ল। মুখখানা মুহূর্তের জন্য সামান্য রক্তিম হয়ে উঠল। সহজে নিজেকে সামলে নিল। যতটা সম্ভব নির্বিকার স্বরে বলল, "আমার একজন সহকর্মী আছেন।"

"পুরুষ না স্ত্রীলোক?"

"পুরুষ।"

"তিনি কোথায়?"

"য়ুরোপে। ভিয়েনায়।"

"এটাকে বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানই ধরা হবে হয়ত?" খানিকটা আপন-মনে বললেন সাবিত্রী আম্মা।

"কেন? তা কেন হবে?" একটু উত্তেজিত হ'ল সে। "আমরা দু'জন বাঙ্গালী বটে, কিন্তু অর্থ ও যন্ত্রপাতি যাঁরা দিচ্ছেন তাঁরা বিদেশী। তাছাড়া, গবেষণার ছাত্র আমরা দেশের সর্বত্র থেকে নেব। প্রাদেশিকতার বিচারে একেবারেই নেব না।"

"আপনার আন্তরিকতায় আমি অবিশ্বাস করিনি। কিন্তু এদেশে কতগুলি নূতন মনোবৃত্তি দেখা দিয়েছে, অনেক দিন বাইরে থেকে আপনি তাদের সঙ্গে হয়ত পরিচিত নন। স্বাধীনতা পাবার পর জীবন-তৃষ্ণা বড় বেড়ে গেছে আমাদের, অথচ সুযোগ সে অনুপাতে বাড়ে নি। তাই যা কিছু তৃষ্ণার বারি, তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি। চাকুরি নিয়ে, পার্লামেন্টে, বিধানসভার আসন নিয়ে, এমন কি কলেজে, য়ুনিভারসিটিতে সীট নিয়েও কাড়াকাড়ি পড়ে যায়।"

"আমাদের গবেষণা কেন্দ্রকে সর্বভারতীয় করার সংকল্পই আমাকে বাংলা দেশের অনেক দূরে রাজধানী দিল্লীতে স্থান নির্বাচনে অনুপ্রাণিত করেছে। তা সত্ত্বেও যদি বাঙ্গালী-মাদ্রাজীর প্রশ্ন ওঠে তা বড় দুঃখের হবে।"

সাবিত্রী আম্মা ক্লান্ত হাসলেন। "দিনকাল কেমন যেন বদলে যাচ্ছে, বদলে

গেছে,” বললেন, ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। “আমরা যত ছোট্ট হচ্ছি আমাদের ছায়াগুলো তত বড় হচ্ছে। সবটা বুঝি নে, বুঝবার চেষ্টাও করি নে আর। তা যাক। কথাটা আমি এমনই তুললাম। আমার নিজের মনোভাব দিয়ে নয়; তাঁদের, যাঁদের মনোভাবের দাম বেশী। শেষ পর্যন্ত ওতে আটকাবে না। আপনার আসল প্রয়োজন জমির। তা আশা করি পেয়ে যাবেন।”

“ধন্যবাদ।” খুশিতে মুখ উজ্জ্বল হ'ল নবাগতার। “এ আপনার অনুগ্রহের ফল। কতদিন লাগবে?”

“এ সব কাজ তাড়াতাড়ি হতে চায় না আমাদের দেশে। অনবরত পেছনে লেগে থাকতে হয়। যাদের কাছে তদ্বির করতে হয় তাদের অনেককে হয়ত আপনার ভাল লাগবে না। কিন্তু মন বিস্বাদ হলেও দমবেন না, কারণ কাজের চাবিকাঠি এদেরই হাতে। লেগে থাকতে পারলে, মাসখানেকের মধ্যে জমিটা পেয়ে যাবেন।”

“আপনি ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন। তবু লেগে থাকতেই হবে। দরকার হলে এখানে ছুটে আসব।”

“নিশ্চয়ই আসবেন। হ্যাঁ, আরও দু'একটি জানবার বিষয় আমার রয়ে গেছে।”

“বলুন।”

“ব্যক্তিগত দু'একটা প্রশ্ন করব। আপত্তি থাকলে উত্তর দেবেন না, আমি আমি একটুও ক্ষুণ্ণ হব না।”

“করুন।”

“আপনার বয়স কত?”

“একচল্লিশ।”

“কে কে আছেন আপনার? তারা কোথায়?”

“মা আছেন। কলকাতায়। একটি বোন, সে ইংলণ্ডে ডাক্তারী পড়ছে।”

“বিয়ে করেছিলেন ক'বছর আগে?”

“পনের।”

“ক'দিন টিকেছিল বিবাহিত জীবন?”

“তিন বছর।”

“আপনার সন্তানটি কোথায়?”

বুকের কাঁপন প্রাণপণ চেপে সে বলল, "সে লণ্ডনে—কিন্তু এত সব আপনি জানলেন কি করে?"

"আপনার সুস্পষ্ট জবাবে বড় সুখী হলাম।"

বাংলোর বাইরে আর একখানা গাড়ী এসে থামল। হর্ণের ছোট্ট আওয়াজে সাবিত্রী আম্মা বুঝলেন ডাক্তার চৌধুরী। সেই মুহূর্তেই রামস্বামী এসে বলল, "ডাক্তার এসে গেছেন।"

"এক মিনিট বসতে বল ওঁকে।" সাবিত্রী আম্মা হেসে তাকালেন বিস্মিতা অতিথির দিকে। সে যাবার জন্য প্রস্তুত। হাত দু'খানি তুলে নমস্কার করছে। একটু ইতস্তত করে সে বলল:

"একটা অনুরোধ ছিল।"

"বলুন।"

"আমাকে এবার থেকে নাম ধরে ডাকবেন। আমি আপনার মেয়ের মত।"

গম্ভীর হয়ে গেলেন সাবিত্রী আম্মা। যেন কোনও ভাবাবেগ জোরে চাপলেন। মুখখানা কঠোর হ'ল। একবার চোখ বুজে জোরে নিঃশ্বাস নিলেন। যখন তাকালেন, চোখে প্রশান্ত হাসি; স্নেহ ঝরছে।

বললেন, "বেশ তো। আজই হয় ত তোমায় নাম ধরে ডাকতুম, কিন্তু সত্যি বলতে কি, তোমার নামটি ভুলে গেছি।"

"আমার নাম দেববাণী!"

"দেববাণী! আহা, বেশ নাম।"

দুই

গাড়ী স্টার্ট দিয়ে বড রাস্তায় বেরিয়ে দেববাণী ঘড়ির দিকে তাকাল। ন'টা কুড়ি। অনেকগুলো কাজ সারাদিনের জন্য লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, একে একে তাদের দাবী মেটাতে হবে। সাবিত্রী আম্মার সঙ্গে কথাবার্তায় মনটা খুশি হয়েছে। কার্যসিদ্ধির সম্ভাবনা তার একমাত্র কারণ নয়; প্রথম সাক্ষাৎ-কারেই এই বর্ষীয়সী মহিলার প্রতি দেববাণীর মন আকৃষ্ট হয়েছিল। এঁর সুনাম শুনেই অবশ্য সে গিয়েছিল সাহায্যের প্রয়োজনে; দ্বারস্থ হয়ে কেবল যে শূন্য হাতে ফেরে নি তাই নয়, কেমন একটা আকর্ষণ বোধ করেছে। সাবিত্রী আম্মার জীবনের কোনও বিশেষ কিছু তার জানা নেই; তবু মনে হয়েছে, কোথাও, ঐ ভাঁজ-পড়া মসৃণ উজ্জ্বল ত্বকে লুক্কায়িত কোনও স্তরে, তার নিজের জীবনের সঙ্গে কিছু একটা মিল রয়েছে। তিনি প্রথম আলাপে দেববাণীকে আপনার ক'রে নিয়েছেন।

হঠাৎ বেঁকে-আসা এক সাইকেল-আরোহীর সামনে গাড়ীকে ব্রেক চেপে দাঁড় করাতে গিয়ে দেববাণীর মন হ'ল, যেমন তার প্রায়ই মনে হয়, জীবন কী বিচিত্র, কী রহস্যময়। একদিন, এই ত যেন সেদিন, দ্বারে দ্বারে আমার জন্যে কিসের ভাণ্ডার সাজান ছিল? লাঞ্ছনা, অপমান, গ্লানির। জীবনে মার খেয়ে কোনও দিকেই যেন আলোর সন্ধান ছিল না, পদে পদে পুঞ্জীভূত অন্ধকার। আজ যেন দুয়ার খুলে গেছে, জীবন আমায় স্বীকার ক'রে নিয়েছে। এ স্বীকারে পরিতৃপ্তি আছে, খানিকটা মাদকতাও, কিন্তু ব্যথায়-ভরা দুঃখের স্মৃতিতে জড়ান এ স্বীকার। পরাজয় সহজে মানে নি নিষ্ঠুর পৃথিবী, অনেক দাম দিয়ে তাকে জয় করতে হয়েছে। তবু কি সত্যিই আমি জিতেছি? তবু কি মাঝে মাঝে মনে হয় না বড় বেশী দাম দিতে হ'ল? আর যা মিলল, যেটুকু সার্থকতা, পূর্ণতা, পরিতৃপ্তি, তার সঙ্গে র'য়ে গেল অনেকখানি ব্যর্থতা, শূন্য, অতৃপ্ত তৃষ্ণা! পূর্ণিমার চাঁদও কি তার জ্যোৎস্না দিয়ে কলঙ্ক ঢাকতে পারে?

বৃষ্টি এখন আর নেই। বরং মেঘ -ফিকে হয়ে এসেছে। চাপা, লাজুক রোদ উঠেছে। জোর কন্‌কনে হিমেল হাওয়া বইছে, বাঁ হাতের দরজা দিয়ে

সে হাওয়ার স্পর্শ লেগে শীতের পোশাকে আবৃত শরীরও বার বার কেঁপে উঠছে। দেববাণীর মনে তখনও সাবিত্রী আম্মার স্পর্শ। প্রথম দিনের সাক্ষাৎকারে সাবিত্রী আম্মা যেসব প্রশ্ন করেছিলেন তার জবাব দিতে তার একটুও বিব্রত লাগে নি। বরং বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর সুস্থ অনুসন্ধিৎসা ভালই লেগেছিল। আরও ভাল লেগেছিল গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন প্রস্তাবে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ। আমি ছিলাম একেবারে অপরিচিত ; আমার মত অনেকেই নিশ্চয় নিয়ত সাবিত্রী আম্মার সাহায্যপ্রার্থী। তথাপি তিনি নির্ভেজাল উৎসাহের সঙ্গে প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছিলেন ; দু'ঘণ্টা ধ'রে নানা রকম প্রশ্নে তাঁর যা জানবার জেনে নিয়েছিলেন। বিদেশে আমি কি কি কাজ করেছি জানতে তাঁর আগ্রহের সীমা ছিল না। আমার প্ল্যানটা মনোমত হয়েছিল বলেই, কাজের চাপ সত্ত্বেও, নিঃস্বার্থ পরহিতৈষায় তা নিয়ে তদ্বির করেছেন, কাজ সাফল্যের পথে অনেকখানি এগিয়ে রেখেছেন। আজ অসুস্থতা নিয়েও আমায় সযত্নে কাছে ডেকেছেন ; কথাবার্তায় বার বার আমার প্রতি দরদ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তবু সাবিত্রী আম্মা স্ত্রীলোক ; নারীর জীবন সম্বন্ধে নারীর কৌতূহল তিনি এড়াতে পারেন নি। বেশী কিছু জানতে চান নি, কিন্তু সামান্য ক'টি প্রশ্নে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি জানেন, আমি স্বাভাবিক সাধারণ নই। অবাক লাগছে, কি ক'রে তিনি আমাকে চিনলেন, কি ক'রে তাঁর দৃষ্টি আমার বর্তমান ভেদ ক'রে অতীতে পৌঁছল, যে অতীত অর্থহীন হয়েও মিথ্যে নয়, সারা জীবন ঘষেও যা নিশ্চিহ্ন হবে না।

হঠাৎ মনে পড়ল দেববাণীর, হিমাদ্রি একদিন বলেছিল, "তুমি যতদিন অতীতকে ভয় করবে, ততদিন সে তোমার পেছনে লেগে থাকবে।" ভয় ? হিমাদ্রি আজও, এতদিনেও, জানে না কি গভীর অন্ধকার অরণ্যের মত সে ভয়। হিমাদ্রি পুরুষ তাই সে জানে না। দেববাণী নারী, তাই সে জানে।

গাড়ী মথুরা রোড ধ'রে নিজামুদ্দিনের দিকে ছুটেছে। আপিসের সময় হয়ে এল। যানবাহনের ভিড় বেড়েছে, আর দেখা দিয়েছে সেই অসংখ্য সাইকেলের দপ্তর-গামী মিছিল, ভারতবর্ষের রাজধানীর যা বোধ করি সবচেয়ে বড় পরিচয়। এত সাইকেল দেববাণী আগে কোথাও দেখে নি, না কলকাতায়, না বিদেশের কোনও শহরে। সাইকেল সম্বন্ধে তার একটা অর্থহীন ভয়, সেই মৃত্যুহীন অতীতের বিরাটতর ভয়ের একাংশ। অনেকদিন আগে বার বার একটা সাইকেল জীবন্ত সর্বনাশ বহন ক'রে শূন্য থেকে আচমকা ধূমকেতুর

মত দেববাণীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, বার বার দেববাণীর পায়ে-চলা জীবনের ছন্দপতন ঘটিয়েছে। আজ সে অতীত অনেক দূরে, বহু বহু দূরে। তবু সে মিথ্যে হয়ে যায় নি। হায় ভগবান্, সে আছে।

সে আছে। এই দুটো শব্দ উচ্চারিত হতেই দেববাণীর শরীর কেঁপে উঠল। শীতে নয়। পুরাতন ভয়ে। এক মাস হ'ল সে ভারতবর্ষে ফিরেছে দীর্ঘ দশ বছর বিদেশে কাটিয়ে। মাত্র আট দিন কলকাতায় কাটিয়ে বাকী সময়টা সে দিল্লীতেই রয়েছে। ভারতবর্ষের মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে এ দুটো শব্দ বার বার তার মনে মেঘ-গর্জনের মত নিনাদিত হয়েছে। নিজের অজ্ঞাতে বার বার তার চকিত চক্ষু রাস্তার অচেনা-অজানা মানুষের ভিড়ে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে, বুঝি বা আবার একটা সাইকেল এসে হঠাৎ তার গতিরোধ করল, বুঝি বা পৃথিবী কাঁপিয়ে ঘোষণা করল : আমি আছি।

একটু ন'ড়ে চ'ড়ে বসল দেববাণী নরম আসনে। বিরাট আমেরিকান গাড়ী, পাখীর পালকের মত নরম আসন, চলে নিঃশব্দ গতিতে, রাস্তায় ভেসে। বিদেশে বড় গাড়ী চালিয়ে আরাম, কিন্তু দিল্লীর রাস্তায় অসুবিধে, বার বার গতিবেগ কমাতে হয়, রাস্তা ছেড়ে দিতে হয় সাইকেলকে, গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ীকে। মুহূর্ত আগের অহেতুক ভয়ের কথা ভেবে দেববাণী নিজেকে সাহস দিল, বোঝাল ; এই শহরে দশ বছর পরে, এই বিরাট চলমান গাড়ীতে সে সে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

নিজামুদ্দিনে একটা বড় বাংলো বাড়ীর ফটকে দেববাণী গাড়ী নিয়ে ঢুকল। এখানে তার সাময়িক বাসস্থান। এক মার্কিন ভদ্রলোকের গৃহে দেববাণী স-খরচায় অতিথি। মার্কিন ভদ্রলোক, ডাক্তার রবার্ট পোস্ট, দিল্লীতে নতুন স্থাপিত আমেরিকান মিশন হাসপাতালে স্পেশালিস্ট ডাক্তার। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে দেববাণী যখন গবেষণা করত, তখন এই পোস্ট পরিবারের সঙ্গে তার আলাপ হয় ; আলাপ ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। যে কয়জন বিদেশী দেববাণীর গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপনে আন্তরিক উৎসাহী, রবার্ট পোস্ট তাদের একজন। বয়স তাঁর চুয়াল্লিশ, দেখে বরং একটু বেশীই মনে হয়। ছ'ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা দেহে মাংসের অভাব, তাই সামান্য বাঁকানো। গাল গর্তে, চোখ কোটরগত ; প্রকাণ্ড বঁড়শির মতো নাকের নীচে চাপা পাতলা ওষ্ঠাধর। মাথায় চুল প্রায় নেই বললেই চলে। বলা বাহুল্য, রবার্ট পোস্ট সুদর্শন নয়। কিন্তু এমন অসামান্য ব্যক্তিত্ব দেববাণী খুব বেশী দেখে নি। কথা কম বলে ;

হাসে একেবারে বালকের মত। নিজের কাজ ক'রেও পরের কাজে সাহায্যে তার আলস্য নেই।

রবার্ট পোস্টের স্ত্রী আইরীণ দেববাণীর বন্ধু। স্বামীর পাশে ছোট দেখালেও দেববাণীর চেয়ে সে বেশ খানিকটা লম্বা। একটু মোটা; তা নিয়ে ক্ষোভের শেষ নেই। তিনটি সন্তানের সে জননী; দুটি ছেলে, দেশে স্কুলে পড়ছে; একটি মেয়ে, বছর সাতেক বয়স, তাকে ওরা সঙ্গে এনেছে ভারতবর্ষে। কাজের তাগিদে স্বামীকে প্রায়ই ঘুরে বেড়াতে হয়। আইরীণ প্রথম প্রথম সঙ্গে যেত, এখন যাবার উৎসাহ নেই। এত বড় বাড়ীতে তাকে একা থাকতে হয়। তাই দেববাণী যখন আইরীণকে লেখে সে দিল্লী আসছে গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে, ওরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই অতিথি হবার সাদর নিমন্ত্রণ জানায়। দেববাণীরও বেশ চিন্তা ছিল, ভারতবর্ষ ছাড়ার আগে দিল্লী সে আসে নি, শহরটা তার অপরিচিত। মার্কিন বন্ধু দম্পতির আমন্ত্রণ খুশি হয়ে সে গ্রহণ করেছিল। রবার্ট পোস্ট তার কাজে সাধ্যের অতিরিক্ত সাহায্য করছে, দু'তিনজন বিদেশীর সঙ্গে পরিচয় ক'রে দিয়েছে, যাদের কাছেও দেববাণী সাহায্য পাচ্ছে। পোস্টদের গাড়ী সে ব্যবহার করছে। বাড়ীর দোতলায় তাকে ওরা দু'খানা ঘর দিয়েছে, একখানা শোবার, অন্যখানা কাজকর্মের। এমন কি একটা আলাদা টেলিফোনের ব্যবস্থা পর্যন্ত করতে চেয়েছিল, দেববাণী রাজী হয় নি। আহার ও বাসস্থানের জন্য টাকা অবশ্যই সে দিচ্ছে, কিন্তু যে আরামে যত্নে আছে তার তুলনায় কম।

গাড়ী থেকে নেমে দেববাণী দোতলার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে আইরীণের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল।

"বাণী!"

"বল।" নেমে এল দেববাণী।

"তোমার দুটো চিঠি আর একটা 'তার' এসেছে।"

"ফরিন্?"

"না। ইন্ল্যাণ্ড।"

"দেখি।"

চিঠি দু'খানাই বিদেশ থেকে। একখানা হিমাদ্রির। অন্যখানা দেবযানীর। কিন্তু 'তার'? সে 'তার'টা আগে খুলল।

আইরীণের দিকে তাকিয়ে বলল:

"কালই আসছেন।"

"কে ?"

"মা।"

"তাই নাকি ? কালই ! খুব ভালো !"

দেববাণী বলল, "আইরীণ, এখনও সময় আছে, ভেবে দেখ।"

"আবার তোমার মাথায় ভূত চাপল !"

"সত্যি বলছি, এখনও অন্য ব্যবস্থা করা সম্ভব।"

"তোমার পক্ষে সব সম্ভব তা জানি। কিন্তু ওকথা আবার কেন ? যা ঠিক হয়ে আছে তা নিয়ে এই শেষমুহূর্তে কেন অস্থির হচ্ছ ? তার চেয়ে বল, আজ সকালে কি কাজ হ'ল।"

"কাজ অনেকটা এগিয়েছে। সাবিত্রী আম্মা বললেন, মাসখানেকের মধ্যে জমিটা পেয়ে যাব।"

"খুব ভাল। এবার বাড়ীর প্ল্যানটা পাশ করাও, আর ভাল কনট্রাক্টর দেখ।"

"তা করব। টেড্ কবে আসছে ? পরশু ?"

"হুঁ।"

"এ সপ্তাহেই কাজ দুটো ক'রে রাখতে হবে।"

"সাবিত্রী আম্মা আর কি বললেন ?"

"গাল গল্প হ'ল। ঠাণ্ডা লেগে ওঁর একটু জ্বর হয়েছে। তা সত্ত্বেও অনেকক্ষণ কথাবার্তা বললেন।"

"তোমার সেই চিরন্তন 'চার্ম'।"

"তাই বটে। বয়স্কাদের ওপর প্রতিক্রিয়া তার বেশী। মিসেস ডোনাটের কথা মনে নেই ?"

"নেই আবার !" দু'জনেই হেসে উঠল।

"হেসো না।" দেববাণী বলল, "বুড়ী বিগলিত না হলে আজকের কাজে হাত দিতুম কি ক'রে ?"

"তা বটে।" আইরীণ হাসতে হাসতে বলল।

মণিবন্ধে ঘড়ির দিকে নজর নিক্ষেপ ক'রে দেববাণী বলল, "গল্প করার সময় কি আমার আছে, হে ঈশ্বর ! সারাদিন আজ ঘুরে বেড়াতে হবে।"

"আমিও এক্ষুণি বেরুব। ফোর্ডটা আমি নিচ্ছি। তুমি অন্যটা নিয়ে বেরিয়ো।"

"চারটে নাগাদ ফিরে মার জন্য ঘর গুছিয়ে রাখতে হবে। তুমি কি তার আগেই ফিরবে?"

"নিশ্চয়। তোমাকে আমার সঙ্গে চায়ের নিমন্ত্রণ করছি।"

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় যেতে যেতে দেববাণী বুঝল, মনে এখনও সংশয় জমে আছে। মা আসছেন কালই। মা যে আসবেন তা ঠিকই ছিল; দেববাণী নিজেও চায় আসুন। কিন্তু এই বিদেশী গৃহে তিনি আতিথ্য নেন, সে চায় নি। মা-কে নিয়ে আলাদা ফ্ল্যাটে থাকবে ঠিক করেছিল; কাছা-কাছি একটা ফ্ল্যাট দেখেও রেখেছিল। কিন্তু আইরীণ ও রবার্টের ইচ্ছে মা এখানেই থাকুন। অন্তত কিছুদিন। তাঁর অসুবিধা হলে অন্য ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে, করা যাবেও। দেববাণী সহজে রাজী হয় নি। মা বয়স্থা, নিজস্ব জীবন-রীতিতে অভ্যস্তা। সকালে পূজো করেন। নিজের হাতে রান্না ক'রে খান। এ বিদেশী পরিবেশে তিনি সংকুচিত হবেন। কিংবা হয়ত এই মার্কিনদম্পতি তাঁর আচার-বিচার নিয়ে হাসবে, কৌতুক করবে। দেববাণী তা সইতে পারবে না। অথচ মা-কে দেখবার, মা'র সঙ্গে পরিচিত হবার আগ্রহ যেমন এদের তীক্ষ্ণ, এদের জানবার আকাঙ্ক্ষাও তাঁর কম নয়। তা ছাড়া এ বাড়ীতে বাস করায় দেববাণীর অনেক সুবিধা। গাড়ী পাওয়া যায়। সারাদিন দেববাণীকে শহর চ'ষে বেড়াতে হয়। কোথায় য়ুনিভারসিটি, সেখানে আজই তার এক্‌স্‌টেনশন লেকচার শুরু। গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপন নিয়ে ঘোরাঘুরি ত আছেই। টেলিফোন ছাড়াও ত দেববাণী পঙ্গু হয়ে পড়বে! এ সব দিক্ থেকে এক্ষুণি এ বাড়ী ত্যাগ করা তার পক্ষে বড় অসুবিধা।

কাল মাকে আনতে স্টেশনে যেতে হবে।

ঘরে ঢুকে টেলিগ্রামটা দেববাণী লিখবার টেবিলে কাচ চাপা দিয়ে রাখল। তার ঘর দু'খানা বেশ বড়। চক্‌চকে মোজেক-করা মেঝে, বড় বড় জানালা দিয়ে প্রচুর আলো-বাতাস ঘরে আসে। কাজের ঘরে সুন্দর সোফা সেট, দুটো আলমারী, বই-এর শেল্‌ফ, লিখবার টেবিল, বসবার চেয়ার, আরাম-কেদারা। আইরীণ মালীকে দিয়ে ফুলদানীতে সপ্তাহে দু'বার নতুন ফুল রাখায়। পাশেই শোবার ঘর। প্রশস্ত পালঙ্ক, ডানলোপিলোর আচ্ছাদনে নরম। মেঝেয় কার্পেট। একপাশে ওয়ারড্রোব, অন্য দিকে ছোট্ট টেবিল। পালঙ্কের মাথার কাছে সুন্দর ছোট্ট টেবিলে রেডিও। অন্যপাশে আরও একটা টেবিল, তাতে বই, কলম, লেখার সরঞ্জাম। শোবার ঘরের সঙ্গে স্নানের ঘর, বিদেশী কায়দায়। কল থেকে

ঠাণ্ডা, গরম জল পাওয়া যায়। এক প্রান্তে, প্রশস্ত ঘরটার এক কোণ জুড়ে, ড্রেসিং টেবিল, আলনা, লিনেন বক্স।

মনে মনে দেববাণী মা'র জন্যে কি ব্যবস্থা করা হবে ভেবে নিল। এই বড় পালঙ্কটা, আইরীণ বলেছে, সরিয়ে দুটো ছোট খাট পেতে দেবে। সুতরাং শোবার কোনও অসুবিধে হবে না। মা'র এ বাড়ীতে থাকা নিয়ে আইরীণ রবার্টের সঙ্গে যখন আলোচনা হ'ত, তখনই আইরীণ ব'লে রেখেছিল, বাড়ীতে দুটো বাড়তি খাট রয়েছে, বড় পালঙ্কটা সরিয়ে পেতে দেওয়া হবে। বলেছিল একটু রঙ্গ-রস ক'রে, আইরীণের যা স্বভাব। রবার্ট যেমন গম্ভীর, আইরীণ তেমন প্রগল্‌ভা।

"ছোট খাটদুটো ওঘরে পাঠাতে হবে। বাণীর ত আবার একা শোবার অভ্যেস। অন্যের সঙ্গে এক বিছানায় শুতে বোধকরি ও ভুলেই গেছে।"

দেববাণীর মুখ লাল হয়ে উঠছিল।

"সব ব্যাপারেই তোমার মুখ-খারাপ না করলে চলে না?"

"আহা, আহা, বেচারা লাল হয়ে গেল। সত্যি বল, বাণী—"

"তুমি মার খাবে।" বাণী উঠে পড়েছিল।

"না, না। আর বলব না। তাহলে এই ঠিক হ'ল। দুটো খাটের ব্যবস্থা করা হবে।"

অনেক দূরের বিস্মৃতি থেকে একটা দৃশ্য দেববাণীর চোখের ওপর ভেসে উঠল, বাথরুমে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে।

সেই গ্রাম, সেই নিরালা, নির্জীব, নিস্তব্ধ গ্রাম। যার নাম সে এত কষ্ট ক'রেও ভুলতে পারল না। সেই গ্রাম। আর মাটির মেঝে, টিনের-দেয়াল সেই ঘর। সেই ঘর আর সেই মানুষগুলি, আর সেই লোক। দেববাণী চোখ বুজল। আমি দেখব না, দেখব না, দেখব না। তবু তারা ছবির মত স্থির হয়ে দাঁড়াল দৃষ্টির অন্ধকারে। সেই ছোট্ট স্যাঁতসেতে ঘরে পুরানো কালের অসম্ভব ভারী পাথরের মত শক্ত চৌকি। মা'র পাশে সারারাত দেববাণী জেগে। মাও জেগে, সেও জেগে। শীর্ণ গরুতে টানা ছ্যাকড়া গাড়ী চ'ড়ে সারাদিন খুঁজে খুঁজে মা তাকে বার করেছিলেন সেই গণ্ডগ্রামের জীর্ণ গৃহে। রাত্রিতে দেববাণীই তাঁকে ফিরতে দেয় নি। মা'র দেহে ক্লান্তির পাহাড়। তবু নিদ্রাহীন তাঁর চোখ। মা-কে জড়িয়ে ধ'রে কত কান্নাই দেববাণী কেঁদেছিল। সে কি দুঃখের কান্না? আজ আর মনে নেই।

"বাণী! বড় ভুল করলি!" বার বার একই কথা বলেছিলেন মা। "বড় ভুল করলি রে বাণী।"

রাত্রি যখন ভোর হয়ে এল, দেববাণী শুধু বলেছিল: "মা, যদি সত্যিই ভুল ক'রে থাকি, ভুল যেদিন ভাঙবে, সেদিন ত বড় নিঃস্ব, বড় দুর্বল, বড় একা হয়ে যাব। সেদিন তোমাকে পাব ত?"

মা তক্ষুণি উত্তর দেন নি। দেববাণী শুনতে পেল, তিনি অতি নিঃশব্দে বিষ্ণু-স্তোত্র পাঠ করছেন। জানালার ফাঁক দিয়ে প্রভাতের স্নিগ্ধ আলো দেখা দিল। মা উঠে বসলেন। ডান হাতটি বুলিয়ে দিলেন দেববাণীর মাথায়, মুখে, শরীরে। যেন তার হৃদয়ের মধ্যে মুখ রেখে বললেন, "বাণী, বড় ভুল করেছিস। এ ভুল তোর ভাঙবে। কিন্তু তুই ভেঙে পড়িস নে। তোকে আমি নরম তৈরী করি নি। সর্বদা মনে রাখিস, জীবনে পরাজয় যে মানে না, সে হারে না। একদিকে রাস্তা বন্ধ হলে, দশদিকে রাস্তা খোলে। আর মনে রাখিস, তোর মা আছে। এ কথাটা এক মুহূর্তের জন্যে ভুলিস নে! অন্তত দুঃখের সময়, বিপদের দিনে কখনও ভুলিস নে।"

তোমায় আমি কোনওদিন ভুলিনি, মা। দেববাণী গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে বলল। ভুলব কি ক'রে? তুমি ত শুধু মা নও, তুমি যে জননী! তুমি হিমালয়ের মত কঠিন, সমুদ্রের মত অতল, শরতের আকাশের মত উদার, বর্ষার মেঘের মত স্নেহসিক্ত। আমি আজ যে বেঁচে আছি, সে গৌরব তোমার। জাহাজে চ'ড়ে সমুদ্র পাড়ি দিতে বার বার তীরহীন সীমাহীন সুনীল জলধির পানে তাকিয়ে তোমাকে মনে পড়েছে। তোমার কথা মনে হয়েছে প্রত্যেক সাফল্যে, প্রত্যেক ব্যর্থতায়।

আজও আমার যেটুকু লজ্জা, যা কিছু ভয়, তোমার জন্যে।

স্নান সেরে দেববাণী আবার বেরুবার জন্যে তৈরী হল। চুল ভেজায় নি, শুধু মাথায় জল দিয়েছে। ফিকে সবুজ রংএর মাদ্রাজী সিল্কের শাড়ী পরেছে, তার সঙ্গে পুরো হাতার কালো কার্ডিগান। ওয়ারড্রোব খুলে উলের মোজা পরেছে পায়ে আর সামান্য উঁচু হিল জুতো। ব্যাগ হাতে বাইরে এসে দেববাণী দেখল, ড্রাইভার সুজন সিং উপস্থিত। ছোট ফিয়াট গাড়ীটা ঘষে-মেজে চক্‌চকে করেছে। এই ছিপ্‌ছিপে বলিষ্ঠ শিখ যুবকটিকে দেববাণীর বড় পছন্দ; কথা বলে কম, সর্বদা সেবা-পরায়ণ, সতর্ক; মুখে চোখে ধারাল ব্যক্তিত্বের ছাপ। মাথায় গোলাপী কাপড়ের পাগড়ি, গালে সবেমাত্র নতুন দাড়ি গজিয়েছে।

মনিবের কাছে পাওয়া কালো পশমী উর্দি পরিষ্কার, পরিপাটি। এমন কি জুতো পর্যন্ত নতুন পালিশে চক্‌চকে। দেববাণীকে বাইরে দেখতে পেয়ে সুজন সিং হাত তুলে নমস্কার করল। বলল, "এখুনি বার হবেন, না একটু দেরি আছে?"

দেববাণী হাতের ঘড়ি দেখল। প্রশ্ন করল, "মেমসা'ব বেরিয়ে গেছেন?"

"জী হাঁ।"

"তোমার কি কোনও কাজ বাকী আছে?"

"না মাঈজি।"

চট্‌পট্‌ সে গড়ীর দরজা খুলল। দেববাণী বসল ভেতরে। মিনিটের মধ্যে সুজন সিং গাড়ী স্টার্ট্‌ দিল।

দেববাণীর কিছু মনে পড়ল। বলল, "সুজন সিং, খানসামাকে একবার ডাক।"

গাড়ী বন্ধ ক'রে সুজন সিং খানসামাকে ডেকে আনল।

এ লোকটিও পাঞ্জাবী, নাম লছমন সিং। একে দেববাণীর তেমন পছন্দ নয়। রান্না করে ভাল, বিলাতি রান্না জানে অনেক রকম। অবশ্যি আইরীণ রাঁধতে ভালবাসে, খেতেও, তাই বুঝি ওর দেহে সামান্য মেদাধিক্য। কিন্তু লোকটা যেন বড় বেশী চালাক, প্রায় ধূর্ত। দেববাণীর সন্দেহ নেই, সে আইরীণের সংসার থেকে বেশ দু'পয়সা গুছিয়ে নিচ্ছে। বিদেশী সংসারে দেশী এক মহিলার আবির্ভাব সে ভাল চোখে দেখে নি, প্রথমে দেববাণীকে খানিকটা অবহেলা করতে চেষ্টা করেছে। পারে নি। সুজন সিং দেববাণীকে প্রথম দিন মেমসা'ব বলেছিল, সেলাম করেছিল, যেমন আইরীণকে করে। ছেলেটিকে প্রথম দর্শনেই ভাল লেগেছিল, তাই দেববাণী বলেছিল 'মেমসা'ব', বা 'সেলাম' তার পছন্দ নয়, সে যেন তাকে 'মাঈজি' বলে, 'নমস্তে' করে। লছমনকে দেববাণীর ভাল লাগে নি। তার কাছে সে মেমসা'বই থেকে গেছে।

লছমন এসে বলল: "মেমসা'ব!"

"শোন। আমি লাঞ্চ খেতে আসব না, চায়ের আগে ফিরব। বিকেলে একটু কাজ আছে। তুমি, ইব্রাহিম আর মোহন, তোমরা তিনজন তৈরী থেক।"

গাড়ীতে ব'সে দেববাণী বলল, "আজ অনেক কাজ আছে, সুজন সিং। তোমাকেও দোকানে খেয়ে নিতে হবে। বাড়ী যেতে পাবে না।"

"তাতে কোনও বাৎ নেই মাঈজি।"

"প্রথমে চল সেক্রেটারিয়েট।"

স্বদেশের রাজধানীতে সেক্রেটারিয়েট ব্যাপারটা দেববাণীকে খানিকটা

অভিভূত করেছে। ছাত্রী জীবন কেটেছিল কলকাতায়। রাইটার্স বিল্ডিং-এর নাম শুনেছিল অনেক, কিন্তু একবার ছাড়া কোনদিন, তার সংস্পর্শে আসতে হয় নি। কোম্পানী আমলের ওই লাল ইটের বাড়ীটাকে ভাল ক'রে দেখে নি পর্যন্ত কোনওদিন। শুধু একদিন, জীবনের এক চরম দুর্দিনে, একবার তাকে তার গহ্বরে ঢুকতে হয়েছিল। অন্ধকার পথ, অন্ধকার ঘর, আর মোটা একজন সহানুভূতিহীন মাঝবয়সী মানুষ ছাড়া কিছু এখন আর মনে নেই। শুধু মনে আছে লোকটির কর্কশ কণ্ঠস্বর, আর, হ্যাঁ, ডান গালে বড় কাল আঁচিলে দুটি পাকা চুল।

কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিং না জেনে থাকা গেছে, কিন্তু দিল্লীতে সেক্রেটারিয়েট না জেনে, না মেনে, বাঁচবার উপায় নেই।

এ শহরের প্রাণকেন্দ্র হ'ল 'বড়া দপ্তর'। সে এত বড়, এত তার দাপট, তার কাছে মানুষের মূল্য তুচ্ছ। সে চলে নিজের অমোঘ নিয়মের দীর্ঘসূত্র বেতালে; আপন মাহাত্ম্যে সে মাতাল। দেববাণী ভেবেছিল, সেক্রেটারিয়েটের বড় সাহেবরা বুদ্ধিমান, কর্মকুশল, দেশের কল্যাণ তাঁদের, একমাত্র না হোক্, প্রধান কাম্য। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে, প্রয়োজনের তাগিদে, যাঁদের সংস্পর্শে তাকে আসতে হয়েছে তাঁরা অন্য জাতের মানুষ। তাঁরা নিজেদের দাম বড় বেশী বোঝেন, অন্যের দাম বড় কম। তাঁরা বাস্তব থেকে দূরে বাস করেন, পৃথিবীটাকে দেখেন নিজস্ব এক কৃত্রিম দৃষ্টিতে, বিকৃত ক'রে। তাঁরা দায়িত্ব এড়াতে চান, সিদ্ধান্ত নিতে ভয় পান। বলেন বেশী, শোনেন খুব কম। সর্বদা বুঝিয়ে দেন, তাঁরা যা ভাবেন তাই ঠিক, যা করেন তা নির্ভুল। দেববাণীর রাগ হয়, মজাও লাগে। পশ্চিমে তার দশ বছর কেটেছে, কিন্তু ব্যুরোক্র্যাট্‌দের মাহাত্ম্য বোঝবার সুযোগ হয় নি। য়ুরোপ আমেরিকায় সিভিল সার্ভেন্টদের চেয়ার ছেড়ে দিতে সমাজ অভ্যস্ত নয়। ভাতরবর্ষেই উপন্যাসের আদর্শ নায়ক আই. সি. এস। ভারতবর্ষে রাজপুরুষের মর্যাদা আকাশ-উঁচু। পাশ্চাত্ত্যে সরকারী চাকুরেদের প্রতি বেসরকারী মানুষের বরং একটু অবহেলা। ওদেশের সিভিল সার্ভেন্ট সেবক। এদেশে তারা শাসক।

এই ক' সপ্তাহে বহুবার যে তিক্ত অভিজ্ঞতা দেববাণীকে পীড়া দিয়েছে, সেক্রেটারিয়েটের উত্তর ভবনে রিসেপ্‌শন আপিসে দাঁড়িয়ে আজ তার পুনরাবৃত্তিতে সে রুষ্ট হ'ল। পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকবার পর রিসেপ্‌শনিস্ট তার দিকে তাকাল। দেববাণী বলল, মিঃ শ্রীবাস্তবের সঙ্গে দেখা করতে চায়। প্রশ্ন

হ'ল, অ্যাপয়েন্টমেণ্ট আছে? দেববাণী বলল, আছে। রিসেপ্‌শনিস্ট বিরাট তালিকা থেকে শ্রীবাস্তবের টেলিফোন নম্বর বার করল। ডায়াল ক'রে যাকে পেল সে শ্রীবাস্তবের সেক্রেটারী। শুনতে পেল, শ্রীবাস্তব মিটিং-এ ব্যস্ত।

"মিটিং কখন শেষ হবে?"

"তা জানি নে।"

"তিনি আমাকে এ সময় আসতে বলেছিলেন।"

রিসেপ্‌শনিস্ট তখন অন্য সাক্ষাৎপ্রার্থীকে 'স্বাগত' করছে।

"আপনি মিঃ শ্রীবাস্তবের সেক্রেটারীকে জিজ্ঞেস করুন মিটিং কখন শেষ হবে, এবং আমি ওপরে গিয়ে অপেক্ষা করতে পারি কিনা।"

একটু উষ্মার সঙ্গে কথাগুলি বলায় রিসেপ্‌শনিস্টের দৃষ্টি দেববাণী আবার আকর্ষণ করল। আরও একটু জোর দিয়ে এবার দেববাণী বলল, "আমার সময় অত্যন্ত মূল্যবান, একেবারেই অপচয়ের নয়।"

ঘর-ভরা লোক এবার দেববাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে। দেববাণী বুঝল, সে রেগে গেছে। নিজেকে সামলে নিল।

"আপনি অনুমতি করলে আমি একটু বসতে পারি। আগন্তুকদের বসতে বলার নিয়ম বোধহয় এখানে নেই।" এবার একটু হেসে কথাগুলি বলল দেববাণী।

"বসুন, বসুন", টাকমাথা ভদ্রলোক ব্যস্ত হলেন।

"ধন্যবাদ। আপনি টেলিফোন করলে বড় বাধিত হব।"

"টেলিফোনের দরকার নেই। আপনি ওপরে চ'লে যান। আমি স্লিপ তৈরী ক'রে দিচ্ছি।"

শ্রীবাস্তবের সেক্রেটারী দেববাণীকে বসতে দিল। বলল, মিনিট দশেকের মধ্যেই তিনি এসে যাবেন। দেববাণী ব'সে ব'সে এলোমেলো অনেক কিছু ভেবে নিল। ট্রেন লেট আসে কিনা, স্টেশনে টেলিফোন ক'রে কাল সকালে জেনে নিতে হবে। সুজন সিং-কে আসতে বলব, না নিজেই যাব গাড়ী নিয়ে? শ্রীবাস্তব যদি বলে আরও মাসখানেক দেরি হবে তাহলে কি মাদ্রাজের কাজটা সেরে আসব? হিমাদ্রির চিঠি এসেছে দু'দিন হ'ল, আজ তাকে লিখতে হবে। হিমাদ্রির লেখা কয়েকটা কথা মনে বেজে উঠল। "তুমি ভারতবর্ষে, আমি ভিয়েনায় এও যেমন সত্য, তেমনই সত্য যে আমরা দুজনে একই পৃথিবীতে, একই সৌর-জগতে। দূরত্ব ও নিকটত্বের কোনও মাপ নেই, বাণী। দুটো

মানুষ পাশাপাশি শুয়ে থেকেও অনেক, অনেক দূর ; আবার নর্থ পোলে দাঁড়িয়ে সাউথ পোলের বন্ধুকে মনে হ'তে পারে বড় কাছে।—" হিমাদ্রি বৈজ্ঞানিক হ'লে কি হবে, ওর মন শিউলি ফুলের ইশারায় যত সহজে সাড়া দেয়, গ্র্যাভিটেশনে তত নয়। হিমাদ্রি বলে, "পদার্থবিদ্যা নিয়ে মাথা ঘামালে কি হবে, মানুষটা আমি অপদার্থই রয়ে গেলাম।"

দেববাণীর মন থেকে তিক্ততাটুকু বুঝি কেটে গিয়েছিল ; কৌতুক স্নিগ্ধ হাসি ওর সুগঠিত চিবুকে খেলা করছিল। ললিতপ্রসাদ শ্রীবাস্তব মিটিং শেষ ক'রে নিজের কামরায় ফিরবার সময় দেখলেন, বেশ খুশি মনেই দেববাণী অপেক্ষা করছে। তাই আরও দশ মিনিট পরে তাঁর কামরায় দেববাণীর ডাক পড়ল।

ললিতপ্রসাদ শ্রীবাস্তব ফাইলে চোখ রেখে বললেন, "বড় দুঃখিত। আপনাকে অপেক্ষা করতে হ'ল।"

দেববাণী কণ্ঠে সামান্য শ্লেষ এনে, মুখে হাসি রেখে বলল, "আধ ঘণ্টা। এখনও যদি আধখানা মন দিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলেন, তাহলে আজ না হয় থাক।"

"না, না। পুরো মন দিয়েই কথা বলছি।" শ্রীবাস্তব সোনাবাঁধান দাঁত বার ক'রে হাসলেন। দেবরাণী দেখতে পেল, হাসলে তাঁর চোখ প্রায় পুরোপুরি বুজে যায়। "আমাদের জীবন ত আপনারা জানেন না! আমরা মনুষ্যসমাজের একেবারে বাইরে।"

"অতি-মানুষের সমাজে।"

"অতি কিম্বা নেতি জানি নে।" চোখ বুজে শ্রীবাস্তব পুনবায় হাসলেন। "তবে মানুষ যে আর নই, তা বেশ বুঝতে পারি। এখন বলুন, কি আপনার জন্য করতে পারি।"

"এমন ভাবে কথা বলছেন যেন আমি এই প্রথম আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী।"

"তাই নাকি?" চোখ বুজে আবার হাসলেন শ্রীবাস্তব। "অভ্যেস, বুঝলেন ডাঃ রায়, অভ্যেস। বাড়ীতে গিন্নী কাছে এসে দাঁড়ালেও ব'লে ফেলি, হোয়াট্ ক্যান্ আই ডু ফর ইউ?"

"আমার প্ল্যানটার কি হ'ল? বলেছিলেন আজ খবর নিতে, তাই এসেছি।"

"ও, হ্যাঁ, আপনার রিসার্চ সেণ্টার? দেখুন, ডাঃ রায়, প্ল্যানটা ত ভাল মনে হচ্ছে, কিন্তু কতগুলি ডিফেক্ট্ যেন দেখতে পেলাম।"

"ডিফেক্ট্? কি ধরনের?"

"আমি নোট দিয়েছি ওগুলো দেখিয়ে। মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে এখনও ফেরত আসে নি। অন্তত এসেছে ব'লে আমি জানি নে।"

"অর্থাৎ, ব্যাপারটা যাতে আরও জটিল হয়ে যায়, আরও দেরি হয়, তার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন।"

"কি করব, বলুন। আমাদের সব জিনিস খুঁটিয়ে দেখতে হয়। দেশের স্বার্থ, পাব্লিকের স্বার্থ যেখানে জড়িত, সেখানে চট ক'রে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়।"

"কি ধরনের ডিফেক্ট্ আপনার চোখে পড়ল?"

"তা ত আপনাকে বলা যাবে না, ডাঃ রায়। সরকারী ব্যাপার। আমাদের অনেক কিছু ভেবে দেখতে হবে। ধরুন, ভেবে দেখতে হবে, এমন একটা রিসার্চ সেণ্টার, যার প্রয়োজনীয়তা আমরা সবাই স্বীকার করি, কোনও ব্যক্তি বিশেষের কর্তৃত্বে না হয়ে সরকারী কর্তৃত্বে হওয়া উচিত কিনা। প্রাইভেট ম্যানেজ্মেণ্ট থাকলেও সরকার যদি জমি ও অর্থ সাহায্য দেন, তাহলে কতখানি নজর তার ওপরে রাখা দরকার হবে। তা ছাড়া আরও কথা আছে, যা আপনাকে বলা যায় না।"

শুনতে শুনতে দেববাণীর গা জ্ব'লে গেল। শ্রীবাস্তব থামলে সে বলল, "দেখুন মিঃ শ্রীবাস্তব, আপনি যদি ভেবে থাকেন এ রিসার্চ সেণ্টার স্থাপন করার পেছনে আমার কোনও দুষ্ট স্বার্থ আছে, বড় ভুল করছেন। আমি নিজের চেষ্টায় বিদেশীদের সাহায্যে, য়ুরোপে ও আমেরিকায় কিছু কাজ করেছি। ভারত সরকার আমায় কোনও সাহায্য করেন নি। কষ্ট ক'রে কিছু অর্থ আমি সঞ্চয় করেছি। তার সঙ্গে আমার বিদেশী সুহৃদ্রা বেশ কিছু অর্থ যোগ করতে প্রস্তুত। ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের প্রসার নিয়ে আপনারা অনেক কথা ব'লে থাকেন। আমরা কত পেছনে প'ড়ে আছি, এগোবার আমাদের কি ভীষণ দরকার, আপনিও জানেন, আমিও। দিল্লীর সর্বত্র প্রচুর খোলা জমি। আমি কয়েক একর জমি ও সামান্য অর্থ আপনাদের কাছ থেকে চাইছি। সেণ্টারের পরিচালনার ভার আমি একটি বোর্ড অব ট্রাষ্টির হাতে দেবার প্রস্তাব করেছি, তাতে আপনাদের মনোনীত সদস্যও থাকবেন। যদি আপনারা রিসার্চ সেণ্টার না চান, আমাকে পরিষ্কার বলে দিন। আমার দুঃখ হবে, কিন্তু স্বার্থহানি হবে না।"

শ্রীবাস্তব যেমন ভাল বক্তা তেমন ভাল শ্রোতা নন। দেববাণী থামতেই

তিনি বললেন, "আপনার উদ্দেশ্য বা আন্তরিকতা নিয়ে আমাদের সন্দেহ নেই। আমাদেরও ত বিষয়টা বিচার ক'রে দেখতে হবে! যে-সব বিদেশী আপনাকে অর্থ সাহায্য করছেন, তাদের কোনও অন্য উদ্দেশ্য আছে কি না ভেবে দেখতে হবে। আপনি বলেছেন, এক মার্কিন মহিলা আপনাকে দু'লক্ষ ডলার দিতে রাজী আছেন।"

"আমাকে নয়। রিসার্চ সেণ্টারকে।"

"একই কথা। যদি সেণ্টারটা আমি স্থাপন করি তিনি নিশ্চয় এক পয়সা দেবেন না।"

রসিকতা করতে পেরে শ্রীবাস্তব হাসলেন। পরে আবার বললেন, "কথাটা আমি এমনি তুললাম। এসব বিদেশী সাহায্য-প্রস্তাবগুলি আমাদের ভেবে দেখতে হবে।"

দেববাণী প্রায় হতাশ হ'ল। "ভেবে দেখতে কত সময় নেবেন আপনারা?"

"তা সময় ত একটু লাগবেই। এসব কাজ তাড়াতাড়ি হয় না।"

"কিন্তু আমার হাতে সময় যে বড় কম। আমি দু' মাসের বেশী থাকতে পারব না।"

"এর মধ্যেই আমাদের সিদ্ধান্ত আপনি জানতে পারবেন আশা করছি।"

"এটুকু দয়া করবেন।" দেববাণী উঠল। "আমি দু'মাসের ছুটিতে দেশে এসেছি। দিল্লী ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার এক্সটেন্শন লেকচার আছে, কিন্তু আসল কাজ আমার এই সেণ্টার স্থাপনের ব্যবস্থা করা।"

শ্রীবাস্তবও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

এমন সময় টেলিফোন বাজল।

দেববাণী পা বাড়াতে গিয়ে শ্রীবাস্তবের মুখে নিজের নাম শুনে দাঁড়িয়ে গেল। বুঝতে পারল শ্রীবাস্তব ঊর্ধ্বতন কোনও অফিসারের সঙ্গে তারই বিষয়ে কথা বলছেন:

"আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার; ডাঃ রায় আমার ঘরে আছেন।···ফাইলটা ত আপনাকে গত সপ্তাহে পাঠিয়ে দিয়েছি···না, স্যার, এ ধরনের কোনও রিসার্চ সেণ্টার আমাদের নেই···হাঁ, স্যার,···নিশ্চয়, স্যার, অবশ্য···"

টেলিফোন নামিয়ে রেখে শ্রীবাস্তব দেখতে পেলেন দেববাণী চেয়ার জুড়ে ব'সে আছে।

"আমার সম্বন্ধেই কথাটা হচ্ছিল যেন, মিঃ শ্রীবাস্তব।"

"আপনি আগামী সপ্তাহে সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করবেন। মঙ্গলবার ফোনে এ্যাপয়েন্টমেণ্ট করবেন।"

"নমস্তে। আপনার সাহায্যের জন্য আমি সত্যি কৃতজ্ঞ।"

লিফটের জন্যে অপেক্ষা করল না দেববাণী। লঘুপদে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামল। কাজ এগোচ্ছে কিনা সে বুঝল না। হিমাদ্রিকে আশাজনক কিছু লিখবার মত ঠিক পাওয়া গেল না। রিসার্চ সেণ্টারের স্বপ্ন আসলে তার নয়, হিমাদ্রির। হিমাদ্রির উৎসাহ দেববাণীকে টেনেছে। আমেরিকা ছেড়ে যাবার আগের দিন হিমাদ্রি বার বার এরই কথা বলেছে। "বাণী, তুমি নিজে বড় হয়েছ, এবার দেশের দিকে তাকাও। সুযোগ পেলে অনেক মেয়ে তোমার মতো হতে পারবে।"

"আমার মত হওয়াটাকে কোনও মেয়ের পক্ষে সৌভাগ্য মনে কর তুমি?" বিষণ্ণ স্বরে জবাব দিয়েছিল দেববাণী।

নিউইয়র্ক শহরে ছোটখাট রেস্তোরাঁয় দু'জনে কফি পান করছিল। গম্ভীর হয়ে হিমাদ্রি বলেছিল, "সৌভাগ্য ব্যাপারটা কি, আজও বুঝলাম না, বাণী। ধন নয়, মান নয়, শুধু সুখের বাসা। শুধু ভালবাসা।"

"তাই বা নয় কেন?"

"এই দেখ, তুমিও জানো না। তোমার ভাগ্য তোমাকে যেখানে টেনে এনেছে তার কাছাকাছি পৌছতে পারলে অনেক মেয়ে ধন্য হবে।"

"তাতে এটুকু বোঝা গেল যে মেয়েদের সম্বন্ধে তুমি কিছু জান না।"

"আমি তোমাকে জানি।"

"আমাকেও তুমি জান না, হিমাদ্রি। আর জান না ব'লেই তুমি অমনি ক'রে ভিয়েনা পালিয়ে গেছ।"

"তা নয়।" কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে হিমাদ্রি বলেছিল। "তা নয়, বাণী। তোমাকে জানি ব'লেই আমি দূরে চলে গেছি। তোমরা ভাব, ভাবতে ভালবাস, আমরা তোমাদের জানিনে। কিন্তু আমরা যে তোমাদের জানি তা তোমরা জান না। তোমাকে আজ ষোল-সতর বছর দেখে আসছি, এই দীর্ঘকালের চেষ্টায় তোমাকে আমি জানি। জানি কোথায় তোমার দ্বিধা, কোথায় দ্বন্দ্ব; কোথায় তোমার শক্তি, কোথায় দুর্বলতা। অনেক বড় হয়েও কেন তুমি মাথা নীচু ক'রে থাক। সব আমি জানি। তোমার কথা, যা অনেক কিছু তুমিও জান না, তাও আমি জানি।"

কেমন ক'রে তুমি আমায় এমন ভাবে জানলে, হিমাদ্রি? সিঁড়ি শেষ ক'রে দেববাণী বাইরে এল। আমি নিজেই যে নিজেকে জানি নে! বুঝি নে কেন মন হঠাৎ ভারী হয়ে ওঠে, কেন সে পালাতে চায়। এই ত এক্ষুণি সে আবার পালাতে চাইছে। বলছে, কি হবে এ সব রিসার্চ সেণ্টারে, চল, চ'লে যাই অন্য কোথাও। চল লণ্ডনে যাই। দেবকুমার, দেবু, আছে ওখানে; দেবযানী আছে। চল ভিয়েনা যাই, হিমাদ্রি আছে। চল আমেরিকায় ফিরে যাই। দেশে আসবার জন্যে অস্থির হয়েছিলাম, এসে ভালই লাগছে, কিন্তু হঠাৎ যেন কিছুই ভাল লাগে না, মনে হয় চ'লে যাই, একদিন, অনেকদিন আগে, যেমন চ'লে গিয়েছিলাম। কিন্তু তেমন যাওয়া জীবনে আর হবে না। সে ছিল মুক্তির ডানায় ভর দিয়ে অনন্ত আজানা আকাশে উড়ে যাওয়া, সত্যিকারের পালান, পাখী যেমন পালায় বন্ধ ঘরের দরজা হঠাৎ খোলা পেয়ে, বিদ্যুৎ যেমন পালায় মেঘের অন্ধকার থেকে।

বাইরে দাঁড়িয়ে গাড়ী খুঁজছিল দেববাণী। হঠাৎ দেখতে পেল, সুজন সিং গাড়ী নিয়ে তার সামনে। দরজা খুলে দিল। ভেতরে ব'সে দেববাণী বলল, "য়ুনিভারসিটি যেতে পারবে?"

"জী হাঁ।"

গাড়ী চলল।

নতুন দিল্লীর প্রশস্ত রাজপথ পেরিয়ে, পুরাতন দিল্লীর জনাকীর্ণ রাস্তা ছাড়িয়ে, অনেক দূরে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়। শহরের একেবারে বাইরে নতুন উপশহর। নির্জন, নিঃশব্দ ছায়াশীতল পরিবেশ। বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে বক্তৃতা দিতে হবে ভেবে দেববাণীর রক্ত কিঞ্চিৎ চঞ্চল হ'ল। বিদেশে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সে পড়িয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষে, নিজের দেশে, বিশ্ববিদ্যালয়ে নিমন্ত্রণ এই তার প্রথম।

ধাবমান গাড়ীতে ব'সে দেববাণী নিজের জীবনের সুদীর্ঘ ছবি দেখতে পেল। সেই আমি কি এই আমি? এই ত সেদিন, সব কিছু অন্য রকম ছিল, এই ত সদিন! হাতিবাগানে সরু নোংরা গলির পুরানো দোতলা ফ্ল্যাটে দু'খানা রে ছোট্ট সংসার: মা, আমি, দেবযানী। সেখানে যাদের ভিড়, তারা কবল ভবিষ্যতের রং-বেরং স্বপ্নে মগ্ন। সে স্বপ্ন-জগতে আকবর বাদশা আর রিপদ কেরাণীর ছিল না কোনও তফাৎ। তারপর এল ঝড়। কোথা থেকে ক'রে এল আজও জানি নে। সব তচনচ হয়ে গেল। ভেঙ্গে গেল

আমাদের অনেক আশা-দিয়ে-ঘেরা বাসা, আমি ছিটকে পড়লাম অন্ধকার গহ্বরে। যেদিন মূর্ছা ভাঙ্গল, কি ক'রে সেদিনও বেঁচে ছিলাম? মা নিয়ে এলেন অর্ধচেতন আমাকে। তার পর শুরু হ'ল নতুন ক'রে বাঁচবার লড়াই। কি ভীষণ সে সংগ্রাম! একটি নির্যাতিত বাঙ্গালী মেয়েকে জীবনের রাজপথে দাঁড়াতে দিতে এত মানুষের এত আপত্তি যে কেন দানা বেঁধে উঠল, আমি কোনও দিন বুঝতে পারিনি। তাকে রাস্তায় মুখ থুবড়ে প'ড়ে থাকতে দেখলে তারা সবাই কি সুখী হ'ত? সে সংগ্রামেও আমি জিতলাম। না কি মা জিতলেন। তার পর? তার পর এক অঘটন ঘটল। আমার আশে-পাশে, ঘোরতর দুর্দিনে, একজোড়া সতর্ক স্নেহশীল চোখ যে এতদিন বিচরণ ক'রে এসেছে তা কি আমি জানতাম? কোথা থেকে কোন্ যাদুতে কলেজে চাকরি পেলাম, রিসার্চের সুযোগ পেলাম। তখন কোথায় আমার সময়? সকাল না হতে যে পরিশ্রম শুরু হ'ত মধ্যরাত্রি পেরিয়ে তার শেষ। যেদিন ডক্টরেট পেলাম, মা, তুমি আনন্দে কাঁদলে, দেববানীর খুশির শেষ নেই, আর আমার কি গভীর, অতল শ্রান্তি, কি নিষ্প্রাণ নির্বোধ ঘুম!

এর পরে একদিন হঠাৎ পৃথিবী আমায় ডাকল। আটাশ বছর বয়সে যে মেয়ে বাংলা ছেড়ে একবার মাত্র জব্বলপুর গিয়েছিল, সে চ'লে গেল আমেরিকা। নতুন, নতুন, সব কিছু নতুন। শুধু শহর নয়, পথ-বাজার নয়, মানুষ নয়, সমস্ত জীবনটাই যে নতুন! দশ-বার বছর আমেরিকা, য়ুরোপ ঘুরে যে দেববাণী তৈরী হ'ল সে কে? সে কি সেই মেয়েটি? দেববাণীর নাম হ'ল। তার গবেষণা আন্তর্জাতিক সম্মান পেল। বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় চাকরি পেল সে। এই দেববাণী কি সেই দেববাণী?

সেই দেববাণী ছিল লাজুক, ভীরু, পরাধীন ভারতবর্ষের মেয়ে। এই দেববাণী আণবিক যুগের পৃথিবীর নারী বৈজ্ঞানিক।

আণবিক যুগ! হাসি পেল দেববাণীর। এই আজকের দেববাণী কেবল আণবিক যুগের নারী নয়, বৈজ্ঞানিক। আন্তর্জাতিক সুনাম তাকে ডেকে এনেছে, সাদর নিমন্ত্রণে এনেছে ডেকে, স্বদেশের দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে। আজ আধ ঘণ্টা পরে, সে বক্তৃতা দেবে ভারতবর্ষের য়ুনিভারসিটিতে। কি বলবে? বিষয় ত নির্বাচিত। সায়ান্টিফিক্ ম্যান, বিজ্ঞানযুগের মানুষ। এখানে 'ম্যান' মানে যে পুরুষ নয় দেববাণীই তার প্রমাণ। কিন্তু দেববাণী ত কেবল মানুষ নয়, সে যে মেয়ে মানুষ। একদিন সে ছিল মেয়ে, এখন নারী। শুধু নারী

নয়, ভারতবর্ষের নারী। সাবিত্রী আম্মা আজই সকালে বলেছিলেন, ভারতবর্ষে হিন্দু হয়ে জন্মাবার একটা দুরপনেয় দায়িত্ব আছে। দেববাণী জানে। ভারতবর্ষ দেশ নয়, সংস্কৃতি ও সংস্কার। আমাদের রক্তের স্রোতে ধমনীতে ধমনীতে ভারতবর্ষ প্রবাহিত। তাই এই আণবিক যুগেও বিদেশে গিয়ে আমরা একা। পশ্চিম আমাদের শিক্ষা দেয়, দীক্ষা দেয় না ; সে নিজেই যে দীক্ষা হারিয়েছে। সভ্যতা শেখায়, সভ্য করে না ; তার নিজের সভ্যতাই যে বিপন্ন। ভারতবর্ষে জন্মাবার দায়িত্ব সর্বক্ষণ আমাদের বুকের ওপর বোঝা হয়ে থাকে। দশ বছরের বিদেশ-প্রবাস দেববাণীকে হাড়ে হাড়ে এ সত্য বুঝিয়ে দিয়েছে। অনেক কিছুই আমরা করতে পারি নে, দিতে বা নিতে পারি নে, যেহেতু আমরা ভারতবর্ষের মেয়ে। অনেক কিছু আমরা বুঝতে পারি, জানতে পারি, দেখতে পাই, যা ওরা জানে না, বোঝে না, দেখে না, কারণ আমরা ভারতবর্ষের মেয়ে।

ভারতবর্ষে জন্মাবার দায়িত্ব যে কত বড়, এ সত্য বিদেশে যাবার আগে দেববাণীর মনে হবার কারণ ছিল না। বিদেশে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে এ দায়িত্ব সে অনুভব করেছে। শুধু বিদেশী পুরুষ-বন্ধুদের সান্নিধ্যে নয়, একান্ত ভারতীয় হিমাদ্রি বসুর কাছেও। হিমাদ্রির কাছে যেন আরও বেশী, কেন না, হিমাদ্রি ভারতবর্ষের প্রাণশক্তির টুকরো। তাই হিমাদ্রিকে একান্ত কাছে পেয়েও সে গ্রহণ করতে পারে নি। তাই ত বার বার দেববাণী নিজেকে বলেছে, এটা বিদেশ, দেশ থেকে অনেক দূর। এখানে আমি স্বাধীন। কিন্তু তবু ভারতবর্ষের বন্ধনে আমি স্বাধীন নই। আমাদের মধ্যে যা সবচেয়ে বড় ব্যবধান, তার নাম ভারতবর্ষ।

কি বিচিত্র এ দেশ, এই ভারতবর্ষ! কোথাও এর সংহতি নেই, সমন্বয় নেই, মিল নেই। কি দুস্তর ব্যবধান, কি ভয়ংকর অমিল। জীবনের ঝড়ে টুকরো টুকরো ভারতবর্ষ। য়ুরোপ আমেরিকা তাই আমাদের জানে না, বোঝে না। ভারতবর্ষের মেয়েরা ওসব দেশের কাছে রহস্য। ওরা ভাবে, শাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে আমরা গোপন যাদু লুকিয়ে রাখি। জানে না, যা লুকিয়ে রাখি তা আমাদের হাজার হাজার বছরের প্রাচীনতা। শত শত বছরের অভিজ্ঞান লুকিয়ে নিয়ে আমরা চলি। ওরা আমাদের বৈষম্য দেখে অবাক হয়। ওরা বৈষম্যকে জয় করেছে, ধ্বংস করেছে, আমরা আরও বিষম করেছি। আমাদের দেশে মেয়েরা মন্ত্রী, রাজদূত, বৈজ্ঞানিক ; আমাদের দেশে মেয়েরা নোংরা, মূর্খ, পর্দানশীন, শত অপমানে, নির্যাতনে ধরিত্রীর মত নির্বাক। ভারতবর্ষ কার

পরিচয়ে পরিচিত ? যে নারী মন্ত্রী, না যে অর্ধ-বিদেশিনী, যে আজ রোম কাল নিউইয়র্ক করে, তার ? না, যে এখনও সকাল থেকে মাঝ রাত্রি পর্যন্ত দরিদ্র স্বামী, একপাল সন্তানের সেবা ক'রে দু'মুঠো অন্নের সঙ্গে সহ্য করে অশেষ গঞ্জনা, অজস্র অপমান, তার ? না, আমার মা'র মত যারা বহু শতাব্দীর বিপ্লব নিজের জীবনের মধ্যে হজম ক'রে নিয়েছেন, যাঁদের জ্ঞান অপরিসীম অথচ শিক্ষা সামান্য, বল অতুলনীয় অথচ সম্বল তুচ্ছ, ক্ষমা ও সহনশীলতা যাঁদের অক্ষয়, তাঁদের ? এ আণবিক যুগে ভারতবর্ষের প্রতীক মেয়ে কারা ? দেববাণী দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমি জানি নে।

গাড়ী ঢুকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটকে। দেববাণী সতর্ক হ'ল। দেখতে পেল কয়েকজন অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, ছাত্র-ছাত্রী তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ী থামল। তারা সবাই এল এগিয়ে। দরজা খুলে বাইরে আসতে তারা দেববাণীকে স্বাগত করল।

জীবনের এক বড় ঘটনার সামনে দাঁড়িয়ে দেববাণীর মন হঠাৎ বহুদূরে চ'লে গেল। শহর কলকাতা। সার্কুলার রোড। সায়ান্স কলেজের বিরাট সাদা অট্টালিকা। ক্লান্ত, ক্লিষ্ট একটি মেয়ে, শুধু জীবনে হার-না-মানার সংকল্প সম্বল ক'রে, ধীরে ধীরে, প্রশস্ত সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। হ্যাঁ, সে উঠেছিল। অনেকের অনেক বাধা সত্ত্বেও সে উঠেছিল।

তুমি যে তাকে উঠতে দেখেছিলে, হিমাদ্রি, সেই দিন থেকে, তা সে জানত না। আজ জানে। তাই আজ সে দেখতে পাচ্ছে, ভিয়েনা য়ুনিভারসিটির গবেষণাগারে ব'সে, তুমি খুশির হাসি হাসছ।

তিন

চায়ের বেশ খানিক আগে দেববাণী বাসায় ফিরল।

ক্লান্ত হ'লেও মনে প্রচ্ছন্ন প্রশান্তি। সার্থকতার মোলায়েম তৃপ্তি দিনের সঞ্চিত অনেকখানি গ্লানি মুছে দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিনের বক্তৃতা ছাত্রদের আশাতীত আনন্দ দিয়েছে। বক্তৃতার শেষে অধ্যাপকদের বিশ্রাম-কক্ষে দেববাণীর জন্যে ঘরোয়া ছোট্ট স্বাগত-অনুষ্ঠানের আয়োজন হ'ল। ভাইস-চ্যান্সেলার চেয়েছিলেন অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ দেববাণীর সঙ্গে খোলা মনে কথাবার্তা বলবেন। কিন্তু ছেলেমেয়েরা এসে ভিড় জমাল; অনুষ্ঠান দখল ক'রে বসল। দেববাণীকে ঘিরে দাঁড়াল তারা, দলবদ্ধ, কচি কোমল, অনুভূতি-কাতর মুখ, চোখে ঔৎসুক্য, ঔদ্ধত্য, সংশয়। বড় ভাল লাগল দেববাণীর। বক্তৃতা দেবার সময় শ্রোতাদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বিলীন; বহু ব্যক্তির বদলে বক্তার চোখের সামনে জমাট হয়ে থাকে নৈর্ব্যক্তিক সমষ্টি, কঠিন, ক্ষমাহীন, যেন বহু দূরের কোন বিজাতীয় পরিবেশ। বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে সে-বাতাবরণ গ'ড়ে ওঠে না যা সংলাপ-প্রসূ। যে সব মুখগুলি প্রকাণ্ড হল-ঘরের গ্যালারীতে দেববাণীর দিকে সারি সারি দৃষ্টিবদ্ধ হয়ে ছিল, তাদের মধ্যে কোথায় ছিল এই অতিঘনিষ্ঠ প্রাণ-প্রাচুর্য, যা অধ্যাপকদের কমন-রুমে দেববাণীর চতুর্দিকে ঘন হয়ে দাঁড়াল! ওদের দিকে তাকিয়ে মনে পড়ল দেববাণীর সে নিজেও একদিন এমনি ছিল। আমিও ছিলাম তোমাদেরই একজন, কিন্তু সে ত আজকে নয়, সে আজকে নয়, সে বহুদিনের পুরানো ইতিহাস। তবু সে জীবন্ত। এই যে তুমি, কি নাম তোমার? কমলা চৌহান, তোমারই মত সেদিন ছিলাম আমি, এমনি বেশবাসে উদাসীন, অবিন্যস্ত চুল, হাতে বই-খাতার বোঝা, চোখে অবাধ্য জিজ্ঞাসা, বুকে সমুদ্রের গর্জন।

কোন দুর্দম্য বাৎসল্যে দেববাণী মেয়েটির কাঁধে হাত রেখে প্রশ্ন করল, "বিজ্ঞান পড়?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। ফিফ্‌থ ইয়ার।"

"না। অ্যাপ্লায়েড কেমিষ্ট্রি।"

"খুব ভাল। পাশ ক'রে চাকরি, না গবেষণা, না বিয়ে?

"চাকরি।"

"গবেষণা নয়?"

"চাকরির দরকার আছে," মেয়েটি মৃদু, নম্র স্বরে বলল।

"বেশ ত, চাকরি ক'রেও গবেষণা চলে। বিদেশে হাজার হাজার লোক তাই করে। তাদের মধ্যে মেয়ের সংখ্যা কম নয়।"

"আপনার বক্তৃতা আমাদের খুব ভাল লেগেছে," সরল খুশির উচ্ছ্বাসে মেয়েটি বলল।

"যদি জিজ্ঞেস করি, কেন ভাল লাগল?" দেববাণীর মুখে হাসি। সবার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল সে।

"বিজ্ঞানের কথা এমনি ক'রে আমরা আগে শুনিনি। বিজ্ঞানকে এমন ভাবে আমাদের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে আমরা আগে দেখিনি।"

মুখের হাসি মিলিয়ে গেল দেববাণীর। কোথায় সমুদ্র রাজে, বুঝি আমার হিয়ার মাঝে। দেববাণীর মনে কথা বেজে উঠল, প্রত্যেকটি কথা এক টুকরো বেদনা। আমরা ব'লে থাকি, সবার উপরে মানুষ সত্য। কিন্তু কথাটা একবার ভেবে দেখি না। ভাবলে বিস্ময়ের শেষ থাকে না। মানুষকে সবার উপরে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে বিজ্ঞান। জীবনের সম্ভাবনা-সীমানা এত বেড়ে গেছে যে তার নাগাল আমরা লাগাম-ছাড়া কল্পনাতেও পাই নে। এক মহা আশ্চর্য যুগে আমরা বাস করছি। দেশ, কাল, পাত্র সব বদ্‌লে একাকার হয়ে যাচ্ছে। তোমরা ভারতবর্ষের ছেলেমেয়েরা, কী বিচিত্র সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ তোমাদের সামনে! ভাবতে শেখ, বড় ভাবনা, অনেক বড়, আকাশের চেয়ে উঁচু, পৃথিবীর চেয়ে বড়। মানুষ ত আজ তাই। পৃথিবী তাকে ধরতে পারছে না। আকাশ তাকে বাঁধতে পারছে না। সমস্ত পৃথিবী এসে দাঁড়িয়েছে তোমাদের প্রাঙ্গণে।

বাড়ী ফিরে দেববাণী কাপড় বদলাল। লোকজন ডেকে আসবাব-পত্র বদ্‌লে ঘর দু'খানাকে মা'র আসন্ন আগমনের জন্য নতুন ক'রে সাজিয়ে নিল। স্নান-ঘরে গিয়ে মুখ-হাত-পা ধুয়ে আইরীণের চায়ের বৈঠকে যাবার জন্যে তৈরী হ'ল। পরল ফিকে নীল রংএর কাশ্মীরী সিল্ক, ওপরে হালকা হলুদ গরম কার্ডিগান।

সামান্য প্রসাধন করল। পাউডারের ক্ষীণ প্রলেপ, চুলে চিরুণীর সযত্ন সঞ্চারণ। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, কিছু সময় এখনও আছে। বসল হিমাদ্রিকে চিঠি লিখতে। এখন শেষ হবে না, কিন্তু আরম্ভ ক'রে রাখা যাক।

নীচে নেমে দেববাণী যখন আইরীণের বৈঠকখানায় ঢুকল, তখন ছোট্ট একটি চা-পায়ী সমাবেশ ঘরখানাকে মুখর ক'রে তুলেছে!

দেববাণীকে দেখে আইরীণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। অন্তত ভয়ানক বিস্ময়ের ভান করল। "বাণী! তোমার হয়েছে কি?"

সমবেতদের মধ্যে একজন ছাড়া সবাই দেববাণীর পরিচিত। তাদের সংক্ষিপ্ত অভিবাদন ক'রে সে হাসতে হাসতে বলল, "কি হয় নি তাই বল।"

"প্রেমে পড় নি নিশ্চয়," দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে আইরীণ জবাব দিল।

"ভুল। আজ ভয়ঙ্কর প্রেমে প'ড়ে গেলাম।"

"কার প্রেমে?"

"এক পাল ছেলেমেয়ের।"

দেববাণী বসল। আইরীণের চোখে চোখ রেখে বলল, "হতাশ হলে?"

আইরীণ কাঁধ আর বাহুর ভঙ্গি ক'রে বলল, "তোমাকে নিয়ে আশা করলাম কবে, যে হতাশ হব?"

এক টুকরো কেক খেতে খেতে দেববাণী বলল, "সত্যি আজ প্রেমে প'ড়ে গেলাম। তাই মনটা খুশি-খুশি। অনেক দিন এমন খুশি লাগে নি।"

আমন্ত্রিতদের মধ্যে সুদর্শন, সুচতুর, সুবেশ একটি যুবক, সুভাষ প্যাটেল। আইরীণদের বাড়ীতে প্রায়ই আসে। ফুলব্রাইট বৃত্তি পেয়ে আমেরিকা গিয়েছিল; ফিরে এসে সরকারী কাজ পেয়েছে। দেববাণী তাকে চেনে। খুব একটা পছন্দ করে না। আইরীণ সুভাষ প্যাটেলকে বলল, "আজ বাণীর বক্তৃতা শুরু হ'ল দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে।"

নিরুৎসাহ কণ্ঠে সুভাষ প্যাটেল মন্তব্য করল, "বক্তৃতা করতে পারলে অধ্যাপকগণ নিদারুণ খুশি হয়ে ওঠেন।"

"ঠিক বলেছেন," মানল দেববাণী। "কিন্তু অধুনা এদেশে তাঁদের একটু অসুবিধা দেখা দিয়েছে।"

"কি রকম?"

"শুনতে পাই, এদেশে বক্তৃতা করবার একচেটিয়া অধিকার বর্তমানে

পলিটিশিয়ানরা দখল ক'রে নিয়েছেন। অধ্যাপকদের আর কোনও সুযোগ মিলছে না।"

"তাঁদের জন্যে ক্লাসরুম আছে। আর আছে দলে দলে অমনোযোগী ছাত্রছাত্রী, যারা কান দিয়ে দেখে, চোখ দিয়ে শোনে।"

"তাই বা আর পুরো রইল কোথায়? শুনতে পাই, স্কুল-কলেজেও কোন অনুষ্ঠান হলে রাজনৈতিক নেতাদের পদস্পর্শে তাকে পবিত্র করে নিতে হয়। ক্লাসরুমে ত বক্তৃতা হয় না, মিঃ প্যাটেল, পড়াশুনা হয়! অন্তত হওয়া উচিত। কিছু কিছু ভাল ছেলেমেয়ে তৈরী হয়; তাদের কেউ কেউ আবার বৃত্তি পেয়ে বিদেশেও যেতে পারেন।"

একটি মেয়ে ছিল উপস্থিত, দেববাণী তাকে আগে দেখে নি। ছিপছিপে চেহারা, বেশ লম্বা, মুখখানা সুন্দর। ডান গালে বড় একটি কালো আঁচিল। ববকরা চুল। ওষ্ঠাধর রঞ্জিত! শীতকালেও সে পাতলা চৌলি পরেছে, কোমরের বহুলাংশ অনাবৃত; শিফনের শাড়ীর প্রগল্‌ভ আড়ালে স্তন দুটি সুপরিস্ফুট। ঠোঁটের রং বাঁচিয়ে সযত্নে সে বিস্কুট, কেক আর স্যাণ্ড-উইচ দাঁত দিয়ে কেটে খাচ্ছিল। এবার সরু কণ্ঠে বলল, "আপনি বুঝি দিল্লী য়ুনিভারসিটিতে পড়ান?"

দেববাণী সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, "না।"

আইরীণ ব'লে উঠল, "মাপ কর বাণী; ভুলে গিয়েছিলুম তোমাদের পরিচয় নেই। ইনি হচ্ছেন প্রমীলা থাপর। সুভাষের স্যুইট-হার্ট। আমেরিকান এক্সপ্রেসে কাজ করেন।" প্রমীলার দিকে তাকিয়ে যোগ দিল, "দেববাণী আমেরিকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ায়। ইংলণ্ডেও পড়িয়েছে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ওকে এক্সটেনশন লেকচারের জন্যে ডেকে এনেছে। এর পর মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়েও ওর বক্তৃতা আছে।"

এই গুরুগম্ভীর ভূমিকা প্রমীলা থাপরের মনে বিশেষ রেখাপাত করল না। শুনতে শুনতে তার হাই উঠল, রক্তিম-নখ সরু-আঙুল হাত তুলে জৃম্ভণ চাপল। তার পর বলল, "হাউ ওয়াণ্ডারফুল।"

নিমন্ত্রিতদের মধ্যে এক ইংরেজ দম্পতি, একটি তুর্কী যুবতী, এক মার্কিন ভদ্রলোক। ইংরেজ জন কোল ও মার্গারেট কোল পোদ্দার-দম্পতির বন্ধু, সে সুবাদে দেববাণীর পরিচিত। জন কোল ইংরেজ দূতাবাসের মাঝারী কর্মচারী, স্কটল্যাণ্ডের লোক। ছ'ফুট লম্বা, তেমনি চওড়া; মাথা-ভরা চকচকে টাক, চতুর্দিকে লালচে চুলের ক্ষীণ সীমারেখা। ঘাড়ে মাংসের তিন ভাঁজ। কানে

গুচ্ছ গুচ্ছ কাঁচা পাকা চুল। কথা বলে কম জন কোল; চুপ ক'রে থাকে ব'লে সে যে মনোযোগী শ্রোতা তাও নয়। এক সময় নিশ্চয় চোখদুটি গভীর নীল ছিল; এখন ফিকে নীল আর ফিকে লাল মিলে এমন মিশ্র বর্ণ ধারণ করেছে যে মনে হয় না, জন কোলের কোন কিছুতে উৎসাহ আছে; কোন ব্যাপারে সে উত্তেজিত। জীবন নিয়ে সে বরং বিরক্ত, তিক্ত-স্বাদ। যে কথা সর্বদা তার মন জুড়ে থাকে তা হচ্ছে সে রাষ্ট্রদূত। তার প্রতিটি কথার সঙ্গে পৃথিবীর ভাগ্য অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা। তাই কথা বলে কদাচিৎ, যখন বলে খুব সাবধানে, ওজন ক'রে।

মার্গারেট কোল ঠিক উল্টো। সেও দীর্ঘাঙ্গী। হাড়প্রধান দেহ, নাক বড় বেশী উঁচু ও তীক্ষ্ণ, ওষ্ঠাধর একটু অতিরিক্ত চাপা। মার্গারেট কোল সুদর্শনা নয়, সুহাসিনী। হাসলে তাকে অকারণ সুশ্রী দেখায়; তাই সে কেবল হাসে, হাসে আর কথা বলে। ডিপ্লোম্যাটিক সমাজের গেজেট, সবাকার শেষ-সংস্করণ সংবাদ তার সুবিদিত। এ বিষয়ে মুখরোচক আলোচনায় তার উচ্ছল উৎসাহ রাষ্ট্রদূত স্বামী জন কোলের বিষণ্ণ উচিত-বোধের তোয়াক্কা করে না। তবে, মার্গারেটের নিজেরও যে দায়িত্ববোধ সজাগ, তার প্রমাণ দিতে অনর্গল সুস্বাদু ভাষণের মাঝে মাঝে সে শ্রোতাদের সতর্ক ক'রে দেয়, "যা বলছি তা সবই কিন্তু অফ্ দ' রেকর্ড; আমাকে আবার 'কোট' ক'রো না···"

তুর্কী মেয়েটির নাম তানিয়া। তুর্কী দূতাবাসের প্রথম সেক্রেটারীর কন্যা। ধব্ধবে ফর্সা, প্রায় ছ' ফুট লম্বা, সুঠাম-সুগঠিত দেহ। য়ুরোপীয় কায়দায় চুল ছাঁটা, চলন-বলন সব য়ুরোপীয়, তবু কোথায় রহস্য-ইংগিতে লেগে আছে প্রাচ্যের লালিত্য। আইরীণের কাছে মাঝে-মধ্যে সে আসে; দেববাণীর তানিয়াকে ভাল লাগে। সুস্থ সবল সহজ সব কিছু দেববাণীর মনে সাড়া দেয়। তানিয়ার মধ্যে এসব গুণ কিছু আছে; ভাগ্যক্রমে যা নেই তাকে সোজা বাংলায় বলা হয় ন্যাকামি।

আমেরিকান ভদ্রলোক এ বাড়ীর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অন্যতম। লিওনার্ড হোপ। এডোয়ার্ড পোষ্টের অ্যাসিষ্ট্যান্ট। বেঁটে খাটো ছোট্ট মানুষ; মার্কিন সমাজে কেমন বেমানান। চওড়া কপালের ওপর ভীষণ আত্ম-প্রচারক এক জোড়া ঘন দীর্ঘ ভ্রূ; বড় বড় সদাবিস্মিত প্রায়-বোবা চোখ। লম্বাটে মুখখানা চিবুকের দিকে সংক্ষিপ্ত, চিবুকের ঠিক মাঝখানে স্পষ্ট একটি ভাঁজ। গুরু-গম্ভীর কিছু বলবার আগ্রহ লিওনার্ড হোপের বেশী। সব কিছু মিলে মানুষটা কেমন

কৌতুকময় ; স্বচ্ছ, নির্ভেজাল, কিন্তু আত্মাভিমানী। লিওনার্ড হোপ মনে করে সে মস্ত বুদ্ধিবাদী, ইনটেলেকচুয়াল। দেববাণীর প্রতি তার সজাগ আগ্রহ পোষ্ট পরিবারে রহস্য-কৌতুকের বিষয়। দু একবার দেববাণীকে নিজের গাড়ী ক'রে সে কর্মস্থলে পৌঁছে দিয়েছে, বেড়াতে নিয়ে গেছে। গম্ভীর ভারিক্কী চালে কথাবার্তা বলে লিওনার্ড।

জৃম্ভণ চেপে প্রমীলা থাপর বলল, "হাউ ওয়াণ্ডাফুল।"

তানিয়া দেববাণীর গা ঘেঁষে বসল। দেববাণী সস্নেহে হাত রাখল তার পিঠে। তানিয়া প্রশ্ন করল, "কি বিষয়ে বক্তৃতা হ'ল?"

"সে ভারী গম্ভীর ব্যাপার," উত্তর করল আইরীণ। 'দ্' সায়ান্টিফিক্ ম্যান।' বুঝতে পারি নে, শুধু ম্যান কেন? বিজ্ঞান কি পুরুষদের একচেটিয়া? বিশেষ ক'রে বক্তা যখন নারী এবং বৈজ্ঞানিক, তখন বিষয়-বস্তুর নাম হওয়া উচিত ছিল 'দ্' সায়ান্টিফিক্ ম্যান অ্যাণ্ড উয়োম্যান!"

"ম্যান মানে পুরুষ নয়, মানুষ", বলল লিওনার্ড হোপ।

"হোপ মানে হতাশা," ফোড়ন কাটল আইরীণ।

"সুভাষ যখন ষ্টেটস-এ ছিল," কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে বলল প্রমীলা, "ওকে প্রায়ই অনেক বড় বড় সভায় বক্তৃতা করতে হ'ত। না, সুভাষ?"

সুভাষ প্যাটেল এমন পাকা বিনয়ে কথাটা চাপা দিল যে দেববাণী তারিফ না ক'রে পারল না। বলল, "মাই গড, ওসব কথা তুলে কাজ নেই। বক্তৃতা দেওয়া এমন কিছু বড় ব্যাপার নয়।" তক্ষুণি জন কোলের দিকে তাকিয়ে অন্য কথা পারল, "ইরাকের ব্যাপারটা কি রকম বুঝছেন, মিঃ কোল?"

পাইপ-মুখে জন কোল ঘোঁৎ ক'রে আওয়াজ তুলল শুধু। তার মানে, আমার কি কিছু বলার উপায় আছে? যা বলব তাতে ইতিহাসের চাকা ঘুরে যায় যদি?

তানিয়া বলে উঠল, "ব্যাপার বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না।"

জন কোল তার পানে কুঞ্চিত-ভ্রূ দৃষ্টি হানল। পরক্ষণেই মনে হ'ল, নির্বোধ বালিকার নির্বুদ্ধি মন্তব্যে বিরক্তি দেখানোরও ভয়ানক কদর্থ হতে পারে। পাইপ টেনে সে নিরুৎসাহে নিমজ্জিত হ'ল।

আইরীণ মার্গারেট কোলকে প্রশ্ন করল, "পরশু অশোকায় ফ্যাশন প্যারাডে তোমাদের দেখলাম না কেন?"

"হায় হায়, সে কথা আর ব'লো না," প্রবাহিত হ'ল মার্গারেট কোল। "যাবার জন্যে সব তৈরী। কলকাতা থেকে নতুন ড্রেসটা পর্যন্ত এসে গেছল— আমি কলকাতার স্যামুয়েল ফ্রিটসে ড্রেস করাই তা জানই ত, যদি হোম থেকে না আনাতে পারি, দিল্লীর এ সব নির্বোধ দরজির কাছে তুমি কিছু নিজেকে সঁপে দিতে পার না—(আইরীণ অর্থসূচক হাসি হাসল)—কিন্তু তা হলে কি হবে, বাধার পরে বাধা। প্রথমে ত সেই চিরন্তন সমস্যা, চাকর-নোকর-খানসামা। আমি সত্যিই বুঝতে পারিনে এরা কোন ধাতুতে তৈরী। জনের ভ্যালেট, সেই যে পাগড়িমাথা ছোকরা, ডারম সিং হঠাৎ উধাও…"

"কিছু না জানিয়ে?" ক্রুদ্ধ স্বরে হানল প্রমীলা থাপর। "পুলিশে ফোন করলেন না কেন?"

"প্রায় তাই। হঠাৎ সকালে ব'লে বসল, বিকেলে সে গ্রামে যাবে। গ্রামে যাবার মানে জান ত,—মানে হ'ল, নোকরি করব না। অর্থাৎ আর কেউ তাকে ফুসলে নিয়েছে। লোকটা কাজকর্ম বেশ শিখেছিল, স্মার্ট ছিল মন্দ না, চেহারাও প্রেসেণ্টেব্‌ল; আমি আগেই জনকে বার বার বলেছি, ও পালাল বলে, ওকে কিছু মাইনে বাড়িয়ে দাও। দেওয়াও হ'ত, জন সব কাজ খুব ভেবে চিন্তে করে, এ ব্যাপারটাও তুমি যে ভাবছিলে, ডার্লিং আমি তোমার মুখের দিকে চেয়েই বুঝেছিলাম। কিন্তু লোকটার একটুও তর সইল না! বিদেয় হ'ল পরশু বিকেলে। গ্রামে যাবার নামে কোথায় উঠল গিয়ে জান? জানবে কি ক'রে! এ যে আমাদের কল্পনার বাইরে! উঠল গিয়ে কোপেনহাগানে। বুঝতে পারছ ত? কোপেনহাগানে!! ওখানকার মহিলাদের শিখ যুবক দেখলেই জিবে জল আসে। এ সব কিন্তু ভাই অফ্‌ দ্' রেকর্ড, আমাকে আবার 'কোট' ক'রো না। মনমেজাজ বড় বিগড়ে গেল। একটা ভ্যালেট চ'লে গেল সে জন্যে নয়— একটা গেল, দশটা আসবে, এ ত আর য়ুরোপ নয়; কিন্তু ভেবে দেখ ত, আমরা যদি এ সব সামান্য ব্যাপারেও একে অন্যের পেছনে ছুরি চালাই, তাহলে কোথায় আমাদের পশ্চিমী একতা, এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে আমরা কম্যুনিজমকে রুখবো কি ক'রে? এই প্রশ্নই আমি জনকে করলাম, তার উত্তর এখনও পাই নি। উচিত ছিল না কি কোপেনহাগানে একটা প্রতিবাদ পাঠানো? অবশ্য এ সবই অফ্‌ দ্' রেকর্ড, ইউ মাষ্ট নট কোট মি। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, পোলিশ ফার্ষ্ট সেক্রেটারীর চাকর কি পালিয়ে গিয়ে হাঙ্গারীয়ান ট্রেড কাউন্সিলরের ঘরে নোকরি পাবে? এক সঙ্গে সবাই ওরা ব'লে উঠবে, স্পাই!…"

"ডারম সিং তাহলে তোমার যাওয়াটা মাটি করল? বড় দুঃখের কথা।"

"ডারম সিং মাটি করবে কেন? মন মেজাজ খারাপ ছিল, সন্ধ্যা হতেই বড় মাথা-ব্যথা শুরু হ'ল। তাও যেতাম, কিন্তু জন রাজী হ'ল না। বলল, তোমার কষ্ট হবে, তার চেয়ে শুয়ে থাক।"

"আদর্শ স্বামী জন," আইরীণ মুচকি হেসে টীকা করল। "এক দিকে পত্নীর প্রতি প্রশংসনীয় মনোযোগ, অন্য দিকে সম্ভাব্য ব্যয় থেকে আত্মরক্ষা।"

জন কোল গলার মধ্যে পাথর-ঠোকা শব্দ করল। অর্থ, তোমার বুদ্ধি আছে, আইরীণ পোষ্ট, তাই তোমার বাড়ী এসে তোমার কাছে ব'সে থাকতে আমার ভাল লাগে।

দেববাণীর কিন্তু ভাল লাগছিল না। কোনও দিন সে এ ধরনের লঘুকর বৈদগ্ধ্যের অংশীদার হতে পারল না। সে জীবন তার অজ্ঞাত রয়ে গেল যেখানে কেবল হাল্‌কা মেঘের দায়িত্ববিহীন সঞ্চরণ, না বর্ষে, না পুঞ্জীভূত হয়। যে আলাপেব অর্থ নেই তার অভ্যাবৃত্তি দেববাণীর দুঃসহ। যে বন্ধুতায় আন্তরিকতা নেই তার লঘুভার দেববাণী বইতে পারে না। যে আকাঙ্ক্ষায় আগুন নেই তার নির্বাপিত ভস্ম দেববাণীর কুৎসিত লাগে। এ কারণে বিদেশে বিদগ্ধসমাজে চালু হবার টিকেট দেববাণী কোনও দিন পায় নি। তার বন্ধু-বান্ধবীরা বলেছে, সে বড় বেশী সীরিয়স, হালকা হবার অনর্গল আনন্দে বঞ্চিত। অথচ দেববাণী জানে, তা নয়। আমি যে কত হালকা হতে পারি, ওরা জানে না। ওদের জীবন এত ভারী, বাইরের নেশা না হলে ওরা হালকা হতে পারে না। আমার জীবন ভারী নয়, পূর্ণ। পূর্ণতা যে ভার নয় ওরা কেমন ক'রে বুঝবে? যে আনন্দে ব্যথা নেই, যে তৃপ্তি অতৃপ্তি আনে না, যে সাফল্য স্মরণ করিয়ে দেয় না তুমি কত ক্ষুদ্র, কত দুর্বল, তা ত জীবনকে পূর্ণ করে না, ভারী করে। আত্ম-সুখের ভারে এই জন কোল ন'ড়ে বসতে পারছে না, আত্ম-তৃপ্তির ভারে মার্গারেট কোল পিষ্ট; শ্লাঘা চেপে মারছে সুভাষ প্যাটলকে, দুর্বল কামনা তার সুাইটহার্ট প্রমীলাকে। বেচারা লিওনার্ড হোপ, অহমিকার আঙ্গুল চুষতে সদা-ব্যস্ত। অন্ধকার পৃথিবীতে, 'দীপশিখাটি বাঁচিয়ে একা চলছে ধীরে ধীরে।' এর মধ্যে আইরীণ আলাদা; নকল জানে না, মেকীকে তাচ্ছিল্য করে। আইরীণ সহজ স্বাভাবিক। আইরীণের কাছে আমি হাল্‌কা। ওদের সান্নিধ্য আমার বড় ভারী লাগে।

তানিয়া দেববাণীর সঙ্গে চুপি চুপি কথা বলছিল; লিওনার্ড এসে পাশে দাঁড়াল।

"কেমন হ'ল আপনার লেকচার," লিওনার্ড প্রশ্ন করল দেববাণীকে।

"ভাল।"

"আবার কবে হবে?"

"কাল।"

"আমার কাছে কিছু বই আছে, আপনার কাজে লাগতে পারে; যদি চান, দিয়ে যাব রাত্রিবেলা।"

"ধন্যবাদ। আর বই দিয়ে কি হবে? আমি এমন কিছু জ্ঞান-গম্ভীর বলছি না যে, বই-এর ঝালাই না হলে চলবে না।"

"বুঝলাম না।" অত্যন্ত গম্ভীরস্বরে বলল লিওনার্ড। অর্থাৎ, তোমার কথার কোনও মানে হয় না।

"এটা কোনও বিশেষজ্ঞ থীসিস নয়। পপুলার লেক্‌চার। বিজ্ঞান মানুষের জীবনকে কি ভাবে, কত ভাবে প্রভাবিত করেছে তার কাহিনী। ভারী ভারী কেতাব দেখিয়ে ছেলেমেয়েদের ভড়্‌কে দিয়ে কি হবে? আমি যতটা সম্ভব সহজ ক'রে বলতে চেষ্টা করছি যাতে সবাই বুঝতে পারে, সবার মনে একটু দাগ লাগে।"

"আমার কাছে অনেক পপুলার সায়েন্সের বই আছে। ওটা আমার হবি। সেগুলো আপনাকে দিয়ে যাব।"

"বেশ ত, দেবেন। অনেক ধন্যবাদ।"

"আজ সন্ধ্যেয় কি করছেন?" পাশের চেয়ারে বসল লিওনার্ড।

"অর্থাৎ কোথাও যাচ্ছি কি না?" মৃদু হেসে দেববাণী পাল্টা প্রশ্ন করল।

"যাচ্ছেন কোথাও?"

"না।"

"চলুন না, কোথাও যাওয়া যাক।"

"কোথায় যাবেন?"

"এই ধরুন সিনেমায়।"

"রুচি নেই।"

"তা হ'লে এমনি ঘুরে আসব। ওখলা চলুন, অথবা রীজে।"

সারাদিন একটানা কাজের পর দেববাণীর ক্লান্ত লাগছিল। একটু বেড়াতে

পারলে মন্দ হয় না। বেশ শীত নেমেছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, যদিও বৃষ্টি আর নেই। ইলেকট্রিক হিটারে ঘর গরম; এ গরমে আরাম, কিন্তু দেববাণীর মাথা কেমন ব্যথা করছে, মনে হচ্ছে খোলা হাওয়ায় ভালো লাগবে।

"আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।" পরোক্ষে সম্মতি দিল সে।

"কেউ আসছে?"

"হ্যাঁ। আমার মা কাল সকালে আসছেন।"

"সে ত কাল সকালে। অনেক দেরি।"

"অনেক দেরি নয়। ওটা কথা বলার কায়দা। আজ রাত্রির পরেই কাল সকাল।"

"মাঝখানে পুরো একটা রাত্রি।"

"সামান্য একটা রাত। এক ঘুমে শেষ।"

"আপনি খুব ঘুমোন?"

"আমি ভাল ঘুমোই। শোবার সঙ্গে সঙ্গে সুনিদ্রা। যখন জাগি, তখন প্রভাত।"

"নো স্লিপিং ডোজ?"

"রক্ষে করুন! কখনও নয়। তাহলে বোধ হয় আর জাগবই না।"

"আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ নন।" গম্ভীর রায় দিল লিওনার্ড হোপ।

"জানি।" হাসতে হাসতে বলল দেববাণী।

দেববাণী জানে ওষুধ ছাড়া আমেরিকায় অনেকের রাত্রে ঘুম হয় না।

"কখন বেরোবেন?"

"পাঁচটা বাজে। ধরুন আধ ঘণ্টার মধ্যে?"

"ফিরতে চান কখন?"

"সাতটায়।"

"এত তাড়াতাড়ি?" বিমর্ষ হ'ল লিওনার্ড।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। কিছু মনে করবেন না। কয়েকটা কাজ প'ড়ে আছে।"

"তার মধ্যে সবচেয়ে বড় নিশ্চয় কালকের লেকচার?"

"হয়ত।"

মনে মনে দেববাণী বলল, তা নয়। হিমাদ্রিকে চিঠি লিখতে হবে।

সাতটা বাজবার কিছু পরে দেববাণী ফিরে এল। লিওনার্ড তাকে নামিয়ে দিয়ে বিদায় নিল। ভেতরে আর এল না।

বৈঠকখানার পাশে সিঁড়ির দিকে যেতে দেববাণী দেখল, এডোয়ার্ড ও আইরীণ আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এডোয়ার্ড হঠাৎ ফিরে এসেছে। তাই আইরীণ তাকে ছাড়তে চাইছে না।

দেববাণী সিঁড়িতে উঠতে যাবে, আইরীণের গলা ভেসে এল :

"বাণী !"

দাঁড়িয়ে গেল দেববাণী।

"ঘরে এস, ডার্লিং।"

ঘরে ঢুকল দেববাণী। আইরীণ তখনও স্বামীকে ছাড়ে নি।

"এই দেখ, বাণী, বব্ এসে গেছে। হোয়াট অ' সারপ্রাইস !"

"তাই তোমার খুশির শেষ নেই," হাসল দেববাণী।

"নিশ্চয়।" সজোরে রবার্টের মুখে সে চুম্বন চাপল। রবার্ট স্নেহভরে তাকে আলাদা ক'রে দিতে আইরীণ ব'লে উঠল, "বাণী, স্বামী না হলে কি মেয়েদের চলে ?"

দেববাণী হাসি মুখে বলল, "না। গাড়ী একেবারে অচল।"

"কোথায় গিয়েছিলে, বাণী ?" রবার্ট প্রশ্ন করল। এর মধ্যে রুমাল দিয়ে সে ওষ্ঠাধর থেকে পত্নীর অধরোষ্ঠের রক্তিম প্রলেপ সাফ করেছে।

"বাণীর আজ ডেট ছিল," ব'লে উঠল আইরীণ।

"হোঃ !" সিগারেট ধরাতে ধরাতে শব্দ করল রবার্ট। "কে সেই ভাগ্যবান্ ?"

"লিওনার্ড হোপ।" দীর্ঘ উচ্চারণে নামটিকে রমণীয় ক'রে বলল আইরীণ।

"হাঃ হাঃ," হেসে উঠল রবার্ট।

"লিওনার্ড কিন্তু বাণীর প্রেমে পড়ছে।" আইরীণ নাছোড়বান্দা।

রবার্ট প্রশ্ন করল, "তোমার কাজ কতদূর এগোল ?"

"কিছুটা হয়তো এগিয়েছে। ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"হুম্ ! তোমার ত আজ বক্তৃতা ছিল ! কেমন হ'ল ?"

"আই'ওজ্ মব্ব্ড", বলল দেববাণী।

"চমৎকার ! সব তা হলে ভালোই চলছে।"

"তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল, বব্," দেববাণী মৃদুস্বরে বলল।

"বল।"

"কাল সকালে মা আসছেন।"

"ওঃ, এই কথা? আমি আধ ঘণ্টা হ'ল এসেছি। তুমি কি ভাবছ, আইরীণ প্রত্যেকটি নতুন খবর আমাকে দেয় নি? মাই ডিয়ার গার্ল, সব ঠিক আছে। তাঁকে নিয়ে এসো। যদি তাঁর অসুবিধে হয়, তোমার জন্যে অন্য ব্যবস্থা ক'রে দেব।"

এর পরে আর কথা চলে না। দেববাণী ওপরে গেল। যাবার আগে আইরীণকে বলল, "আমার খাবারটা যেন ঘরে পাঠিয়ে দেয়।"

আজ ওরা একা একা থাক। দেববাণী মনে মনে বলল। অপ্রত্যাশিত স্বামীকে পেয়ে আইরীণ আনন্দে অধীর। আজ বাইরের লোকের ছায়া না পড়ুক ওদের আহারে-বিহারে।

চার

সকাল সকাল উঠে পড়ল দেববাণী। চট্ ক'রে ঘর গুছিয়ে চ'লে গেল স্নানঘরে। গরম জলের কল খুলে বাথ-টব ভ'রে নিল। ঠাণ্ডা জল মিলিয়ে সহনীয় করল। তারপর আরামে অবগাহন।

স্নান সেরে স্টেশনে যাবার জন্যে তৈরী হ'ল দেববাণী। মা আসছেন। কড়া শীত; দেববাণী উলের অন্তর্বাস পরেছে, তার ওপর হাল্কা বেগুনি রঙের তাঁতের শাড়ী। কালো কার্ডিগানে সংরক্ষিত দেহ। হাতে পশমী দস্তানা। পায়ে মোজা।

মন গুন গুন গান গেয়ে উঠল দেববাণীর। মা অনেক যত্নে দু' বোনকে গান শিখিয়েছিলেন। দেববাণীর গলা ভারী, মধুর; দেবযানীর পাতলা, মিঠে। দেববাণীকে তাই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে শিক্ষা দিয়েছিলেন; দেবযানীকে রবীন্দ্র-সঙ্গীতে। ওস্তাদ আসতেন সপ্তাহে দু'দিন। দেববাণী ঘণ্টার পর ঘণ্টা কসরত করত। সুরের ঢেউ দেববাণীকে অমৃতের অতলে নিয়ে যেত, সে দেখতে পেত ঝরণা নেমে আসছে, মেঘে আকাশ কালো হ'য়ে এল, বিরহ-বিধুর নববধূ নীরবে কাঁদছে, সমুদ্র করছে উন্মত্ত গর্জন, তাণ্ডব তালে শ্মশানে নৃত্য করছেন মহাদেব, গাছে গাছে হঠাৎ ফুল ফুটে উঠল, দীপ জ্বলল, লক্ষ শিশু একসঙ্গে উঠল হেসে। রাগ-রাগিণী গ্রাস করত দেববাণীকে, মনে হ'ত, আমি নেই, আমি দেহহীন সুরের মূর্ছনা, মৃত্যুঞ্জয়ী অমৃতের নেশায় মাতাল।

সুর একদিন অসুর হয়ে দেববাণীকে মারল। অমৃতের জন্যে হাত পেতে-ছিল দেববাণী। পেল পাত্র ভরা গরল।

অনেকদিন, কতদিন তার হিসেব নেই, দেববাণী গান করে নি। অসুরের মধ্যেও সুর দেখে সে সম্মোহিত হয়েছিল, দুঃসহ আকর্ষণে মৃত্যুর অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। যখন মুক্তি পেল, তখন জীবনের নিষ্ঠুর কঠোর দাবীতে সঙ্গীতের সুর ছিল না। সে সুদীর্ঘ নিরবকাশ সংগ্রামে গান ছিল না।

তার পর একদিন আবার গান ফিরে এল। দেববাণী সেদিনের কথা ভুলতে পারে না।

তুমি আমায় আবার গান করালে, হিমাদ্রি।

লণ্ডনে, টেমস্ নদীর ধারে, সে-সন্ধ্যাবেলা তুমি নিশ্চয় ভুলতে পারবে না, যেমন পারবো না আমি। অদূরে পার্লামেণ্ট ভবনের চুড়াগুলি ধূসর আকাশে আবছা দেখাচ্ছে; টেমসের কালো নিস্তরঙ্গ জলে ষ্টীম লঞ্চ চলছে। কিছু দূরে বিদেশাগত জাহাজের মাস্তুল দেখা যাচ্ছে। আমরা দাঁড়িয়ে আছি একটা পুলের ওপর, দেয়ালে ভর দিয়ে ভিড়ের চাপে রুদ্ধশ্বাস নগরীর অপেক্ষাকৃত নির্জন কোনে। আমি লণ্ডনে এসেছিলাম তোমাকে আমাদের নতুন তৈরী বাড়ীর ছবি দেখাতে; ভেবেছিলাম, তোমার সঙ্গে না জানি কতো কথা আছে আমার। এসে আবার দেখলাম তুমি আমি একত্র হ'লে নীরবতার অন্ধকার নেমে আসে; সে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আমরা দুজনে দুজনের অন্তর খুঁজে বেড়াই। নিবাক তোমার চোখে থর থর বেদনা, জমাট কামনা ভয়ংকর মূক হ'য়ে ওঠে: আমার মুখের কথা বুকের মধ্যে লুকিয়ে থেকে বারম্বার আমাকে অস্থির করে তোলে। তোমাকে অদেয় সেদিন আমার কিছু নেই। অথচ কিছুই যে আমি দিয়ে উঠতে পারছি না, আজও, এই আজও পারছি না, হিমাদ্রি। আমাকে পেয়েও না পাওয়ার দুঃসহ ব্যথায় তুমি মর্মাহত; তোমার চিরন্তন স্থৈর্য বিচলিত। একদিন বস্টনে তোমাকে ফিরিয়ে দেবার ভরাট অবসরটুকু আমার দরকার ছিল; সে অবসর যে এমন ধারাবাহিক কঠিন প্রতীক্ষায় পরিণত হবে, তখন ভাবতে পারিনি। অথচ এ প্রতীক্ষা তোমার জন্যে নয়; এ জননী দেববাণীর ব্যর্থ, অসম্ভব প্রতীক্ষা কুমারী দেববাণীর জন্যে! তোমার উদার একদা উদাস প্রেমের স্তিমিত স্নিগ্ধ আলোকে গা ঢাকা দিয়ে অনেকদিন আগে তোমার একান্ত নিকটে এসে গেছি, অথচ শেষ ব্যবধানটুকু আর কেটে উঠল না; সে যে আমার হৃদয়ের ব্যবধান! তুমি আমার সংযম ভেঙ্গে দিয়েছ কিন্তু সংশয় ভাঙ্গতে পারো নি; অন্ধকারে গাছের ছায়ার মতো অবাস্তব ভীষণতায় সে আমাকে ঘিরে রেখেছে।

কিন্তু, সেদিন টেমস্ নদীর তীরে, ম্লান বিষণ্ণ সন্ধ্যায় হঠাৎ এক অঘটন ঘটেছিল।

ঝর-ঝর মল্লিকা শেষ কথা বলতে গিয়ে যদি দেখতে পায় আবার সে নতুন ক'রে ফুটে উঠেছে, তা কি ভয়ংকর অঘটন নয়?

হঠাৎ তুমি ব'লে বসলে, "বাণী, একটা কথা রাখবে?"

দেববাণী বলেছিল, "তোমার কোন কথা কি আমি রেখেছি?"

"রেখেছ বৈ কি!"

"কৈ? মনে পড়ছে না ত!"

"এই যে তুমি আজ এত বড় হয়েছ, তাতে কি আমার কথা রাখা হ'ল না?'

দেববাণী হাসল। "খুব বড় হয়েছি? বাবার মত বড়?"

একটু পরে দেববাণী আবার বলল, "তুমি অনেক আশা দিয়েছিলে, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার অনেক প্রেরণা দিয়েছিলে। তবু, তোমার কথা রাখতে হবে বলেই আমি এই দশ বছর নেশাগ্রস্তের মত একটানা পরিশ্রম করিনি। তার আরও কারণ ছিল।"

দেববাণী ব'লে চলল, "কারণগুলি আজ তোমাকে বলি। ম'রে গিয়েও যখন মরলাম না, তখন সংকল্প করলাম, বাঁচার মত বাঁচব। হার মানব না, মানব না, মানব না। শুরু হ'ল আমার লড়াই। তার রসদ পেলাম কার কাছে? অনেকের কাছে। মা'র কাছে। তোমার কাছে।"

"তোমার নিজের কাছেই সবচেয়ে বেশী।"

"মা, তুমি, আরও একজন আছে। জান সে কে?"

"খোকন।"

"খোকন। মনে হ'ল, আজ আমি নিঃস্ব, লুণ্ঠিত; অপমানে, গ্লানিতে, অশ্রদ্ধায় দীনহীন। আমাকে নিয়ে গর্ব নেই কারুর। আছে শুধু লজ্জা।"

তুমি, হিমাদ্রি, আমার হাত চেপে ধরলে।

"স্থির করলাম, এ লজ্জা আমায় দূর করতে হবে। এমন কিছু হতে হবে যাতে মা দেববাণী বলতে গর্ব বোধ করেন। আমার ছেলে তার মায়ের কথা ভেবে গর্বিত হয়। আর তুমি—"

"আমি কী?" মৃদু হাসলে তুমি, হিমাদ্রি।

"আর তুমিও একটু গর্ব অনুভব কর। না ভাব, যা গড়লে ভাঙা টুকরো জোড়া দিয়ে, তা নিতান্তই কাঠের পুতুল।"

হালকা হলে তুমি, হিমাদ্রি। হেসে বললে, "তাহলে কোন কথাই তুমি আমার রাখ নি। আজ তার ব্যতিক্রম হোক। আজ একটা কথা রাখ। একটা গান কর।"

গান!! দেববাণী আকাশ থেকে পড়ল। হিমাদ্রি, গান? গান কোথায়? কোনও দিন কি ছিল তার মধ্যে? আলো ঝলমল লণ্ডন শহর মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। দেববাণী ভেসে চলল দেশ পেরিয়ে, সমুদ্র, মরুভূমি, জনপদ পেরিয়ে।

কলকাতা শহরে হাতিবাগানের কাছাকাছি যে ছোট্ট ফ্ল্যাটে এসে সে পৌঁছল, সেখানে সপ্তসুরের ঐকতান যেন একসঙ্গে বেজে উঠল : বিস্মিত দেববাণী সুরের পরশ পেল যুগান্তের ব্যবধানে। কি আশ্চর্য, হিমাদ্রি, দেববাণীর বুকে গান বেজে উঠল !

"একটা গান কর, বাণী।"

"কেন ? গাইতে বলছ কেন ?"

"তুমি পূর্ণ হবে না গান না গাইলে। তোমার জীবনের ইমারৎ উঠেছে, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় নি। অদম্য উৎসাহে, দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়, অক্লান্ত পরিশ্রমে তুমি কর্মে সার্থকতা পেয়েছ, এবার তোমার পথ খোলা। কিন্তু জীবনটা ত শুধু শ্রম নয়, জীবন আনন্দ। তুমি যেদিন অহরহ হঠাৎ-খুশিতে গান গেয়ে উঠবে, সেদিন জীবনে তুমি আনন্দ পাবে।"

হিমাদ্রি, তুমি জান না, আমার হঠাৎ কি হল, টেমস্ নদীর প্রতিটি আন্দোলন থেকে, হাল্কা শীতল হাওয়া থেকে, নরম ম্লান অন্ধকার হ'তে এমন কি অনতিদূরের স্তিমিত ল্যাম্প-পোষ্ট থেকে, অগণিত বিচিত্র ধারায় সুরের লহরী আমার মনে সঞ্চারিত হ'ল। শিউরে উঠলাম আমি, তোমার হাতের মধ্যে হাত আমার ঠাণ্ডা হয়ে এল।

আমি বললাম, "বয়েস কত হ'ল খেয়াল আছে, হিমাদ্রি ? অহরহ খুশিতে গেয়ে উঠবার কথা বলছ ?"

"বুদ্ধিমতী নারীর কথা হ'ল না, বাণী। রবি ঠাকুর সত্তর বছর বয়সেও গাইতেন। বিদেশে এত বছর কাটল, দেখছ না, জীবন এদের কী অফুরন্ত, কী অপরাজেয় ? তুমি বাঙালী মেয়ে বলেই কি এত সহজে নিঃশেষ ?"

"না। আমিও আশিতে খুশি হয়ে গলা ছেড়ে গান গাইব। তাতে জীবনের জয় ঘোষিত হ'তে পারে, কিন্তু প্রতিবেশীদের স্নায়বিক ব্যাধি বেড়ে যাবে।"

"কথা রাখ। গান কর।"

"বলতে লজ্জা করছে, হিমাদ্রি, গাইতে আমার ইচ্ছে করছে। কিন্তু কি গাইব ? কতকাল গাই নি। সুর কি গলায় উঠবে ?"

"উঠবে, উঠবে। তুমি শুরু কর।"

"এখানে ? এই বিজাতীয় পরিবেশে বাংলা গান ? যদি পুলিসে ধ'রে নিয়ে যায় ?"

"বাজে ব'কো না। আস্তে গান ধর।"

"কি গাইব ?"

"যা তোমার মন চায়।"

অনেক, অনেক বছর পরে, আবার আমি গান গাইলাম, হিমাদ্রি, কেবল তোমার কথা রেখে গান গাইলাম। গাইলাম, গান আমার মনে বেজে উঠল ব'লে। গান বাছতেও মুহূর্তের বেশী সময় লাগল না! খুঁজতেই অনেকদিন আগে শেখা মার অতি প্রিয় একটা গান গলায় অপেক্ষা করছে দেখতে পেলাম। কী আশ্চর্য, হিমাদ্রি, আজ এখন আবার আমি সে গানটাই গাইছি: 'নীরব আলোকে জাগিল হৃদয়-প্রান্ত, অলস আঁখির আবরণ গেল সরিয়া, জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া।'

হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেববাণী তৎপর হল। লিখবার টেবিলে হিমাদ্রিকে লেখা চিঠি প'ড়ে ছিল। তুলে নিল। মৃদু হাসল দেববাণী। মনে এখনও সুর বাজছে: 'জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া।' অনেক বড় চিঠি লিখেছি তোমাকে, হিমাদ্রি ; তুমি পেয়ে খুশি হবে। তোমাকে লিখতে গিয়ে খোকনকে আমার আর লেখা হল না। ঘুমে তখন চোখ ভ'রে এসেছে। আজ লিখব খোকনকে। মাম্মা এসেছেন দিল্লীতে, জেনে সে খুব খুশি হবে।

চিঠি ব্যাগে রেখে দেববাণী নীচে নেমে এল। পোষ্ট পরিবারের তখনও প্রভাত হয় নি। হলেও, শয়ন ঘরে আবদ্ধ। দেববাণী গ্যারাজ থেকে গাড়ী বার করবার কথা ভাবতে ভাবতে নীচে নেমে অপ্রত্যাশিত পরিতোষের সঙ্গে দেখতে পেল, সুজন সিং গাড়ীর গাত্রমর্দনে ব্যস্ত। দেববাণীকে দেখে সে নমস্তে করল।

"নমস্তে, সুজন সিং। তোমাকে ত আসতে বলিনি।"

"আমি নিজেই এলাম, হুজুর।"

"এই শীতের সকালে—"

"কোই বাৎ নেই, হুজুর। আপনি একা গাড়ী নিয়ে স্টেশনে যাবেন, তা কেমন ক'রে হয়?"

"সুক্রিয়া, সুজন সিং। এবার চল। গাড়ীর সময় হয়ে এল।"

শীতের সকাল। রাস্তা জনবিরল। কুয়াসা পড়েছে। পাতলা ধোঁয়াটে কুয়াসা, দৃষ্টি-রোধী নয়। গাড়ী বেশ বেগে চলল। হাওয়া আটকাবার জন্যে দেববাণী দরজার কাচ তুলে দিয়েছে। গাড়ী ক্ষরেন পোষ্ট দপ্তরে দাঁড় করিয়ে দেববাণী নেমে গিয়ে চিঠিখানা ছাড়ল। আঠার মিনিটে গাড়ী স্টেশনে পৌছল।

ট্রেন আসবার তখনও মিনিট আটেক দেরি।

দেববাণী নেমে গেলে সুজন সিং প্রশ্ন করল: "কোন্ গাড়ী হুজুর ?"

"জনতা। কলকাতার জনতা।"

সুজন সিং যে অবাক হল, দেবাণীর নজরে ধরা পড়ল। সুগঠিত মুখে বড় বড় চোখ দু'টির ওপরে তির্যক ভ্রূ ঈষৎ বাঁকল, পরক্ষণেই স্বাভাবিক হ'ল। দেববাণীর মজা লাগল। সুজন সিং ভাবতে পারে নি দেববাণীর মা জনতায় আসবেন। আরও পরিষ্কার ক'রে দেববাণী দ্বিতীয়বার বলল: "আমার মা আসছেন কলকাতার জনতায়।"

মা বেশী পয়সার আরামপ্রদ রেলযাত্রার বিরোধী। সারা জীবন দারিদ্র্য ও অভাবের সঙ্গে সংগ্রামে দু'পক্ষে কেমন মিতালি হয়ে গেছে। দারিদ্র্য হেরেছে —এ জন্যে নয় যে আজ দেববাণী যথেষ্ট রোজগার করে, মাকে সে অনেক আরামে রাখতে চায়; এ জন্যে যে মার অভাব বোধ নেই। দারিদ্র্যকে তিনি আজীবন তুচ্ছ করেছেন, মাথা ঘামাবার সম্মানটুকু পর্যন্ত দেন নি। অল্প বয়সে দুটি মেয়ে নিয়ে বিধবা হবার পর থেকে দারিদ্র্যের সঙ্গে তাঁর লড়াই। মেয়েদের মানুষ করতে হবে এ সঙ্কল্প যেদিন তিনি অন্তরে গ্রহণ করলেন, সেদিন জন্ম নিল অন্য এক সঙ্কল্প: দারিদ্র্যের কাছে হার মানলে চলবে না। হার মানেনও নি। দেববাণী ও দেবযানী অনেক পেয়েছে, যা তাদের পাওয়ার কথা তার চেয়ে বেশী। শিক্ষার ত্রুটি মা করেন নি। শুধু স্কুল কলেজে পড়ান নি, গান শিখিয়েছেন, ছবি আঁকা শিখিয়েছেন। দেববাণী-দেবযানী ছেঁড়া শাড়ী পরে নি, ছেঁড়া জুতা ব্যবহার করে নি। আবার তেমনি যা নিতান্ত প্রয়োজন, তার বেশী পায় নি। গৌরব ও দুঃখের সঙ্গে মা বলেন, তোরা কত কষ্ট করেছিস। স্কুলে ফার্স্ট হতিস, কোনও দিন মাইনে লাগে নি; কলেজে বৃত্তি পেয়েছিলি, মাইনে লাগে নি। তোদের জন্যে আমি আর কি করেছি। যা করেছেন, মঙ্গলময় ভগবান। এই হল মার স্বভাব। কোন কিছুর জন্যে কৃতিত্ব নেবেন না। আজও, অভাব যখন বিগত, তিনি প্রয়োজনের বেশী কিছু নিতে রাজী নন। দেববাণী বলেছিল, বড্ড শীত হবে রাস্তায়, তুমি ফার্স্ট ক্লাসেই যেয়ো লেপ গায়ে দিয়ে আরামে ঘুমিয়ে। মা হেসে বললেন, তোর যা কথা! কে না কে থাকবে কম্পার্টমেণ্টে, আমি অমন ক'রে চলতে পারব না। তাছাড়া আমি যাব জনতায়।

"জনতায় ? সে যে দু' রাত্রির পথ!"

"বেশ র'য়ে-স'য়ে যাব, দেশ দেখতে দেখতে। থার্ড ক্লাসে গেলে একটা মস্ত

সুবিধে, জানিস ? কত বিচিত্র মানুষ দেখতে পাওয়া যায়। পকেট-কাটা থেকে সাধুসন্ত পর্যন্ত। বরযাত্রী, নতুন বৌ থেকে থুড়থুড়ে বুড়ো-বুড়ী।"

"তাদের শরীরের বিচিত্র সুবাস। বিড়ির গন্ধ। চিনেবাদাম খোলসের ছড়াছড়ি, বহু মানুষের কফ্, কাশি, থুতু। শিশুর কান্না। যাত্রীদের বুক-ফাটানো চেঁচামেচি। মালপত্র নিয়ে ঝগড়া।"

হাসতে হাসতে মা বললেন, "বল ত! এমন নাটক ফেলে ফার্স্ট ক্লাসে কি কেউ যায় ?"

"ঘুম চাই নে তোমার দুটো পুরো রাত ?"

"বেঞ্চি রিজর্ভ ক'রে নেব। আরামে ঘুম দেব। তুই ভাবিস নে। শুধু ঘুম নয় রে, ভাল ভাল স্বপ্নও দেখব।"

এর পরে আর কিছু বলার থাকে না। মা আসছেন জনতায়। দূরে, বোধ করি যমুনা-পুলের এপারে, গাড়ীর ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। সিগন্যাল নামল। জ্বলল সবুজ আলো। কুলিরা ব্যস্ত-সমস্ত। যাত্রীদের নামিয়ে নিতে যারা এসেছে, দেববাণীর মত, তারা তৎপর। ট্রেন এবার আসছে। দেববাণীর মন নেচে উঠল। মা এসে গেছেন। ঐ এগিয়ে-আসা গাড়ীর উন্মুখ যাত্রীদের মধ্যে একজন আমার মা। ব্যাকুল-দৃষ্টি দেববাণী এগিয়ে গেল। গাড়ীর গতি মন্থর। গাড়ী থামল। যাত্রীরা হুড়োহুড়ি ক'রে নামছে। কুলিরা মাল টানাটানি করছে। এই দুরন্ত ভিড়ে মা নামবেন কি ক'রে ? কোথায় দেববাণী তাঁকে খুঁজে পাবে ? দেববাণী একবার এগিয়ে গেল। মাকে পেল না। পেছনে ফেলে আসিনি ত ? তাড়াতাড়ি আবার উল্টোদিকে ছুটল। পেল না। আশঙ্কায়, উত্তেজনায় দম ফুরিয়ে এসেছে। এবার সে একটু গুছিয়ে নিল নিজেকে। ধীরে ধীরে চলি, প্রত্যেকটি কামরা দেখে, প্রত্যেক দরজায় থেমে। মা নিশ্চয় আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

একটা কম্পার্টমেণ্টের দরজায় দাঁড়িয়ে দেববাণী ভেতরে উঁকি দিয়ে খুঁজছে, পেছন থেকে কে তাকে জড়িয়ে ধরল।

দেহ ভেঙ্গে পড়ল দেববাণীর! ভাল ক'রে না তাকেয়েই বলে উঠল : মা।

মা'র মুখে মিষ্টি হাসি।

"কি রে, খুঁজে পেলি না ত ?"

দেববাণীর কথা বলার শক্তি নেই।

"উঃ! এর মধ্যে কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় ?"

"এই ত তোকে আমি পেলুম।"

"তোমার জিনিসপত্র কোথায় ?"

"ঐ ত, ওখানে।"

"কুলি পেয়েছ ?"

"পেয়েছি। বাব্বা, বড় শীত রে তোদের দিল্লীতে!"

"দিল্লী আবার আমার হ'ল কবে থেকে ?"

"এবার হবে। তোর গবেষণাগার তৈরী হবে দিল্লীতে, তুই-ও হয়ে যাবি দিল্লীর।"

"চল, এগোই।"

"চল্।"

"রাস্তায় কষ্ট হয় নি ত ?"

"একটুও না।"

"ঘুমিয়েছিলে ?"

"যত খুশি।"

"কিছু খেয়েছ ?"

"না, দু'দিন উপোস রয়েছি। তুই কি আমার গার্জেন হলি ? চল, এগিয়ে চল।"

ওদের বেরিয়ে আসতে দেখে সুজন সিং গাড়ী নিয়ে এগিয়ে এল। বিরাট মোটর গাড়ী দেখে মা বললেন, "ওরে বাবা, এ যে বিরাট! কার রে ?"

"ডাঃ পোস্টের। ড্রাইভারও তার।"

"আমি ত ভাবলাম তুই একাই গাড়ী নিয়ে আসবি।"

"তাই করছিলাম। ওকে বলিও নি আসতে। সকালে দেখি নিজেই এসে গেছে। ছেলেটা বড় ভাল।"

"আমি ভাবলাম, তুই বুঝি গাড়ী চালিয়ে আমায় নিয়ে যাবি।"

"আঃ, তুমি ছাড়ো। দেখো কত গাড়ী চালাই তোমাকে নিয়ে।"

"কেমন চালাস ?"

"দেখোই না।"

"হ্যাঁ রে, তোর আমেরিকান বন্ধুরা বাংলা জানে ত ?"

"চমৎকার জানে।"

"তাও ভাল। তা নইলে কথা বলব কি ক'রে ?"

"কেন ? তুমি কি ইংরেজী জান না ?"

"ও মা, ওকে জানা বলে ? ঘরে ব'সে শেখাকে কি জানা বলে ?"

"বলে। তুমি যতটা ইংরেজী জান, হাজারে একজন আমেরিকান কোনও বিদেশী ভাষা ততটা জানে না।"

"এসে প'ড়ে বড় ভাবনা হচ্ছে রে। এলাম ত উৎসাহ করে। ওদের আতিথেয়তাও নিলাম। কিন্তু কথা যদি না কইতে পারি ?"

"চুপ ক'রে শুধু হাসবে।"

"তা পারব। কিন্তু আমার সময় কাটবে কি ক'রে ? তুই ত তোর কাজ নিয়ে ব্যস্ত।"

"একটা দোভাষী রেখে দেব তোমার জন্যে।"

"রক্ষে কর। এ কি রাজনীতি, যে দোভাষী দিয়ে কাজ চলবে ? আমরা নিজেরাই নিজেদের কথা ঠিকমত বলতে পারিনে, দোভাষী কি করবে ?"

"তা হলে উপায় ?"

"তোর বন্ধু আইরীণকে বাংলা শেখাস নি কেন ?"

"তার চেয়ে তোমাকে ফরাসী শেখানো সোজা ?"

"হ্যাঁ রে বাণী, ওরা কোন অসুবিধায় পরবে না ত ?"

"এক-আধটু কি আর হবে না অসুবিধা ? কিন্তু ওরা স্বীকার করছে না ; তোমার কথা ভাবছে। তোমায় পাছে অসুবিধা হয়।"

"তোর কি মনে হয় ? হবে ?"

"কোনদিন কোথাও তোমার অসুবিধে হয়েছে ব'লে ত জানিনে, মা।"

"কিন্তু এখানে যে ভয়ানক সুবিধার ছড়াছড়ি, তাতে অসুবিধা বিলক্ষণ হতে পারে। যাক-গে, সাহসে বুক বাঁধি, কি বল !"

গাড়ী এসে গেল নিজামুদ্দিনে। ঢুকল বাড়ীর ফটকে। দেববাণী নামল। মাকে নামাল।

মা দেখতে পেলেন, সুদর্শনা হাসি-খুশি একটি বিদেশী মেয়ে দাঁড়িয়ে। হাত জোড় ক'রে নমস্কার জানাল। ভাঙ্গা বাংলায় বলল, "আমার নাম আইরীণ। আসুন।"

মা তার পিঠে হাত বুলালেন। ভাঙ্গা ইংরেজীতে বললেন, "তোমাকে দেখে বড় সুখী হলাম। তোমার কথা অনেক শুনেছি।"

আইরীণ আবার বলল, "আসুন।"

পাঁচ

দেববাণীকে দেখে খুশি হলেন সাবিত্রী আম্মা। মুখের ভাঁজে ভাঁজে হাসি জমে রইল। আজ আর মিস রায় নয়। আজ শুধু দেববাণী। দেববাণীর পিঠে হাত রেখে তাকে বুকে টানলেন সাবিত্রী আম্মা।

"এসো, দেববাণী, এসো। তুমি আজ আসতে পারবে কি না ভয় করছিলাম।"

"বাঃ। আপনি নেমন্তন্ন করেছেন, আর আমি আসব না?"

"তোমার মা এসেছেন কিনা! মাকে ফেলে তুমি হয়ত—" হাসি দিয়ে বাক্য পুরো করলেন সাবিত্রী আম্মা।

"মা আরও জোর করে আমায় পাঠালেন।"

"পাঠাবেন বৈ কি? তাঁর শরীর সুস্থ আছে ত?"

"মাকে খুব একটা অসুস্থ কোনও দিন দেখিনি। সব অবস্থায়, সর্বত্র, সব সময় তাঁকে স্বাভাবিক দেখতেই আমরা অভ্যস্ত। এখানে এসে দিব্যি জমে গেছেন। আমার বন্ধু মিসেস্ পোর্স্টের সঙ্গে তাঁর ভাব দেখলে অবাক হবেন।"

"শুনে আনন্দ হ'ল, দেববাণী। এসো, এ-ঘরটায় এস। তোমাকে দু'-একজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি।"

"আপনি কি অনেককে নেমন্তন্ন করেছেন?" সামান্য সংকুচিত হ'ল দেববাণী।

"অনেককে নয়। পাঁচ-ছয়জন, আর তুমি।"

"চলুন।"

"আরও একজনকে দেখবে, দেববাণী।" হঠাৎ গম্ভীর হলেন সাবিত্রী আম্মা। "আমি চাই, সে তোমাকে ভাল করে জানুক, তুমিও তাকে ভালভাবে চেন।"

উৎসুক চোখে তাকাল দেববাণী।

তার চোখে চোখ রেখে সাবিত্রী আম্মা বললেন, "সে আমার মেয়ে, সরোজা। এসো।"

শয়ন-ঘরের বিপরীত বড় ঘরে দেববাণীকে নিয়ে সাবিত্রী আম্মা ঢুকলেন। তিনজন ভদ্রলোক, এক মহিলা ও একটি মেয়েকে দেখতে পেল দেববাণী

পুরুষরা দাঁড়ালেন। দেববাণী লক্ষ্য করল, মেয়েটি উঠবার কৃত্রিম ভঙ্গি করল, উঠল না, চেয়ারে চেপে বসল ; দেববাণীর প্রতি একবার বক্রদৃষ্টি হানল।

সাবিত্রী আম্মা পরিচয় করিয়ে দিলেন। চারজনই পার্লামেণ্টের সদস্য। "এই হ'ল মিস্ রায়," তাঁদের কাছে দেববাণীর পরিচয় দিলেন সাবিত্রী আম্মা, "ওকে আমি দেববাণী বলেই ডাকি, ওর কথা একটু-আধটু আপনাদের বলেছি, এবার আপনারা নিজেরাই ওকে জানবেন। দেববাণী, ইনি এম. শ্রীনিবাসম্। লোক-সভার সদস্য। মাদ্রাজের বড় এক কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারে এঁর আগ্রহ অসামান্য। ইনি ভি. প্রসাদ রাও, অন্ধ্র প্রদেশ থেকে লোক-সভায় এসেছেন, সাচ্চা কংগ্রেস-সেবী, গান্ধীজী স্নেহ করতেন এঁকে। আর ইনি হলেন ওয়াই. পি. সনাতনম্। কেরল থেকে এসেছেন রাজ্যসভায়। মিঃ সনাতনম্ কেরলে কিছুদিন মন্ত্রিত্ব করেছেন, শিক্ষা-মন্ত্রিত্ব। লোকসভায় ইনি একজন শিক্ষাসমস্যা-বিশেষজ্ঞ ; মন্ত্রীরা অনেক সময় এঁর পরামর্শ ও সদুপদেশ নিয়ে থাকেন। ইনি, দেববাণী, ইনি সুরেশ্বরী ভার্গব, আমার সহকর্মী ও বন্ধু। তুমি যখন জন্মাও নি তখন থেকে সুরেশ্বরী ভার্গব উত্তর ভারতে সুবিখ্যাত। এঁর জীবনের পাতায় পাতায় ভারতবর্ষের এক সুদীর্ঘ ঘটনাবহুল ইতিহাস।"

দেববাণী প্রত্যেককে সসম্মানে নমস্কার করছিল। শ্রীনিবাসম্ গম্ভীর, বেঁটে, রোগা মানুষ, মাথা-ভরা টাক, দাড়ি-গোঁফ কামান, হাড় বার করা মুখ। তামিল কায়দায় ধুতি পরেছেন, সঙ্গে পশমের পাঞ্জাবী, ছাই রংএর আলোয়ান। প্রসাদ রাও ঘন কৃষ্ণবর্ণ, মজবুত, বলিষ্ঠ মানুষ ; মাথায় একরাশ তুষার-শুভ্র চুল, হাসি-খুশি, চঞ্চল ব্যস্ত-সমস্ত। ধুতির ওপর গলাবন্ধ মোটা পশমী কোটে শীতে আত্মরক্ষা করছেন। সনাতনম্ বিপুলকায় ; বিরাট মুখে তিন ভাঁজ চিবুক ; বড় বড় চোখে মোটা কাঁচের চশমা। তাঁর নাসারন্ধ্রের দিকে তাকিয়ে দেববাণীর হাসি পেল, মনে পড়ল কথামালার গল্প : ঘুমন্ত সিংহের নাকে ইঁদুরের প্রবেশ। ঘাড় প্রায় নেই, প্রকাণ্ড মাংসল কাঁধে সুবৃহৎ মাথা। একখানা সোফা পরিপূর্ণ করে উপবিষ্ট সনাতনম্ ; উঠে দাঁড়ালেন বেশ কষ্টে। গলাবন্ধ কোটে তাঁকে অতিকায় গোলাকার কোনও বস্তু মনে হ'ল, অথচ দেববাণী দেখল, বড় বড় চোখে সনাতনম্ তাকে খুঁটিয়ে দেখছেন।

সুরেশ্বরী ভার্গবকে দেববাণীর প্রথম দৃষ্টিতে ভাল লাগল। বয়স হয়তো সত্তর পার হয়েছে ; কিন্তু বার্ধক্য যে স্ত্রীলোককে এত প্রশান্ত, সুন্দর করতে পারে, দেববাণী আগে খেয়াল করে নি। ধবধবে ফর্সা রং এখনও উজ্জ্বল। চোখের দীপ্তি

এখনও অম্লান। অপ্রচুর শুভ্র কেশ অযত্নে বিন্যস্ত। ছোট-খাটো ছিমছাম দেহ, সাদা উলের ব্লাউজ ও মোটা সিল্কের শাড়ীতে সুশোভন। বাঁধান দাঁতে ভাঙ্গা চিবুক সামান্য অসহায়; পাতলা অধরোষ্ঠে বাসিফুলের ক্লান্ত কোমলতা, সারা মুখে শান্ত হাসির দীপ্তি চিবুক বেয়ে যেন ঝরছে। দেববাণী এসে দাঁড়াতে সুরেশ্বরী ভার্গব স্নেহের হাসিতে বললেন, "সাবিত্রী আম্মার কাছে তোমার কথা শুনেছি, মা। বড় কাজে নেমেছ। ভগবান তোমার ভাল করুন।"

দেববাণীর ইচ্ছে হ'ল পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। এ পরিবেশে বেমানান হবে তাই মাথা নত করে প্রণতি জানাল।

মনে মনে দেববাণী আরও অনেক কিছু ভেবে নিল। সাবিত্রী আম্মা বলেছিলেন পার্লমেণ্টের কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে দেববাণীকে পরিচয় করিয়ে দেবেন। তাঁরা শিক্ষা প্রাসারে, বিশেষত বৈজ্ঞানিক শিক্ষা, উৎসাহী। তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হলে শুধু যে দেববাণীর গবেষণাগার স্থাপনে সুবিধে হবে তাই নয়, নতুন ভারতবর্ষে প্রথম সারির লোকেরা কি চিন্তা করেন তার আন্দাজও সে পাবে। প্রস্তাবটা দেববাণীর আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। নিমন্ত্রিতগণের সঙ্গে পরিচিত হবার সময় দেববাণীর মনে হচ্ছিল সাবিত্রী আম্মা এমন ক'জনকে একত্রিত করেছেন, যাঁরা তাকে খুঁটিয়ে দেখবেন, যাঁদের সহানুভূতি তাকে অর্জন করতে হবে। শীতের দুপুরে সাবিত্রী আম্মা এঁদের আহারে আমন্ত্রণ করেছেন প্রধানত দেববাণীকে পরিচয়ের সুযোগ দিতে। তাঁর এই অনুগ্রহে যেমন দেববাণীর মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল, তেমনি সন্ত্রস্ত হল আসন্ন সংঘর্ষের সম্ভাবনায়। তিনজন পুরুষের একজনকেও তার বিশেষ আশ্বাসবহ মনে হ'ল না। বরং খানিকটা অস্বস্তির সঙ্গে সে বুঝল, তিনজনই বহু দূর থেকে কঠিন নজরে তাকে যাচাই করছেন। প্রসাদ রাওয়ের হাস্যচঞ্চল মুখেও কঠিন ঔদাসীন্যের সংকেত। একা সুরেশ্বরী ভার্গব তাকে অনেকখানি আত্মবল ও বিশ্বাস দিলেন। সবার ওপরে, সে বার বার মনে মনে বলল রয়েছেন সাবিত্রী আম্মা। তবু তার অস্বস্তির ভাবটা একেবারে কাটল না।

"দেববাণী, এ আমার মেয়ে সরোজা।"

দেববাণী সরোজার মুখোমুখি দাঁড়াল। প্রথম দৃষ্টিতে সরোজাকে ভালবা না দেববাণী। মনে হ'ল মুখখানা কঠিন; চোখে ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন। মনে হ'ল, ক্ষীণ গোঁফ-রেখা ঘনিষ্ঠ পরিচয়কে দৃঢ় নিষেধ জানাচ্ছে। ভাল ক'রে তা দেখল দেববাণী। সরোজা সাবিত্রী আম্মার চেয়ে লম্বা, কিন্তু মানানসই;

মাংসল নয়, সুগঠিত। গালের চোয়াল চওড়া, চিবুক কোমল।' সামান্য চাপা নাক কপাল থেকে নেমে এসেছে ; প্রশস্ত মসৃণ কপাল। সরু ঈষৎ-বাঁকান জ্র। ওষ্ঠের মাঝখানে সুন্দর ছোট্ট একটি তরঙ্গ। অসমান দাঁতের সারি। সরোজার মুখে প্রধানতম অঙ্গ তার চোখ। এত সুন্দর, এত বড় ভাষাময় চোখ দেববাণী আগে দেখে নি। নাকের পাশ থেকে কানের প্রায় যেন কাছাকাছি সরোজার কালো, প্রদীপ্ত নয়ন। চোখের তারা যত কালো, পরিবেশ তত শুভ্র। সে যখন পরিপূর্ণ তাকায় কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগে ; ধবধবে অনেকখানি সাদার মধ্যস্থলে ঘনকৃষ্ণ চক্‌চকে চোখের মণি জ্বলজ্বল করে। এ চোখের সামনে সহজে দাঁড়ান যায় না। যেন অনেক বেশী দেখে নেয় সরোজা। কিন্তু সহজে সে কিছু দেখতে চায় না। বেশীর ভাগ সময় সুবিস্তৃত নয়নে ঔদাসীন্যের পর্দা ঝুলিয়ে রাখে সরোজা। তখন কেউ তার সঙ্গে কথা বলতেও সাহস পায় না। কদাচিৎ তার চোখ যখন নিদ্রা-ভঙ্গে জেগে ওঠে, যে বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে তাতে, তার মধ্যে বিদ্রূপের ঝলকানি। কথা বলে সরোজা কম ; বলার দরকার হয় না। যা মুখে বলে না, দৃষ্টিতে জানিয়ে দেয়। তার দৃষ্টির সামনে মানুষের বাইরের পর্দা খুলে যায়, সরোজা দেখতে পায় ভিতরের মানুষকে। দেখে খুশি হয় না। চোখে কঠিন বিদ্রূপের চাবুক মারে।

পরস্পরের সামনে দাঁড়িয়ে দেববাণী ও সরোজা দু'জন দু'জনকে দেখল। দেববাণীর মনে পড়ল মেয়ের কথা উঠলে সাবিত্রী আম্মা বিচলিত হন। একটু আগে উচ্চারিত তাঁর কথা দেববাণীর কানে বাজল : আমি চাই, সে তোমাকে ভাল ক'রে জানুক, তুমিও তাকে ভালভাবে চেন।

জোড়হাতে নমস্কার করল দেববাণী।

"কবে এসেছেন আপনি ?" মৃদুস্বরে প্রশ্ন করল।

প্রশ্নের উত্তর দিল না সরোজা। বড় বড় চোখ পুরোপুরি মেলে দেববাণীকে বার বার দেখল। চোখের ঔদাসীন্য কেটে গিয়ে বিদ্যুৎ খেলল, বিদ্রূপের বাণ হেনে সরোজা বলল :

"আচ্ছা ! আপনিই মা'র শেষতম পাগলামি !"

"ঠিক বলছেন," চাপা হেসে উঠল দেববাণী। "পাগলামিই বটে। কবে এলেন আপনি ?"

দেববাণীর একান্ত স্বাভাবিক সপ্রতিভতায় বিস্মিত হ'ল সরোজা। তার ব্যঙ্গবাণের কাছে প্রায় সবাই পরাস্ত, নিপীড়িত হয়। সো ইউ আর মাদার্স

লেটেষ্ট ক্রেজ—কথাগুলির মধ্যে বেশ খানিকটা জ্বালা সে মিশিয়ে দিয়েছিল। দেববাণী তা একেবারে গায়ে মাখল না। কিম্বা, সে প্রদাহ দেববাণীর দেহে লাগল না। প্রথম সংঘাতে সরোজা হারল। অনভ্যস্ত অনুভূতি তার মন্দ লাগল না। এবারও দেববাণীর প্রশ্নের উত্তর দিল না সরোজা।

নিমন্ত্রিত পুরুষ তিনজন উত্তেজিত আলোচনায় নিমগ্ন। সাবিত্রী আম্মা হেসে হেসে কথা বলছেন স্থরেশ্বরী ভার্গবের সঙ্গে। তিনি যে সর্বক্ষণ তনয়ার দিকে মন নিবিষ্ট রেখেছেন, তাঁর চোখ যে বার বার আত্মজাকে নিরীক্ষণ করছে, সরোজা তা পরিষ্কার জানতে পেল। দেববাণীর চোখে সবটুকু দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে সে প্রশ্ন করল, "মাকে আপনি প্রভাবিত করলেন কোন যাদুতে?—হাউ ডিড্ 'য়ু স্প্রেড্ 'য়র চার্ম্ অন্ মাদার?"

হাসতে হাসতে দেববাণী জবাব দিল, "ঠিক তার উল্টো। তিনিই আমাকে প্রভাবিত করেছেন। আমার আর যাই থাক, চার্ম্ নামক বস্তুটির পূর্ণ অভাব।"

"অর্থাৎ আপনি জানেন ওটা আপনার প্রচুর রয়েছে।"

"আপনাকে আমার অনেক ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। কিন্তু বাধছে।"

"কেন? আপনার ত সহজে বিশেষ বাধে ব'লে মনে হয় না।"

হেসে উঠল দেববাণী। সরোজা আবার বুঝল, বিষে কাজ হ'ল না।

দেববাণী বলল, "আমার চার্ম্ কাজ করছে না। ধন্যবাদ দি' কি করে?"

ক্ষীণ হাসির বক্র রেখা ওষ্ঠের তরঙ্গে ঈষৎ খেলে গেল সরোজার। চোখে ভ'রে নিয়ে এল রাশি রাশি ঔদাসীন্য। চোখ বুজল বিরক্তির ভঙ্গিমায়, যখন মেলল তখন সে যেন বহুদূরে, বর্তমানে তার সামান্য মনোযোগ পর্যন্ত নেই। দেববাণী যে আছে, তার সামনেই আছে, তারই মায়ের সম্মানিত অতিথির মর্যাদায়, আরও চারজন গুণী-মানী ব্যক্তির উপস্থিতিতে প্রাধান্য-প্রাপ্ত দ্বি-প্রাহরিক আহার-আমন্ত্রণে, সব বিস্মৃত হ'ল সরোজা, সব তুচ্ছ, সামান্য, স্তিমিতার্থ হয়ে গেল সরোজার কাছে; নিজেকে সে সরিয়ে নিয়ে গেল ঔদাসীন্যের গহ্বরে।

অপ্রতিভ, বিস্মিত, মুগ্ধ হ'ল দেববাণী।

আমন্ত্রিত আরও দু'জনের আগমনে সবার মন অন্যত্র সঞ্চারিত হ'ল। সাবিত্রী আম্মার অভ্যর্থনায় বিগলিত হয়ে ঘরে ঢুকলেন গণপৎ গৌতম ও চতুর্নারায়ণ মালব্য। দু'জনই উত্তর প্রদেশ থেকে নির্বাচিত পার্লামেন্টের সদস্য। গৌতমের বয়স ষাট উত্তীর্ণ, লম্বা, সরু দেহ, পাকা চুল কদম-ছাঁটা। গরম

চুড়িদার ও আচকানে আঁটসাঁট দেখাচ্ছে। দেববাণীর সঙ্গে পরিচয় হতে বললেন, "আপনি ত দেখছি এ ইয়ং উয়োম্যান। আমি ভেবেছিলাম, বুঝি-বা সাবিত্রী আম্মার সমবয়সী কেউ হবেন।" মালব্য মাঝারি সাইজের মাঝারি-দর্শন মাঝারি-বুদ্ধি মাঝ-বয়সী মানুষ; মোটা খদ্দরের কুর্তা ও পায়জামা ছাড়া এত শীতেও কিছু ধারণ করেন নি। দেববাণীকে 'নমস্তে' ক'রে সোজা তিনি সনাতনমের পাশের চেয়ারে বসলেন। পরক্ষণেই দু'জনের মধ্যে বাক্-বিতণ্ডা শুরু হ'ল। সাবিত্রী আম্মা মৃদু হেসে স্বরেশ্বরী ভাগবকে বললেন, "মালব্য ও সনাতনম্ কোনও বিষয়ে একমত নয়। একসঙ্গে হলেই তর্ক।"

স্বরেশ্বরী মন্তব্য করলেন, "দু'জনের চেহারাই যে একেবারে আলাদা।"

"আলাদা চেহারার লোকদের বুঝি মিল হয় না?"—বিস্মিত হাস্যে প্রশ্ন করলেন সাবিত্রী আম্মা।

"অনেক ক্ষেত্রে ত হয় না দেখে আসছি। খুব মোটা আর খুব সরু দু'জন লোকের সাচ্চা বন্ধুত্ব সহজে কখনও দেখতে পাবে না। সাড়ে ছ'ফুট লম্বা মানুষের সঙ্গে পাঁচ ফুট এক ইঞ্চি পুরুষের মিতালি অস্বাভাবিক।"

দেববাণী দাঁড়িয়েছিল ওদের পাশে। সে বলল, "স্বামী-স্ত্রী হলে কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম।"

তিনজনেই হেসে উঠলেন। সাবিত্রী আম্মা বললেন, "স্ত্রী যদি দারুণ মোটা হন, আর স্বামী টিনটিনে সরু, তা হলে স্ত্রীর মধ্যে বাৎসল্য ভাব বেশী দেখা যায়। মাদ্রাজে এমন এক দম্পতিকে আমি জানি। স্ত্রী দশাসই তিন মণ, স্বামী এক মণ দশ সের। মহিলা মহাশয়কে এমন দেখাশোনা করেন যেন তিনি তাঁর চিররুগ্ন সন্তান।"

"ভদ্রলোকও নিশ্চয় পত্নীতে মাতৃদর্শনে পরিতৃপ্ত।" স্বরেশ্বরী ভার্গব টিপ্পনী করলেন।

"প্রথমে তিনি রীতিমত বিদ্রোহী ছিলেন। কিন্তু যত স্ত্রীর দেহ বিপুলাকার হ'ল, ততই যেন তার বিদ্রোহ ফুরিয়ে গেল। এখন যদি স্ত্রী তাঁকে কাছে ডেকে কোলে বসিয়ে ধোসে খাইয়ে দিতে চান, অমান্য করার মত সাহস তাঁর আছে কি না সন্দেহ।"

স্বরেশ্বরী ভার্গব হাসতে হাসতে বললেন, "ফিরোজপুরে এক স্বামী-স্ত্রী ছিল; সবাই তাদের চিনত। স্বামী ছ'ফুট চার ইঞ্চি, যেমন দীর্ঘ তেমন প্রশস্ত। মাথায় বিরাট পাগড়ি। না, শিখ নয়; পেশোয়ারী হিন্দু। রাস্তায় চললে মনে হ'ত

একটা চেনার গাছ হেঁটে যাচ্ছে। তার স্ত্রী ছিল ঠিক উল্টো। ছোট্ট মানুষটি, চমৎকার দেখতে। পাঁচ ফুটেরও কম লম্বা, ক্ষীণ দেহ। দু'জনে রাস্তায় চললে সবার দৃষ্টি পড়ত তাদের ওপর। অথচ স্ত্রীর এমন ভয়ানক দাপট ছিল যে, ভদ্রলোক একেবারে কেঁচো হয়ে থাকতেন।"

"অসম্ভব।" হেসে প্রতিবাদ করলেন সাবিত্রী আম্মা।

"সত্যি বলছি। অমন ছোট্ট সুন্দর মেয়েটির মেজাজ যে অত প্রখর হতে পারে, না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। রাগলে সে স্বামীকে মারতে পর্যন্ত ছাড়ত না।"

"আর ঐ চেনার বৃক্ষ নীরবে স্ত্রীর প্রহার সহ্য করত ?"

"প্রকৃতির পরিহাস ত সেখানেই। লোকটি রীতিমত ভয় করত স্ত্রীকে।"

দেববাণী দেখতে পেল সরোজা নিতান্ত অমনোযোগে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে ; চোখে-মুখে তার থমথমে বিরক্তি। পুরুষদের মধ্যে সোৎসাহ রাজনীতি-চর্চা চলছে। কান পেতে যেটুকু দেববাণী শুনতে পেল তাতে বুঝল, একই সঙ্গে একাধিক প্রসঙ্গ আলোচিত হ'চ্ছে। সনাতনম্ ও মালব্য কংগ্রেসের সমাজবাদ নিয়ে খণ্ডযুদ্ধে অবতীর্ণ। মালব্য বলছেন, কংগ্রেস সমাজবাদ গ্রহণ করে নি, করতে পারে না তার শ্রেণী-চরিত্র বিসর্জন না দিয়ে ; সনাতনম্ জাহির করছেন, মালব্য আসলে কম্যুনিষ্ট, তাই তিনি গণতান্ত্রিক সমাজবাদ যে কত বড় তা বুঝতে পারছেন না। শ্রীনিবাসম্ ও প্রসাদ রাও কোনও মন্ত্রীর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সরস আলোচনায় নিমগ্ন ; একে অন্যের পরিবেশিত তথ্য ও তাৎপর্য পরমানন্দে আস্বাদন করছেন ; গণপৎ গৌতম, দেববাণী দেখল, কোনও আলোচনায় বিশেষ অংশ নিচ্ছেন না। দু দলের কথাতে মাঝে মাঝে কান দিচ্ছেন, কিন্তু তাঁর চোখ বার বার ঘুরে ফিরে সরোজাকে নিরীক্ষণ করছে।

রামস্বামী দ্বারপথে উদিত হয়ে সাবিত্রী আম্মাকে কি বলল। সাবিত্রী আম্মা একবার ভেতরে গেলেন। অবিলম্বে ফিরে এসে বললেন, "আহার তৈরী। আপনারা আসুন।"

সবার সঙ্গে দেববাণী বারান্দায় এসে দাঁড়াল। প্রশস্ত টেবিলে আহারের আয়োজন দেখে দেববাণী বিস্মিত, চমৎকৃত হ'ল।

সাবিত্রী আম্মা আগেই সবাইকে বলেছিলেন, তামিল প্রথায় তামিল আহারের আয়োজন করা হয়েছে।

এ নিয়ে দু'চারটে রসিকতাও হয়েছিল।

সুরেশ্বরী ভার্গব বলেছিলেন, "আমার বাড়িতে তোমাকে একদিন তা হলে পাঞ্জাবী খানা খেতে হবে।"

সাবিত্রী আম্মা জবাব দিয়েছিলেন, "যে খানা তুমি খাও তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তোমার ছেলেরা যা খায়—"

গণপৎ গৌতম মন্তব্য করেছিলেন, "ভারতবাসী যখন সবাকার খানা এক-সঙ্গে খেতে শিখবে তখন আমাদের জাতীয় ঐক্য নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না।"

প্রসাদ রাও যোগ দিয়েছিলেন, "খাদ্য-মন্ত্রীকে তা হলে একটা 'ন্যাশনাল ডিশ' প্রস্তাব করতে বলা হোক। পাঞ্জাব-মারাঠা-গুজরাট-বঙ্গ-তামিল-উৎকল-আসামের দৈনিক খাদ্য থেকে বাছাই করে তৈরী হবে 'ন্যাশনাল ডিশ'। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীরা যখন পার্টি দেবেন, এই 'ন্যাশনাল ডিশ' পরিবেশিত হবে।"

শ্রীনিবাসম্ বলেছিলেন, "ব্যাপারটা মন্দ হবে না। কিন্তু। মাছের ঝোল দিয়ে ইড্‌লী খেয়ে তামিল ব্রাহ্মণের জাত যাবে। তণ্ডুরী মুর্গি দর্শনে মারাঠা ব্রাহ্মণ মূর্ছা যাবেন।"

দেববাণী দেখল, টেবিলে নিমন্ত্রিতদের জন্যে কলাপাতা পেতে দেওয়া হয়েছে, সদ্য-ধোওয়া, চকচকে পরিষ্কার, মসৃণ, সবুজ, জলসিক্ত। প্রত্যেক কলাপাতার পাশে ষ্টেন্‌-লেস্ ষ্টীলের গ্লাস। প্রত্যেক কলাপাতায় প্রাথমিক খাদ্য পরিবেশিত। মাঝখানে সরু সুগন্ধি চালের সাদম্, তার ওপর তাজা 'নাই', অর্থাৎ ঘি। সাদমের ওপরে ডান কোণে উপ্‌পু (নুন), পাশে পাচরি। পাচরি থেকে পর পর বাঁ দিকে আভিয়াল, পরুত্তোয়াল, কুটু, ভাজা, বড়া, পাপড়ম, পিকু। সাদমের নীচে ডান দিকে সামান্য পায়সম্। দেববাণী কখনও তামিল গৃহে আহার করে নি, নিয়ম-কানুন তার অজানা। বিদেশে বহুবার তাকে অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। অভিজ্ঞতার দ্বারস্থ হয়ে সে আর সবাই কি করেন তার অপেক্ষায় রইল।

সবার দেখাদেখি দেববাণী প্রথম একটু পায়সম্ মুখে দিল। অনেকটা বাঙ্গালী ঘরের পায়েস, কিন্তু চাল বেশী, দুধ কম। সাদম (ভাত), ডাল ও পাচরি অল্প পরিমাণে মিশিয়ে আহার শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘর থেকে এল সাম্বার। পাচরি, দেববাণী দেখল, সব্জী, দই ও কাঁচা লঙ্কার মিশ্রণ, খেতে মন্দ লাগল না। সাম্বারে অড়হর ডাল, তেঁতুল, দু'চার টুকরো সব্জী, আর মরুঙ্গকায়—সজনের

ডাঁটা। তিনরকমের তরকারী বার বার পরিবেশন করল রামস্বামী। কারী—কাঁচাকলার ঝোল: আভিয়াল—নানা তরকারীর সংমিশ্রণ, করেলা-সংযোগে সামান্য তিক্তস্বাদ্; পরুত্তোয়াল—অনেক রকম তরকারী দিয়ে শুকনো করে রাঁধা। সাম্বারের সঙ্গে এল দুরকমের পাপড়—পাপড়ম্ ও আপরম, প্রথমটা ডালের, দ্বিতীয়টা চালের। তারপর রসম্। দক্ষিণ-ভারতীয় নিমন্ত্রিতগণ যথেষ্ট পরিমাণে রসম্ খেলেন; অড়হর ডালের জুসের সঙ্গে তেঁতুল, টমাটো, ধনে ও অধিক মাপের জল দিয়ে তৈরী তাঁদের এই অতি প্রিয় খাদ্য দেববাণীর পছন্দ হল না। রসমের পর পাল-পায়সম্, অর্থাৎ দুধের পায়েস। তারপর এল মরু—বাংলায় যার নাম ঘোল। বাটি ভরতি মরু পান করলেন দক্ষিণ দেশের অতিথিগণ; অন্য সবাই সামান্য গ্রহণ করলেন; দেববাণী ভদ্রতার খাতিরে একটু নিল। সবশেষে ফল নিয়ে এল রামস্বামী। ওয়ারেপরম্--কলা, আর মাম্বড়ম্—আম। দক্ষিণ ভারতীয়গণ আচমন করে আহারে মনোনিবেশ করেছিলেন, গণ্ডুষে ভূরি-ভোজন সমাপ্ত করলেন।

দেববাণী বুঝল, তামিল রীতিতে এলাহী আয়োজন করেছিলেন সাবিত্রী আম্মা। দক্ষিণী নিমন্ত্রিতেরা বার বার আহার্য ও রন্ধন-নিপুণতার সরব প্রশংসা করলেন। উত্তর ভারতের গণপৎ গৌতমও খেলেন বেশ তারিফ করে। চতুর্নারায়ণ মালব্য বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারলেন না; সম্ভবতঃ রুটির অভাব তাঁর আহারকে অপূর্ণ রেখে দিল। সুরেশ্বরী ভার্গব সামান্য খেলেন। দেববাণীর ক্ষিধে পেয়েছিল; খেতে তার মন্দ লাগল না। কিন্তু বেশ একটু অস্বস্তির সঙ্গে খেতে হল তাকে। সাবিত্রী আম্মা বার বার জিজ্ঞেস করে চললেন, তার ভাল লাগছে কিনা; খেতে বসে এমনি জবাবদিহি করা দেববাণীর অনভ্যাস। তা ছাড়া, দেববাণী লক্ষ্য করল, সরোজা অতি সামান্য আহারের বাকী সময়টা শুধু তাকেই দেখল, সহজ চোখে নয়, অপাঙ্গে, বক্র-দৃষ্টিতে, যাতে অনেকখানি সন্দেহ, খানিক কৌতূহল, কিছু ঈর্ষা।

এক ঘণ্টার বেশী আহারে কাটল। সঙ্গে সঙ্গে আলাপ আলোচনা। সাবিত্রী আম্মা কথাবার্তার পথনির্দেশ করলেন। আচমন করে অতিথিগণ আহারে প্রবৃত্ত হলে তিনি দেববাণী-প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন। দেববাণী বিব্রত হল, কিন্তু পরীক্ষার জন্যে তৈরীও হল।

সাবিত্রী আম্মা বললেন, "দেববাণীকে আজ ডেকেছি আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করাতে। দু'দিন হ'ল ওর মা এসেছেন কলকাতা থেকে; তাঁকে একা

ফেলে এখানে থেতে আসায় ওর অসুবিধা ছিল। তবু দেববাণী এসেছে, বিশেষ করে এ জন্য যে আপনাদের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ পাবে।"

"সেজন্যে ওঁকে আমাদের সবার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত", কণ্ঠস্বরকে সুমধুর করে বলে উঠল সরোজা।

দেববাণীর কান গরম হল, চোখ জ্বালা করল। সাবিত্রী আম্মা সরোজার মন্তব্যে মন দিলেন না।

সুরেশ্বরী ভার্গব একবার দেববাণীর মুখের পানে তাকিয়ে একটুকরো ভাজা আলু চিবোতে লাগলেন।

গণপৎ গৌতম বলে উঠলেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

প্রসাদ রাও দেববাণীকে বলল, "আপনি দিল্লীতে রিসর্চ সেণ্টার খুলতে চান? কি কি বিষয়ে রিসর্চ হবে আপনার সেণ্টারে?"

দেববাণী উত্তর দিল, "এপ্লায়েড ফিজিক্স আর ইন্‌ডাষ্ট্রীয়াল কেমিষ্ট্রী।"

"কোন পর্যায়ের রিসর্চ?"

"আমাদের ইচ্ছে কেবলমাত্র উন্নত পর্যায়ের। এম. এস-সি পাশ করার পর সেণ্টারে ছাত্র-ছাত্রীরা যোগ দিতে পারবেন। অধ্যাপকরাও আসতে পারবেন। যাঁরা কিছু রিসর্চের কাজ ইতিমধ্যে করেছেন, আরো উন্নত মানের রিসর্চ করতে চান, তাদের জন্যেও ব্যবস্থা থাকবে।"

"রিসর্চ করে লাভ কি হবে?" জানতে চাইলেন সনাতনম্।

হঠাৎ দেববাণী জবাব খুঁজে পেল না। বুঝতে পারল সরোজা মৃদু হাসছে। দেববাণী বলল, "বিজ্ঞান নিয়ে উন্নতমানের রিসর্চে যা যা লাভ হয়ে থাকে তার সবটাই হবে।"

"একটু বুঝিয়ে বলুন", দাবী করলেন সনাতনম্।

"আমাদের ইচ্ছে যাঁরা রিসর্চ করবেন তাঁরা দেশী বা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সহযোগিতার যোগসূত্র রেখে কাজ করবেন। ডক্টরেট পাবার জন্যেও রিসর্চ কনডাক্ট করা হবে। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গেও আমরা সহযোগিতা করব।"

"বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী হবে?"

দেববাণী গণপৎ গৌতমের দিকে তাকিয়ে বলল, "কেন হবে না? আমেরিকার দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কথাবার্তা কিছুটা আমার হয়েছে। এ দেশের ছাত্রছাত্রী অধ্যাপকদের পক্ষে বিদেশে গিয়ে রিসর্চ করা কত কঠিন আপনাদের জানা আছে। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগসূত্র

এখনও অত্যন্ত ক্ষীণ। দেশী বিদেশী অধ্যাপকদের দ্বারা পরিচালিত উন্নত মানের রিসর্চের ব্যবস্থা যদি আমরা করতে পারি তা হলে এখানকার থিসিসের ওপরেই বাইরের ডক্টরেট পাওয়া সম্ভব হবে। তা ছাড়া ডক্টরেট পাওয়াটা বড় কথা নয়। বৈজ্ঞানিক রিসর্চের প্রমাণ নব নব আবিষ্কারে। আমাদের রিসর্চ সেণ্টারে যদি সত্যিকার ভালো কাজ হয়, যদি আমরা বিজ্ঞানের পথে চলে প্রকৃতিকে নূতন পথে পরাস্ত করতে পারি, শিক্ষা প্রসারে সাহায্য করতে পারি, পৃথিবীতে আমাদের মূল্য নিশ্চয় স্বীকৃত হবে।”

চতুর্নারায়ণ মালব্য বললেন, “আমাদের দেশে ইতিমধ্যেই কয়েকটি জাতীয় লেবরেটরী স্থাপিত হয়েছে। বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা তাদের কর্ণধার। কিন্তু রিসর্চ বা আবিষ্কার যে বিশেষ হচ্ছে তা ত নয়।”

দেববাণী বলল, “বৈজ্ঞানিক রিসর্চ সময় ও কষ্ট সাপেক্ষ। চট করে সার্থকতা পাওয়া অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব। আজীবন গবেষণা ক'রেও অনেকে সার্থকতার ছোঁওয়া পান না। তাই, রিসর্চ লেবরেটরী খুললেই তাতে সোনা ফলবে এমন আশা সব সময় অবাস্তব। অবশ্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ফল তাড়াতাড়ি পাওয়া উচিত। আমাদের দেশে বিজ্ঞান সবে মাত্র জাতীয় জীবনে প্রবেশ করেছে। শিল্প প্রসারের পদে পদে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা। বিজ্ঞান আমাদের দেশের যতটা সেবা করতে পারে পাশ্চাত্য দেশগুলির ততটা নয়। ধরুন, ঘানির তেল। ঘানি টানে গরুতে। মোটর লাগিয়ে ঘানি টানাতে পারলে অনেক বেশী তেল তৈরী হয়। তেমনি, আমাদের গ্রামে ক্ষেতে জল দেওয়া। সব ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের প্রতীক্ষায় আমাদের দেশবাসী বসে আছে। বিজ্ঞান এসে তার ঘরে বিজলী বাতি জ্বালবে, তার উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াবে, তা'কে অতীত যুগের দৈহিক মেহনতের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবে। বিজ্ঞান বন্যা আটকাবে, মাঠের ফলন বাড়াবে, জমির উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করবে। সর্বত্র বিজ্ঞানের প্রয়োজন। সরকারী প্রচেষ্টা কোথায় কতটুকু কি করতে পেরেছে না পেরেছে আমার জানা নেই।”

“আপনার রিসর্চ সেণ্টারকে বেসরকারী রাখতে চান ?”

দেববাণী বলল, “ঠিক বলেছেন। তার কারণ অনেক। প্রথমতঃ, সরকারী উদ্যোগে যা হচ্ছে তা হোক, তার অপেক্ষায় বসে না থেকেও আমরা নিজেদের প্রচেষ্টায় যা করতে পারি তা করব। দ্বিতীয়তঃ, সরকারী প্রতিষ্ঠানের যেমন অনেক ভাল, তেমনি অনেক কিছু ভাল নয়। সরকার হচ্ছে বিরাট পাহাড়ের মত, বিপদের সময় ছাড়া মন্থরগতি। অসংখ্য নিয়মের বেড়াজালে বাঁধা।

শুনেছি, ন্যাশনাল লেবরেটরীতে একটা সস্তা যন্ত্র বিকল হলে মাসাধিক কাল কাজ বন্ধ হয়ে থাকে। আমরা আর একটু ক্ষিপ্রগতি হতে চাই।"

"আপনি বিদেশ থেকে বৈজ্ঞানিক আনবার কথা ভাবছেন?"

"কয়েকজন বিদেশী বৈজ্ঞানিকের দরকার হবে বলে মনে হচ্ছে। বিদেশে অনেক গুণী ও নামী ভারতীয় বৈজ্ঞানিক আছেন। তাঁদের মধ্যেও উপযুক্ত লোকের সন্ধান করতে হবে।"

"তাঁরা দেশে ফিরতে চান না কেন?" শ্রীনিবাসম্ প্রশ্ন করলেন। "তাঁদের ফেরা উচিত।"

"কেন বলুন ত?" সহাস্যে পাল্টা প্রশ্ন করল দেববাণী।

"দেশপ্রেম বলে একটা জিনিস ত আছে! তারা না হয় মাইনে কমই পাবেন, তবু দেশে তাঁদের যখন এত প্রয়োজন, তখন তাঁদের ফিরে আসা কর্তব্য।"

"মাপ করবেন, মিঃ শ্রীনিবাসম্", দেববাণী উত্তর দিল। "আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি নে। দেশপ্রেম নিশ্চয় বড় জিনিস; ওটা শুধু রাজনৈতিক নয়। বিদেশে যাঁরা আছেন তাদের মন দেশের জন্যে ব্যথিয়ে ওঠে। দেশ তাঁদের টানে। আদর্শের বড় বুলি তাঁরা আওড়ান না। দেশের কাজের টান নয়, মাটির টান, জল-হাওয়ার টান, আত্মীয়-বন্ধু পরিজনের টান। কিন্তু তবু তারা ফিরতে চান না। কেউ কেউ ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পরে ফিরে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে ব্যথা ভরা মন নিয়ে পুনরায় দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন।"

"কেন? দেশ তাঁদের কাছে কি অপরাধ করেছে?"

"তাঁদের কারুর কারুর সঙ্গে আমেরিকায় ও য়ুরোপে আমার কথা হয়েছে। তাঁরা অর্থলিপ্সু নন; অন্ততঃ সবাই নিশ্চয় নন। দেশে অনেক কম মাইনের কাজ করতে তাঁরা রাজী। কিন্তু যেখানে তাঁদের আঘাত লেগেছে সবচেয়ে বেশী, তা হচ্ছে মানুষ হিসাবে প্রাপ্য সম্মানের অভাব। বিদেশে বৈজ্ঞানিক, লেখক বুদ্ধিজীবী অধ্যাপকদের যে সম্মান, এদেশে তার অভাব। সরকারী কর্ম নিয়ে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক দেশে ফিরে এসে দেখেছেন, তার চেয়ে প্রশাসনিক অফিসর-দের সম্মান ও ক্ষমতা অনেক বেশী। বিদেশে বিদ্যা ও কর্মের পুরস্কার হিসেবে যেটুকু খাতির, মান, যশ তাঁরা পান, তার অংশও দেশে আমরা তাঁদের দিতে চাই নে। সত্যি হোক, মিথ্যে হোক, এই হল তাঁদের প্রধান অভিযোগ।"

"কিন্তু আপনি ত প্রচুর খাতির পাচ্ছেন দেখতে পাচ্ছি," বলে উঠল সরোজা।

তার দিকে মুখ ফিরিয়ে দেববাণী বলল, "তা পাচ্ছি। কিন্তু তার মূলে আমার নিজের অর্জিত কর্ম নয়, আপনার মায়ের স্নেহ।"

মালব্য বললেন, "আপনি অনেক দিন বাইরে ছিলেন?"

দেববাণী হেসে বলল, "এখনও আছি। আমি কয়েক মাসের ছুটিতে আছি।"

"আবার চলে যাবেন?"

"যেতে ত হবেই। যদি রিসর্চ সেণ্টার স্থাপিত হয় তা হলে কর্মস্থান দেশে হবে। যদি না হয়, আরও কিছুদিন বিদেশে কাটাতে হবে।"

"আপনার সঙ্গে এ উদ্যোগে আর কে কে আছেন?"

"আছেন কয়েকজন। বিদেশে দশ-বারো জন বন্ধুর উৎসাহ ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আমরা পেয়েছি।"

"আপনারা কে কে?"

"আমি ও আমার এক বন্ধু।"

"তাঁর নাম জানতে পারি কি?"

"ডাঃ হিমাদ্রি বসু।"

"এখন তিনি কোথায়?"

"ভিয়েনায়।"

"কি করেন?"

"ওখানকার য়ুনিভারসিটিতে পড়ান।"

"আপনি বিয়ে করেন নি?" প্রশ্নকর্ত্রী এবার সরোজা।

দেববাণী তার চোখে চোখ রেখে উত্তর দিল, "করেছিলাম। স্বামীর সঙ্গে বনিবনাও হয় নি। বিয়ে ভেঙে দিয়েছি; আমার একটি ছেলে আছে। সে ইংলণ্ডে পড়ে।"

সকলে একটু অপ্রস্তুত হলেন। সরোজা হার মানল না।

প্রশ্ন করল, "বিয়ে ভেঙে গেল কেন?"

দেববাণী মৃদু হেসে বলল, "ঐ যে বললাম। বনিবনাও হল না।"

"আপনার ভূতপূর্ব স্বামী কি করেন?"

"খোঁজ রাখিনি।"

হাই তুলে সরোজা বলল, "একটা ব্যাপার আজকাল প্রায়ই আমাদের দেশে

দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বড় কাজ, দেশের কাজ, সে-সব মেয়েদের দ্বারাই সম্ভব যারা হয় বিয়ে ভেঙে দিয়েছেন, নয় বিবাহিত স্বামীর জন্যে বড় একটা কেয়ার করেন না। ব্যাপারটা বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়।"

সাবিত্রী আম্মা চঞ্চল হ'লেন। মেয়েকে লক্ষ্য ক'রে কিছু একটা বলতে গেলেন। ততক্ষণে দেববাণী সরোজাকে জবাব দিতে শুরু করেছে:

"তাই যদি হয়ে থাকে, তাহ'লে বিষয়টাকে মন দিয়ে বিবেচনা করা দরকার বৈকি?"

"দেখুন না," সরোজা আরও বলল, "মেয়েরা মন্ত্রী হচ্ছে, রাষ্ট্রদূত হচ্ছে, ম্যাজিস্ট্রেট, ইঞ্জিনীয়র, ডাক্তার, পাইলট, ডেপুটি সেক্রেটারী, এম. পি—কি না হচ্ছে? অথচ—"

"এঁদের সবাই নিশ্চয় স্বামীকে ডিভোর্স করেন নি, বা আপনি অন্য যা ইঙ্গিত করলেন, সে পথে পা দেন নি!" দেববাণী পাল্টা বলে উঠল।

"কিন্তু স্বামীকে এঁরা যে বিশেষ মেনে চলেন তাও ত মনে হয় না।"

এতক্ষণ পরে সুরেশ্বরী ভার্গব কথা বললেন, সরোজার দিকে তাকিয়ে, আস্তে আস্তে: "স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সম্পর্ক এমন জিনিস, সরোজা, যা নিয়ে সাধারণ মন্তব্য অনেক সময় অচল। অনেক কিছু আমরা বাইরে থেকে খণ্ড দৃষ্টিতে দেখি, দেখে যে-বিচার করি, তা অবিচার। স্ত্রী ও পুরুষ ক্রমে ক্রমে জীবনক্ষেত্রে সমপর্যায়ে দাঁড়াচ্ছে; তাদের সাবেকী সম্পর্কের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। আমার নিজের কথা বলি। আসলে একমাত্র নিজের কথাই আমরা পরিষ্কার ক'রে বলতে পারি, অথচ প্রায়ই তা বলতে চাই নে। আমার স্বামী যখন স্বদেশীতে যোগ দেন, সে গান্ধী-যুগেরও আগে, লোকমান্য তিলকের যুগে। তখন আমি নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে বালিকা-বধূ। সামান্য লেখাপড়া শিখেছিলাম বাড়ীতে বাবার কাছে। স্বামী দেশের কাজ করেন, দেশের কথা ভাবেন, আমি তার বিন্দু-বিসর্গও বুঝতে পারি নে। আরও লক্ষ লক্ষ ভারতীয় মেয়ের মত আমার স্থান সংসারে, স্বামীর স্থান তাঁর বিচিত্র বিরাট কর্মক্ষেত্রে। সে সময় আমাদের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক ছিল একরকম। তারপর একত্রিশ সালে আমিও যখন গান্ধীজীর চেলা হলাম, জেলে গেলাম, জেলে ব'সে পড়াশুনা করলাম, ম্যাট্রিক পাশ পর্যন্ত দিলাম, মুক্তি পাবার পর আমাদের সম্পর্ক অন্য স্তরে এসে দাঁড়াল। মুখে তিনি যাই বলে থাকুন, বাস্তবক্ষেত্রে স্ত্রীকে রাজনীতির জঙ্গমে ছেড়ে দিতে সহজে রাজী হ'লেন না। কিন্তু একবার যে ঝরণা বইতে শুরু

করেছে পাহাড়ের গায়ে, তুমি তাকে বাঁধবে কি করে? আমি কংগ্রেসে ভিড়ে গেলাম, বেশ কিছু মান-সম্মানও হল, সঙ্গে সঙ্গে প্রাইভেট প'ড়ে বি. এ পাশ করলাম। তখন আমাদের সম্পর্ক অনেকখানি নতুন ধরনের হল। যে মানদণ্ডে যৌবনে আমার বিচার চলত সে মানদণ্ড মিথ্যে হয়ে গেল। একদিন পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলা আমার নিষেধ ছিল; আর এখন আমি বহু পুরুষের সঙ্গে অবাধে মিশতে লাগলাম। অনেক কথা রটল আমার নামে। তার প্রায় সবটাই ঘুরে ফিরে ফেরৎ আসত আমার কাছে। কিন্তু, এই বৃদ্ধ বয়সে আমি বলছি, স্বামীর সঙ্গে আসল সম্পর্কে আমার কোনও দিন একটুও ছেদ পড়ে নি! একথা তিনিও জানতেন, আমিও জানতাম।"

সকলে নীরবে সুরেশ্বরী ভার্গবের কথা শুনলেন। আহার মন্দগতি হল। তিনি থামলেও নীরবতার রেশটুকু রয়ে গেল।

তখন গৌতম বললেন, "একটা কথা আপনাদের মানতেই হবে। পুরুষদের আপনারা অনেক দোষ দিয়ে থাকেন। কিন্তু এ দেশে পুরুষরা স্বেচ্ছায় স্ত্রীজাতির উন্নতির পথ তৈরী করেছেন। স্বাধীন হবার পরই স্ত্রীলোকদের যে পূর্ণ ভোটাধিকার দেওয়া হল, তার জন্যে আপনাদের একটুও আন্দোলন করতে হয় নি। এমনকি এদেশে যে নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন, তাও বলতে গেলে, পুরুষদের তৈরী। অথচ য়ুরোপের নানা দেশে মেয়েদের অনেক সংগ্রাম ক'রে পূর্ণ নাগরিক অধিকার পেতে হয়েছে।"

সাবিত্রী আম্মা বললেন, "কথাটা ঠিক। আমাদের পুরুষরাই মেয়েদের লাঞ্ছনা, অপমান, দুঃখ ও দাসত্বের দুর্বিসহ দুর্ভাগ্য বুঝতে পেরে তা দূর করবার জন্যে এগিয়ে এসেছেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগরের কথা কোনও ভারতীয় নারী বিস্মৃত হবে না। তেমনি ছিলেন তিলক, গোখলে, রানাডে। এর সঙ্গে বাংলায় বিবেকানন্দ, মাদ্রাজে আনি বেসান্ত, পাঞ্জাবে দয়ানন্দ। তারপর এলেন মহাত্মা গান্ধী। পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদেরও ডাক দিলেন দেশের মুক্তি-যুদ্ধে। ত্রিশ বছর সংগ্রামের নেতৃত্ব ক'রে গান্ধীজী স্ত্রী-পুরুষের অনেক প্রাচীন ব্যবধান ভেঙ্গে দিলেন। স্বাধীন ভারতবর্ষে মেয়েরা পুরুষদের সমান রাষ্ট্রীয় অধিকার পেল। তারা মন্ত্রী হল। বিদেশে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রদূত হল। বিশ্বের দরবারে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করল। পার্লামেণ্টে, বিধানসভায়, কর্পোরেশনে মেয়েরা আসন পেল। স্বাধীনতার আগেও কংগ্রেসের সভাপতি পদে তিনটি নারী বসতে পেরেছিলেন, যদিও তাঁদের দুজন ছিলেন ইংরেজ—অ্যানি বেসান্ত ও নেলী

সেনগুপ্তা। আজ জীবনের বহু পথ মেয়েদের কাছে খোলা। কিন্তু তাই বলে ভাববেন না, মেয়েদের সংগ্রাম করতে হয় নি, বা আজও হয় না। যে বিভিন্ন যুগের বিরাট ব্যবধান আমরা এক জীবনে অতিক্রম করে এসেছি, পৃথিবীর ইতিহাসে তার নজির খুব বেশী নেই। আমাদের পুরুষরা বাইরে মেয়েদের অধিকার প্রচার করেছেন, কিন্তু বাস্তবে স্বীকার করেন নি সহজে। খোঁজ করলে দেখতে পাবেন আজ যে সব স্ত্রীলোক জাতীয় জীবনে কিছুটা মর্যাদা পেয়েছেন তাঁরা বেশির ভাগ বড় ঘরের মেয়ে। তাঁদের পরিবারে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব এত বড় ছিল, কোন অধিকারের জন্যে তাঁদের সংগ্রার করতে হয় নি। কিন্তু যাদের হয়েছে,—সংখ্যায় তারা বেশী নয়—তাদের জীবনের অলিখিত ইতিহাস ভারতবর্ষের বহুযুগের ইতিহাস। আমি যখন অতীত জীবনের কথা ভাবি, বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত এই পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন বছরের অতিক্রান্ত ইতিহাসকে স্মৃতিপথে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করি, মনে হয় এ আমার একার ইতিহাস নয়, অনেক যুগে জন্ম নেওয়া, অনেক মেয়ের ইতিহাস। আমি যেন এক সাবিত্রী আম্মা নই, আমার মধ্যে অনেক সাবিত্রী বিলীন। অথচ তারা সবাই অর্ধ-পরিস্ফুট ; অর্ধেক বেঁচেই তারা মরে গেছে।"

দেববাণী বলল, "আমার মাও তাই বলেন। বলেন, আমার মধ্যে অনেকগুলি মেয়েমানুষের জন্ম হল ; অথচ তাদের একজনও পূর্ণ বিকশিত হল না।"

সাবিত্রী আম্মা বললেন, "গত পঞ্চাশ বছরে আমাদের দেশে মেয়েদের জীবনে কি নিদারুণ বিপ্লব বয়ে গেছে তার খবর বড় কেউ রাখে না। আজ দ্রুত পরিবর্তনে আমরা এত অভ্যস্ত যে কি এল, কি গেল ভেবে পর্যন্ত দেখি নে। কিন্তু মানুষের জীবনে এমন কিছু নেই যা আসে-যায় অথচ মনে, চেতনায়, দাগ রেখে যায় না। সামাজিক পরিবর্তন তামিলনাদে ঘটেছে সব চেয়ে কম, সব চেয়ে ধীরে। তথাপি তার পরিব্যাপ্তি দেখে আমি বিস্মিত হই। আমি যা বলছি তার মানে এই নয় যে, সাবেকী জীবন নিঃশেষে ফুরিয়ে গেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষ তার অনেক প্রাচীনতা এখনও বজায় রেখেছে, বহুদিন রাখবে। কিন্তু নতুনকে যে-ভাবে সে গ্রহণ করেছে তার তুলনা বোধকরি বিরল। নতুন যে পুরাতনকে ভাঙ্গে নি তার কারণ আমরা। আমরা ভারতবর্ষের মেয়েরা। আমরা নতুনকে পুরাতনের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে এমন ভাবে গ্রহণ করেছি যে সমুদ্র নিস্তরঙ্গ জলাশয়ে পরিণত হয়েছে।"

প্রসাদ রাও দেববাণীকে বললেন, "আপনারা আধুনিকারা কি মনে করেন?"

মৃদু হেসে দেববাণী বলল, "আমি ঠিক আধুনিকা নই। এ প্রশ্ন আপনি মিস সরোজাকে করুন।"

সরোজা বলে উঠল, "আমাকে আধুনিকা ভেবে বসলেন কি ক'রে? আমি বিজ্ঞানের ধারে কাছে নেই। বিজ্ঞানই হল আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।"

দেববাণী বলল, "আধুনিকা কাকে বলে জানি নে। এবার কলকাতায় একজনের দেখা পেলাম, তাঁর কথা বলি। আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়া তিনি। পূর্ববঙ্গে চল্লিশ বছর আগে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। ছিলেন নিতান্ত গরীবের অনূঢ়া কন্যা। বাবার কঠিন অসুখ হ'লে ভিন গাঁয়ের নামকরা ডাক্তার ডাকা হয়েছিল চিকিৎসার জন্যে। বাবা রক্ষা পেলেন, কিন্তু ডাক্তার পেলেন না। রুগী ডাক্তারের পা জড়িয়ে ধরল। প্রায়-বৃদ্ধ ডাক্তার, বহুদিন বিপত্নীক। তাকে দায়মুক্ত করতে হবে। দয়াপরবশ হয়ে ডাক্তার একটি কচি গ্রাম্য মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে ফিরলেন। তাঁর বয়স পঞ্চাশ উত্তীর্ণ; নববধূর মাত্র তের। পত্নীকে ঘরে এনে বড় লজ্জিত, সংকুচিত হলেন তিনি। ভাইরা, ছেলেরা সব বড় বড়, নাতি-নাতনীতে পরিপূর্ণ সংসার। লজ্জা তার আরও বাড়ল যখন সেই তের বছরের মেয়ে কিছুতেই শয়নঘরে যেতে রাজী হল না। দিনভাগে তিনি তাকে কাছে ডেকে বললেন, তুমি আমার ভ্রাতৃ-বধূদের ও পুত্র-বধূদের মধ্যে জীবন কাটাতে পারবে? সে বলব, পারব। তিনি বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন, যে ভুল হয়ে গেছে আর তার সংশোধন হতে পারবে না। ভালো করে ভেবে বল, তুমি কি সন্তান চাও না? দৃঢ়স্বরে সে বলল, না। স্বামী বললেন, যদি আমার অবর্তমানে এরা তোমায় না দেখে? উত্তর হ'ল, আমি নিজেই নিজেকে দেখতে পারব। স্বামীর সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক সে মেয়েটির কোন দিন হ'ল না। কয়েক বছরে তিনি গত হলেন। কেবলমাত্র পরের সেবা করে যুবতী বিধবা জা ও বধূদের সংসারে নিজের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করলেন। লেখাপড়া সামান্য জানতেন। কালে দেখা গেল তিনি ছাড়া সংসার অচল। সবাকার সব বিপদে তিনি। নিত্য নতুন হাওয়া এল সংসারে। সব কিছু টলল, কেবল টললেন না তিনি। ছোট ভাই প্রেম করে অসবর্ণ বিবাহ করল; বড় ভাই দাদারা সব রেগে আগুন। সে নীচু জাতের বৌকে সাদরে গ্রহণ করলেন তিনি। সেজ ছেলে বিলেতে গিয়ে মেম বিয়ে করল। সবার কত রাগ! আঁকা বাঁকা বাংলা অক্ষরে মেম-বধূকে আশীর্বাদ পাঠালেন তিনি। মেজ ছেলের মেয়ে প্রাইভেট টিউটরের সঙ্গে

পালিয়ে গেল। তাদের ফিরিয়ে এনে শাস্ত্রীয় মতে বিবাহ দেওয়ালেন তিনি। তার পর দেশ ভাগ হয়ে গেল। এঁদের বাড়ী-ঘর সব পড়ল পূর্ব-পাকিস্তানে। গ্রাম থেকে একে একে সবাই কলকাতা চলে গেল। পড়ে রইলেন স্বামীর ভিটে আঁকড়ে একমাত্র তিনি। আমি এবার তাঁকে দেখলাম আর এক রূপে। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষদের নানা প্রকার জুলুমের বিরুদ্ধে আশ্চর্য সাফল্যের সঙ্গে বার বার লড়েছেন তিনি, অনেক জুলুম তাঁরই জন্যে শেষ হয়েছে, বা কমে গেছে। বছরে তিন চার বার তিনি একা গ্রাম আর কলকাতা যাওয়া-আসা করেন ; একবার 'ভিসা' নিয়ে সামান্য গোলমালে এক সপ্তাহ তাঁকে পাকিস্তানী জেলে পর্যন্ত কাটাতে হয়েছিল। তবু তিনি গ্রামের অনেক অস্থাবর সম্পত্তি, টাকা, গহনা, বাসনপত্র, প্রাচীনকালের নানা রকম নিদর্শন, কলকাতা নিয়ে এসেছেন। শুধু তাই নয়, শহর থেকে পনের মাইল দূরে রিফিউজি হিসেবে একখণ্ড জমি আদায় করে নিজের তত্ত্বাবধানে ছোট্ট একটি বাড়ী তৈরী করছেন। এঁর চেয়ে বড় আধুনিকা আমি কোথাও দেখিনি।"

সপ্রশংস মনোযোগে সকলে দেববাণীর কথা শুনছিলেন। সে থামতেই সরোজা বলে উঠল, "কিন্তু এ আধুনিকায় মিঃ প্রসাদ রাওয়ের মন ভরবে না। তিনি চান অন্য আধুনিকা।"

সনাতনম্ যোগ দিলেন, "যে আধুনিকারা সবদা আমাদের চোখের সামনে বিচরণ করেন।"

সরোজা বলল, "যাঁরা কংগ্রেসী সরকারের উপমন্ত্রী হয়ে স্লিভলেস ব্লাউজ পরেন, বব-ছাঁট চুল রাখেন, ঠোঁটে লিপষ্টিক লাগান, যাঁরা রাষ্ট্রদূতের পত্নী হয়ে বল ড্যান্স করেন ও হুইস্কি খান ; যাঁরা পার্লামেণ্টে বা বিধান-সভার সদস্যা হয়ে..."

বড় একটা হাই তুলে সরোজা বাক্য অসমাপ্ত রাখল।

আহার শেষ হয়ে এসেছে। মরু পান করে নিমন্ত্রিতগণ ওয়াড়েপরম্ ও আম্বড়ম খাচ্ছেন। সাবিত্রী আম্মা প্রসাদ রাওকে বললেন, "দেববাণীর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় হ'ল। এবার আশা করি আপনারা ওকে সাহায্য করবেন।"

প্রসাদ রাও বললেন, "নিশ্চয় ! আপনি যখন বলছেন—"

"আমি বলছি বলে নয়। ও বড় কাজে নেমেছে। সে কাজের দাবীতেই আপনারা ওকে সাহায্য করুন, আমি তাই চাই।"

সবাই সম্মতিসূচক আওয়াজ বা অঙ্গভঙ্গি করলেন। সনাতনম্ বললেন, "আপনি যখন ওঁর পেছনে রয়েছেন, সাহায্যের নিশ্চয় অভাব হবে না।"

মালব্য মন্তব্য করলেন, "দরকার বোধ করলে আপনি আমাদের কাছে আসবেন। যা পারি আমরা নিশ্চয় করব।"

সরোজা বলল, "তাতে দেববাণী খুশি হতে পারে, কিন্তু মা হবেন না। মার ইচ্ছে আপনারাই ওঁর কাছে গিয়ে যা যা দরকার তার ব্যবস্থা করে দিন।"

গৌতম বললেন, "বেশ ত। তাই করা যাবে।"

"মুশকিল কি জানেন ?" সরোজা আরও বলল, "উনি মোটর গাড়ীর পারমিট চান না, চাল গম বিক্রীর লাইসেন্স না, নিজের জন্য চাকরি পর্যন্ত না। তবে রিসর্চ সেণ্টার স্থাপিত হলে চাকরি দেবার ক্ষমতা ওঁর নিশ্চয় থাকবে, তা ছাড়া ছাত্রছাত্রী ভর্তি করার ব্যাপার ত আছেই।"

আহার সমাপ্তির সীমায় পৌছেছিল। সরোজা উঠল। বলল, "মাপ করবেন। আমাকে এক্ষুণি একবার বেরুতে হবে। দুটো বেজে গেছে।"

সরোজা সোজা কলঘরে ঢুকল।

একে একে সকলে বিদায় নিলেন। সনাতনম্, প্রসাদ রাও ও শ্রীনিবাসন্ একসঙ্গে গেলেন প্রসাদ রাওএর গাড়ীতে। গৌতমকে মালব্য সঙ্গে নিলেন কোনও মন্ত্রীর ভবনে। সুরেশ্বরী ভার্গব ট্যাক্সীতে ঘরে ফিরলেন। যাবার বেলা দেববাণী তাঁকে আনত হয়ে নমস্কার করল। তিনি বললেন, "বেটি, আমার বাড়ী একবারটি এস। তোমার সঙ্গে আরও ভাল করে আলাপের ইচ্ছে রইল।"

দেববাণীকে নিয়ে সাবিত্রী আম্মা শোওয়ার ঘরে ঢুকলেন। নিজে বিছানায় বসে দেববাণীকে আরাম কেদারায় বসালেন। বললেন, "তোমার কি তাড়াতাড়ি আছে ?"

"না।"

"মা একা একা আছেন। তোমাকে আটকে রাখা উচিত হবে কি ?"

"আপনার অসুবিধে না হলে আমি একটু বসতে চাই।"

হাসলেন সাবিত্রী আম্মা। "তুমি তা হলে একটু বস। তোমার সঙ্গে গ করতে ভালো লাগে।"

দেববাণী বলল, "আপনি শুয়ে পড়ুন। শুয়ে শুয়ে গল্প করুন। এতক্ষণ ধকল গেছে আপনার।"

"শোবার অভ্যেস নেই দুপুরে," সাবিত্রী আম্মা বালিশ টেনে নিয়ে বসলেন। "বেশ শীত পড়েছে আজ।"

দেববাণী উঠে কম্বল এনে তাঁর পায়ে জড়িয়ে দিল। কম্বল টেনেটুনে দেহ এলিয়ে বসলেন সাবিত্রী আম্মা।

"কেমন লাগল্ এঁদের তোমার ?"

"মন্দ কি ?" সংকুচিত হাস্যে বলল দেববাণী।

"এরা সবাই পলিটিশিয়ান। আমাদের দেশে এখন পলিটিশিয়ানদের যুগ চলছে।"

"আপনি এঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন, তাতে লাভ হ'ল আমার অনেক। কিন্তু এঁরা কি সত্যিই আমায় সাহায্য করবেন ?"

"তুমি রাজনীতি বোঝ, দেববাণী ?"

"না।"

"রাজনীতির জারজ সন্তান হ'ল 'লবি'। মার্কিন দেশে তুমি নিশ্চয় কথাটা শুনেছ।"

"শুনেছি।"

"আমাদের দেশেও 'লবির' প্রতাপ শুরু হয়েছে। এ এক আশ্চর্য বস্তু। সূতায় সূতায় অনেক স্বার্থ জড়িয়ে এক-একটা 'লবি' তৈরী হয়। শেষ পর্যন্ত কে কোথায় বসে যে সূতা টানে বোঝা যায় না। শুধু দেখা যায়, কোন একটা বিষয় নিয়ে হঠাৎ প্রচণ্ড 'জনমত' তৈরী হয়ে বসে আছে। নানা প্রকার রহস্যময় প্রভাব বিস্তার করা হয় কর্তাদের ওপর।"

"জনমত তৈরী হয় কি করে ?"

"সেও এক রহস্যময় ব্যাপার। অন্যতম প্রধান পথ সংবাদপত্র। হঠাৎ দেখবে কোনও এক বিষয়ে সংবাদপত্রগুলি বড় বেশী মুখর। কোথা থেকে কোন গোপন সূত্রে তারা সব তথ্যের সন্ধান পায়। তথ্যের সঙ্গে স্বার্থের তত্ত্ব মিলিয়ে তৈরী হয় প্রচার। তাকেই চালান হয় জনমত বলে।"

"আপনি কি আমার জন্যে 'লবি' তৈরী করছেন ?"

"না। লবি আমি তৈরী করতে জানিনে। আমি শুধু কয়েকজন এম. পি.-কে তোমার প্রচেষ্টার সঙ্গে, তোমার সঙ্গে, পরিচিত করিয়ে রাখলাম। যদি কখনও এ নিয়ে কথাবার্তা আলোচনা ওঠে, এঁরা হয়তো কাজে লাগবেন। ব্যক্তিগত জীবনে এঁরা যাই হোন, রাজনীতিতে এঁদের মতামত অগ্রাহ্য নয় !"

"আপনি আমার জন্য অনেক করেছেন," কৃতজ্ঞতায় বিগলিত স্বরে দেববাণী বলল, "কেন করছেন জানি না। শুধু এটুকু জানি আপনার স্নেহ আমার অমূল্য সম্পদ্। কিন্তু আমি ত রাজনীতি করছি না। বিজ্ঞান-কেন্দ্র স্থাপনের মধ্যে রাজনীতি আসবে কেন ?"

সাবিত্রী আম্মা ম্লান হাসলেন। "তুমি তা বুঝবে না, দেববাণী। যুগটাই যদি রাজনীতির, তাহলে সব কিছুর মধ্যেই রাজনীতি আসবে।"

"তাতে শিক্ষার ক্ষতি হবে। রাজনীতিরও লাভ হবে না।"

"সত্যি কথা। কিন্তু আজ আমরা তা বুঝতে পারছি না। বুঝতে সময় লাগবে। এখন সব কিছু আমরা রাজনীতির মানদণ্ডে মেপে দেখছি। তুমি রিসার্চ সেণ্টার খুলতে চাইছ। এর মধ্যে অনেক রাজনীতি এসে পড়বে।"

"না, আসবে না !" দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠল দেববাণী।

"শত চেষ্টা করেও তুমি তাকে আটকাতে পারবে না।" মৃদু, মলিন হেসে দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে বললেন সাবিত্রী আম্মা। "প্রত্যেক পদে পদে দেখবে রাজনীতির কাঁটা। এ বিষয়ে কোনও কল্পনা-বিলাস তোমার থাকা উচিত নয় ; তাহলে তুমি হারবে।"

"কিন্তু আমি যে রাজনীতির কিছু জানি না।"

"স্বাধীন ভারতবর্ষে ত কোনও কাজে আগে হাত দাও নি, তাই জান না। এবার হাত দিয়েছ, এখন জানবে।"

"আমার ধারণা রাজনীতি বড় নোংরা জিনিস। কোন নোংরা কাজ আমি করতে পারি না।"

"রাজনীতি নোংরা তাতে সন্দেহ নেই। তুমি নিশ্চয় চেষ্টা করবে যাতে কোনও নোংরা কাজ তোমায় করতে না হয়। সর্বদা পারবে কি না তা নির্ভর করবে তোমার চরিত্র-বলের ওপর।"

"কি ধরনের রাজনীতি আসতে পারে রিসার্চ সেণ্টারের কাজে, আমায় বুঝিয়ে বলুন।"

"সবটা ত এখন বলা যাবে না, দেববাণী। তবু এক-আধটু তোমায় বলছি। প্রথম যে প্রশ্ন উঠেছে, তা হ'ল তোমার বিদেশী সাহায্য পাবার ব্যাপারে।"

"তার আভাস আমি পেয়েছি।"

"তুমি সাহায্য পাচ্ছ আমেরিকা, জার্মেনী ও ইংলণ্ড থেকে। তিনটি দেশই এক বিশেষ দল ব'লে বর্তমান পৃথিবীতে পরিচিত।"

"কিন্তু আমি ত কোনও দেশের গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাচ্ছি না। এমন কি কোনও ফাউণ্ডেশানেরও না। নিতান্ত কয়েকজন বন্ধু স্থানীয় ব্যক্তি আমায় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।"

"কিন্তু দেখবে, এক দল লোক এখনি বলতে শুরু করবে তুমি মার্কিন দেশের এজেণ্ট হয়ে কাজে নেমেছ।"

"মিথ্যে কথা।"

"তবু তারা বলবে। আর এ কথা ওঠার মানেই ত রাজনীতি। পার্লামেণ্টে তারা প্রশ্ন করবে। সরকারকে সে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তুমি যদি আমেরিকা থেকে অধ্যাপক আনাও, তা নিয়েও রাজনীতি হবে।"

দেববাণীকে অত্যন্ত গম্ভীর দেখে সাবিত্রী আম্মা আবার বললেন, "তা ছাড়া, ওরাই কি তোমাকে রেহাই দেবে? দেখবে এখানকার মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলি নানা ভাবে তোমার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে চাইবে।"

"এসব কথা আমি ভেবে দেখিনি।"

"এবার তোমাকে সব কথাই ভাবতে হবে দেববাণী। বিজ্ঞান বস্তুটাই ত বর্তমান জগতে সবচেয়ে বড় রাজনীতি। যে দারুণ সংগ্রাম চলছে বিশ্ব-জুড়ে তার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। তোমাকে ভেবে দেখতে হবে, তুমি কোন দেশের বিজ্ঞান ভারতবর্ষে আনবে। মার্কিন বিজ্ঞান? না রুশ বিজ্ঞান।"

"বিজ্ঞানের কোনও দেশকালপাত্র নেই।" দেববাণী দৃঢ় প্রত্যয়ে বলল, "বিজ্ঞান সমস্ত মানুষের।"

"দেখতে পাচ্ছ না বিজ্ঞানকেও আজ দেশজ রূপ দেওয়া হয়েছে? স্পুটনিক যখন মহাকাশে উঠল, সোভিয়েট নেতারা বললেন, এ জয় সোভিয়েট বিজ্ঞানের। হাইড্রোজেন বোমা তৈরী করে আমেরিকানরা বলল, জয়, মার্কিন বিজ্ঞানের জয়।"

"বৈজ্ঞানিকরা তা বলেন না। বলেন রাজনৈতিক নেতারা। আর খবরের কাগজে যারা লেখে তারা।"

"বৈজ্ঞানিকদের আলাদা সত্তা কোথায়, দেববাণী? তাঁরা ত সবাই গবর্ণমেণ্টের বা শিল্পের দাসত্ব করেন।"

"সবাই করেন না।"

"বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন, সে আবিষ্কারের ব্যবহার করে কারা? এ্যাটম বোমা যাঁরা তৈরী করলেন তাঁরা কি তার অপব্যবহার বন্ধ করতে

পেরেছিলেন ? তারা ত জানতেনই, কি ভয়ানক মারণাস্ত্র তারা পলিটিশিয়ান-দের হাতে তুলে দিচ্ছেন ! এমন বৈজ্ঞানিকের নাম কর, দেববাণী, যিনি আণবিক শক্তিকে মানুষ মারা পৃথিবী ধ্বংসের কাজে লাগানর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন।"

"অনেকের নামই আপনাকে বলতে পারি," দেববাণী আস্তে আস্তে বলল, "মার্কিন দেশেও এমন অনেক বৈজ্ঞানিক আছেন যারা আণবিক শক্তিকে পৃথিবী ধ্বংসের কাজে অপ-নিয়োগের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে সমাজকল্যাণ চেতনা ক্রমেই দানা বেঁধে উঠছে। আপনি হয়ত জানেন না, কয়েকজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আণবিক শক্তিকে ধ্বংসাত্মক কাজে বিনিয়োগ করার সম্ভাবনা বুঝতে পেরে ঊর্ধ্ব-স্তরের রিসর্চ পর্যন্ত করতে রাজী হন নি। তাঁরা মার্কিন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হয়েছেন ; কারুর কারুর চাকরি পর্যন্ত গেছে। বিলাতে আণবিক অস্ত্রসজ্জার বিরুদ্ধে যে গণ-আন্দোলন গড়ে উঠছে তারও পুরোভাগে একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক।"

সাবিত্রী আম্মা কিছুক্ষণ ভাবলেন। তার পর বললেন, "কিন্তু আমার বিশ্বাস যদি একবার লড়াই বেধে যায়, সব বৈজ্ঞানিকই রাষ্ট্রের সেবার জন্যে তাদের জ্ঞান ও শ্রম সম্পূর্ণ বিনিয়োগ করবেন।"

"লড়াই লাগলে কি হবে জানি না। লড়াই যাতে না লাগে তার চেষ্টা পৃথিবীতে হাজার হাজার বৈজ্ঞানিক করছেন।"

"বুঝতে পারছি, বৈজ্ঞানিকদের নিন্দা তুমি সহ্য করবে না," হেসে বললেন সাবিত্রী আম্মা। "কিন্তু তুমি যা বললে তাতেও প্রমাণ হ'ল যে বিজ্ঞান রাজনীতির জালে জড়িত।"

দেববাণী চুপ করে রইল।

"ভারতবর্ষের কথা অবশ্য আলাদা", বলে চললেন সাবিত্রী আম্মা। "এ দেশে, যা তুমি একটু আগে বলছিলে, বিজ্ঞানের যুগ সবেমাত্র শুরু হয়েছে।"

"এখনই তাকে রাজনীতির জালে বেঁধে রাখা তাই আরও বেশী অনুচিত।"

"অনুচিত তা মানি। কিন্তু অনেক অনুচিতই চালু হয়ে যায়। মুশকিল কি জান ? এ দেশে সবকিছু উদ্যোগের উৎস সরকার। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পর্যন্ত সরকারী প্রভাবে এসে গেছে। ন্যাশনাল লেবরেটরীগুলি সরকারি প্রতিষ্ঠান ! লেখকদের অধিকাংশ নানা রকম সরকারী দাক্ষিণ্যের প্রত্যাশী

অধ্যাপকরা সরকারী কৃপার জন্যে সর্বদা হাত পেতে থাকেন। সরকার মানেই রাজনীতি। আমাদের বুদ্ধি-মুখী জীবনে রাজনীতির ব্যাপক অনুপ্রবেশ বড় ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে, দেববাণী।"

"আপনাকে একটা কথা খোলাখুলি বলা দরকার।" দেববাণী সসঙ্কোচে বলল, "বলতে আমার লজ্জা হয়, কিন্তু সত্যকে স্বীকার করতেই হবে। ভারতবর্ষ আমার কাছে প্রায় অচেনা। কলকাতায় আমার ছাত্রীজীবন কেটেছে পড়াশুনায়। তখন নিজেকে নিয়েই, সবার মত, আমিও মত্ত ছিলাম। তার পর, পড়া শেষ না হতে, আমার জীবনে উঠল বিরাট ঝড়। আমি বিয়ে করে বসলাম। তিন চারটা বছর কি করে যে কাটল তা আমি এখনও ঠিকমত বুঝতে পারিনি। সব কিছু তোলপাড় করে সে ঝড় যেদিন শান্ত হ'ল, আমি তখন পঙ্গু, নির্জীব, জীবন্মৃত। যিনি আমাকে গভীর পাঁক থেকে টেনে তুলে আবার জীবনের সন্ধান দিলেন, তিনি আমার মা। কিন্তু জীবন তখন ভয়ঙ্কর কঠিন; তার দাবী মিটিয়ে পৃথিবীর বুকে একটু মর্যাদার স্থান তৈরী করতে আরও ছ'সাত বছর কেটে গেল। এ ছ'সাত বছরেও আমি কেবল নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিল নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা। দেশের ওপর দিয়ে অনেক বিপ্লব বয়ে গেল এ ক' বছরে, কিন্তু আমি আমার নিজের বিপ্লব নিয়ে এত ব্যতিব্যস্ত, অন্য কোনও কিছুই যেন আমায় স্পর্শ করল না। আজ ভাবতে অবাক লাগে, কি করে আমি চতুর্দিকের এত বড় বড় ঘটনার প্রতি অমন উদাসীন ছিলাম। যুদ্ধ শেষ হবার কিছু পরেই আমি বিদেশে চলে গেলাম। দশ বছর কাটল বিদেশে, তার পর এই প্রথম আমি ভারতবর্ষে ফিরে এসেছি। ছিলাম কলকাতায় একটি সাধারণ মেয়ে, এখন আমি অভিজ্ঞতায় বড়; গোটা পৃথিবীর চেতনা আমার অন্তরে। অথচ নিজের দেশকেই আমি জানি না, চিনি না, বুঝি না। সব কিছু, তাই আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকছে, রহস্যময় লাগছে।"

সহানুভূতির স্পর্শ এনে সাবিত্রী আম্মা বললেন, "তোমার দোষ নেই। আমরাই বা ভারতবর্ষের কতটুকু জানি? আমাদের জীবন প্রধানত আঞ্চলিক। হঠাৎ আমরা গোটা দেশের সমস্যার মুখোমুখি। তাই চারদিকে এত বেশী গোলমাল। যে লোকটার সমস্ত জীবন কেটেছে নিজের জেলায়, বা বড় জোর প্রাদেশিক রাজধানীতে; বর্ণ, গোত্র, আত্মীয়গোষ্ঠী ও গ্রাম-জেলা ছাড়া আর কিছু যে ভাবতে পারে নি, ভাবার দরকারই হয় নি, আজ সে হঠাৎ দেশের নেতা

হয়ে বসেছে। ভারতবর্ষ এত বিরাট, এত প্রাচীন, তাকে জানা বা চেনা মোটেই সহজ নয়, দেববাণী।"

"পাঁচ বছর আমেরিকায় পড়িয়ে আজ আমার কিছু সুনাম হয়েছে," দেববাণী বলল। "দুটো মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি অধ্যাপনা করেছি। রিসর্চ ক'রে যে সুখ্যাতি পেয়েছি তারই জোরে য়ুরোপেও আমি অধ্যাপনা ও রিসর্চের সুযোগ পেয়েছি। আমার কিছুটা আন্তর্জাতিক খ্যাতি হয়েছে, বলা যেতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনটাও কেমন আন্তর্জাতিক হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে আমার জীবনের আসল সমস্যার সমাধান হয় নি।"

"সে সমস্যা তোমাকে দেশে ফিরিয়ে এনেছে?"

"দেশে আসবার সময় তা মনে হয় নি। কিন্তু এসে নানা কথা, নানা প্রশ্ন মনে আসছে। যেন বুঝতে পারছি আমার জীবনের আসল যা সমস্যা, একমাত্র ভারতবর্ষে ছাড়া তার সমাধান হ'তে পারে না। আমি কে, কোথায় আমার স্থান, আমার জীবনের প্রকৃত অর্থ কি, এ সব প্রশ্নের জবাব না পেলে সে সমস্যার শেষ হবে না।"

"এ প্রশ্নের জবাব তুমি দেশে কি পাবে?"

"আর কোথায় পাব, বলুন?" কাতর কণ্ঠে বলল দেববাণী। "বিদেশে সব পাওয়া যায়—বিদ্যা, মান, যশ, অর্থ, বন্ধু,—শুধু নিজের স্থানটুকু, নিজের আসল পরিচয়টুকু পাওয়া যায় না।"

সাবিত্রী আম্মা বললেন, "তোমার প্রশ্ন বড় কঠিন, দেববাণী। ভারতবর্ষেও মাত্র জীবনের আরম্ভ। এখানে আজ সবকিছু অসমাপ্ত। বহু-ধারায় বহু-জনের বহু-আকাঙ্ক্ষার কোলাহল। তুমি যে সমাপ্তির, যে পরিপূর্ণতার সন্ধান করছ তা পাবে কিনা কে জানে!"

দরজায় লঘু-পদশব্দে দু'জনে তাকিয়ে দেখলেন, সরোজা দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে গিয়েছিল সরোজা, সবেমাত্র ফিরেছে। সাবিত্রী আম্মা কন্যাকে দেখে বিব্রত হলেন। দেববাণী বলল, "আসুন না।"

যেন অনিচ্ছায় ঘরে ঢুকল সরোজা।

গাঢ় সবুজ বাঙ্গালোর সিল্কের শাড়ী পরেছে সরোজা। ক্ষীণ দেহে শাড়ী ভাঁজে ভাঁজে তরঙ্গিত। লাল রংয়ের ব্লাউজের ওপর কালো কার্ডিগান। সরু কোমর, সুগঠিত দেহ সরোজার। বর্ণ গৌর না হলেও উজ্জ্বল। বড় বড় চোখে ঘনকৃষ

পল্লব। প্রশস্ত কপালে চূর্ণ কুন্তল। দেববাণীর চোখে বড় সুন্দর লাগল সরোজাকে। জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে সরোজা। ছোট্ট পরিপূর্ণ স্তন দুটি উঠছে, নামছে।

ঘরে ঢুকে একবার চতুর্দিকে তাকাল সরোজা। বোধ হয় ভাবল বসবে কিনা, কোথায় বসবে।

সাবিত্রী আম্মা প্রশ্ন করলেন, "কোথায় গিয়েছিলে?"

চট ক'রে উত্তর দিল না সরোজা। একটু পরে বলল, "বাইরে।"

কিছু বলতে গিয়ে সাবিত্রী আম্মা নিজেকে সামলে নিলেন।

বড় বড় চোখের পূর্ণ দৃষ্টি মেলে সরোজা দেববাণীকে দেখল।

অস্বস্তিকর নীরবতা ঘর ভ'রে দিল।

সরোজা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। দেববাণীকে লক্ষ্য ক'রে বলে উঠল, "আপনি কেন বৃথা সময় নষ্ট করছেন এদেশে?"

"কার সময়?" আশ্চর্য হ'ল দেববাণী।

"আর কার? আপনার নিজের। আশা করি আপনার কাজকর্ম বিদেশে কিছু এখনও আছে!"

দেববাণীর মুখে কথা এল না।

"যদি কিছু কাজকর্ম থাকে ত চ'লে যান। এদেশে ব'সে সময় নষ্ট করবেন না।"

দরজার দিকে পা বাড়াল সরোজা। এগিয়ে যেতে পিছু ফিরে আবার দাঁড়াল। দেববাণীর চোখের সামনে এসে বলল, "এদেশে কিছু হবে না। রিসর্চ সেণ্টার গড়তে গিয়ে দেখবেন মন্দির গড়েছেন, সেখানে মোহান্তের রাজত্ব। এখানে কিছু হবার জো নেই। এদেশে সব ভেজাল, সব পঙ্গু, সব ব্যাধিগ্রস্ত। বিরাট অনুর্বর বন্ধ্যা এ দেশ; কিছু ক'রে উঠতে পারবেন না এখানে। হয় একেবারে ভেঙ্গে যাবেন, নয় ভেজালে ভেজালে আপনিও নাদুস-নুদুস সার্থক দেশসেবকে পরিণত হবেন।"

বলে সে বেরিয়ে গেল।

দেববাণী স্তম্ভিত হ'ল। সাবিত্রী আম্মা চুপ করে রইলেন। যখন তাকালেন, বার্ধক্যনম্র চোখদুটি তাঁর ব্যথায় কাতর।

আস্তে আস্তে দেববাণী উঠল, "আমি আজ আসি।"

সাবিত্রী আম্মা ইঙ্গিতে তাকে বসতে বললেন। দু'চার মিনিট দেববাণী নীরবে বসে রইল।

বালিশে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সাবিত্রী আম্মা বললেন, "সরোজা আমার একমাত্র মেয়ে।"

দেববাণী চুপ ক'রে রইল।

"আমার একটা উপকার করবে, দেববাণী?" সাবিত্রী আম্মা কাতর কণ্ঠে বলে উঠলেন।

"বলুন।"

"সরোজাকে তুমি বন্ধু ক'রে নাও।"

"নেব।"

এবার তার দিকে তাকালেন সাবিত্রী আম্মা। "কাজটা সহজ হবে না। বার বার ও তোমায় আঘাত করবে।"

"সে আঘাত আমার লাগবে না।"

বাইরে এসে গাড়ীতে বসল দেববাণী। স্টার্ট দিয়ে ধীর গতিতে গাড়ী ফটকের সামনে নিয়ে দেখল, সরোজা দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার দিকে মুখ করে। গাড়ী থামাল দেববাণী। সরোজার নজর তার দিকে পড়তে পাশের দরজা খুলে দেববাণী বলল:

"আসুন।"

বিস্মিত সরোজা বলে উঠল, "কোথায়?"

"আসুন না!"

"আপনি যান।"

দেববাণী আবার বলল, "আসুন।"

দেববাণীর চোখে স্থির দৃষ্টি রাখল সরোজা।

তার পর গাড়ীতে উঠে তার পাশে বসল।

ছয়

দেববাণীর ঘরের মস্ত জানলা দিয়ে বাসন্তী দেবী আকাশের পানে তাকিয়ে ছিলেন। শীতের নীল আকাশ, সূর্যের তাপে উজ্জ্বল ; ইতস্ততঃ খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘের খেয়ালখুশি সঞ্চরণ। দূরে গাছপালার সবুজের ঊর্ধ্বে বাদশাহ হুমায়ুনের কবরের শীর্ষ-গম্বুজ! সকালে উঠে বাসন্তী দেবী স্নান সেরে পূজো করেছেন ; মোটা সাদা সিল্কের শাড়ী পরেছেন দেববাণীর অনুরোধে। গরম জলে স্নান করতে চান নি, কিন্তু সেখানেও দেববাণীর অনুরোধ এড়াতে পারেন নি। "এখন তুমি আমার হাতে," জোর গলায় বলেছে দেববাণী। "অনেকদিন তুমি যা বলেছ আমরা করেছি। এখন আমি যা বলব, তুমি করবে।"

"মোটামুটি মানলাম," হেসেছেন বাসন্তী দেবী। "কিন্তু তুইও যেমন মাঝে-মধ্যে আমার অবাধ্য হয়েছিস, আমারও তেমনি অবাধ্য হবার অধিকার নিশ্চয় থাকবে!"

মুখখানা হঠাৎ ম্লান হয়েছে দেববাণীর। "সে তুমি ঠিক মত শাসন করতে পারনি ব'লে" সামলে নিয়েছে পরক্ষণে। "আমার শাসন বেশী কড়া। অবাধ্য হ'লে চলবে না।"

কাজে বেরিয়ে গেছে দেববাণী। বাসন্তী দেবী পূজো সেরে গায়ে পশমী র‍্যাপার জড়িয়ে জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। কন্‌কনে শীতের হাওয়া বইছে। এ শীতের মাদকতা আছে, ভাবছেন বাসন্তী দেবী। চক্‌চকে আকাশে দিগন্ত-বিস্তৃত নীলের পানে তাকিয়ে মন তার কোন্ উদাস অতীতে চ'লে গেছে।

ইতিহাসের কত রহস্যময় স্বাক্ষর বহন ক'রে আছে দিল্লীর পথের ধূলি, বাতাস। দূরে ঐ সমাধি-মন্দিরে হুমায়ুনের স্মৃতি। তারও হাজার হাজার বছর আগে মহাভারতের যুগ পদচিহ্ন রেখে গেছে দিল্লীর মাটিতে। কত সাম্রাজ্য, কত রাজা, কত রাজধানী আজ নিশ্চিহ্ন। এই সুবিস্তীর্ণ মানব ইতিহাসের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেখলে কত ক্ষুদ্র, কত অর্থহীন লাগে আমাদের জীবন! যেন অনন্ত-প্রবাহিণী মহানদীর অণুবিন্দু জল এক-এক মানুষ! অথচ কত জটিল,

কত রহস্যময়, সমস্যা-সংকুল আমাদের প্রত্যেকের জীবন। কত বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত প্রতি জীবনের এক এক শাখা-নদী। কত কূলে কূলে ঢেউ তুলে অজানা-অচেনা পথে অবিশ্রান্ত তার গতি। অথচ এমন শক্তি মানুষের অজানাকে জানবার, অচেনাকে চেনবার, বিচিত্রকে গ্রহণ করবার যে, মনেই যেন হয় না, জীবন চলেছে নব নব কূল ছাপিয়ে। মনে হয় যেন একটানা চ'লে এসেছি, থামি নি, বসি নি, ভাবি নি; শুধু দেহ কখন জরাগ্রস্ত হয়েছে, মন ক্লান্ত। ভাগ্যিস মানুষকে সর্বদা অতীতের বোঝা বইতে হয় না, তাই সে বর্তমানের রাস্তা ধরে ভবিষ্যতে পা বাড়াতে সাহস পায়। ভাগ্যিস মানুষ ভোলে; তা নইলে স্মৃতির অলঙ্ঘনীয় পাহাড় দাঁড়াত তার যাত্রাপথ অবরোধ ক'রে।

আজ এই শীতের রোদ-চক্‌চক কর্মহীন সকালে মুখর নিশ্চুপ ইতিহাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাসন্তী দেবী নিজের জীবনের অতীতকে যেন চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ দেখতে পেলেন। বড় বিস্ময় লাগল তাঁর। কি বিরাট পরিবর্তনের বিন্যাস চারদিকে! কত যুগ, কত কাল এর মধ্যে গলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। কত বিপ্লব, কত বন্যা, কত প্লাবন ভেঙ্গেছে, গড়েছে এই যুগযুগান্তের অলিখিত ইতিহাসকে। যে দেববাণী একটু আগে গাড়ী চালিয়ে বেরিয়ে গেল গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপনের তদ্বিরে, সে কি আমারই রক্তে-মাংসে গড়া পেটে-ধরা মেয়ে? মনের মধ্যে আর একটা শূন্য স্থানে যার জন্যে ব্যথা বেজে উঠল সে আজ অনেক, অনেক দূরে অজানা-অচেনা পরিবেশে অধ্যয়ন করছে, সেই দেবযানীও কি আমারই দেহের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল? ভাবতে কেমন অস্থির লাগে। আজ যে উত্তীর্ণ-ষাট বছরের বৃদ্ধা অপরিচিত বিদেশীর গৃহে আমন্ত্রিত অতিথি, যে স্বাধীন ভারতের রাজধানীর নব-নির্মিত পোশাকী কলোনীর ফ্যাশন-দুরস্ত বাড়ীর বিরাট জানলা দিয়ে আজ এই শীতের সকালে ভারতবর্ষের সু-প্রাচীন ইতিহাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, সে কি আমি? সে কোন্ আমি?

কাল রাত্রে দেববাণীর সঙ্গে অতীতের কথা হচ্ছিল। সে বলছিল, "মা, তোমার নতুন-নতুন লাগছে না?"

"কেন রে? আমি কি এতই পুরানো হয়ে গেছি যে নতুনের আস্বাদও পেতে পারিনে?" তিনি কৌতুক করেছিলেন।

"ভেবে দেখ ত মা," দেববাণীর কণ্ঠস্বর গম্ভীর, "কি বিচিত্র বিস্ময়কর আমাদের জীবন? যখন হাতিবাগানের ফ্ল্যাটে আমরা ছিলাম তখন কি এক দিনও ভেবেছি আমার জীবনের পরিণতি এমন হবে?"

এক সঙ্গে এক বিছানায় শুয়েছিলেন তিনি ও দেববাণী। বাসন্তী দেবী দেববাণীর মাথায় মৃদু হাত বুলিয়ে বললেন, "পরিণতি কোথায় দেখলি ? সবে ত তোর জীবন শুরু।"

"পরিণতির পথে পা বাড়িয়েছি ত ?"

"ভগবান্ করুন, পথ তার দীর্ঘ হোক, প্রশস্ত হোক।"

"তোমার কথা ভেবে আরও অবাক্ লাগে আমার, মা," দেববাণী বলল। "তুমি কোথায় জীবন শুরু করেছিলে, জীবন কোথায় তোমায় টেনে এনেছে ! একটা জীবনে এত বিরাট পরিবর্তনের মিছিল ভাবা যায় না, মা। অথচ তুমি কেমন সহজ গতিতে চ'লে এসেছ, চলেছ আর বেড়েছ। আমি মাঝে মাঝে ভাবি, তুমি পারলে কি ক'রে ?"

দেববাণীর মাথায় হাত রেখে বাসন্তী দেবী বলেছেন, "বাণী, কি ক'রে পেরেছি তা আমি নিজেও জানিনে। তবে এইটুকু জানি যে, এদেশের মেয়েদের জীবনে যে বিপ্লব ঘ'টে গেছে, পুরুষদের জীবনে তার অর্ধেকও ঘটে নি। আমরা যেমন ক'রে সবদিক সামলে পরিবর্তনের বন্যা হজম করেছি, পুরুষরা তা পারে নি।"

"মা, তোমরা যা পেরেছ, আমরাও তা পারছি না।"

"তোদের সমস্যা অনেক জটিল রে বাণী।"

"তোমাদেরও কম জটিল ছিল না, মা। তোমরা সবদিক্ সামলাতে পেরেছ। তাই তোমাদের মধ্যে কিছুটা পূর্ণতা আছে, অন্তত পূর্ণতার ছোঁওয়া লেগেছে। আমরা সবদিক সামলাতে পারছি না। তাই আমাদের জীবনে, অনেক পেয়েও শূন্যের বোঝা।"

"আমরা অনেক সামলেছি তার কারণ ছিল। আমাদের সমাজ ছিল, শাসন ছিল। যৌথ একান্নবর্তী পরিবারের ভাল-মন্দ বাধা-নিষেধের বর্ম ছিল। খানিকটা আদর্শবাদ, অনেকখানি দৃঢ়-বদ্ধ নীতিবোধ ছিল। আজ সে-সব কিছু নেই। সমাজ নেই। একান্নবর্তী পরিবার নেই। শাসন, বাধা-নিষেধ নেই। জীবন বহির্মুখী হয়েছে, তার দাবী ও দায়িত্ব, তৃষ্ণা ও চাহিদা অন্য রূপ নিয়েছে। নীতি-বোধ পালটে গেছে। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সম্পর্ক সহজতর এবং জটিলতর হয়েছে! যেখানে তোদের সামলে রাখতে পারে এমন অবস্থা নেই, সেখানে তোরা সবদিক সামলাবি কি ক'রে ?"

কিছুক্ষণ দু'জনে নীরব। নীরবতা ভঙ্গ ক'রে দেববাণী হঠাৎ প্রশ্ন করল :
"মা, একটা কথা খুব জানতে ইচ্ছে করে। বলবে ?"

"কি কথা ?"

"বলতে-সংকোচ হচ্ছে, মা। অপরাধ নিও না।"

"বল।"

"বাবাকে তুমি ভালবাসতে ?"

সহজে বাসন্তী দেবীর মুখে কথা এল না। এ কি অসঙ্গত আশ্চর্য প্রশ্ন মেয়ের মুখে ? কিন্তু বাসন্তী দেবী বুঝলেন জবাব তাঁকে দিতে হবে।

"তার আগে, ভালবাসা কাকে বলে বুঝিয়ে দে।"

"না, মা। ভালবাসা কি তুমি খুব ভাল ক'রে জান।"

"সন্দেহ হয় জানি কি না। তোদের মত নিশ্চয় জানি নে। ভালবাসাও যুগে যুগে বদলায়।"

"তোমাদের যুগের মাপেই বল না কেন ?"

"তোর বাবা বেশীদিন বেঁচে থাকেন নি। দেবযানীর যখন পাঁচ বছর তখন তাঁর মৃত্যু হ'ল। সে আজ বহু বছর আগের কথা। স্বামী হিসেবে তিনি সুখী ছিলেন। স্ত্রী হিসেবে আমি অসুখী ছিলাম না।"

"তার মানে তুমি বাবাকে ভালবাসতে পার নি।"

বাসন্তী দেবী নীরব রইলেন।

"তবু তোমরা সুখী ছিলে," দেববাণী একটু পরে বলল। "তোমাদের জীবনে ছন্দপতন হয় নি। স্ত্রীর সব কর্তব্য তুমি পালন করেছ ; স্বামীর কর্তব্যের অবহেলা তিনি করেন নি। জীবনের আগুন তোমরা পাও নি, কিন্তু মৃদু উত্তাপে পরিতৃপ্ত থেকেছ। একেই আমি বলি সবদিক সামলে চলা ! আমাদের জীবনে তা সম্ভব নয়।"

বাসন্তী দেবী বুঝলেন দেববাণীর অন্তরে দ্বন্দ্ব। এমন কোন সমস্যার সামনে সে দাঁড়িয়েছে যার সমাধান সহজ নয়। তাই মার জীবনের সঙ্গে নিজের জীবন মিলিয়ে দেখছে। প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে, নিজের জীবনের প্রশ্ন।

দেববাণী ব'লে উঠল, "মা, আরও একটা প্রশ্ন আছে।"

"বল।"

"তুমি কি কোনও দিন কাউকে ভালবাস নি ?"

বাসন্তী দেবী চুপ ক'রে রইলেন।

দেববাণীর অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁর বুকে আঘাত করছে। দীর্ঘকাল বিদেশে কাটিয়ে যে-দেববাণী মাতৃক্রোড়ে সংক্ষিপ্তকালের জন্যে ফিরে এসেছে তাকে যেন তিনি পুরোপুরি চেনেন না। ও কি আমার সেই দেববাণী? যাকে নিজের হাতে মানুষ করেছি, নিজের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার জ্বালা নিয়ে যাকে একদিন গড়তে চেয়েছিলাম? যে আমার অনেক আনন্দ, অনেক বেদনা? যাকে নিবিড় বন্ধনেও বাঁধতে পারিনি, যার মধ্যে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলছে তার খবরটুকু পর্যন্ত আমার জানা ছিল না? দশ বছর অজানা পরিবেশে কত কঠিন সমস্যার সঙ্গে নিঃসঙ্গ সংগ্রামে আজ ওর মন কত বদলেছে; ওর আকাঙ্ক্ষা নতুন পাখা নিয়েছে, সংশয় নতুন অর্থ গ্রহণ করেছে। আমি ওর মা, কিন্তু আজ এই বিদেশী গৃহের অপরিচিত শয্যায় অন্ধকার শীতের রাত্রে ও আমাকে শুধু মা ব'লে জানছে না। আমি ওর কাছে অন্য কালের নারী। এ কালের মেয়ে দেববাণী অন্য কালের মেয়ে বাসন্তীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, বৃদ্ধ-মাতৃত্বে পরিণত জননীকে নয়। সে বুঝতে চায়, বাসন্তীর জীবনধারার মধ্যে তার সংশয়ের মীমাংসার ইশারা আছে কিনা। যে কথা কোনও দিন কারুর সঙ্গে হয় নি, আজ ওকে তা বলতে হবে। না বললে, ও ভাববে, মা, তুমি আমায় দিলে না। দিলে না তোমার পূর্ণ পরিচয়। ভুলে গেলে, আমি শুধু তোমার মেয়ে দেববাণী নই; আমি নারী। নারীর সমস্যা নিয়ে তোমার কাছে দাঁড়ালাম, তুমি মাতৃত্বের পর্দা তুলে আড়ালে চ'লে গেলে।

অন্ধকার ঘরে বাসন্তী দেবীর মনে হ'ল, কালের ব্যবধান ঘুচে গেছে, যুগ যুগান্তরের সঙ্গে গেছে মিশে। লেপের নীচে মা ও মেয়ের সংলগ্ন দেহ উত্তাপের আরামে বিগলিত; কিন্তু দু'টি নারীচিত্তে প্রচণ্ড প্রলয়ের মৌন গর্জন।

অন্ধকার ভেদ ক'রে বাসন্তী দেবীর স্তব্ধ, অসহায়, কণ্ঠ বেজে উঠল।

"বাণী", তিনি মৃদুস্বরে বললেন, "বড় বিপদে ফেললি তুই আমায়। আমার মেয়ে তুই, কিন্তু তোকে যেন আমি আর চিনি নে। কোনও দিন তোকে আমি ভাল ক'রে চিনিনি, তাই বুঝি অত বেশী তুই আমাকে আকর্ষণ করেছিস। দেবযানীকে আমি পুরোপুরি চিনি, তাকে নিয়ে কোন সমস্যা হয় নি আমার। তুই বড় হ'লে আমার মনে ভয় হ'ল, তোকে বেঁধে রাখতে পারব না। তোর মধ্যে আমার যৌবনের ছায়া দেখতে পেতাম। বার বার অতর্কিতে তোর মুখ থেকে, চোখ থেকে, দেহ থেকে আর একটা মেয়ে আমার পানে উঁকি মেরে মুহূর্তের ঝিলিকে ব'লে যেত, চিনতে পার? এ তোমার মেয়ে নয়,

এ তুমিই। চমকে যেতাম। রাতের পর রাত চিন্তায় ঘুম আসত না। যে আমিকে চিরদিন শাসনে রেখেছিলাম, সে যে এমন লুকিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে তোর মধ্যে বাসা বাঁধবে তা কি কখনও জানতাম ?"

"আমি কিন্তু জানতে পেরেছিলাম, মা তোমার ভয়ের কারণ", দেববাণী আস্তে আস্তে বলল। "আমি জানতাম।"

যেন শুনতে পেলেন না বাসন্তী দেবী : ব'লে চললেন, "যুগে যুগে মানুষের আকাঙ্ক্ষা, বাসনা বদলে যায়। আমার পক্ষে যে সংযম, যে আত্মশাসন সম্ভব হয়েছে, তোর দ্বারা তা হবে না, এই ছিল আমার ভয়।"

"একদিন তোমার ভয় বাস্তবে পরিণত হ'ল।"

"তুই প্রশ্ন করছিলি, আমি কাউকে কোনওদিন ভালবেসেছি কিনা? বেসেছিলাম, সে যে কতকাল আগে তার পরিমাপ নেই। গ্রামে পাশাপাশি বাড়ীর প্রায় সমবয়সী দু'টি ছেলেমেয়ে। ছোট্টবেলা থেকে এক সঙ্গে খেলে, বেড়ায়, চলে। গ্রাম্য সম্পর্কে দু-পরিবারে নিকট-বন্ধন। একদিন যে এই আশৈশব সখ্য ভালবাসায় ফুটে উঠবে তা কি তারাই কোনওদিন ভাবতে পেরেছিল ?"

রুদ্ধনিঃশ্বাসে দেববাণী শুনল। মা-র কথা নয়। বাসন্তীর কথা। অন্য কালের একটি মেয়ের জবানবন্দী।

"সে ছিল প্রথম স্বদেশীর যুগ। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের পরে সন্ত্রাসবাদের প্রথম প্রকাশের যুগ। বাংলার প্রাণকেন্দ্র কলকাতা থেকে অনেক দূরে আমাদের গ্রাম ; কিন্তু সে যুগের বহ্নিবন্যা আমাদেরও পুড়িয়েছিল। গ্রামে গ্রামে চাপা উত্তেজনা। যুবকের দল একদিকে দেহমন-গঠনে হঠাৎ মনোযোগী, অন্যদিকে স্বদেশীর নেশায় তপ্ত-রুধির। সে ছিল আশ্চর্য আদর্শবাদের যুগ। বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ। সে যুগে যে বাস করে নি তার ধারণা হবে না, কি এক অভিনব আদর্শে বাংলার ছেলেদের চিত্ত সেদিন উজ্জ্বল হয়ে গিয়েছিল। যুবকেরা গোপনে দল গঠন করত, গোপনে চলত তাদের দেশের পূজা ; বাছা বাছা যুবকদের ডাক পড়ত ঢাকায়, কলকাতায়, সন্ত্রাসবাদে আত্মবলির জন্যে। এমনি একদিন ডাক পড়ল, যার কথা বলছি, তার।"

জোরে নিঃশ্বাস নিলেন বাসন্তী দেবী। দেববাণী বুঝল, বলতে তাঁর কষ্ট হ'চ্ছে। উদ্বেল সমুদ্রের উত্তুঙ্গ তরঙ্গ অতিক্রম ক'রে অতীতের স্মৃতি-দ্বীপের দিকে পাড়ি দিয়েছেন বাসন্তী দেবী।

"একদিন সে হঠাৎ গ্রাম ছেড়ে চ'লে গেল। গেল রাত্রে। যাবার আগে সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়ীতে বাবার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হ'ল তার। দরজা বন্ধ ক'রে ঘণ্টা দুই ওরা কি সব আলোচনা করল; আমি কৌতূহল চেপে রইলাম বাধ্য হয়ে। যখন দরজা খুলে সে বেরিয়ে এল, মুখ তার ভীষণ গম্ভীর। বাবাকেও দেখলাম, ভয়ানক গম্ভীর, বড় বিষণ্ণ। বুঝলাম, প্রশ্ন ক'রে জবাব পাওয়া যাবে না। যাবার আগে সে আমায় কাছে ডাকল। বলল, বাসন্তী, আমি আজই রাত্রে কোথাও যাচ্ছি।

"কোথায় যাচ্ছ, প্রশ্ন করা বৃথা; তাই শুধু জিজ্ঞেস করলাম, কবে আসবে? সামান্য হেসে সে বলল, জানি না।

"একদল সন্ত্রাসবাদী ধরা পড়েছিল কিছুদিন আগে। দলের একজন বিশ্বাস-ঘাতকতা ক'রে ধরিয়ে দিয়েছিল। তখন নিয়ম ছিল বিশ্বাসহন্তার একমাত্র শাস্তি মৃত্যু। যে ভীরু বিশ্বাস ভেঙেছিল, মৃত্যুভয়ে শহর থেকে পালিয়ে আমাদের পাশের গ্রামে নিজের বাড়ীতে সে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। পুলিস পাহারা থাকত সে বাড়ীতে রাত্রিদিন। আমরা শুনতাম ছেলেরা বলছে, তার দিন শেষ হয়ে এসেছে।

"আমার মনে বড় ব্যথা লাগত। বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে। আদর্শের আগুনে পুড়েছিল, তাই স্বদেশীতে যোগ দিয়েছিল। শেষ পরীক্ষায় উৎরোয় নি। ভেঙে পড়েছে। মনে হ'ত, এ দুর্বলতা ক্ষমার অযোগ্য নয়। তাকে হত্যা করলে মায়ের কি হবে, ভাবতে চোখে জল আসত। মা দিনরাত তাকে ঘিরে থাকে, মুহূর্তের আড়াল করে না। কিন্তু ছেলেরা আমার দুর্বলতায় হাসত। এমনি ক'রে অগ্নিযুগের দল-গঠন চলে না। বিশ্বাসঘাতকের একমাত্র শাস্তি মৃত্যু। ভীরুর স্থান নেই অগ্নিযুগে।

"আট দিন পরে সে ফিরে এল। নিদারুণ গাম্ভীর্যে সে তখন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। বাবার সঙ্গে আরও গোপন কথাবার্তা চলল। বাবাকে জীবনে আমি অত গম্ভীর, অত নিরানন্দ দেখিনি। কয়েকবার তাকে প্রশ্ন করতে গিয়ে নিষ্ঠুর দেওয়ালে ধাক্কা খেলাম। বুঝলাম, কোনও আসন্ন ভয়ংকর কাজে তার আহ্বান এসেছে। কিন্তু সে যে কি ভয়ংকর তা অনুমান করারও সাধ্য আমার ছিল না।

"কদিন পরেই সব জানাজানি হয়ে গেল। বিশ্বাসহন্তা যুবকটি সর্বদা সতর্ক পাহারায় বাস করে। বাড়ীর আশেপাশে রজনীর অন্ধকারে প্রতিদিন অজ্ঞাত

মানুষের ভয়াল পদধ্বনি। সে পদধ্বনি লক্ষ্য ক'রে আর্ত অনুনয়ে রোজ তার মা বলেন, ওর যত অপরাধই হয়ে থাকুক, ও আমার একমাত্র ছেলে, তোমরা ওর প্রাণ নিও না। প্রত্যুত্তরে অন্ধকার থেকে বিদ্রূপের কর্কশ হাসি তীক্ষ্ণ তীরের মত ছুটে আসে।"

কিছুক্ষণ বাসন্তী দেবী চুপ ক'রে রইলেন। শীতল রজনীর গম্ভীর অন্ধকারে দেববাণী তাঁর চাপা ব্যথার শাণিত শ্বাস-প্রশ্বাস শুনতে পেল। কিছু একটা বলতে গেল, কিন্তু এই বাঙ্ময় মৌন ভাঙতে সাহস হ'ল না।

"মানুষের মনে যখন জিঘাংসার প্রলয় ওঠে, বাণী, তার ভয়াল ভয়ংকর চেহারা বাইরে থেকে আমরা কতটুকু বুঝতে পারি? মানুষ মানুষকে মারে, এ তো কেবল ঘটনা বা দুর্ঘটনা নয়, মানুষের হীনতম বিকৃতি! তাকে যতই না আমরা বীরত্বের, দেশপ্রেমের মহিমা দিয়ে সাজাই, এ নৃশংসতার ক্ষমা নেই।" বাসন্তী দেবী গভীর নিঃশ্বাস নিলেন। "একদিন রাত্রে সে ছেলেটি আহারের পর রান্নাঘরের ছাতনাতলায় মুখ ধুতে গেল। রোজ সে ঘরেই মুখ ধোয়। দু'দিন বাড়ীর আশেপাশে রাত্রিতে বিভীবিকাময় পদধ্বনি শোনা যায় নি, তাই বুঝি তার ভয় কাটল; মা-র আপত্তি অগ্রাহ্য ক'রে বাইরের অন্ধকারে মুখ ধুতে গেল। হঠাৎ আমগাছের আড়াল থেকে দু'বার বারুদের হুংকার। একটি গুলি তার বুক ভেদ করল। আর্তনাদ ক'রে মুহূর্তে সে শেষ হয়ে গেল।

"এ ঘটনার কিছুই আমরা জানতাম না। শুধু দেখলাম, অনেক রাত্রি অবধি বাবা জেগে জেগে বই পড়ছেন। লণ্ঠনের আলোয় তাঁর গম্ভীর মুখ দেখে শুতে যাবার সময় ভয় করছিল। আমার কেমন অস্বস্তি লাগল, ঘুম এল না। রাত নিশুতি হলে হঠাৎ দরজায় মৃদু করাঘাতে উঠে বসলাম। বাবা দরজা খুলে দিয়েছেন। চাপা স্বরে যে ক'টি কথা উচ্চারিত হ'ল তাতেই বুঝলাম কে এল এত গভীর রাতে। উঠে পড়লাম, কিন্তু ও-ঘরে যেতে সাহস হ'ল না। শুনতে পেলাম বাবা ও তার কথাবার্তা:

'কি হ'ল?'

'ঠিক আছে।'

'পেরেছ?'

'হুঁ।'

'কোন্ পথে এলে?'

'খাল পেরিয়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে।'

'পুলিস ?'

'খুঁজছে।'

'কতক্ষণ সময় আছে ?'

'ঘণ্টা দুই।'

'তাহলে খেয়ে নাও। নৌকো তৈরী আছে।'

"রুদ্ধনিঃশ্বাস, লুপ্তবুদ্ধি আমি নিঃসাড় হয়ে বসে রইলাম। ও কিছু একটা ভয়ংকর কাজ ক'রে এসেছে বুঝলাম, তাই এখুনি পালাবে। কি করেছে, কোথায় পালাবে প্রশ্নগুলি মনের মধ্যে হাতুড়ি পিটতে লাগল। একটু পরে আমার ঘরের দরজায় মৃদু শব্দ হ'ল। বাবা আস্তে আস্তে ডাকলেন, বাসন্তী।

উঠে এসে দরজা খুললাম।

'ঘুমোও নি ?'

'না।'

'এসো আমার ঘরে।'

"ঘরে ঢুকে দেখি পাথরের মত নিশ্চল সে দাঁড়িয়ে আছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, চোখের দৃষ্টি চিন্তায় আচ্ছন্ন। বাবা বললেন, 'খাবার আছে ?' নিঃশব্দে আমি বেরিয়ে গেলাম। ক্ষীর, মুড়ি, নারকেল, আম নিয়ে যখন ফিরে এলাম, সে আমার দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসল। নিঃসহায় করুণ হাসি। বাবা বললেন, 'খেয়ে নাও।' সে খেল। অভিভূত আমি তার আহার দাঁড়িয়ে দেখলাম। বাবা বললেন, 'তুমি ঘণ্টাখানেক শুয়ে নাও।'

"বাবার ঘরে বড় ইজি-চেয়ারে তৎক্ষণাৎ সে শুয়ে পড়ল।

"ঘরে গিয়ে ঠায় ব'সে রইলাম। চিরদিন সে গম্ভীর, স্বল্পবাক্, কিন্তু আজ যেন তার সব কথা ফুরিয়ে গেছে। যেন সে নিজেই একেবারে নিঃশেষ। কিছুক্ষণ পর বাবা আবার আমার ঘরে এলেন। বললেন, 'বাসন্তী, আজকের ঘটনা যেন কেউ না জানে।' দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, 'জানবে না।' বাবা বললেন, 'ছোট একজনের মত বিছানা, থান দুই ধুতি, আমার একটা কামিজ সতরঞ্চিতে বেঁধে দাও।' গলা দিয়ে প্রশ্ন বেরিয়ে আসতে চাইল, ও কোথা যাচ্ছে ? কি করেছে ? কিন্তু প্রশ্ন বৃথা।' উত্তর পাওয়া যাবে না।

"বিছানা বেঁধে বাবার ঘরে এসে দেখি ইজি-চেয়ারে সে নিশ্চিন্তে নিদ্রিত। নির্মল মুখে অব্যক্ত বেদনা জমাট হয়ে আছে।

"বাবা তাকে ডেকে তুললেন।

"এবার তোমার যাবার সময় হল।

"চট ক'রে তৈরী হ'ল সে।

"বাইরে সামান্য পদশব্দে চকিত হয়ে বাবা দরজা খুললেন। 'রতন মাঝি এসে গেছে।' একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললেন, 'বেশী দেরী ক'রো না।' ব'লে, বাইরে চ'লে গেলেন।

"কিছুক্ষণ আমার মুখে কথা এল না। সেও নীরব, নিশ্চল। কিন্তু আমি বুঝলাম, এ মুহূর্ত জীবনে আর আসবে না। প্রশ্ন করলাম ঃ

'কি করেছ ?'

'খুন।'

"নিঃশ্বাস আটকে গেল আমার। তবু বললাম, 'কাকে ?'

'বিশ্বাস-ঘাতককে।'

'তুমি খুন করলে ?'

'করতে হ'ল।'

'কোথায় পালাচ্ছ ?'

'জানি না।'

'তার পর।'

'তার পর আর কি ?'

'এবার তোমার ফাঁসি হবে, জান ?'

'হতে পারে।'

"চোখ দিয়ে দু' ফোঁটা জল বুঝি গড়িয়ে পড়েছিল। হঠাৎ মনে হ'ল গাল জ্বলছে। বললাম, 'আমি ?' সে নীরব রইল। বাইরে থেকে বাবা তাকে ডাকলেন। এক পা এগিয়ে গিয়ে সে দাঁড়াল। কি যেন বলতে গিয়েও বলল না। আমি তাকে গড় হয়ে প্রণাম করলাম। মাথায় সে হাত রাখল। উঠে দাঁড়াতে বলল, 'যাই।' দরজা অবধি এগিয়ে গিয়ে আবার দাঁড়াল। বলল, 'জীবনে হেরো না, বাসন্তী।'

"সেই তার শেষ কথা। পালাবার পথে সে ধরা পড়ল। তিন মাস পরে তার ফাঁসি হয়ে গেল।"

দেববাণী মা-র বুকে মাথা লুকিয়ে শুয়ে রয়েছে। নিথর, নিস্তব্ধ অন্ধকার ভেদ ক'রে ছুটন্ত রেলগাড়ীর সুতীব্র শব্দ শোনা গেল। জীবনও ও-রকম চলছে।

অতীত দূরে রেখে বর্তমানের বুক দিয়ে, ভবিষ্যতের অন্ধকার ভেদ ক'রে এক-একটা বড় ঘটনায় কিছুক্ষণ থেমে, রেলগাড়ী যেমন থামে স্টেশনে। মা যাঁর নাম একবারও উচ্চারণ করলেন না, দেববাণী তাঁকে দেখে নি, তবু জানে। এ রোমাঞ্চকর কাহিনীর কিছুটা সে আগেও শুনেছে, মা-ই বলেছেন। বড় হবার পর দেববাণীর মনে হয়েছে এ কাহিনী ও তার নায়কের জন্যে মা-র মনে বুঝি বিশেষ দুর্বলতা সঞ্চিত ; মনে পড়েছে বলতে বলতে মা-র গলা কেমন ভারী হয়ে উঠেছে। কিন্তু আজ সে এক্ষুণি যা শুনল, সে ত মার গল্প নয়, বাসন্তীর জীবন-কাহিনী। চৌদ্দ বছরের বাসন্তী, বাংলার নবযুগে মাতৃ-মন্ত্রের আগুনে জ্বলেওঠা নগণ্য গ্রামের অগ্নি-দীক্ষিত পরিবারের নবযৌবনা বাসন্তী, দেববাণীর চোখের সামনে অন্ধকারে ভেসে এসে দাঁড়াল।

চমকে উঠল দেববাণী। ও যে আমি, এ যে আমি !

দেববাণীর মনে পড়ল, সে-ও ভালবেসেছিল। ভালবাসায় ভেসে গিয়েছিল। সেকালের বাসন্তী অত কঠিন সংযমে নিজেকে বেঁধেছিল ব'লেই একালের দেববাণীর একটুও সংযম রইল না। আমি একেবারে ভেসে গেলাম। কারুর বাধা মানলাম না, কোনদিকে চাইলাম না। অথচ কেউ কি কোনও দিন ভেবেছিল, মা, আমি এমন ভেসে যেতে পারি ? তুমি ত ভাবই নি, আমি নিজেও কি কখনও ভেবেছি ? ছোটবেলা থেকে সবাই বলেছে আমি গম্ভীর, দুরন্ত। যে বয়সে মেয়েদের মন প্রথম রঙিন হয়, আমার মনে কোন রং-এর দাগ লাগে নি। জীবনকে বড় রহস্যময় মনে হয়েছে, বুদ্ধি হবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছে অনেক কিছু আমার জন্যে পথের প্রান্তে অপেক্ষা করছে। জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখে এসেছি, কি নিদারুণ কষ্টে একমাত্র আত্মবলে তুমি আমাদের দু-বোনকে মানুষ করেছ, শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই, নালিশ নেই, তুমি সদা-হাস্যময়ী, সর্বদা তোমার কৌতুক, তুমি লোহার মত শক্ত, নবনীর মত নরম। চাকরি করেছ আমাদের মানুষ করার জন্যে, এমন ভাবে রেখেছ, গড়েছ আমাদের, দারিদ্র্য কি আমরা জানতে পারিনি। যখন যা দরকার সব পেয়েছি, দরকারের বেশীও। জ্ঞান-বুদ্ধি হবার সঙ্গে, তাই, একমাত্র সংকল্প ছিল বড় হব, অনেক কিছু করব, তোমার সব অভাব মেটাব, বুক তোমার গর্বে ভ'রে দেব। বুঝতাম, পুত্রের অভাবে তুমি দুঃখ পেতে, মাঝে মাঝে বলতে, আমাদের বিয়ে হয়ে গেলে তোমাকে দেখবার কেউ থাকবে না। মন আমার তৈরী হয়ে গিয়েছিল, আমি

নির্বোধের মত ভাবতাম, বিয়ে আমি করব না, সারাজীবন তোমার পাশে থাকব। পড়ব, পড়াব। গবেষণা ক'রে ডক্টরেট পাব, সুন্দর বড় সাজান ফ্ল্যাটে আমার নিজস্ব লেবরেটরী থাকবে; দেয়াল-ঘেঁষা আলমারীতে বই। দেবযানীর বিয়ে হবে। তোমাকে নিয়ে থাকব আমি।

কিন্তু মা আমি নিজেকে কি একটুও জানতাম? তুমিও কি আমায় জানতে? হয়ত তোমার ভয় ছিল, তাই দেখতাম মাঝে মাঝে তুমি কি দুর্বোধ্য জিজ্ঞাসায়, গোপন সন্ধানে আমার পানে তাকিয়ে থাকতে। কলেজে পড়ার সময় বাড়ীতে কয়েকটি সহপাঠী বন্ধু আসত, দু'চার জন নবীন অধ্যাপকও; বড় ইচ্ছে ছিল তোমার, তাদের মধ্যে কারুর সঙ্গে আমার ভাব হোক। কোন দিনও যে হয় নি, সহপাঠীদের যে অনায়াসে আমি ছোট ভাই ক'রে নিতাম, অধ্যাপকদের মনের ধারে কাছে ধরা পড়তাম না, তুমি তাতে দুঃখ পেতে। তোমার সাবধানী প্রশ্ন, সন্ধানী দৃষ্টি আমি বুঝতে পারতাম। মজা লাগত। তখন কি ভেবেছি, মা, তুমি আমায় দেখে আশ্বস্ত হতে না; ভয় পেতে? ভয় পেতে, আমি কিছু একটা ভয়ংকর হঠাৎ না ক'রে বসি। তোমার চোখে ভয়ের ছায়া দেখতে পেতাম, বুঝতাম না।

একদিন তোমার ভয় বাস্তব হ'ল। ভয়ংকর ভীষণ কিছু ক'রে বসলাম, মা। সেদিন আমার বয়স কত ছিল? উনিশ? উনিশের দেববাণী ভেসে গেল ভালবাসার বন্যায়। চতুর্দশী বাসন্তীর সংযম কেন সে উত্তরাধিকারে পায় নি, মা? সর্বনাশের সঙ্গে তার প্রেম হ'ল। বিভীষিকার সৌন্দর্যে সে সম্মোহিত হ'ল। ঝড়ের মধ্যে দেখল, শুধু বিদ্যুতের ছলকানি। প্লাবনের তাণ্ডব সঙ্গীতই শুধু শুনতে পেল। দেববাণী বিদ্রোহী হ'ল। তোমরা প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও তাকে ধ'রে রাখতে পারলে না। সে বেরিয়ে গেল। সে না ভেবেছিল, নিজে বিয়ে করবে না, দেবযানীর বিয়ে দেবে? হায় বিধাতা, সে বিদ্রোহী হ'য়ে বিয়ে করল; আর দেবযানী আজও কেমন নিশ্চিন্তে, সহজে, অনায়াসে কুমারী!

বাসন্তী দেবী ফিরে গিয়েছিলেন অগ্নিযুগের বাংলার অখ্যাত তাঁর পিতৃ-পুরুষের গ্রামে। দেববাণী ফিরে গেল আগুনে পোড়া কলকাতা শহরে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুন। সে আগুনে ভারতবর্ষের কোন শহর যদি জ্ব'লে গিয়ে থাকে, তার নাম কলকাতা। জাপানী বোমায় নয়, মার্কিন-ইংরেজের জয়-দাবীর দাপটে। কলকাতার পথে পথে হাজার হাজার নিরন্ন ক্ষুধার্ত মানুষের আর্তনাদ; মৃত্যু। অন্যদিকে, বহু কুপথে, মহানগরীর দ্রুত আত্ম-অপচয়

দেববাণী ছাত্রকালে এ দাহনের বিশেষ কিছু জানতে পারে নি। অধ্যয়নে নিমগ্ন তার কুমারী মনকে সযত্নে মা কেমন ক'রে এ বিরাট মহাবহ্নির দহন থেকে আড়াল ক'রে রেখেছিলেন? শুধু রাতের পর রাত বুভুক্ষু মানুষের অন্ন-প্রার্থনার আর্তনাদ তার নিদ্রা হরণ করেছে, দু'গ্রাস ভাত মুখে দেবার সঙ্গে সঙ্গে যে আর্তনাদ রোজ রাত্রে গলির মধ্যে, বাড়ীর সদর দরজায় সে শুনতে পেত, শুনে আর খেতে পারত না, ছুটে গিয়ে আহার্য বিলিয়ে দিত কঙ্কালসার নারী পুরুষ, শিশুকে। মা রাগও করতে পারতেন না। কলেজ থেকে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে খাইয়ে দিতেন পেট ভ'রে। নিজে যে তিনি প্রায়ই অর্ধাহারী থাকতেন, দেববাণী দেবযানী তা জানত। মহাযুদ্ধের নিষ্ঠুর চেহারার এ ছাড়া অন্য পরিচয় তারা পায় নি। বাসার কাছে দু'দিন জাপানী বোমা পড়েছিল; ভাবতে অবাক লাগে, দু'বোন ও মা, কেউ তারা বিশেষ ভয় পায় নি। কলকাতার বাইরে যাবার স্থান তাদের ছিল না, যাবার কথাও ওঠে নি। তাই বোধ করি মা তাদের ভয় পেতে দেন নি। বোমার আতংক কৌতুকে তুচ্ছ করেছেন।

দেববাণী ভাবল, মা, চৌদ্দ বছরের বাসন্তীকে ধ'রে রাখবার অনেক কিছু ছিল। প্রিয়তমকে হারিয়ে তাই সে ভেঙে পড়ে নি। বিয়ে করেছে, জননী হয়েছে, জীবনে লড়েছে। তাকে ধ'রে রাখবার জন্যে অগ্নিযুগের বঙ্গদেশ ছিল, বিবেকানন্দ-অরবিন্দ-বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন; স্বদেশীযুগের মাতৃমন্ত্র ছিল; সমাজ ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কলকাতার উনিশ বছরে দেববাণীকে ধ'রে রাখবার জন্যে ছিলে শুধু তুমি আর দেবযানী। আর কিছু নয়। তোমাদের সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গমাতা তখন অন্নহীনা, ধর্ষিতা; সমাজ ঘুষ আর চুরির বিষে জর্জরিত; নীতির শাসন, আদর্শের বাঁধ চূর্ণ। দেববাণী তাই কি ভেসে গেল? মহতের টানে নয়। আদর্শের বন্যায় নয়। নর্দমার প্লাবনে।

অনেকক্ষণ নীরব থেকে বাসন্তী দেবী আবার বললেন, "বাণী, মেয়েদের ভালবাসা বড় দুঃখের। ভালবেসে পুরুষ উল্লসিত হয়, নারী নিস্তব্ধ। নারীর প্রেম নিঃশেষে পরিপূর্ণ বিলিয়ে দেওয়া। ঠিক জানি না, মনে হয় এ সৌভাগ্য বেশীর ভাগ মেয়ের জীবনে আসে না। প্রেমের স্বল্প দাবী মেটান কঠিন নয়। তোর বাবার দাবী পরিমিত ছিল। বেশীদিন তিনি বাঁচেন নি। কিন্তু যতদিন ছিলেন, বিবাহিত জীবন নিয়ে তাঁর কোন নালিশ ছিল না। তাঁর প্রথম সন্তান হিসেবে একথা তোর জানা দরকার।"

"মা," দেববাণী দৃঢ় বিশ্বাসে বলল, "তোমাকে নিয়ে কারুর নালিশ থাকতে পারে না।"

"ক'টা বছরের বা কথা, বাণী," বাসন্তী দেবী আবার স্মৃতিচারণে নিমগ্ন হ'লেন, "পঞ্চাশ বছরও হয় নি। কি আশ্চর্য বদলে গেল দেশ, কাল, পাত্র, মানুষের জীবন। আমাদের জন্ম গ্রামে, শৈশব থেকে প্রথম যৌবন পর্যন্ত একেবারে গ্রামীণ। চল্লিশ বছর শহরে কাটিয়েও আমি আসলে গ্রাম্য। আমার চেতনার যেটুকু কালের দাবী অগ্রাহ্য ক'রে সজীব, তাতে এখনও সেই গ্রাম্য-জীবন ভিড় ক'রে আছে। চোখ বুজলে দেখতে পাই পদ্মা নদীর চক্‌চকে রূপালি বালুতট, কাশবনের ফুলের সঙ্গে আকাশের সাদা মেঘ এক হয়ে গেছে। জেলেরা মাছ ধরছে, নদীবক্ষ থেকে ভেসে আসছে ভাটিয়ালি সুর। দেখতে পাই, ঘন-গভীর আমবাগান, দীর্ঘপত্র জামরুল গাছের নীচে পাটি পেতে গ্রীষ্মের দুপুরে নিদ্রিত আমার বাবা। বর্ষার স্পর্শে কদমফুল ফুটেছে, গন্ধে বাড়ীঘর ভরপুর। দুপুরে জানলার ধারে ব'সে তাকিয়ে আছি উদাসীন নীল আকাশে—দূরে আকাশ ছুঁয়েছে বাঁশবন, বকুল গাছে ডাকছে পাখী, সন্ধ্যে না হতেই কামিনী ফুটে উঠছে স্তবকে স্তবকে। সকাল থেকে প্রজারা আসছে বাবার কাছে নানা কাজে, এমন কেউ নেই যার সঙ্গে না আছে স্নেহের টান, মাটির স্নেহ। বিপদে আপদে, রোগে অভাবে, তাদের একমাত্র সহায় বাবা; তেমনি উৎসবে, আনন্দে, পূজা-পার্বণে প্রধান অতিথি বাবা। বাবার চতুর্দিকে আমরাও তার মহিমার অংশীদার। গ্রাম আমাদের জীবনকে দায়িত্বশীল করেছিল। আমি শুধু বাসন্তী নই, আমি বাবার মেয়ে। এ পরিচয়ের দাবী মেটাতে আমাদের সর্বদা সতর্ক থাকতে হ'ত। কলকাতা নামে বিরাট রহস্যময় একটা শহর ছিল জানতাম, অনেক দূরে; গ্রামকে সে তখনও গ্রাস করে নি, গ্রামের জীবন তখনও ভরপুর। কিন্তু সে পরিপূর্ণতা কি তাড়াতাড়িই না ফুরিয়ে গেল! বিয়ের তিন বছর পরে তোর বাবা আমাকে কলকাতা নিয়ে আসেন। সে কলকাতার সঙ্গে আজকের শহরের কোন তুলনা হয় না। তারপর কি দ্রুতগতিতে চলল পট-পরিবর্তন! আমাদের গ্রামীণ চেতনার ওপর নিদারুণ জুলুম চালিয়ে কাল বদলাতে লাগল; বিন্দুমাত্র করুণা নেই পুরাতনের জন্যে কোথায় গেল অগ্নিযুগ, মাতৃপূজা! কোথায় গেল বিবেকানন্দ-অরবিন্দ-বঙ্কিম চন্দ্রের বাংলা দেশ? ঝগড়া বিবাদ দাঙ্গা-বিরোধে মানুষগুলি সব বদলে গেল জীবনের প্রথম অধ্যায়ে আমরা যে সম্প্রীতি-শান্তির আশ্বাস পেয়েছি, তো

তার কিছুই পেলি না। দু'টো বিশ্বযুদ্ধ ঘ'টে গেল চোখের ওপর ; দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, সংঘাতের শেষে দেশ পর্যন্ত দু'ভাগ হয়ে গেল। যে-গ্রামীণ চেতনায় এখনও আমাদের চিত্ত পরিপূর্ণ, সে গ্রাম হয়ে গেল বিদেশ। আজ দেখ, জীবনের সায়াহ্নে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি। যে দু'টি মেয়েকে মানুষ করবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় বিধবা হবার পর স্বামীর জন্যে শোকের সময় পর্যন্ত পাই নি, তাদের সঙ্গে আমার জীবনের তুলনা করলে ভাবি, ওরা কি আমারই গর্ভে জন্ম নিয়েছিল? একটা জীবনে কি এত বিচিত্র পরিবর্তন সম্ভব? আমি এখনও গ্রামীণ ; তুই ত পৃথিবীর চেতনা নিয়ে বিশ্ব-নাগরিক। দেবযানীর মত অমন নরম মেয়েটা একা একা কোন্ সাত সমুদ্র ছাড়িয়ে বিদেশে প'ড়ে আছে জীবনের তাগিদে। বিয়ে ক'রেও সুখ পেলি না, একমাত্র সন্তানকে কোথায় পরদেশে ফেলে রেখে কিসের নেশায় দিন কাটছে তোর অন্যদেশে। মা হয়েও তোদের আমি বুঝতে পারি নে, চিনতে পারি নে।"

"আমরা কিন্তু তোমাকে ঠিক বুঝি, মা।" দেববাণীর স্বর গভীর হ'ল। "যুগ বদলেছে, আমরা কক্ষ্যচ্যুত তারার মত কে কোথায় ছিটকে পড়েছি। পৃথিবী বড় ছোট হয়ে গেছে। কলকাতা দূরে ছিল তাই তোমরা গ্রামীণ ছিলে। আজ বাংলা দেশে গ্রামীণ ভদ্রলোক আর নেই। সবাই শহুরে। এখন আমাদের দেশে আমরা হ'তে চলছি ভারতবাসী। পুরোপুরি আমরা আর বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী পর্যন্ত নই। আমাদের সত্তার কিছুটা ভারতবাসী হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে আরও হবে। তেমনই, ঘটনার স্রোতে, আমরা কেউ কেউ বিশ্বচক্রে জড়িয়ে পড়েছি। দেশে দেশে মানুষের জন্যে শত শত দ্বার খুলে গেছে। তোমার দু'টি মেয়ে নতুন যুগের বিশ্বনাগরিকতার আস্বাদ যদি পেয়ে থাকে, তুমি গর্ব করবে না? আমরা যখন যেখানেই থাকি, মা, আমাদের মনের অনেকখানি প'ড়ে থাকে তোমার কাছে। রাত্রিতে সমুদ্র পাড়ি দিতে গিয়ে নাবিক যেমন ধ্রুবতারার পানে বার বার তাকায়, জীবন-সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে আমরাও তেমনি তোমার দিকে বার বার তাকিয়ে দেখি। তুমি যা পেরেছ, ক'জন পৃথিবীতে তা পারে? বিদেশে তোমার কথা যাদের বলেছি তারা অবাক হয়েছে। আজ যে আইরীণের বাড়ীতে তুমি অতিথি, তার কারণ তোমাকে দেখবার ওর দারুণ আকাঙ্ক্ষা। তোমার কথা শুনে আইরীণ বলেছিল, উনি তোমার একার মা নয় বাণী। উনি ক্ল্যাসিকাল মাদার, সবাকার মা

বাসন্তী দেবী লজ্জা পেলেন। বললেন, "থাম্। তোর সঙ্গে আমার অন্য কথা আছে।"

"বল।"

"তোর সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছি। এবার আমার প্রশ্নের জবাব দে।"

"প্রশ্ন কর।"

"কলকাতায় ত থাকলি না। তোর সঙ্গে কথাই হ'ল না।"

"বল না, কি তোমার জানবার আছে।"

"খুলে বলবি ?"

"বলব।"

"দশ-এগারো বছর বিদেশে কাটালি।" বাসন্তী দেবী একটু ইতস্ততঃ করলেন। তারপর জোর ক'রে ব'লে ফেললেন। "তোর জীবনে কোন পুরুষ আসে নি ?"

খানিক দেরী ক'রে দেববাণী জবাব দিল। "য়ুরোপ-আমেরিকায় বাস করলে, মা, খোলাখুলি কথাবার্তা বলা অনেকখানি অভ্যাস হয়ে যায়। তোমার প্রশ্নের উত্তর সোজাসুজি দি। কোন পুরুষের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক আমার হয় নি।"

বাসন্তী দেবী নিশ্চিন্ত হলেন, দেববাণী বুঝল।

"তোর পেছনে লাগে নি ?"

"এক-আধটু। উৎসাহ না দেখালে ওদেশী পুরুষরা জ্বালাতন করে না। কেন করবে ? ওরা ত বঞ্চিত জীবন কাটায় না ! একজনকে না পেলে আরও অনেককে ওরা পায়। জ্বালাতন করে বরং এদেশী ছেলেরা। ভাবে, বিদেশে গিয়ে সবাই লাগাম-হীন হতে চায়। তবে, ওদের দৃষ্টি প্রধানত শ্বেতাঙ্গিনীদের দিকে।"

"তোর একা একা লাগে না ?"

"লাগে বৈ কি ? কিন্তু অনেকটা সয়ে গেছে। বন্ধু-বান্ধব তো আছে কিছু কিছু।"

বাসন্তী দেবী নীরব হলেন। দেববাণী তাঁর আসল প্রশ্নের জন্যে তৈরী হ'ল।

"হিমাদ্রি ?"

"এখন ভিয়েনায়। ভাল আছে।"

হেসে ফেললেন বাসন্তী দেবী।

"তা জানি। হিমাদ্রিকে তুই ভালবাসিস না কেন?"

"কে বললে ভালবাসি না?"

"ভালবাসিস?"

"খুব।"

"তামাসা রাখ্। তুই ওকে বিয়ে করছিস না কেন?"

"জীবনে একবার নিজের উদ্যোগে বিয়ে করেছিলাম। পস্তেছি। ও কাজ দ্বিতীয়বার করব না। এবার যদি বিয়ে করি, তুমি দিয়ে দেবে।"

"মস্করার কথা নয় বাণী। তুই নাম করেছিস, বড় হয়েছিস। কিন্তু, সেকেলে আমি, আমার মন ভরে না। আমার মন চায়, তোদের সংসারী দেখি। স্বামী-পুত্র নিয়ে ঘর করছিস, আরও দশটা মেয়ের মত; নাতি-নাতনীরা তাদের দিদিমাকে ঘিরে আছে, রূপকথা শুনছে।…" গলা ধ'রে এল বাসন্তী দেবীর।

"জানি মা।" মৃদুকণ্ঠে দেববাণী বলল। "কিন্তু এ আনন্দ আমি তোমাকে আর দিতে পারলাম না। দেবযানী ফিরে এলে ওকে বিয়ে দিও।"

"তুই জানিস, দেবযানী কেন বিয়ে করল না?"

"অনুমান করতে পারি। আমি বিয়ে ক'রে সুখী হই নি, তাই। পাছে ওর বিবাহিত জীবনের সুখ দেখে আমি দুঃখ পাই! আমার হিংসে হয়!! দেবযানীকে আমি চিনি, মা।"

"হিমাদ্রি তোকে ভালবাসে," দেববাণীর কথার ঝালে কান না দিয়ে বাসন্তী দেবী বললেন, "সে আমাকে যে-সব পত্র দেয়, তাতে আমি পরিষ্কার বুঝতে পারি, সে তোকে ভালবাসে।"

"হয়ত বাসে।"

"তোকে সে বিয়ের প্রস্তাব করে নি?"

"ও বরং তোমার কাছে করবে। যা ভয়ানক বাঙ্গালী!"

"কৈ? আমার কাছে ত বিয়ের প্রস্তাব করে নি। চিঠিতে শুধু তোর কথাই থাকে, বুঝতে পারি তোকে কত ভালবাসে। কিন্তু বিয়ে করতে চায়, এমন কিছু ত লেখে নি!"

"তবেই দেখ মা। ওর ইচ্ছে নেই। তুমি যাতে আমার সব খবর পাও তাই নিয়মিত চিঠি লেখে। আমার চিঠি লেখার আলস্য জানে কিনা, তাই।"

"পাছে তুই রাজী না হোস্ নিশ্চয় এই ভয়ে হিমাদ্রি বিয়ের প্রস্তাব করে নি।"

"কিন্তু, ও না করলে আমি রাজী হই কোন্ সুযোগে ?"

"তুই আবার মস্করা করছিস।" ক্ষুণ্ণ হলেন বাসন্তী দেবী। "তোর বাকী জীবনটা কি এমনি ভাবেই কাটবে ?"

"আমি তো বেশ আছি, মা।" দেববাণী দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপল।

"কি জানি কেমন আছিস !" উদাস কণ্ঠে বললেন বাসন্তী দেবী। "তোদের বুঝতে পারি নে। একটা ভুলের বোঝা সারা জীবন টেনে যাওয়ার কোনও মানে নেই, দেববাণী।"

"বোঝা না নামলে তাকে নামানো যায় না, মা।" চুপি চুপি বলল দেববাণী। "তোমার মেয়ে দু'বার বিয়ে করুক তুমি কি তাই চাও ? অল্প বয়সে তো তুমিও বিধবা হয়েছিলে ?"

"বোকার মত কথা বলিস নে, বাণী।" উষ্ণ হলেন বাসন্তী দেবী। "আমার সঙ্গে তোর তুলনা হয় না। আমি ভুল বিয়ে করিনি। স্বামীর মৃত্যু আর স্বামী ত্যাগ এক কথা নয়। তাছাড়া দিনকাল বদলে গেছে। অনেক কিছুই তোরা করছিস যা আমরা ভাবতে পারিনি।"

"আমার মন বেশ সেকেলে, মা।"

"তুই হিমাদ্রির জীবনটা নষ্ট করছিস ?"

"আমি কেন নষ্ট করতে যাব ?"

"সত্য কঠিন হলে আমরা তাকে এড়াবার চেষ্টা করি।"

দেববাণী চুপ ক'রে গেল। যে দ্বন্দ্ব তার মনকে অহরহ নিষ্পেষণ করছে, মা-কে তা বলার সময় আসে নি। দ্বন্দ্ব তার একার নয়। হিমাদ্রিরও। দীর্ঘ-কালের বন্ধুর পথে ওরা আজ অনেক কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। তুমি আমার কত কাছে এসে গেছ, হিমাদ্রি, বোধ হয় তুমি জান না। উপকারী পথদ্রষ্টার ভূমিকায় বিধাতার রহস্যময় নির্দেশে অযাচিত ভাবে আমার জীবনের চরমতম দুর্দিনে তুমি আবির্ভূত হয়েছিলে। আমাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে তোমার স্বতঃপ্রসারিত বন্ধুত্ব যতখানি করেছে, তার তুলনা হয় না। এত দিয়েও কোনদিন কোন প্রতিদান চাও নি হিমাদ্রি, তাই তোমাকে প্রথম আমি শ্রদ্ধা করেছি, সে-শ্রদ্ধায় কিছু জ্বালাও ছিল। তোমার কাছে হাত পেতে অনেক নিয়েছি; নিতে গিয়ে লজ্জায় মাথা নত হয়েছে; অসহায় দৈন্য তীব্র বিদ্রূপ

করেছে। মানুষ সব বোঝা বইতে পারে, চির-কৃতজ্ঞতার বোঝা বইতে পারে না। তুমি আমাকে চির-কৃতজ্ঞ ক'রে রেখেছিলে, তাই তোমাকে উপকারী বন্ধু জেনেও কাছের মানুষ মনে করতে পারিনি। তোমার সামনে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছে তুমি ঐশ্বর্যবান্, আমি দীন্; তুমি শক্ত, আমি দুর্বল্; তুমি নিশ্চিন্ত পাথের অর্জন ক'রে সুস্থির, আমি পথের সন্ধানে অস্থির। তোমার মহত্ত্ব আমায় মুগ্ধ করেছে, সে মহত্ত্বের কাছে আমি কেমন ছোট হয়ে গেছি। তাই তোমাকে কাছের মানুষ মনে করতে পারিনি।

পারিনি, যতদিন না তোমার দৈন্য আমার কাছে ধরা প'ড়ে গেছে। এক-দিন যখন তুমি আর মহৎ রইলে না, নীচে নেমে এলে, তোমার আর্ত দীনতা নিরাবরণ হয়ে ধরা পড়ল আমার কাছে, তুমি আপন হ'লে, কাছের মানুষ হ'লে। আমার বিস্মিত বিহ্বলতা তোমাকে চাবুক মারল; ভাবলে আমি রুষ্ট হয়েছি, বুঝলে না কত দীর্ঘকাল তোমার এই নগ্ন মানুষ-মূর্তির অপেক্ষায় কেটেছে আমার দিন রজনী। আমায় বুঝতে না পেরে তুমি দূরে পালালে, দূরে গিয়ে নিকটতর হ'লে।

কোনও দিন, হিমাদ্রি, তুমি কিছু চাওনি; এবার পুরাপুরি সবটুকু চাইলে। যাকে অভাবহীন মনে ক'রে আতঙ্কিত হয়েছিলাম সেও যে চরম বুভুক্ষায় কাতর, তা কি কখনও ভেবেছিলাম? তোমার নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য যে কঠোর কামনার ছদ্মবেশ, তা কি আগে বুঝতে পেরেছি? তুমি বলেছিলে, 'যে প্রতিমা আমি নিজের হাতে গড়েছি তা আমার, আর কারুর নয়,' আর আমি বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে দেখেছিলাম তোমার প্রসন্নমসৃণ ললাটে নীল শিরা দপ্ দপ্ করছে, ওষ্ঠাধরে কামনার বক্র ইঙ্গিত। তুষারাবৃত মৌনগম্ভীর পবিত্র শুভ্র হিমাদ্রি হঠাৎ আগ্নেয়গিরি হয়ে উঠল; আমার দেহে পুলক লাগল। তোমাকে কি বলেছিলাম আজ মনে করতে পারছি না। শুধু মনে আছে, তোমার আত্মপ্রকাশের মহামুহূর্তে আমাকে সযত্নে আত্মগোপন করতে হয়েছিল। আমি জানতাম, তুমি পালাবে, নিজের পরিচয়ে ভয় পেয়ে পালাবে। চেয়েওছিলাম, তুমি চ'লে যাও। তুমি দূরে না গেলে তোমার এই নতুন উন্মোচন আমি সহ্য করতে পারতাম না। মন ঠিক করার আগেই ধরা প'ড়ে যেতাম। তাতে আমাদের ক্ষতি হ'ত, হিমাদ্রি।

মন ঠিক করা যে এত কঠিন তাও কি জানতাম? তুমি চাইছ; তোমাকে দিয়ে নিশ্চিহ্ন হবার পরিতৃপ্তি আমার কত দিনের স্বপ্ন, রজনীর কামনা। কিন্তু

আমার কতটুকু আর আমি আছি, হিমাদ্রি? তুমি সেদিন কেন চাও নি, যেদিন আমার দেবার অফুরন্ত সম্পদ্ ছিল; দিতে চেয়ে দেবার মত কাউকে না পেয়ে আমি যেদিন সৃষ্টির আগে দেবতার মত একা হয়ে গিয়েছিলাম? যেদিন দস্যু এসে আমায় লুঠ করল, সেদিন কোথায় ছিলে তুমি হিমাদ্রি?—যে প্রতিষ্ঠার সৌধ দেখে আজ তুমি পরিতুষ্ট, জান ত তার ভিত্তি দস্যুর হাতে লাঞ্ছিত? তুমি ত জান না হিমাদ্রি, তোমার প্রতিমার দেহে পশুর অত্যাচার নির্মম চিহ্ন রেখে গেছে? তোমার প্রতিমার গৌরবটুকুই তুমি জান, লজ্জার খবর রাখ কি?

হিমাদ্রি, তুমি কি ভেবে দেখেছ তোমার 'প্রতিমা' জননী? সে শুধু একজন পুরুষের ঘরই করে নি, তার সন্তান পেটে ধরেছে? সে সন্তান আজ সব বুঝতে শিখেছে, জানতে শিখেছে। মা-ই তার পৃথিবীতে একমাত্র সম্বল। বাপের কথা ভুলেও সে একবার মুখে আনে না, কিন্তু আমি জানি, সে তাকে ভোলে নি। পিতৃ-পরিচয়ে বঞ্চিত হবার জন্যে মনে মনে মাকে সে অপরাধী ক'রে রেখেছে! দেবকুমার ছাড়া দেববাণী নেই, হিমাদ্রি; দেববাণীর যদি আজ কোনও আসল পরিচয় থাকে, সে মা। যে মা-কে ছাড়া দেবকুমার কাউকে জানে না, যে মা তাকে পিতৃ-পরিচয়ে বঞ্চিত করেছে, তাকে অন্য একজনের স্ত্রী-রূপে সে যদি সইতে না পারে? মা-র স্বামী বাবা নয়, এ নিদারুণ দুঃখ সে যদি বইতে না পারে?

না, হিমাদ্রি, তোমাকে আমি দিতে পারব না। আমার দেবার কিছু নেই। নিতে নিতে নিঃস্ব হয়ে গেছি।

নীরব অশ্রু চাপতে গিয়ে দেববাণী নিথর নিস্পন্দ হ'ল। বাসন্তী দেবী ভাবলেন, সে ঘুমিয়ে পড়েছে। বার বার তাঁর মনে একই কথা ঘুরে বেড়াল। এত গুরুগম্ভীর বিষয় দেববাণীর কাছে অমন হাল্‌কা হ'ল [illegible]? বার বার তিনি বললেন, তোকে চিনতে পারিনি, বাণী, তোকে বুঝতে পারিনি।

আজ শীতল সকালে জানলার পাশে দাঁড়িয়ে মেয়ের কথা আবার ভাবছিলেন বাসন্তী দেবী। সঙ্গে সঙ্গে নিজের কথাও। মা হবার মত অসহায় দুঃখ আর নেই। যে সন্তানকে পেটে ধ'রে, জন্ম দিয়ে, শৈশব থেকে তিল তিল যত্নে মানুষ করতে হয়, একদিন তার পল্লবিত জীবন বিস্ময়কর অপরিচিতের রূপ ধরে। তার নাগাল মেলে না, সে এগিয়ে যায় রহস্যময় পথে, জননীর মন ক্লান্ত

নৈরাশ্যে বৃথা তার পিছু নেয়। দুস্তর কালের ব্যবধান একদা একান্ত সন্নিকটকে নিষ্ঠুর দূরত্বে দুর্বোধ্য ক'রে রাখে। এ ক্ষেত্রে হয়ত জননীর কর্তব্য সন্তানকে জীবনযাপনের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া, কিন্তু কোন্ মা সে শুভ্র ঔদাসীন্য অর্জন করতে পারে? বাসন্তী দেবী অল্প বয়সে মা হারিয়েছিলেন; বাবার কাছেই তাঁর শৈশব ও প্রথম যৌবন কেটেছে। জীবন-প্রবাহের দুরপনেয় গতিস্রোতে মা-কে যে তাঁর আঘাত করতে হয় নি তা ভেবে এত ব্যথাতেও একটু তৃপ্তি পেলেন।

তাঁর গ্রামীণ বাল্যকাল ও প্রথম যৌবনের সমস্ত স্মৃতির উপর যাঁর প্রভাব সুবিস্তৃত, সেই বাবার কথা মনে পড়ল বাসন্তী দেবীর। পঞ্চাশখানা গ্রামে তাঁর প্রতিপত্তি ছিল। বিশাল বলিষ্ঠ দেহ, বাবরি চুল পিঠ পর্যন্ত প্রলম্বিত; আয়ত নয়নে সিংহের প্রতাপ। অমন বলশালী পুরুষ সচরাচর দেখা যেত না। ছোট তালুকদার হ'লেও বিশ্বম্ভর চৌধুরীর প্রতাপ সেকালে কিংবদন্তীর রূপ নিয়েছিল। দশ-বিশখানা গ্রামে মুঘল-বংশজাত মুসলমান জমিদারের অত্যাচার চ'লে আসছিল বহু বছর; সে অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিশ্বম্ভর চৌধুরী হিন্দু মুসলমানের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিলেন। সেকালে রাজার শাসন গ্রামে ছিল শিথিল, সে শূন্যস্থান আঠার আনা পূর্ণ হ'ত জমিদারের অত্যাচারে। বিশ্বম্ভর চৌধুরী যখন জুলুমের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন একমাত্র বাহুবল ও ন্যায়বুদ্ধি সম্বল ক'রে, অনেক খণ্ড যুদ্ধ লড়তে হ'ল তাঁকে জমিদারের লাঠিয়াল, পেয়াদা ও ভাড়াটে গুণ্ডাদের সঙ্গে। এক একটা খণ্ড যুদ্ধে বিজয় তাঁর প্রতিপত্তি বাড়াল, অনুগত ভক্তদের দল পুষ্ট করল; কালে তিনি সে অঞ্চলের সর্বাধিক জনপ্রিয় নেতার সম্মানে বৃত হ'লেন। বাসন্তী দেবীর মনে আছে, কি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাভক্তি পেতেন তিনি গ্রাম্য মানুষের কাছে, কেমন ক'রে এক ডাকে শত শত লোক এসে হাজির হ'ত লাঠি হাতে, দুপুর রাতের অন্ধকারে জমিদার বাড়ীর অন্দর-মহলের মুসলমান কর্মচারী খবর দিয়ে যেত আসন্ন বিপদের।

সাতবারে এনট্রান্স পাশ করেছিলেন বিশ্বম্ভর চৌধুরী। কিন্তু ইংরেজী ভাষায় তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। নেপোলিয়নের জীবনী, গিবনের রোম্যান সাম্রাজ্যের ইতিহাস, ভিক্টর হুগো ও টলস্টয়ের উপন্যাস প্রিয়পাঠ্য ছিল বিশ্বম্ভর চৌধুরীর। বাবার কাছে ব'সে বাসন্তী শুনত এ সব বই থেকে সুদীর্ঘ আবৃত্তি। বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতা তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল, যেমন ছিল আলিপুর কোর্টে অরবিন্দের বিচারে চিত্তরঞ্জনের ভাষণ। নেহাৎ আদর্শের টানে তিনি স্বদেশীতে

যোগ দিয়েছিলেন। বলিষ্ঠ তাঁর মন দেশমাতৃপূজায় আত্মবলির মন্ত্র সহজে গ্রহণ করেছিল, কিন্তু সন্ত্রাসবাদের ভয়ঙ্কর নৃশংসতা কখনও পূর্ণ অনুমোদন করে নি। যাঁর কাহিনী দেববাণীকে বলতে গিয়ে বাসন্তী দেবী নাম উল্লেখে বিরত থেকেছেন, সেই একান্ত স্নেহের যুবকটির প্রাণান্ত হবার পর বিশ্বম্ভর চৌধুরী আর স্বদেশী করেন নি। তাঁর একমাত্র পুত্র, বাসন্তী দেবীর একমাত্র ভাই, চল্লিশ বছর বয়সে হঠাৎ মারা গেলে সংসারে তিনি একেবারে উদাসীন হয়ে গেলেন। বাসন্তী দেবীর বিবাহের পাঁচ বছর পরে ঘটল এ দুর্ঘটনা ; বিশ্বম্ভর চৌধুরী বাকী জীবন কাশীধামে কাটিয়ে পরিণত বয়সে মারা গেলেন।

বাবার কাছে মানুষ হয়ে বাসন্তীর চরিত্রে যে দু'টো গুণ দানা বেঁধেছিল তা সাহস ও সংযম। দুর্জয় পিতার কন্যা বাসন্তীকেও ভয় অনেকখানি জয় করতে হয়েছিল। বাবার কাছে দেহচর্চার বিদ্যা আয়ত্ত করেছিল বাসন্তী, দেহ ছিল তার সুগঠিত, বলিষ্ঠ। সুন্দরী ছিল না বাসন্তী ; কৃষ্ণ বর্ণ, চওড়া তেজস্বী চোয়াল, প্রশস্ত ললাট, সুগঠিত চিবুক, ছোট ছোট বুদ্ধি-দৃপ্ত চোখে তাকে সুন্দর দেখাত না, আকর্ষণীয় দেখাত। দৃঢ়-চরিত্রের ব্যঞ্জনা ছিল তার মুখে। বিশ্বম্ভর চৌধুরী সযত্নে তাঁকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। স্কুলে না গিয়েও সে শুধু ভাল বাংলাই শেখে নি, ইংরেজীও কিছু শিখেছিল। গীতা, উপনিষদ্ পড়েছিল, বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও রচনা পাঠ করেছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের সব উপন্যাস ও প্রবন্ধও পাঠ করেছিল। সবচেয়ে বড় শিক্ষা সে পেয়েছিল পিতার জীবন ও চরিত্র থেকে। পরের জীবনে চরম দুর্দিনে এ শিক্ষা বাসন্তী দেবীর ছিল প্রধান সম্বল।

যাঁর সঙ্গে তার বিয়ে হ'ল, বাসন্তী তাঁকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করল। ইংরেজ বণিকদের জাহাজী দপ্তরে তিনি কাজ করতেন ; বিয়ের তিন বছর পরে বাসন্তী কলকাতায় এল। জন্ম হ'ল দেববাণীর, দেবযানীর। তার পর হঠাৎ স্বামী মারা গেলেন। অকূল পাথারে পড়ল বাসন্তী। পিতৃকুলে তখন কেউ নেই। মৃত বড় ভাই-এর একমাত্র ছেলে মামা বাড়ী থেকে পড়ছে। গ্রামে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে পরের দাক্ষিণ্যের আশ্রয় নিলে দু' কন্যার জীবন অন্ধকার। এ দুঃসময়ে যে দুঃসাহসে বাসন্তী জীবন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হ'ল তা পিতার কাছে পাওয়া উত্তরাধিকার। স্বামীর সামান্য সঞ্চিত অর্থ নিপুণ সুবুদ্ধিতে বাসন্তী দু'টি ইংরেজ বণিক্‌চালিত কোম্পানীর শেয়ারে বিনিয়োগ করল। সরোজ-নলিনী-বিদ্যালয়ে ট্রেনিং নিয়ে কর্পোরেশন স্কুলে শিক্ষকতার কাজ পেল। নিজের

সবটুকু শক্তি নিযুক্ত করল মেয়েদের জীবন গঠনে। যাতে নিরানন্দ পরিবারের জীবন-রোধী আবহাওয়া তাদের বৃদ্ধি ও বিকাশকে ব্যাহত না করে সেজন্য বাসন্তী নিজের দুঃখ ভুলে, বা লুকিয়ে রেখে, হাস্যে-কৌতুকে আনন্দে মুখর হ'ল। ছোটবেলা থেকে পিতার কাছে নিঃসংস্কার হবার শিক্ষা সে পেয়েছিল। অসঙ্কোচে স্বদেশী যুগের নব-দীক্ষিত ছেলেদের সঙ্গে সে মিশত; গভীর অন্ধকার রাত্রে বাবা যখন বলতেন, 'অচেনা পায়ের শব্দ কানে আসছে, বাসন্তী, যা ত মা, বাইরে একবারটি ঘুরে আয়', লাঠি নিয়ে নির্ভয়ে সে যেত বেরিয়ে। মেয়েদের সঙ্গে সেই বাসন্তী আবার নতুন ক'রে জীবন শুরু করল। তাদের মতই সে হাস্যময়ী; কৌতুকে উচ্ছল; তাদের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চলল তার আত্ম-শিক্ষা। সাতাশ বছর বয়সে বাসন্তী ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করল; পঁয়ত্রিশ বছরে ইণ্টার-মিডিয়েট। অসামান্য বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতা নিয়ে পাশ করার চেয়ে শিখল সে অনেক বেশী। মেয়েদের সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রে নিজেও সঙ্গীত-শাস্ত্রে মনোনিবেশ করল; কেউ প্রশ্ন ক'রলে বলত, নইলে ওরা শিখছে কি না বুঝব কেমন ক'রে? মেয়েদের কাছে বিজ্ঞান পড়ল এক আধটু বাড়ীতে ব'সে যাতে অন্তত সাধারণ বৈজ্ঞানিক সংলাপে মূর্খের ভূমিকা না গ্রহণ করতে হয়। দেবযানী যখন ডাক্তারী পড়তে গেল, মানুষের কঙ্কাল ও অস্থি নিয়ে তার চেয়ে যেন বাসন্তীরই উৎসাহ বেশী।

বাসন্তী দেবী ভাবছিলেন, বাসন্তীর সে কাল আনন্দেই কেটেছিল। দু'টি সুস্থ সবল সুরুচি সুবুদ্ধি বালিকার সঙ্গে জীবন মিলিয়ে বাসন্তীও যেন নতুন ভাবে নতুন রং-এ আর একবার গ'ড়ে উঠছিল। স্বামীর অভাব ব্যথা দিয়েছে, বিহ্বল করে নি। বৈধব্যকে শাস্তি মনে হয় নি, সংযমের অবিরাম পরীক্ষা মনে হয়েছে; যাতে উত্তীর্ণ হবার আনন্দটুকুও কম লাভ নয়। অন্তরের কোন নিভৃত কন্দরে মাঝে মাঝে একটি স্নিগ্ধ-গম্ভীর সুকুমার যুবকের মুখচ্ছবি ভেসে উঠেছে; বাসন্তী তাকে বলেছে, তুমি দেশের জন্য প্রাণ দিয়ে শহীদ হয়েছ, আমিও, দেখ, কত শুদ্ধ-সংযত জীবনযাপন করছি। সংসারের কদর্য কোলাহলে তাকে যে বেশী জড়িয়ে পড়তে হয় নি, স্বামীর কাছে অন্তরের শূন্য ধরা পড়বার মত দীর্ঘ বিবাহিত জীবন যে তাকে যাপন করতে হয় নি, শুদ্ধাচার কৃচ্ছ্রসাধন, আত্ম-সংযম ও আত্মশিক্ষায় মধ্যে বছরগুলি যে তার কাটছে, তাতে সে মোটামুটি তৃপ্ত ছিল। অনেক আশা নিয়ে মেয়েদের মানুষ করছিল বাসন্তী, অনেক অনুচ্চারিত মৃদু-ঝঙ্কৃত স্বপ্নে।

যৌবনে পা দিয়ে দেববাণী ও দেবযানী আলাদা পথের কন্যা হ'ল। দেববাণী সুস্থ, সবল, সুগঠিত; দেবযানী নিরোগ হলেও কৃশ, নরম, কোমল। দেববাণী গম্ভীর, চিন্তাশীল, স্বল্পবাক্; দেবযানী কৌতুকময়ী, রঙ্গিণী, চটুল। দেববাণীর আকর্ষণ বৃহতের দিকে, দেবযানীর সার্থকের দিকে। বাসন্তীর অসীম বিস্ময় ওদের দেখে। ওদের মনের সবটুকু রহস্য লোভীর মত তার কাম্য, ওরা পৃথিবীর চেয়ে বিরাট, জীবনের চেয়ে দুর্জ্ঞেয়। দু'জনেই কলেজে বিজ্ঞান পড়ে, কিন্তু দেববাণীর লক্ষ্য বৈজ্ঞানিকের আজন্ম সাধনা; দেবযানীর ডাক্তার হয়ে আশু প্রতিষ্ঠা। বাসন্তী তাদের বন্ধু-সংগ্রহে বাধা দেয় নি, মেয়েদের রুচি ও নিষ্ঠার ওপর বিশ্বাস তার দৃঢ়। বাড়ীতে কয়েকটি ছেলেমেয়ে যেত আসত, তাদের প্রত্যেককে কত স্নেহে বাসন্তী আপন ক'রে নিয়েছিল। তার বয়স বাড়ছিল, দেহের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ছিল; চুলে পাক ধরল একদিন; বাসন্তী নিজের অজ্ঞাতেই বাসন্তী দেবী হ'ল। সেদিকে তার নজর নেই। বিকাশমান জীবনের বিচিত্র বিস্ময় তাকে বিহ্বল ক'রে রেখেছিল।

দেববাণী রসায়নে অনার্স নিয়ে চতুর্থ বর্ষে উঠল; দেবযানী গেল মেডিকেল কলেজে। এবার বাসন্তী দেবীর মনে প্রথম সন্দেহের ছায়া নামল। ছোট্ট সে ছায়া, মানুষের হাতের চেয়ে বড় নয়, তবু আতঙ্কিত হলেন বাসন্তী দেবী। একদিন হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল, দেববাণী সত্যি বড় হয়েছে। দেহে তার সুসজ্জিত যৌবন-শ্রী। কিন্তু দেহের চেয়েও মনে সে বেড়েছে বেশী। তার আশৈশব গাম্ভীর্যে মিশেছে কেমন এক অভিনব ঔদাসীন্য; জীবনকে সে যেন হঠাৎ যথেষ্ট ভালবাসছে না। বাসন্তী দেবীর মনে হ'ল, দেববাণীর গাম্ভীর্য ওপরের আবরণ; নগ্ন অন্তরে সে আলোড়িত, বিক্ষুব্ধ।

জীবনে প্রথম ভয় পেলেন বাসন্তী দেবী।

মেয়েদের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্বে লজ্জা, সঙ্কোচের আবরণ ছিল না। কি দেববাণীকে প্রশ্ন ক'রে সংশয় মিটল না বাসন্তী দেবীর; বাড়ল। বুঝলে দেববাণী নিজেই জানে না কোন্ ঝড়ে সে উদ্বেলিত; শুধু জানে, তার তর অন্তরে সমুদ্রের গর্জন।

পুরুষহীন সংসারে অন্তরঙ্গ পুরুষ আত্মীয় ছিল বাসন্তী দেবীর ভাইে গৌতম। পিতৃবংশের একক প্রদীপ। গৌতম হস্টেলে থেকে কলেজে প দেবযানীর সমবয়সী, দু-বোনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। হাস্য-চঞ্চল রঙ্গ-রস-প্রিয় গৌ এ বাড়ীর বাসিন্দা না হ'লেও সংসারের একজন। সপ্তাহ-শেষ সাধারণ

গৃহে কাটায়, সে এলে বাড়ীর আনন্দিত আবহাওয়া অধিকতর হাল্কা হয়ে ওঠে।

বাসন্তী দেবী গৌতমের শরণাপন্ন হ'লেন।

"বাণীর মধ্যে নতুন কিছু দেখতে পাস্, গৌতম ?"

"পাই, পিসীমা।"

"কি, বল্ ত ?" উৎসুক হলেন বাসন্তী দেবী।

"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে।"

"তুই-ও রঙ্গ-রস করবি ?" চিন্তাকুল বাসন্তী দেবী চিৎকার ক'রে উঠলেন।

"সে কি পিসীমা!" বিস্মিত হ'ল গৌতম। "তুমি যে ভয়ানক সীরিয়স হয়ে উঠলে। এমন ত তোমাকে কখনও দেখিনি!"

"বাণীর কি যেন হয়েছে, গৌতম।" সামলে নিলেন বাসন্তী দেবী নিজেকে। "আমি জানি, ওর মনে ঝড় বইছে।"

"বইতে দাও।"

"কিন্তু কিসের ঝড় তা ত জানি না।"

"এ বয়সে মনে ঝড় বয়েই থাকে, পিসীমা। সে ঝড়ের সংবাদ আবহাওয়া দপ্তরও জানতে পারে না। তা নিয়ে তোমার ভাবিত হবার কারণ নেই, পিসীমা।"

"কারণ আছে, গৌতম! বাণী সহজ মেয়ে নয়।"

"অত্যন্ত কঠিন।"

"তোর কি মনে হয় কাউকে ভালবেসেছে ?"

"কে ? বাণীদি ? কে সে সৌভাগ্যবান্ পুরুষসিংহ, পিসীমা ? আমি ত জানি, বাণীদির সন্ধ্যা এখনও প্রদীপহীনা। কিন্তু, জান ত, 'কে বোঝে কাহার মন! অবোধ হিয়া, দিতে পেরেছিল বাণী নিঃশেযিয়া'..."

"থাম্, থাম্।" বাসন্তী দেবী হেসে ফেললেন। "তোর কাব্যচর্চা বন্ধ রাখ।"

"রাখলাম।"

"বাণীর কিছু একটা হয়েছে।"

"নিশ্চয় হয়েছে।"

"কি ক'রে জানলি, তুই ?" আবার উৎসুক হলেন বাসন্তী দেবী।

"তুমি যখন বলছ। তুমি ত মিথ্যে বল না।"

"কিন্তু কি হয়েছে তা যে জানি নে।"

"বাণীদিকে জিজ্ঞেস করেছ ?"

"করেছি। কিছু বলে না।"

"এই না-বলা বাণীর ঘন-যামিনী মাঝে, তাহলে, পথ কোথা পিসীমা ?"

"তুই ওকে জিজ্ঞেস কর।"

"করতে পারি। কিন্তু যা তোমাকে বলে নি, তা আমায় কেন, ভগবান্‌কেও বলবে না।"

"কি জানি ? শত হ'লেও আমি মা। বয়সের, কালের বিচারের ব্যবধান।"

"কৈ ? এসব ত কখনও জানতে পারিনি ?"

"মা হবার বড় দুঃখ রে, গৌতম। সন্তানরা তার কোন খবর রাখে না।"

বাসন্তী দেবীর গলা ধ'রে এল। বিস্মিত হ'ল গৌতম। পিসীমার বুকে যে ব্যথার সুর বাজে, আগে কোনও দিন সে টের পায় নি।

সেদিনই রাত্রে বাণীকে পাকড়াও করতে গেল গৌতম। বাণী রেডিওর কাছে ব'সে বেহালা শুনছিল। গৌতম এসে পাশে বসল। দেখল, বাণী ডুবে গেছে সুরের সমুদ্রে। 'দেশ' বাজছে বেহালার করুণ তারে। বাণী দেশ-দেশান্তর পেরিয়ে কোন্ ব্যথার জগতে চ'লে গেছে ; চোখে দু' ফোঁটা অশ্রু, মুখ অব্যক্ত বেদনায় বর্ষাসন্ধ্যার পদ্মকুঁড়ির মত আবেগে অস্থির।

চুপ ক'রে বসে রইল গৌতম। বাণী তাকে লক্ষ্য করল না। এক সময় সে উঠে গেল।

বাসন্তী দেবী সেলাই করছিলেন।

"পিসীমা!" গৌতম এসে পাশে বসল।

কল বন্ধ ক'রে জিজ্ঞাসু চোখে চাইলেন বাসন্তী দেবী।

"বাণীদির ব্যাধি বুঝলাম।"

"কি রে ?"

"সুর।"

"সুর ?"

"ওকে সুরের অসুরে ধরেছে।"

"তার মানে ?"

"ব্যস্। ঐ পর্যন্ত। আর আমি কিছু বলব না। সাবধান হ'য়ো।"

"ব্যাপারটাই বুঝলাম না, সাবধান হ'ব কি ক'রে ?"

"বুঝবে, শীগগির বুঝবে। দেবযানী কিছু বলে নি ?"

"না!"

"ও মরা মানুষের কঙ্কাল আর তাজা ছোকরাদের জঞ্জাল নিয়ে এত ব্যস্ত, অন্যদিকে তাকিয়েও বুঝি দেখে না।"

গৌতমের কথা বিস্ময়কর লেগেছিল। কিন্তু অচিরে তার নির্মম সত্যতা বাসন্তী দেবী টের পেলেন। তখন সুরের অসুর দেববাণীকে গ্রাস করেছে, রাহু যেমন চাঁদকে গ্রাস করে। যে-দেববাণীকে কেউ ধরতে পারে নি, সে বুঝি এমনি গ্রাসিত হবারই অপেক্ষায় বসেছিল! কোনও হিল্লোলে যে দোলে নি, প্রভঞ্জনে উৎপাটিত হ'ল। বাসন্তী দেবী কিছুতেই তাকে বাঁধতে পারলেন না। জেনে, বুঝে, মৃত্যুর মধ্যে জীবন-জ্বালায় সে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার সেই উন্মত্ত প্রেমের ভয়াল হিংস্রতা আজও বাসন্তী দেবীকে ভয় পাইয়ে দেয়। তিনি যে কঠিন সংযমে নব যৌবনে প্রথম ভালবাসার উত্তাপ হজম করেছিলেন, কোন্ আদিম ঐতিহাসিক পথে আত্মজার জীবনে তার এমন দুঃসহ অদম্য পরিণতি? এ প্রশ্নের জবাব বাসন্তী দেবী আজও পান নি।

মসৃণ মেঝেয় বিদেশী উপানৎ অপরিচিত লঘু শব্দ তুলতে বাসন্তী দেবীর অতীত-চারণ ক্ষান্ত হ'ল। মুখ ফিরিয়ে দেখতে পেলেন আইরীণ।

"এস, ঘরে এস," সহাস্যে এগিয়ে এলেন বাসন্তী দেবী। বারান্দা পেরিয়ে আইরীণ ঘরে এল। চেককাটা সার্জের ফ্রক পরেছে আইরীণ, চুল শিথিল, ওষ্ঠাধর অরক্তিম। পায়ে মোজা নেই, সবল মাংসল পা হাঁটু পর্যন্ত অনাবৃত। অবাক হয়ে দেখছিল সে দেববাণীর মাকে। স্নানান্তের শুদ্ধ দেহে ম্লান বিষণ্ণ প্রশান্তি দেখে মুগ্ধ হচ্ছিল। আমন্ত্রণ পেয়ে আইরীণ চেয়ারে বসল। বাসন্তী দেবী তাঁর পানে তাকিয়ে সস্নেহে মৃদু হাসলেন।

"বাণী বেরিয়ে গেছে?"

"অনেকক্ষণ।"

"কখন ফিরবে?"

"একেবারে বিকেলে।"

"আজও ওর য়ুনিভারসিটিতে বক্তৃতা আছে, না?"

"আজকেই শেষ বক্তৃতা।"

"আপনার একা-একা লাগছে নিশ্চয়?"

"আমি বুড়ো মানুষ, আমার আবার একা-একা কি?"

"নতুন শহর, জানা-শোনা কেউ নেই, একা-একা লাগবে না ?"

"বহুদিন তো একা আছি, মা। দুই মেয়ে, দু'জনেই থাকে অনেক দূরে। একটি মাত্র নাতি, তাকেও কাছে পাইনে। একা আমার অভ্যেস হ'য়ে গেছে। ভালই লাগে।"

"ভাল লাগে ?" বিশ্বাস করল না আইরীণ।

"লাগে। জীবনে চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব থাকলে একাকীত্বের সমস্যা। না থাকলে, একা জীবন মন্দ নয়। তা ছাড়া, মানুষ আসলে নিঃসঙ্গ। নিজের মধ্যে সে একাই।"

"এ তো আপনাদের ভারতীয় দর্শন। আমার কিন্তু একা থাকতে একটুও ভাল লাগে না।"

"তুমি কেন একা থাকবে, মা ? তোমার বয়সে একা-একা ভাল না লাগবারই কথা।"

"কিন্তু বাণীকে তো দেখেছি আমেরিকায়! সে দিব্যি একা থাকত। কোনও কষ্ট হ'ত না। নিজেকে নিয়ে তার বড় একটা সমস্যা ছিল না।"

"ওর যে একা না থেকে উপায় ছিল না।"

"কেন থাকবে না ? ইচ্ছে করলেই একাকীত্ব ঘুচিয়ে দিতে পারত বাণী। আমাদের দেশে ওর অনেক স্তাবক ছিল।"

"ও কি কারুর সঙ্গে মিশত না ?"

"মিশত, কিন্তু ওপর ওপর। কাজের, জীবনযাত্রার প্রয়োজনে যতটুকু না মিশলে নয়।"

"তোমাদের সঙ্গে তো মিশত খুব। অনেক চিঠিতে তোমাদের কথা লিখত।"

"হ্যাঁ। আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়েছিল।" একটু থেমে বলল, "বাণীর মত মেয়ে আমি আর দেখিনি।"

বাসন্তী দেবী নীরবে হাসলেন।

"প্রথম প্রথম ওকে আমার আশ্চর্য লাগত। জীবনকে এমন নীরস ক'রে একটি যুবতী মেয়ে কি ভাবে গ্রহণ করতে পারে ভেবে পেতাম না ; ঘর আ লেবরেটরী, কলেজ আর লাইব্রেরী, এ ছাড়া ওর জীবনে আর কিছু ছিল না পাথরের মত শক্ত প্রতিজ্ঞা নিয়ে ও কেবল সাধনা ক'রে যাচ্ছিল মাসের প মাস। ছেলেরাও কত সাধত, একদিনও কারুর সঙ্গে কোন আনন্দে যে

দিতে দেখিনি। কোনও দিন আমাদের সঙ্গে পর্যন্ত একটা সিনেমায় যায় নি। একমাত্র বছরে দুটো-একটা কনসার্টে আমরা ওকে নিয়ে যেতে পেরেছিলাম।”

“সঙ্গীত ওর বড় প্রিয়।”

“তা কি জানি না? কিন্তু ওর মধ্যে আশ্চর্য ছেলেমানুষি ছিল। আমাদের কাছে মাঝে-মধ্যে দু'একটা দিন কাটাত। তখন ওর সঙ্গে আমার ছেলেমেয়ের খেলা দেখলে মনে হ'ত, ওদেরই মত বাণীও একটি শিশু।”

বাসন্তী দেবী হাসলেন।

“একমাত্র যার সঙ্গে ও কখনো-সখনো বার হ'ত, সে হিমাদ্রি।”

বাসন্তী দেবী উৎসুক হ'লেন।

“কিন্তু হিমাদ্রি তো পুরুষ নয়, পর্বত। অমন গম্ভীর মানুষ জীবনে দেখিনি। ঝুলঝুল প্যান্ট, বোতামহীন কোট, ফিতে খোলা জুতা: এই ছিল হিমাদ্রির পরিচয়।” হেসে গড়িয়ে পড়ল আইরীণ। “মাথায় এক ঝাঁক চুল, বোধহয় তিন মাসে একবার কাটত। বড় বড় চোখে পুরু কাচের চশমা।”

“দেববাণীর বড় উপকারী বন্ধু।”

“জানি। প্রথম দিন ওকে দেখে রীতিমত ভয় পেয়েছিলাম। বাণীকে বললাম, এই অদ্ভুত সাধুটিকে কোথা থেকে ধ'রে আনলে? দেববাণী এমন ভাব দেখাল যেন আমি মহাপাপ করেছি।”

“হিমাদ্রি বড় ভাল ছেলে।”

“আর একটু কম ভাল হ'লে খুশি হতাম।”

বাসন্তী দেবীর ইচ্ছে হ'ল আইরীণের কাছ থেকে যতটুকু পারেন দেববাণীর কথা জেনে নেন। কিন্তু সম্মানে বাধল। সংলাপের গতির সঙ্গে সতর্ক পা ফেললেন।

আইরীণ বলল, “আমরা যারা অনেক পেতে অভ্যস্ত, অনেক আরাম, অনেক সুযোগ আমাদের জীবন-সংগ্রামকে শিথিল করেছে। যারা এখনও সামান্য পেয়েছে, অনেক পেতে চায়, পাবার জন্যে তারা যে কত কষ্ট স্বীকার করে, আমরা বুঝতে পারি নে। আমার স্বামী আফ্রিকায় ছিলেন কয়েক মাস। তিনি দেখেছেন শুধু স্কুলে পড়বার অদম্য আগ্রহ নিগ্রো যুবকদের পাঁচ শ' হাজার মাইল পথ হাঁটায়।”

নীরব বাসন্তী দেবীর দৃষ্টিতে উৎসাহিত মনোযোগ লক্ষ্য ক'রে আইরীণ বলল, “কিন্তু আমাদের ঠাকুর্দাদের জীবন অন্যরকম ছিল। আমার ঠাকুর্দার

বয়স তিরাশি, এখনও শক্ত সমর্থ, সোজা। নিজের ফার্ম আছে টেক্সাস রাজ্যে, সেখানে থাকেন। তাঁকে দেববাণীর গল্প বলেছিলাম। মন দিয়ে শুনে বার্ধক্যের আকর্ষণীয় উদাস হাসি হেসে বললেন, এখন তোমরা জীবনের সবটুকু সুবিধে হাতের কাছে সাজানো পাচ্ছ, তাই অবাক লাগছে। আমাদের সময়েও জীবন দোকানের শো-কেসে সাজানো এমন ফরমাসী উপভোগ ছিল না। জীবন ছিল বীরভোগ্য, তাকে ল'ড়ে জয় করতে হ'ত।" একটু থেমে আইরীণ বলল, "আমার ঠাকুর্দার বাবা গরীব ছিলেন ; ছোট্ট দোকানের আয়ে সংসার চলত। বাল্যকালে ঠাকুর্দাকে দোকান দেখবার ভার নিতে হ'ল। সারাদিন দোকান দেখে রাত্রে নিজে নিজে পড়াশোনা করতেন। একদিন দেখা গেল তিনি নিখোঁজ। তিনশ' মাইল হেঁটে অন্য শহরে গিয়ে উঠলেন। রাত্রে হোটেলে বাসন ধোয়ার কাজ নিয়ে দিনে স্কুলে ভর্তি হ'লেন। স্কুলে এত ভাল রেকর্ড দেখালেন যে তাঁকে বৃত্তি দেওয়া হ'ল। এমনি ক'রে স্কুল পেরিয়ে কলেজ, তার পর হার্ভার্ড ল' স্কুলে আইন পাশ ক'রে ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নী হয়েছিলেন। সবাই খুব সম্মান করেন তাঁকে এখনও।"

"তোমার বাবা কোথায় আছেন?"

"বাবা ওয়াশিংটনে সরকারী কাজ করেন। ইঞ্জিনীয়র তিনি। আমার একটি ভাই আছে, মাইকেল। সে ফরেন সার্ভিসে। এখন হাভানায়।"

"সে কোন্ দেশ?"

"দক্ষিণ আমেরিকায় কুবা দেশ আছে, আমাদের দেশের কাছাকাছি। তার রাজধানী হাভানা।"

"তোমার মা-র কথা ত বললে না?"

"আমার মা থাকেন নিউ ইয়র্কে। বাবার সঙ্গে অনেক বছর আগে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।"

"তোমার ভাই বিয়ে করেছেন?"

"ওরও একই অবস্থা। আমাদের দেশে আজকাল বেশ কম বয়সে বিয়ে করার রীতি। তাই বোধহয় অনেক বিয়ে ভেঙে যায়। মাইকেল একুশ বছরে বিয়ে করেছিল। ছাব্বিশ বছরে ওদের ডিভোর্স হয়ে গেছে।"

"সন্তান হয়েছিল?"

"না।" একটু হেসে আইরীণ বলল, "দেখছেন তো, আমাদের পরিবারে বিয়ে টেঁকে না। কেবল আমারই টিঁকে আছে।"

"তুমি তো খুব লক্ষী মেয়ে। তোমার বিয়ে জীবনভোর টি'কবে।"

"অবশ্য লক্ষী মেয়েদের বিয়েও ভেঙে যায়।" আইরীণ নিজের মনে বলল, "কেন যায়, কেউ বলতে পারে না। প্রেম ফুরিয়ে যায়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম না থাকলে সে বিয়ে ভাঙ্গবেই।"

"আমাদের দেশে ভাঙ্গে না।"

"কেন? দেববাণীর ত ভেঙ্গে গেছে।" সরল ভাবে বলল আইরীণ।

"বাণীর বিয়েটা অন্য ব্যাপার।" কণ্ঠস্বর সামান্য কঠিন হ'ল বাসন্তী দেবীর।

"অন্য ব্যাপার কেন?"

"ওকে আমি বিয়ে ব'লেই মানিনি কোনও দিন।"

"আপনি না মানলেও বাণী মেনেছিল," আইরীণের স্বর শুকনো শোনাল। "ওর একটি ছেলেও আছে।"

"কি তুমি শুনেছ জানি নে", পাথুরে গলায় বললেন বাসন্তী দেবী। একটা দুষ্টু লোক নির্বোধ সরল পেয়ে বাণীকে সম্মোহিত করেছিল।"

"সঙ্গীতে।"

"সঙ্গীত না হাতী। বাণী কোনও পুরুষের নিকট সান্নিধ্যে তার আগে আসে নি। কোন পুরুষের দাগ পড়ে নি ওর মনে। সমবয়সীরা বলত, পুরুষ বাণীকে বিকর্ষণ করে। এমন সময় হঠাৎ এ লোকটা ওকে সম্মোহিত করল। বাণীর সঙ্গে তার রুচির, কৃষ্টির, শিক্ষার, পরিবেশের, মূল্যবোধের কোন মিল ছিল না। ওর ভাগ্যের দুর্বিপাক, তাই অমন মারাত্মক ভুল ও ক'রে বসল। অবশ্য ভুল ভাঙ্গতে দেরী লাগল না। বছর না যেতেই বাণী বুঝল নরকে পা দিয়েছে ও। তবু পাঁচ বছর তাকে সুপথে ফিরিয়ে আনবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করল। যখনই আমি বলতাম, বাণী, তুই চ'লে আয়, ও উত্তর দিত, আর কিছুদিন দেখি মা। হয় ত পারব।"

"তাই নাকি?"

"ওকে নিয়ে আমাদের সবার কত উচ্চাশা ছিল। তারও চেয়ে উঁচু ছিল ওর নিজের জীবন-স্বপ্ন। সে সব ধূলিসাৎ ক'রে একটা দানবের কু-পথ জীবনকে সু-পথে ফিরিয়ে আনবার অসম্ভব সাধনায় বছরের পর বছর কাটিয়ে দিল। ওর মুখে তখন তাকাবার শক্তি ছিল না আমাদের। পৃথিবীর সমস্ত ব্যথা, যন্ত্রণা ওর মুখে জ'মে উঠত; তবু হার মানতে চায় নি বাণী। হার মানল যখন ওর

ছেলের জীবন সংশয়াপন্ন, আর তখনও সে লোক কুৎসিত জীবনের বিকৃত নেশায় উন্মত্ত। সব কথা তোমাকে বলা যায় না, ব'লে লাভও নেই ; কিন্তু সন্তানকে বাঁচাবার দায় না থাকলে বাণী সে নরক ছাড়ত না, ওখানেই প'চে মরত।"

"বাণী ওর কথা কিছু কিছু আমায় বলেছে।"

"আমাদের দেশে মেয়েদের প্রধান আদর্শ স্বামীর ঘর আলোকিত করা। নারী-জীবনের চরম বিকাশ বলতে আমরা তাই বুঝি। আজ মেয়েদের জীবনে অন্য অনেক সুযোগ এসেছে। তারা কর্মজীবনে আনন্দ, সম্মান, প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। তথাপি, প্রাচীন দেশ আমাদের, পুরাতন ভাবধারা সহজে হার মানতে চায় না। স্বামী-বর্জিতা নারী আমাদের সমাজে এখনও সম্মান পায় না। বাণী যতই বড় হোক না কেন, যত সম্মানই পাক না কেন দেশে-বিদেশে, ও যে স্বামীকে ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছে এ লজ্জা ওর ঘুচবে না ; নিজের কাছেই ঘুচবে না।"

"আমার কিন্তু তা মনে হয় না," আইরীণ সতর্ক বিশ্বাসে ধীরে ধীরে বলল। "মাপ করবেন, আপনার মেয়েকে বোধ হয় আপনি নিজের মন দিয়ে বিচার করছেন। আমার ধারণা, আপনার ভুল হচ্ছে। বাণী তার ভুল-বিবাহের লজ্জা কাটিয়ে উঠেছে, আমার বিশ্বাস। প্রথম ওর সঙ্গে যখন বন্ধুত্ব হ'ল, বিয়ে নিয়ে ওর লজ্জাই শুধু ছিল না, ভয়ও ছিল অনেক। মরণাপন্ন ছেলেকে নিয়ে যখন বাণী আপনার কাছে ফিরে এল, স্বামীকে ত্যাগ করবার সঙ্কল্প তখনও তার ছিল না। সে লোকটা অমন ভয়ংকর ভাবে ওর সর্বনাশ করতে না এলে ত্যাগ হয়ত বাণী করত না। ওর কথায় তাই তো আমার মনে হয়েছে। ছেলে সেরে উঠলে ওর মনে হ'ল, নিজের পায়ে দাঁড়াবার ব্যবস্থা করা সবার আগে প্রয়োজন। আপনার সাহায্যে তা .ম্ভবও হ'ল। সমস্ত বিপদ থেকে আড়াল ক'রে রাখলেন আপনি ওকে, প্রায় জোর ক'রে পড়া শুরু করিয়ে দিলেন। তখনও ও ভাবে নি, স্বামীকে ডিভোর্স করবে। কিন্তু সে লোকটা ভয় পেয়ে গেল। ভাবল, বাণী তার সকল কু-কাজের কথা সবাইকে ব'লে দেবে, আর আপনারা হয় ত পুলিশেই খবর পৌঁছে দেবেন। তখন মরিয়া হয়ে সে বাণীর পেছনে লাগল। সে সব ভয়ংকর বীভৎস কাহিনী আমি ওর কাছে শুনেছি। তার ক্রূর নিষ্ঠুর নীচ আক্রমণ বাণীর আত্ম-প্রতিষ্ঠার সংকল্পকে দৃঢ় করল। আপনি আশ্চর্য সাহস ও সংকল্প নিয়ে ওর পেছনে দাঁড়ালেন। এর আগে পর্যন্ত বাণী স্বামীকে ঘৃণা করে নি, এবার করল। স্বামীর অনেক দোষ ছিল, কিন্তু তার গুণও ছিল। তার অসামান্য সঙ্গীত-প্রতিভা বাণীকে শত দুঃখে, শত

ব্যথায়ও টানত, তার বলিষ্ঠ দেহের জান্তব তেজে মাদকতা ছিল ; তার সর্বনাশা জীবনের কুটিল অন্ধকারে কিছু লজ্জাজনক আকর্ষণও ছিল। এ ব্যথার টান, এ আকর্ষণ দেববাণী কাটিয়ে উঠতে পারত না, যদি সে-লোকটা ওর বেঁচে উঠবার মরিয়া প্রচেষ্টার ওপর অমন হিংস্রতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে না পড়ত। তার নৃশংস উৎপীড়ন দেববাণীর শেষ মোহটুকু ছিন্ন করল। এবার তার বুক ভ'রে গেল ভয় ও ঘৃণায়। যতদিন দেববাণী কলকাতায় ছিল, তার বিশ্ববিদ্যালয়ে সসম্মানে পরীক্ষা-পাশ ও গবেষণায় সিদ্ধিলাভ, কলেজে চাকরি ও উন্নততর গবেষণার বছরগুলি, যার মধ্যে সে মুক্তি পেল স্বামীর কবল থেকেই শুধু নয়, স্বকৃত মহা-ভুলের কবল থেকেও, ততদিন ঐ ভয় ও ঘৃণা তাকে ঘিরে রেখেছিল।"

বাসন্তী দেবী অখণ্ড মনোনিবেশে আইরীণের কথা শুনে গেলেন। সব কথার অর্থ বুঝতে পারলেন না।

"বিদেশে গিয়ে দু'টোই তার প্রায় কেটে গেছে। ঘৃণা কেটেছে আমি নিশ্চয় ক'রে জানি—ওর মন আবার নির্মল, শুভ্র হয়েছে। ভয় সবটা গেছে কিনা জানি নে, তবে অনেকখানি না গেলে ভারতবর্ষে আবার ও ফিরে আসত না। আমার মনে হয়, সে বিবাহের প্রভাব ওর মন থেকে স'রে গেছে। মুক্তি পেয়েছে দেববাণী।"

বাসন্তী দেবী খুশি চেপে বললেন, "হয়ত ওকে আমার চেয়ে তুমি ভাল বুঝতে পার…"

"আমি বিদেশী মেয়ে, তাই অনেক কথা আমাকে ও প্রাণ খুলে বলতে পারে যা নিজের কাউকে বলতে ওর বাধে। দশ বছর বিদেশে থেকে ওর মন, মনন বদলে গেছে। আগেকার অনেক কি… সংস্কার, বাধা-নিষেধ কেটে গেছে ওর। জীবনকে বড় পরিবেশে বড় তাৎপর্যে দেখতে শিখেছে।"

"তোমার কি মনে হয়, আইরীণ, ওর বাকী জীবন এমনি কাটবে?" সাবধানে বললেন বাসন্তী দেবী।

"অর্থাৎ আবার ও বিয়ে করবে কিনা? এ প্রশ্ন আমি অনেকবার করেছি। ঠিক জবাব পাই নি।"

বাসন্তী দেবীর ইচ্ছে হ'ল হিমাদ্রির কথা জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু সংকোচ লাগল। আইরীণ নিজেই সে প্রসঙ্গ তোলে কিনা তার অপেক্ষায় রইলেন।

একটু থেমে আইরীণ নিজেই বলল, "বিয়ে করবার লোক ওর আছে। কিন্তু ওর নিজের মনে সংশয় কাটে নি।"

"কিসের সংশয় ?"

"এ কালের সংশয়। যে সংশয়ে আমাদের প্রত্যেকের মন বিদ্ধ।"

"কি সে ?"

"নিজেকে না-জানার সংশয়। কি চাই, কতখানি চাই, কোথায় যাচ্ছি, না-জানার সংশয়। দেববাণীর মনে তিনটে সত্তায় সংঘাত চলছে।"

"কিসের সংঘাত ?" বাসন্তী দেবী শূন্যগর্ভ প্রশ্ন করলেন।

"দেববাণী বৈজ্ঞানিক। দেববাণী নারী। দেববাণী মা। এ তিন সত্তার সংঘাত। যতদিন এ সংঘাত না মিটবে, বিজ্ঞান ও মাতৃত্ব ছাপিয়ে নারীর দাবী প্রতিষ্ঠা পাবে, ততদিন, আমার ধারণা, ওর জীবন এমনি চলবে।"

সাত

গাড়ী ফটক পেরিয়ে রাস্তায় নেমে পায়ের মৃদু চাপে ত্বরিৎ-গতি হয়ে কিছু-ক্ষণ চলল, দেববাণী বা সরোজা কেউ কথা কইল না। দেববাণীর দৃষ্টি সড়কে, সরোজার রাস্তা-ঘর-বাড়ী-মানুষ-আকাশ-মিলিত অর্থহীন শূন্যে।

এক সময় সরোজা তীক্ষ্ণ চাপা হেসে উঠল। বলল, "আপনি নিজের ইচ্ছার দড়িতে অন্যকে বাঁধতে এত উৎসুক কেন?"

দেববাণী মৃদু হাস্যে জবাব দিল, "ইচ্ছে নামক শক্তি ব্যবহারে ধারাল হয়। অনেক বছর হয়ে গেছে, ইচ্ছে ছাড়া জীবন-গাড়ী চালাবার অন্য তেল নেই আমার। তাই এ বস্তুর ব্যবহারে খানিকটা এক্সপার্ট হয়েছি।"

"আপনার আত্মবিশ্বাস দেখলে রাগ হয়।"

"ভুল বললেন। আশ্চর্য লাগে।"

"তা লাগে। কিন্তু রাগও হয়।"

"বিশ্বাস কথাটা আমরা বড় সহজে ব্যবহার করি। যেমন, বলি 'বন্ধু'। দু'দিনের আলাপ, বলি, আমার বন্ধু। তেমনই, বিশ্বাস। ভেবে দেখুন, জীবনে আমরা সত্যিকারের কিসে বিশ্বাস করি!"

"আপনি আর কিছুতে না করুন, নিজের ক্ষমতায় নিশ্চয় করেন।"

"ক্ষমতায় নয়। ওখানে আপনার ভুল হ'ল। বিশ্বাস করি নিজের আন্তরিকতায়।"

"আন্তরিকতা!" সাপের গর্জনের মত হেসে উঠল সরোজা। "সে কেমন জিনিস? কোন্ যাদুঘরে পাওয়া যায়?"

দেববাণী সোজা তাকাল পার্শ্ববর্তিনীর চোখে। সে আয়তলোচন জ্বলছে। দেববাণীর স্নিগ্ধ স্নেহস্মিত চোখের ওপর সে জ্বলন্ত দৃষ্টি তির্যক পতিত হ'ল। নড়ল না, কাঁপল না একটুও।

দেববাণী বলল, "আপনাকে কোথায় নামিয়ে দেব?"

"কোথাও না।"

"সে কি?" দেববাণী হেসে ফেলল।

"আপনাকে তুলে নিতে বলিনি। নামাতেও বলব না।"

স্নেহে গলে গেল দেববাণীর স্বর। "তুমি বড় ছেলেমানুষ, সরোজা। চল একটু কফি খাওয়া যাক। তার পর দেখব তুমি কোথায় যাবে, কখন যাবে, কেন যাবে।"

কনট প্লেসে গাড়ী থামাল দেববাণী আম্বাসাডার রেস্তোর্াঁর সামনে। দু'জনে ঢুকলো ভেতরে। অপরাহ্নে জনবিরল রেস্তোরাঁ। দু-দশ জন পুরুষ স্ত্রীলোক যুবক-যুবতী চা-কফি পান করছে। ওরা এক কোণে টেবিলে বসল। বেয়ারা এসে সেলাম করতে, বলল, "কফি।"

"ঠাণ্ডা না গরম?"

"ঠাণ্ডা।"

"আমি ঠাণ্ডা কফি ভালবাসিনে," বলল সরোজা।

দেববাণী তাকাল তার মুখে। মুচকি হাসল। "আজ না ভালবেসেই খাও।"

কফি আসতে একটু দেরী হ'ল। সরোজা নীরব, কিন্তু দেববাণীর মনে হল, নিস্পৃহ নয়। অন্তত তার বিরক্ত উদাস ভাব কেটে গেছে অনেকখানি। সে যে দৃষ্টিতে অদূরে উপবিষ্ট তিনটি কলেজ-পড়া তরুণীর দিকে তাকাচ্ছে তার মধ্যে ধারাবাহিক ক্লান্তি নেই: বরং ধিকি-ধিকি জীবন-লিপ্সা আছে।

দেববাণী বলল, "তুমি কি করছ আজকাল?"

চকিত হল সরোজা। "জীবন-ধারণ।"

"সে তো সবাই করে। এটুকু বয়সে এ ধরনের বুড়ো কথা তোমার বলা উচিত নয়।"

"বয়স আমার কম নয়।"

"তিন কুড়ি দশ?"

"বছরের মাপে বয়স ধরা পড়ে না। আপনাকে এখনও পঁচিশ বছরের খুকি মনে হয়।"

"আর তোমাকে?"

"আমার অনেক বয়স।"

সরোজার কণ্ঠে পুরাতন ক্লান্তির আভাস পেয়ে দেববাণী এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করল।

"শুনেছি তুমি সংবাদপত্রে কাজ করছ?"

"ভুল শুনেছেন।"

"করছ না?"

"ওকে কাজ বলে না।"

"লিখছ তো?"

"একটু একটু!"

"কি বিষয়ে?"

"সোসাইটি!"

"সর্বনাশ। আমাদের দেশের সংবাদপত্রেও এই বিচিত্র ঝাঝালো বস্তুর আমদানী হয়েছে নাকি?"

"আমার কাজ এই বিচিত্র রাজধানী শহরে ঘুরপাক সামাজিক জীবনে রথী-মহারথীদের চলন-বলন-বাচন জনসাধারণের কাছে পরিবেশন করা। নামী বিদেশিনীর কাছে ভারত কত বিস্ময়কর, আমরা কত মহান, পৃথিবীর শান্তি, স্থিতি, প্রগতিতে কত বিরাট আমাদের অবদান, সেই অপূর্ব উদ্দীপক ভারত-স্তুতিকথা আমাকে সংগ্রহ করতে হয়। বিচারশক্তিহীন পাঠককুল তাই প'ড়ে প্রতিদিন নিজেদের পিঠ চাপড়ায়। শাসকগণ সে প্রশংসাপত্র বুকে ঝুলিয়ে গর্বে আত্মপ্রসাদে বিস্ফারিত হন। ক্যাথরিন মেয়োকে গান্ধী বলেছিলেন ড্রেন ইন্‌স্পেক্টর। সরোজা ধর্মরাজ চলমান ভারতবর্ষের ড্রেন ইন্‌স্পেক্টর।"

"মন্দ কি? সব বড় বড় জায়গায় নিশ্চয় খুব খাতির তোমার!"

"খুব।" সরোজার ওষ্ঠ-তরঙ্গে বিদ্রূপ নেচে উঠল।

"তোমাকে ত বিশেষ উদ্ভাসিত মনে হচ্ছে না।"

"উদ্ভাসিত?" এমন ভাবে উচ্চারণ করল সরোজা, যেন সে গভীর অন্ধকারে ডুবে আছে।

"সোসাইটি সর্বত্রই কৃত্রিম হয়ে থাকে। ওটা সভ্যতার অঙ্গাভরণ।"

"আমাদের সভ্যতা নেই, তাই অঙ্গাভরণ আরও বেশী।"

"বল কি? কত প্রাচীন আমাদের সভ্যতা!"

"এত প্রাচীন যে তাকে আর চেনা যায় না। হারাপ্পা বা নালান্দা নিয়ে প্রবন্ধ লেখা যায়, জীবন কাটান যায় না।"

"প্রাচীন সভ্যতার ভিত্তির ওপর নবীন সভ্যতা গ'ড়ে উঠছে না?"

"আপনি দেখছি পলিটিশিয়নদের মত কথা বলছেন! মা'র পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে পার্লামেন্টে দাঁড়াবেন নাকি?"

দেববাণী হেসে উঠল, "রক্ষে কর। রাজনীতিকে আমার বড় ভয়। একবর্ণ বুঝি নে।"

"সেই রাজার গল্প জানেন ত? তাঁতী তাঁকে কোনও বস্ত্র না পরিয়ে বলল, আপনি মহার্ঘ সজ্জায় সুশোভিত। উলঙ্গ রাজা সবাইকে প্রশ্ন করলেন, কেমন দেখছ আমার অঙ্গাভরণ? সবাই শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে বিগলিত আনুগত্যে বলল, চমৎকার।"

"সত্যি বললে মাথা কাটা যাবে যে!"

"আমাদেরও সেই অবস্থা। কিছু নেই, অথচ তারস্বরে সবাই বলছে, সব আছে। শ্লোগান জিনিসটা এমন মহিমাময় মিথ্যে যে, আওড়াতে আওড়াতে সে ঈশ্বরের মত অপ্রমাণিত সত্য হয়ে যায়।"

"কোনও জিনিসই পুরো মিথ্যে নয়, সরোজা।"

"দেখুন, আমার এ সব চোখ-ঠারানো পিঠচাপড়ানো দর্শন একেবারে ভাল লাগে না।" সাপের মত গর্জে উঠল সরোজা। "আমরা অস্থি-মজ্জায় অসৎ, তাই সব কিছুর মধ্যে গোঁজামিল খুঁজে বার করি। আত্মতৃপ্তিতে আমরা অবিজিত। কোন কিছুই একেবারে মিথ্যে নয়? সুতরাং মিথ্যেও একেবারে মিথ্যে নয়, চোরাকারবার একেবারে অসৎ নয়, লোক ঠকানো পুরো অন্যায় নয়। সুতরাং সব চলে, সব চলবে। এই হ'ল আমাদের জীবনদর্শন। অথচ আমাদের রাষ্ট্র-প্রতীকে বিঘোষিত হয়েছে, সত্যমেব জয়তে। নেলসনের শেষ সিগন্যাল!"

কফি এল। কফি ঢালতে ঢালতে দেববাণী ভাবল, কেন, কোন্ বিষে এই সুদর্শনা মানিনী মেয়েটির কুমারী মন এমন জর্জরিত হয়ে গেছে? ওর মা'র অন্তরে যে বিষন্ন সদাশয়তা, ক্লান্ত দাক্ষিণ্য, সযত্ন সহানুভূতি, ওর মনে কেন তার এমন অভাব? অথচ কি আশ্চর্য ক্ষুরধার ওর মন, কি গভীর স্পর্শকাতর!

কফিতে চুমুক দিয়ে দেববাণী বলল, "আমার গবেষণাগার স্থাপনে তুমি সাহায্য করবে?"

"না।"

"কেন নয়?"

"গবেষণাগার স্থাপন করা আপনার হবে না।"

চমকে উঠল দেববাণী। "সে কি? কেন হবে না? হতেই হবে।" ব্যাকুল হ'ল সে।

"হবে না। এই এক জায়গায় আপনার ইচ্ছে পরাস্ত হবে।" প্রতিশোধের আনন্দে হঠাৎ খুশি হ'ল সরোজা।

সামলে নিল দেববাণী নিজেকে।

"তুমি ভুল করছ। গবেষণাগার হবেই।"

"হলে ত ভালই।"

"তা হলে তুমি সাহায্য করবে?"

"না।"

"কেন?"

"আমার সাহায্যে আপনার প্রয়োজন নেই। আপনার গবেষণাগারে আমার প্রয়োজন নেই।"

"তোমার-আমার পারস্পরিক প্রয়োজন হতে পারে।"

"পারে না।"

"এত নিশ্চিন্ত হ'চ্ছ কি করে? তোমার জীবনে যে সমস্যা জ'মে পাথর, তা গলবার দিনের অস্থিরতায় আমাকে তোমার প্রয়োজন হতেও পারে।"

"আমার জীবনে কোনও সমস্যা নেই।" সংক্ষিপ্ত নীরবতার পর সরোজা আবার বলল, "অনুগ্রহ ক'রে আমার জীবন নিয়ে অনধিকারচর্চা নাই বা করলেন।"

অন্য সময়, অন্য কারুর মুখে এ-ধরনের কথাবার্তায় দেববাণী রাগত। আজ তার রাগ হ'ল না! একে ত সাবিত্রী আম্মার কাতর মিনতির কতব্য-নির্দেশ; তা ছাড়া রহস্য-গোপন সরোজার আকর্ষণ। মৃদু হেসে সে বলল, "একেবার অনধিকার নয়।"

"অর্থাৎ মা আপনাকে আমার 'গার্জেন' করেছেন?"

সরোজা কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠল। দেববাণীর প্রতিবাদ-ইঙ্গিত অগ্রাহ্য ক'রে এক নিঃশ্বাসে সে ব'লে গেল, "মা'র কোনও অধিকার নেই আমার পেছনে আপনাকে লাগিয়ে দেবার। আমার পচিশ বছর বয়স, আমি পূর্ণ স্বাধীন। মাকে বলবেন, তিনি নিজের জীবন সামলাতে পারেন নি, আমার জীবন নিয়ে তাঁকে ঘাঁটাঘাঁটি করতে হবে না। করলে তিনিই আঘাত পাবেন। আপনাকেও বলছি, আপনার কি যথেষ্ট কাজকর্ম নেই যে আপনি আমার পেছনে লেগে রয়েছেন? শুনেছিলাম আপনি ব্যস্ত বড় বড় কাজ নিয়ে, ও-সব কি মা'র প্রোপাগাণ্ডা মাত্র?"

সরোজার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হ'ল, চোখ জ'লে উঠল, রুদ্ধ, কুপিত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে বুক উঠল, নামল।

দেববাণী কম বিস্মিত হ'ল না। বিস্ময় গোপন না ক'রে বলল, "এত উত্তেজিত হলে কেন ?"

"হব না ? উনি কেন আমায় একা ছেড়ে দেন না ? কেন আমাকে নিয়ে ওঁর এত মাথাব্যথা ? উনি জানেন আমার জন্যে কিছু ওঁর করার নেই, যা করতে পারেন—আমাকে একা থাকতে দেওয়া—তা কিছুতে করবেন না। মা জানেন, তিনি যা দিতে পারেন তার কিচ্ছু আমি চাই নে ; আমি যা চাই তা তিনি দিতে পারেন না। কারণ আমি কিছুই চাই নে। উনি কেন আমায় নিজের মনে থাকতে দেবেন না ? কেন আমাকে নির্বুদ্ধি পেট-মোটা, ডবল-চিবুক এম. পি-দের মধ্যে ডাকবেন, কেন আপনার সঙ্গে পরিচয় করাবেন, কেন পার্টিতে নিয়ে যাবেন ? আমি ত ওঁর কোনও ক্ষতি করিনি !"

"তিনি মা যে !" দেববাণী আস্তে উচ্চারণ করল ! এত আস্তে, এত সন্তর্পণে, হেমন্ত-রাতে শিশির পড়ার মত, যে সরোজা হঠাৎ থেমে গেল। তাকিয়ে রইল দেববাণীর চোখে।

নরম মাটির সন্ধান পেয়ে দেববাণী উৎসাহিত হ'ল।

"বড় ভাল তোমার মা। বড় স্নেহপরায়ণ, সহানুভূতিশীল।"

তিক্ত হাসি দেখা দিল সরোজার ওষ্ঠাধরে। "মা এত ভালো যে ঠিক বাস্তব নন।"

"এ কথা কেন বলছ ?"

"আপনাকে সবাই খুব বুদ্ধিমতী বলে ! অথচ আপনি দেখছি লোক চেনেন না।"

"সব কিছু কি কেউ চিনতে পারে ?"

"মা হচ্ছেন সেই দুর্ভাগাদের দলে যারা কল্পনাকে মনে করে বাস্তব, কল্পনার পরাজয় কিছুতে মানতে চায় না, যাদের আলেয়ার পেছনে ছুটবার শক্তি, ধৈর্য অসামান্য। তাঁরা এত আদর্শ-অন্ধ যে, আদর্শ কখন যে প'চে গ'লে ভূত হয়ে গেছে, দেখতে পান না। চতুর্দিকে পঙ্কের মধ্যে তাঁরা কেবল পঙ্কজ খুঁজে বেড়ান। সেজন্যেই মা'র সর্বদা একটা 'কজ' বা 'ক্রেজ' চাই। কিছু একটা নিয়ে সব সময় তিনি লড়বেন। যতদিন ইংরেজ ছিল, মা-দের ভাবনা ছিল না। ইংরেজ চ'লে গিয়ে মহা বিপদ হয়েছে। লড়বার আর কিছু নেই। অনেক কিছু নিয়ে লড়তে গিয়ে দেখেছেন, সংগ্রাম অচল। তবু হাল ছাড়বেন না। হালে হাতের কাছে কিছু না পেয়ে বেশ মীইয়ে গিয়েছিলেন। এমন সময় এলেন আপনি। ঈশ্বর

প্রেরিত 'কজ' পাওয়া গেল। এখন আপনার রিসর্চ সেন্টার নিয়ে মেতে উঠেছেন। যাঁর সঙ্গে দেখা তাকেই একবার বলা চাই। তাতে আপনার বা সেন্টার-প্রজেক্টের সাহায্য না হলে ক্ষতি নেই। মা'র আত্মতৃপ্তি হলেই যথেষ্ট।"

"না, না। তুমি ঠিক বলছ না। ওঁর প্রতি বড় অন্যায় করছ!"

"আপনি জানেন না। আপনার মত আরও অনেকের অনেক 'কজ' নিয়ে মা লড়াই করেছেন। প্রায় সবগুলো হেরেছেন, জিতেছেন দু'চারটে। কিন্তু পরাজয়গুলি তিনি একেবারে ভুলে গেছেন, যেন তারা ঘটে নি কোনও দিন। শুধু মনে রেখেছেন ছোটখাট জিৎগুলিকে। এতে কেবল নিজেকেই ঠকান নি, অন্যদেরও। অথচ এই ঠকাবার ব্যাপারটা ওঁর একটুও মনে নেই। শুধু তাই নয়, যাঁরা ওঁর সব ব্যাপারে অবিরাম হস্তক্ষেপে বিরক্ত, তাঁদের প্রকৃত মনোভাব মা দেখেও দেখতে পান না। বার বার প্রতিহত হয়েও বিশ্বাস করেন, সবাই তাঁর কথা শোনে, মানে, গ্রহণ করে।"

"কিন্তু সবাই ত ওঁকে শ্রদ্ধা করে।" দেববাণীর বুকে কেমন একটা ব্যথা জ'মে উঠল।

"করুণা করে। আমার মনে হয় না, ভারতবর্ষের লোকেরা কাউকে, কোনও কিছুকে, শ্রদ্ধা করে।"

দেববাণী শঙ্কিত চোখে তাকাতে সরোজা আবার বলল, "শ্রদ্ধায় পাহাড় টলে না, বরফ গলে না। গলে ক্ষমতায়। পৃথিবীতে যাদের হাতে ক্ষমতা, 'পাওয়ার', তাদের ক'জনে শ্রদ্ধা করে? বরং তাদের অধিকাংশকেই দস্তুর মত অশ্রদ্ধা করে সবাই, তবু তাদের মানতে হয়। যার হাতে ক্ষমতা আছে, সে ক্ষমতা ছাড়া আর কিছুকে শ্রদ্ধা করে না। তেজ তেজকে মানে, বল বলকে। যে সব কারণে মা একদা শ্রদ্ধা পেতেন আজ তার প্রভাব মিটে গেছে। মা আশ্চর্য সাহসে একদিন সামাজিক বিদ্রোহ করেছিলেন; সেদিন অনেকের শ্রদ্ধা তিনি পেয়েছিলেন। আজ সে বিদ্রোহ অর্থহীন, সবাই করছে, বা করতে পারে, করলে কেউ ভ্রূকুটি পর্যন্ত হানবে না। মা গান্ধীর আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেলে গিয়েছিলেন। আজ গোটা গান্ধীবাদই অশ্রদ্ধেয়, জেলে যাওয়ার জলে জীবনের চিঁড়ে ভেজে না। মা সৎ, সহানুভূতিশীল উদার—এর কোনটাই বর্তমানের ভারতীয় রাজনীতির বাজারে চলতি মুদ্রা নয়। মাকে কেউ শ্রদ্ধা করে না, কিন্তু মা সর্বদা ভাবেন সবাই তাঁকে সকাল-সন্ধ্যায় প্রণাম করে।"

"কিন্তু আমার রিসর্চ সেণ্টার ব্যাপারে তাঁর প্রচেষ্টা খুব কার্যকরী হয়েছে।"

"ও আপনার কল্পনা। কল্পনা-বিলাসও সংক্রামক ব্যাধি। যদি কিছু হয়ে থাকে, মা'র জন্যে নয়, মা সত্ত্বেও।"

"তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি নে।"

"আপনার খুশি। আমি, আপনার মত, আমার ইচ্ছা, ধারণা, বিশ্বাস অন্যের ওপর চাপাতে চাই নে।"

"তুমি কেন বলছিলে রিসর্চ সেণ্টার হবে না?"

"দিব্যদৃষ্টি।"

"কাজ কিন্তু অনেকখানি এগিয়ে গেছে।"

"পেছুতে কতক্ষণ?"

"তুমি ভীষণ অন্ধকারবাদী।"

"মা'র মত অন্ধ আলোকবাদী হতে চাই নে।"

দেববাণী নিজের মনেই বলল, "রিসর্চ সেণ্টার না হলে একজন মনে খুব দুঃখ পাবে।"

"আপনার বয়-ফ্রেণ্ড?" সরোজার ঠোঁটে বক্রহাসি।

"আমার বন্ধু।"

"আপনি তাকে বিয়ে করবেন?"

চম্‌কে উঠেই হেসে ফেলল দেববাণী: "তোমার সাহস ত কম নয়?"

"সাহসের কি দেখলেন?"

"তোমার মাও এ প্রশ্ন আমায় করেন নি।"

"তার মানে মা'র আপনার সম্বন্ধে যথেষ্ট কৌতূহল নেই।"

"তোমার আছে?"

"বর্তমানের জন্যে একটু আছে।"

"কেন?

"আপনাকে দেখে মজা লাগছে।"

"মজা?"

"খুব। আপনি হচ্ছেন ব্যতিক্রম। সচরাচর থেকে আলাদা।"

"তুমিও ত তাই।"

"আমি? আমি আলাদা নই। আমি একা। আলাদাদেরও একটা জাত থাকে। একার কোনও জাত নেই।"

হঠাৎ সরোজা উঠল। "দয়া ক'রে মনে রাখবেন, আমি একাই থাকতে চাই।"

"কোথায় যাচ্ছ ?" দেববাণীও উঠল।

"আমার গতিবিধির সংবাদ কাউকে দেবার অভ্যেস নেই।"

"তোমাকে পৌঁছে দি।"

"একই কারণে, দরকার নেই।"

"তুমি একদিন আমার ফ্ল্যাটে এস।"

"ধন্যবাদ।"

দ্রুত পদক্ষেপে সরোজা বেরিয়ে গেল। হিল-তোলা জুতার খট্-খট্ আওয়াজে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে সবার চোখে মুহূর্তে বিস্ময় জাগিয়ে সে নিষ্ক্রান্ত হ'ল। দেববাণীর দৃষ্টি তার অপস্রিয়মাণ সুঠাম-ছন্দিত দেহকে দরজা পর্যন্ত অনুসরণ করল।

দেববাণী বিদায় নেবার পর সাবিত্রী আম্মা ক্লান্ত দেহ বিছানায় এলিয়ে দিলেন। তাঁর মনে তৃপ্তি ও বেদনা একসঙ্গে মিলে-মিশে বিচরণ করছিল। দেববাণীকে কয়েকজন বিশিষ্ট এম. পি-র সঙ্গে পরিচিত করিয়ে তিনি তৃপ্তি বোধ করলেন ; এ পরিচয় দেববাণীর উদ্যোগকে সার্থকতার পথে এগিয়ে দেবে ভাবতে তাঁর ভাল লাগল। কিন্তু এ ভাল লাগায় কেমন একটা অপূর্ণতা র'য়ে গেল, যা সাবিত্রী আম্মাকে গোপনে পীড়া দিতে লাগল। এই ধরনের মৃদু পীড়ন সর্বদা আজকাল অস্তিত্বের অভ্যন্তরে তিনি অনুভব করেন। কেবল মনে হয়, আমার কিছু করার নেই, দেবার নেই, পাবার নেই। আমি ফুরিয়ে গেছি। কালের কঠিন নির্দয় মাপে আমি অতিরিক্ত। আমি আর কিছু সাধন করি না। সকলে আমাকে সহন করে মাত্র।

দিবানিদ্রার অভ্যাস নেই, তবু আজ সাবিত্রী আম্মার চোখ ক্লান্তিতে বুজে এল। নিজেকে বার বার তিনি সান্ত্বনা দিতে চাইলেন, না, তুমি ফুরিয়ে যাও নি, এখনও তুমি আছ, দেশের, সমাজের, মানুষের প্রয়োজনে আছ। এই ত পরম নিঃস্বার্থে, সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতার ঊর্ধ্বে একটি সৎসাহসী গঠন-প্রয়াসী মেয়েকে সাহায্য করতে তুমি এগিয়ে এসেছ, তোমার চেষ্টায় তার কাজ অনেকখানি এগিয়ে গেছে। কিন্তু, চোখ বুজে, সাবিত্রী আম্মা স্বতঃউচ্চারিত সান্ত্বনা-গুঞ্জনের মধ্যে নিবিড় কান পেতে সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করলেন, এ মিথ্যা

প্রবোধ তাঁর জীবনসন্ধ্যার করুণ দারিদ্র্য, মলিন শূন্যতাকে ঢেকে রাখবার দুর্বল প্রয়াস মাত্র। মনে হ'ল, বজ্রাঘাতে নিহত তালগাছ যেমন নগ্ন নিষ্প্রয়োজনের আর্ত প্রতীকের মত আকাশের দিকে অন্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, আমিও তেমনি তাকিয়ে আছি ভারতবর্ষের দিকে, আমার দীনতা, শূন্যতা কারুর চোখ এড়াতে পারছে না।

অথচ, মুদিত চোখের অন্ধকার পর্দায় স্মৃতির ক্ষিপ্রচলমান ছায়াছবি দেখতে দেখতে সাবিত্রী আম্মার মনে হ'ল, আমি ত এমন ছিলাম না! অনেক বছর আগে, যখন প্রথম যৌবনের জ্বলন্ত দাবীর চাপে বিদ্রোহী হলাম, তখন থেকে, এই ত সেদিন পর্যন্ত, জীবনের প্রতি প্রহর অর্থপূর্ণ ছিল। বেঁচে থাকার শিহরণ লাগত প্রতিদিনের জীবনে, দুঃখে, শোকে, সুখে-আনন্দে, বিপদে, বিরোধে, সংগ্রামে, জয়-পরাজয়ে। জীবনের পীন আস্বাদে মাদকতা ছিল,—হোক না পাত্র-ভরা পীযুষ বা গরল। প্রগল্‌ভা খরস্রোতা নদীর সতেজ প্রবাহ তাকে ক্লেদকালিমার স্পর্শ থেকে মুক্ত করে। তেমনি জীবন যখন চলে, গায়ে তার দাগ লাগে না। বহু প্রতিলোম লক্ষ্যের দিকে এক সঙ্গে সে হাত বাড়ায়; কখনও একেবারে শূন্য হাতে ফিরে আসে না। কিন্তু জীবন যখন নিশ্চল, গতিহীন, লক্ষ্য আয়ত্ত, অথবা অপ্রতীক্ষ্য, বেঁচে থাকার উত্তাপ যখন নিঃশেষ, তখনকার ক্লান্ত বিষণ্ণ ক্লীব অবসর দীনতার নির্দয় উপহাস।

নিশ্চল জীবনের স্থবির সত্তার গভীর অন্তর্দেশে, সাবিত্রী আম্মার তাই মনে হয়, কে যেন তাকে বার বার পরিহাস করে।

এই গুপ্ত পরিহাসকের বিদ্রূপ থেকে নিজেকে রক্ষা করা সাবিত্রী আম্মার অন্যতম প্রধান সমস্যা। তাকে মানতে চান না তিনি। মানতে চান না, তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত। যেখানে যেটুকু সুযোগ পান, নিজেকে প্রয়োজনীয় ক'রে তুলতে তাঁর চেষ্টা আরও বেড়ে যায়। লোক-সভার কাজে তিনি অখণ্ড মনোনিবেশ করেন; বিতর্কে, কমিটিতে আলোচনায়, অর্থপূর্ণ অংশ গ্রহণে তাঁর চেষ্টার ক্রটি হয় না। অনেক সময় তাঁর পরিশ্রম ব্যর্থ হয় না দেখা যায় অনিচ্ছুক মন্ত্রীদের কৃপণ ভাণ্ডার থেকে মূল্যবান তথ্য তিনি আশ্চর্য দৃঢ়তা ও কৌশলের সঙ্গে টেনে বার করেন। নির্ভীক ও নির্লোভ ব'লে প্রয়োজন মত মন্ত্রীদের হতবুদ্ধি করতে, মুশকিলে ফেলতে সঙ্কোচ সংশয় তিনি বোধ করে না। যে-সব বিল বা সরকারী নীতিতে তাঁর উৎসাহ, বিতর্কের সময় অনে ক্ষেত্রে তিনি সদস্যদের সমবেত মনোযোগ অর্জন করেন; মন্ত্রীরা তাঁর বক্ত

শুধু সতর্ক হয়ে শোনেন না, বিচার ক'রেও দেখেন। সিলেক্ট কমিটিতে শাসকদলের সদস্যা হয়েও সাবিত্রী আম্মা বেশীর ভাগ সময় বিরোধী দলের সহকর্মীদেরও অবাক্ ক'রে দেন সরকারী খসড়ার দোষ-গুণ বিচারে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, তিনি শেষ পর্যন্ত বিরুদ্ধ মত, মিনিট অব্ ডিসেন্ট, লিখতে ব'সে গেছেন। যদি কারুর কোন সমস্যা তাঁর কাছে সাহায্যের উপযুক্ত মনে হয়, মন্ত্রী-উপমন্ত্রীদের দরবারে বারম্বার তিনি যাতায়াত করেন। সাবিত্রী আম্মা চান, লোকেরা আসুক তাঁর কাছে, তাদের সমস্যা, প্রার্থনা, নালিশ নিয়ে। যার মধ্যে ন্যায় নেই তার সপক্ষে তিনি কদাপি কথা বলেন না। কিছু ন্যায় আছে বুঝতে পারলে সংগ্রামের প্রাচীন আকাঙ্ক্ষা তাঁর মধ্যে চট ক'রে জেগে ওঠে। ভাষা, প্রদেশ, ক্ষেত্র, ধর্ম কোনও সঙ্কীর্ণতার অধীন তিনি নন। সুতরাং তাঁর কাছে লোক আসে; নানা অঞ্চলের ভাষার ধর্মের লোক। দু'দিন কেউ না এলে উদ্‌বিগ্ন হন সাবিত্রী আম্মা। নিজের অভ্যন্তরে গুপ্ত পরিহাসকের চাপা বিদ্রূপাত্মক হাসি শুনতে পান। বুকের মধ্যে কেমন করতে থাকে।

অথচ সাবিত্রী আম্মা জানেন, রাজনৈতিক মহলে তার স্বকীয় স্থান কিছু নেই। তিনি দলনেত্রী নন, ক্ষমতার ক্ষীণতম কেন্দ্র-বিন্দুও নন, তাঁর চতুর্দিকে বিগলিত আনুগত্যের বৃত্ত তৈরী হয় না। একদা, যেন কত যুগ আগে, কোন উদ্দীপ্ত প্রেরণার তাপে, তিনি কিছু কাজ করেছিলেন; তার স্মৃতি যাঁদের মন থেকে এখনও একেবারে মুছে যায় নি, তাঁদের কেউ কেউ সাবিত্রী আম্মাকে জীবনের অপরাহ্নে আত্ম-তৃপ্তির সুযোগ দেবার উদার উদ্দেশ্যে পার্লামেন্টে নির্বাচিত করেছেন। সাবিত্রী আম্মা জানেন, এ ঔদার্যের মধ্যে পুরাতন স্মৃতি, স্তিমিত শ্রদ্ধার সঙ্গে আরও এক পদার্থের সংমিশ্রণ, তার নাম দয়া। যদি নির্বাচনে টিকেট তিনি না পান, নালিশ করতে পারবেন, অভিমান, এমন কি ভিক্ষার পথও খোলা থাকবে; দাবী করতে পারবেন না। হয়ত করুণাপরবশ উচ্চপদস্থ কারুর চেষ্টায় রাজ্য-সভায় মনোনীত আসনের একটি তাঁর জুটে যাবে। তাতে জীবন আরও দরিদ্র হবে, পরিহাসকের বিদ্রূপ যাবে বেড়ে।

সাবিত্রী আম্মা বোঝেন, রাজনৈতিক নেতাদের কাছে তাঁর মূল্য ন্যাইসেন্স-পর্যায়ের ওপরে নয়। তাঁরা তাঁকে সময় সময় প্রশ্রয় দেন, খাতির করেন, অন্তত দেখান; কিন্তু মৃদু-মন্দ শুনিয়েও দেন যে, তিনি অযথা, অপ্রয়োজনে, তাঁদের পেছনে লাগেন। যখন সাবিত্রী আম্মা তাঁর অধিকাংশ সাহায্য-প্রার্থীর 'কেস'

নিয়ে বার বার তদ্বির ক'রেও ব্যর্থ হন, পরিহাসকদের বিদ্রূপ তীক্ষ্ণতর হয়, তিনি দুর্বল হয়ে পড়েন, অসহায় শিশুর মত সান্ত্বনা পাবার একমাত্র উপায় আত্ম-প্রপঞ্চের জাল বোনা।

বার্ধক্যের শূন্যতা, সাবিত্রী আম্মা বোঝেন, শতগুণ বর্ধিত হয়েছে পারিবারিক ব্যর্থতার কারণে। স্বামীর সঙ্গে বহু বছর তাঁর যে সম্পর্ক তা দুই বিরোধী শক্তির উদাসীন হিম-শীতল সহ-অবস্থানের বেশী নয়। বহুদিন আগে রাজনীতির উত্তেজনায় সাড়া দেবার সঙ্গে সঙ্গে, স্বামীর সঙ্গে মতান্তর শুরু হয় : অনুক্ত কারণে মনান্তর তারও আগে আরম্ভ হয়েছিল। মন ও মতের ব্যবধান এমন নিঃশব্দে দু'জনের মধ্যে অন্ধকারের দেওয়াল তুলে দিল যে, সাবিত্রী আম্মারও স্মরণ নেই কখন তার প্রথম গোপন পদসঞ্চার, কি ক'রে তার ব্যাপক বিস্তৃতি। এ নিয়ে কোনও দিন কুশ্রী কলহ তাঁদের হয় নি ; শুধু একই দূরে-টানা শক্তির চাপে দু'জনে সমান পারস্পরিক ব্যবধানে স'রে গেছেন। মহীশূর ডোরেইস্বামী ধর্মরাজ ও সাবিত্রী আম্মার মধ্যে মিলিত জীবনের উত্তাপ ফুরিয়ে গেছে ; কিন্তু বিচ্ছেদের প্রয়োজন তাঁরা বোধ করেন নি। বন্ধন যদি কঠিন না হয়, বিচ্ছেদের দরকার হয় না।

মহীশূর ডোরেইস্বামী ধর্মরাজ মাদ্রাজ শহরের আডিয়ার অঞ্চলে অ্যানি বেসান্ত প্রতিষ্ঠিত থিয়োসোফিক্যাল সোসাইটিতে বাস করেন, কদাচিৎ কখনও দিল্লীতে তাঁকে আসতে হয়। সাবিত্রী আম্মার বাসভবনের দ্বিতীয় কক্ষে তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট পালঙ্ক রয়েছে ; দু-তিন বছরে একবার সামান্য ক'দিনের বেশী সে পালঙ্কে ধর্মরাজের চুয়াত্তর বছরের কৃষ্ণকায় পক্বকেশ দেহ বিশ্রাম করে না। সে সংক্ষিপ্ত অবস্থানে সাবিত্রী আম্মা তাঁকে সম্মানিত অতিথির মত যত্ন করেন ধর্মরাজের অধ্যাত্মিকতা, সাবিত্রী আম্মার এম. পি-জীবন নিয়ে আলোচনাও হে থাকে। শুধু হয় না দু'জনের পারস্পরিক জীবন নিয়ে। একদিন দু'টি নদী এ যে মোহনায় মিশেছিল তা গেছে শুকিয়ে। বহুদিন তারা ভিন্ন-গতি। এ অন্যকে প্রশ্ন করবার কিছু নেই।

গত শতাব্দীর শেষদিকে সাবিত্রী আম্মা মাদুরাই শহরের যে ব্রাহ্মণ বং জন্মেছিলেন তাঁরা ছিলেন স্মার্থা শ্রেণীর ; বিষ্ণু ও শিব উভয়ের উপাসক, অত অপেক্ষাকৃত উদার মতাবলম্বী। তাঁরা যেমন তাঞ্জোরে নটরাজমন্দিরে দিতেন, তেমনি শ্রীরঙ্গমের বিষ্ণু মন্দিরে। মাদুরাই-এর মীনাক্ষী-মন্দিরের

তাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, কিন্তু কাঞ্চীভরমে গিয়ে বছরে একবার তাঁরা শিব-কাঞ্চী, বিষ্ণু-কাঞ্চী, উভয় কাঞ্চীতে পুণ্যার্জন করতেন।

সাবিত্রী আম্মার বাল্যকাল কেটেছিল মীনাক্ষী-মন্দিরের প্রভাবে। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় তাঁকে মন্দিরে আসতে হ'ত। চার গোপুরম্ ও বিভিন্ন মণ্ডপমে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। দক্ষিণ গোপুরমের প্রশস্ত দ্বারপথে প্রবেশ ক'রে সহস্র-স্তম্ভ গণেশ-মণ্ডপম্ প্রদক্ষিণ করে, আশ্চর্য ভাস্কর্য জীবন্ত-প্রায় বিরাট প্রতিমূর্তিগুলি বিস্মিত-বিহ্বল চোখে দেখতে দেখতে বালিকা সাবিত্রী উপস্থিত হ'ত মীনাক্ষীর মন্দিরে ; অপলকে তাকিয়ে থাকত মীন-নয়না শিবপ্রিয়ার চোখে, যেখানে, তার মনে হ'ত, পৃথিবীর সমস্ত রহস্য ঘনীভূত। সে চোখে সাবিত্রী দেখতে পেত বহুদূরের অব্যক্ত আকৃতি। তার বুক কাঁপত, পা অবশ হয়ে আসত। সুন্দরেশ্বরের সঙ্গে মীনাক্ষীর বিবাহের রমণীয় কাহিনী সাবিত্রীর আদ্যোপান্ত জানা ছিল ; কিন্তু যে মীনাক্ষীকে প্রতি সন্ধ্যায় প্রাণ ভ'রে সে দেখত, সে কারুর ঘরণী নয়, প্রেয়সী নয়। তাঁর চোখে সমুদ্রমৎস্যকন্যার অতল আহ্বান, বলিষ্ঠ ঋজু তাঁর দেহে উন্মত্ত বীচিমালার সঙ্গে সংগ্রামের তেজ, ওষ্ঠাধরের বিলোল-বিহ্বল হাস্যে নিলম্বিত রহস্য। বালিকা সাবিত্রী প্রতি সন্ধ্যায় যুঁই ফুলের মালা নিয়ে যেত মীনাক্ষী-মন্দিরে ; পুরোহিতদের মধ্যে একজন সে মালা গ্রহণ করতেন। সাবিত্রীর তাতে তৃপ্তি হ'ত না, ইচ্ছে হ'ত নিজের হাতে মীনাক্ষীর গলায় মালা পরিয়ে দেবার সময় নিকট হ'তে তাঁর অস্থির-করা চোখের সবটুকু দেখে নেয়।

এগার ভাই-বোনের কনিষ্ঠা সাবিত্রী। একমাত্র মা ছাড়া সকলে তাকে অতিশয় স্নেহ করতেন। সাবিত্রীর যখন জন্ম হ'ল, পিতা মাদুরাই রামসুব্রাহ্-মনিয়মের বয়স তখন মধ্যপঞ্চাশ উত্তীর্ণ। সন্তানের পর সন্তান প্রসব ক'রে জননী রাজমের দেহ ভেঙ্গে গিয়েছিল ; সাবিত্রী পেটে আসতেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, একাদশ বার মাতৃত্বের মাশুল দেবার মত শক্তি তাঁর নেই। সাবিত্রীকে গর্ভে ধারণ ক'রে তিনি শয্যা নিয়েছিলেন ; নিজের অন্তস্তলে বাড়ন্ত সজীব বস্তুর সঙ্গে সে-অবস্থায় তাঁর বিরোধের সূত্রপাত। নির্দিষ্ট সময়ের মাসখানেক আগে মৃত্যুর মুখোমুখি হ'য়ে তাঁকে জন্ম দিয়ে তিনি যখন জানতে পারলেন সে তাঁর নবম কন্যা, তখন সে বিরোধ চরমে উঠল। সাবিত্রীর আড়াই বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু। আড়াই বছর শেষতম সন্তানের সঙ্গে তাঁর দৈহিক সম্পর্ক ছিল না বললেই হয়। দুগ্ধশূন্য বিশুষ্ক স্তনে সাবিত্রীর প্রথম জৈব তৃষ্ণা

মেটাবার মত ক্ষমতা তাঁর ছিল না। সাবিত্রী যে তাঁকে মৃত্যুর নিশ্চিত গহ্বরে ঠেলে দিল, সে অপরাধ তিনি ক্ষমা করতে পারেন নি। সংসারে অনিবার্য বিধবা পিসীদের হাতে সাবিত্রী বেঁচে রইল, তিনি এক-পা এক-পা ক'রে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেলেন। মেয়েদের মধ্যে সে যে সবচেয়ে সুন্দরী তাতেও তিনি নরম হন নি।

রামসুব্রাহ্মনিয়ম ধার্মিক, পণ্ডিত মানুষ। জিলা আদালতে ওকালতি ক'রে বিশেষ পসার হয় নি, কিন্তু সৎ ও পণ্ডিত ব'লে তাঁর সম্মান আছে। ছোটখাট গোলগাল মানুষটির স্নেহ সাবিত্রী আম্মার বাল্য-কৈশোরের একমাত্র সম্পদ্। সন্তান-স্নেহের উচ্ছ্বাস সেকালে অশালীন ছিল, তথাপি সাবিত্রী সম্বন্ধে দুর্বলতা রামসুব্রাহ্মনিয়ম প্রকাশ না ক'রে পারতেন না। হয়ত অকৃত অপরাধে মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হবার জন্যে পিতৃস্নেহ সে বেশী পেয়েছিল। জন্মাবার পরই রামসুব্রাহ্মনিয়ম কনিষ্ঠা কন্যার জন্ম-পত্রিকা তৈরী করিয়েছিলেন। জ্যোতিষী তাঁকে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন, কন্যা সুলক্ষণা নয়। বৈধব্যের যোগ আছে। অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে আরও বলেছিলেন, তার চেয়ে খারাপ সম্ভাবনাও আছে।

কলঙ্কের? আতঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিলেন রামসুব্রাহ্মনিয়ম। জ্যোতিষী জবাব দেন নি। শুধু এ নির্দেশ দিয়েছিলেন, দশ বছরের মধ্যেই যেন বিয়ে হয়। প্রতি বৎসর জন্মদিনে হোম করতে হবে।

রামসুব্রাহ্মনিয়মও আর প্রশ্ন করেন নি। বোধ হয় মনে মনে সান্ত্বনা পেয়েছিলেন, জন্মপত্রিকা সত্য হ'লে, বেশী দিনের আয়ু তারও আর নেই।

বৈধব্য-যোগের সতর্ক বাণী স্মরণ ক'রে রামসুব্রাহ্মনিয়ম কন্যার নাম রাখলেন সাবিত্রী।

বাল্যের যে প্রথম-স্মৃতি সাবিত্রী আম্মার আজও মনে আছে সে তাঁর বাবার। মনের অনেকখানি জুড়ে আছে। ছোট মানুষটির কণ্ঠস্বর আশ্চর্য উদাত্ত। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলে দিবসের কাজকর্ম থেকে রাত্রির অব্যাহতি পেয়ে, স্নানান্তে তিনি বেদ-উপনিষদ্-রামায়ণ-মহাভারত ভাগবদ্গীতা পাঠ করতেন। প্রতিবেশী-আত্মীয় প্রতিদিন কেউ না কেউ শুনতে আসতেন সে উদাত্ত কণ্ঠের ধ্বনি। সমস্ত ঘর কেঁপে উঠত। ছয় বছরের সাবিত্রী বাবার অনতিদূরে ব'সে সে ধ্বনি শুনত। ছোটবেলায় যে শ্লোকটি তার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, আজকার বার্ধক্যেও সেটি তাঁর প্রিয়। জীবন যে কী বিচিত্র রহস্য, সব নিয়ম-কানুন-বিধি-বিধানের বাইরে, সমুদ্রের চেয়ে বিরাট, মহাকাশের চেয়ে উঁচু, পাহাড়ের চেয়ে কঠিন,

কুসুমের চেয়ে কোমল, মৃত্যুর চেয়ে অন্ধকার, মিলনের চেয়ে আলোকময়, বেদের মহাকবিরা তা বুঝতে পেরেছিলেন। আজও, জীবনের বিচিত্র-বিহ্বল আলোড়নে হতবুদ্ধি, বিড়ম্বিত সাবিত্রী 'আম্মা মনে মনে বার বার আবৃত্তি করেন : কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচৎ, কুত আজাতা কুত ইয়ংবিসৃষ্টিঃ। এ সৃষ্টি কি, কোথায় এর আরম্ভ, কে জানে, কে বলতে পারে ? জ্যোতির্ময় দেবগণও হয়ত আদি-কাহিনীর খবর রাখেন না। এমন কি, যিনি পরম ব্যোমে অধিষ্ঠিত, তিনিও হয়ত জানেন না : যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্, তুসো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ।

দশ বছরের মাঝামাঝি পৌঁছতে রামসুব্রাহ্‌মনিয়ম সাবিত্রীর বিয়ে দিলেন। তিন পুত্রকে তিনি উচ্চ ইংরেজী শিক্ষা দিলেও সেকালে দক্ষিণ-ভারতে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন না থাকায় সাবিত্রীর বিদ্যাভ্যাস গৃহে সমাপ্ত হ'ল। পণ্ডিত রেখে তিনি সাবিত্রীকে তামিল ও সংস্কৃত শেখালেন, সামান্য ইংরেজীও। নিজের কাছে কাছে রেখে গল্পে-কাহিনীতে শাস্ত্র শেখালেন। ছোটবেলা থেকে সাবিত্রীর জানবার বুঝবার, নতুন কিছু করবার সুতীক্ষ্ণ আগ্রহে রাম-সুব্রাহ্‌মনিয়ম বিস্মিত হতেন। দুঃখও পেতেন। বড় মেয়েরা চিরপ্রথামত যে-যার বিবাহিত জীবন যাপন করেছে। রামসুব্রাহ্‌মনিয়ম অ্যানি বেসান্তের থিয়োসোফিক্যাল সোসাইটির সভ্য হয়ে ইণ্ডিয়ান হোম রুল্‌ লীগে যোগ দিয়ে-ছিলেন। কখনও কখনও তাঁর মনে হ'ত, উপযুক্ত সুযোগ, শিক্ষা পেলে এই সুন্দরী, সদা-চঞ্চল, রহস্যময়ী মেয়েটা বোধ হয় অনেক কিছু বুঝতে পারত, জানত, করতে পারত। পরক্ষণে মনে পড়ত জ্যোতিষীর সাবধানবাণী। কি জানি মেয়েটার জীবনে কি অমঙ্গল লেখা রয়েছে!

অর্ধশতাব্দী পূর্বে তামিলনাদে বাল্য-বিবাহ নিয়ম ছিল। মেয়েদের সাত-আট বছরে বিয়ে হয়ে যেত, কিংবা আরও কম বয়সে। সে তুলনায় সাবিত্রীর দশ বছরের কুমারী জীবন রামসুব্রাহ্‌মনিয়মের উদার-মনোভাব সূচনা করে। দশ বছরে দেহে সাবিত্রী খুব না বাড়লেও মনে বেড়েছিল অনেকখানি। মাতৃহীন সংসারে, পিসীদের অস্তিত্ব সত্ত্বেও, বেশ কিছু কাজ তাকে করতে হ'ত। বাবার অনেক ব্যক্তিগত কাজকর্ম সে নিজের হাতে করত। রামসুব্রাহ্‌মনিয়ম তাকে কাছে কাছে রাখতেন ; তার মনের আধ্যাত্মিক একটা ভিত্তি গ'ড়ে দেবার চেষ্টা করতেন। অনেক সময় তার অতি-সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস চাপতেন।

আট মেয়ের বিয়ে দিতে রামসুব্রাহ্মনিয়মের উদ্‌বৃত্ত অর্থ নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। তামিল ব্রাহ্মণ সমাজে মেয়ের বিয়ে মানে মেয়ের-বাপের সর্বনাশ। সাবিত্রীকে ভালো ক'রে মনোমত পাত্রে অর্পণ করার সঙ্গতি রামসুব্রাহ্মনিয়মের ছিল না। অথচ বোনদের মধ্যে সে সবচেয়ে সুন্দরী; বাবারঅন্তরে তার স্থান স্বতন্ত্র। রামসুব্রাহ্মনিয়ম এমন একটি পরিবারের খোঁজ করছিলেন যেখানে অপেক্ষাকৃত স্বল্প-ব্যয়ে পছন্দমত পাত্র মিলতে পারে। খোঁজ ক'রে তিনি যখন প্রায় হতাশ, এদিকে সাবিত্রী দশ বছরের মধ্যস্থলে উপনীতা, তখন বিধাতা প্রসন্ন হলেন। পাত্র মিলল। কন্যা রজস্বলা হবার আগেই তাকে বিয়ে দিতে হবে। কুমারীর রজোদর্শন হলে তখনকার দিনে তার বিবাহের পথ সহজ ছিল না।

ত্রিরুভালুর শহরে মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে সাবিত্রীর বিবাহ হ'ল। ছেলেটির বয়স একুশ, সুদর্শন না হলেও বুদ্ধিদীপ্ত মুখমণ্ডল। বি-এ পাশ ক'রে মাদ্রাজ সরকারে চাকরি করে, মাদ্রাজে থাকে। রামসুব্রাহ্মনিয়ম ভেবে খুশি হলেন, সাবিত্রী স্বামীর সঙ্গে মাদ্রাজে বাস করবে, ত্রিরুভালুরের মত ক্ষুদ্র শহরের নীচু-নজর সমাজে তার জীবন কাটবে না। মাদুরাই—অর্থাৎ "সুন্দরী" —মাদ্রাজের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ শহর; অনেকাংশে রাজধানীর চেয়েও তার গৌরব বেশী।

সেকালে তামিল ব্রাহ্মণদের বিবাহ পাঁচ দিন ধ'রে চলত। এ পাঁচ দিন-ব্যাপী মঙ্গলোৎসবের নাম অঙ্গিনাড়কল্যাণম্। বরপক্ষের জন্যে কন্যা-গৃহের একই সারিতে সামান্য ব্যবধানে আলাদা বাড়ী ঠিক করা হ'ল। রামসুব্রাহ্মনিয়মের বাড়ী বিবাহের উপযুক্ত মাঙ্গলিক কায়দায় সাজান হ'ল। বাইরের দ্বারপথে দেবদারু-পত্রে গেট তৈরী হ'ল। গেটের দুধারে ফলবতী দুই পূর্ণ কদলীবৃক্ষ। আম্রপল্লবে ঢাকা মঙ্গল-কলস; তার ওপর সবুজ সশীষ নারিকেল। সবুজ আম্রপত্রের লাইন বাঁধা হ'ল সরু দড়ি দিয়ে। বাড়ীর ভেতরকার অঙ্গনে বিবাহবাসর। চতুঃস্তম্ভ অনতিপরিসর চত্বরের মধ্যস্থলে মাটি ও গোবর নির্মিত হোম-বেদী। চত্বরের প্রতি স্তম্ভের সঙ্গে এক একটি কদলী-কাণ্ড বাঁধা হ'ল। চারদিকে দড়ি টানিয়ে তাতে আম্রপত্র ও যুঁই ফুলের মালা ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ল। সমস্ত আঙ্গিনায় পুরু ক'রে গোবর লেপা। অঙ্গনে নানাবর্ণের কোলম্, অর্থাৎ আলপনা।

উৎসবের শুরুতে 'নিশ্চিতাসম্'। অর্থাৎ চুক্তিপত্র পাঠ ক'রে বিবাহকে নিশ্চিত করা। উভয় পক্ষ সমবেত হ'ল সুসজ্জিত বিবাহ-বাসরে। সুব্রাহ্মনিয়ম

কম্পিত কণ্ঠে 'লগ্নপত্রিকা' পাঠ করলেন। প্রাচীন কায়দায় রচিত দান-পত্র। পরমকরুণাময় সুন্দরেশ্বরের অপার কৃপায় আমার কনিষ্ঠা কন্যা সাবিত্রীকে তোমাদের হাতে সঁপে দিতে পারলাম। লগ্নপত্রিকায় সাবিত্রীর কুল ইতিহাস, পিতৃপুরুষপরিচয়, রূপ ও গুণ বর্ণনা। তার সঙ্গে বরেরও। লগ্নপত্রিকা পাঠের পর যৌতুকাদি দেওয়া হ'ল, বরপক্ষ নগদ তিন হাজার টাকা ও দেড়শ' ভরি সোনা দাবী করেছিল। টাকা বরের পিতা গ্রহণ করলেন। গহনা বড় রূপোর থালিতে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। কণ্ঠের জন্যে তিরুমঙ্গলী ও চাঙ্গলি, কোমরে ওডিয়ালম্, হাতে নানা প্যাটার্ণের বালাই, কানের জন্যে ওলে, দু'নাকে হীরের মুকুত্তি, পায়ে পরবার কলুসু, পায়ের আঙুলে নাট্টি। ভারী গহনা, রকমে কম, সংখ্যায় অনেক। বরপক্ষের বৃদ্ধরা নেড়ে-চেড়ে দেখলেন দেড়শ' ভরির বেশীই হবে। ওজন করিয়ে নেবার মত নীচুদৃষ্টি বরের পিতার নেই, তাঁরা জানিয়ে দিলেন! বাপ যা যৌতুক দেয় সবটা মেয়ের প্রাপ্য। টাকা নববধূর নামে ব্যাঙ্কে থাকবে। গহনার আসল মালিকও সে। ঠকালে বাপ মেয়েকেই ঠকাবেন। আর ধর্মকে।

সাবিত্রীর হাতে 'মারুদানী' লাগান হয়েছে (বাংলা দেশের গায়ে হলুদের মত) যাতে সকলে একদৃষ্টিতে তাকে চিনতে পারে। 'মঙ্গলস্নানমে'র পর তাকে প্রথম স্বামী-দর্শনে যাবার জন্যে তৈরী করা হ'ল। এমন সময় বরযাত্রীদের অস্থায়ী নিবাসে উৎসবের অঙ্গস্বরূপ একটি ঘটনা ঘটল। বর নগ্নদেহে ছাতা বগলে ক'রে 'পরদেশী কোলম্' অর্থাৎ কাশীযাত্রা করল। পেছনে নিকটতম আত্মীয়, বন্ধুদের ব্যর্থ মিনতি। রামসুব্রাহ্মনিয়ম তৈরী ছিলেন। ত্রস্তপদে ভাবী জামাতার গতিরোধ করলেন। পুরোহিতগণের মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে বরকে লক্ষ্য ক'রে তিনি সানুনয়ে বললেন, এই অল্প বয়সে, প্রথম যৌবনে, কেন তুমি কাশীযাত্রা করছ? আমার সুন্দরী সর্বগুণ সমন্বিতা কন্যা সাবিত্রীকে তোমার স্ত্রী-রূপে অর্পণ করছি, সে তোমার গৃহে কল্যাণ, শ্রী, সমৃদ্ধি আনবে, তোমার জীবন পরিপূর্ণ করবে। অতএব কাশীযাত্রায় বিরত হও। আমার কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ ক'রে গার্হস্থ্যধর্ম পালন কর।

বলা বাহুল্য, বর নিরস্ত হ'ল। এবার তাকে নিয়ে আসা হ'ল বিবাহ-বাসরে। এখন যে উৎসব, তার নাম 'জনবাসম্'। রামসুব্রাহ্মনিয়ম একগাদা খড়ের ওপর বসলেন। তাঁর কোলে বসান হ'ল বধূবেশী সাবিত্রীকে। অন্যদিকে বর। পুরোহিতগণ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করলেন। বর বধূকে দেখল। সাবিত্রী

মাথা নীচু ক'রে রইল। অভিভাবকগণ তাকে অন্তত একবার সম্মুখে-স্থাপিত বড় আয়নায় তাকাতে আদেশ দিলেন, যার বুকে তার স্বামীর প্রতিচ্ছবি। সাবিত্রী সবাইকে অবাক্ করে সহজ-সরল দৃষ্টিতে আয়নায় চেয়ে দেখল। আবছা, অস্পষ্ট এক পুরুষমূর্তি ছাড়া আর কিছু তার চোখে পড়ল না। সে আবার তাকাল। এবার দেখতে পেল মুণ্ডিত-মস্তক কৃশকায় কৃষ্ণবর্ণ একটি তরুণ যুবক মাথা নীচু ক'রে ব'সে আছে। কামান মাথার মধ্যস্থলে নাতিবৃহৎ 'কুড়ুমাই'; নগ্নদেহে শুভ্র 'পূনল'। তার মুখ না দেখতে পেয়ে সাবিত্রীর তৃপ্তি হ'ল না। আয়না ত্যাগ ক'রে এবার সে সোজা তাকাল যুবকের মুখে। বৃদ্ধরা রুদ্ধশ্বাস হলেন, বৃদ্ধারা হা হা ক'রে উঠলেন, পুরোহিতরা স্তম্ভিত হয়ে মন্ত্র পাঠ বন্ধ করলেন। বিব্রত রামসুব্রাহ্‌মনিয়ম ধমকে উঠলেন। তখন সাবিত্রীর খেয়াল হ'ল অনুচিত সে কিছু ক'রে ফেলেছে। লজ্জায় দুঃখে মাটির সঙ্গে মিশে গেল সে।

দু'পাঁচ মিনিট পরে গোলমাল অনেকখানি ক্ষান্ত হ'ল। বরের ভগিনী সাবিত্রীর গলায় তিন-লহর 'মঙ্গলসূত্রম্' পরিয়ে দিল। বিবাহের আসল অনুষ্ঠান। পুরোহিতগণ মন্ত্রপাঠ করলেন। সাবিত্রী বরের সঙ্গে সপ্তপদী হ'ল, দু'জনে একসঙ্গে অরুন্ধতী নক্ষত্র দর্শন করল। দেড় ঘণ্টায় বিবাহের এই প্রধান অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার নিয়ম। তাই এর নাম নালাংগু।

কুমারী সাবিত্রী স্ত্রী হ'ল। ছিল মাদুরাই রামসুব্রাহ্‌মনিয়মের কনিষ্ঠা কন্যা। হ'ল ত্তিরুভালুর রামনাথম্ কৃষ্ণস্বামীর তৃতীয়া পুত্রবধূ। ত্তিরুভালুর কৃষ্ণস্বামী সুন্দরমের পত্নী।

এর পরেও তিন দিন ধরে বিবাহ উৎসব চলল! 'আশীর্বাদম্' ও 'পালিকাই' হয়ে পঞ্চম দিনে উৎসব শেষ হ'লে বরপক্ষ বিদায় নিলেন। সাবিত্রী রয়ে গেল পিতৃগৃহে। রজস্বলা হবার পর তার 'তেরাক্ষী' হবে। 'শান্তি কল্যাণম্' অনুষ্ঠান ক'রে সে যাবে পতিগৃহে।

তিপ্পান্ন বছরের ব্যবধানেও সাবিত্রী আম্মার সে উৎসবের কথা পরিষ্কার মনে আছে। সুদীর্ঘ অতীতের ঘটনাবহুল ইতিহাসের অলিখিত পাতা দ্রুত উলটিয়ে অলস অবসরে কল্পনার পথে বার বার তিনি দশ বছরের বালিকা বধূ সাবিত্রীর কাছে ফিরে যেতে চান। অনেক সময় যাত্রা তাঁর ব্যাহত হয়। দেখেন, রাস্তা নেই, অথবা অতীতের অন্য কোনও ঘটনা হঠাৎ মনে এসে জুড়ে বসে। কিন্তু মাঝে-মধ্যে এখনও রাস্তা তিনি পান :

সেই বিগত শতাব্দীর শেষ প্রান্তের মাদুরাই :

মীনাক্ষী-মূর্তির দিকে অপলকদৃষ্টি ছোট একটি মেয়ে :

একদিন মহাসমারোহে তার বিবাহ :

বিবাহ কথাটা মনে উঠতে হাসি পায় সাবিত্রী আম্মার—পরবর্তী জীবনে বার বার তাঁকে শুনতে হয়েছিল, বিবাহ-বাসরে নির্লজ্জ স্পর্ধার সঙ্গে বরের মুখে তাকাবার মুহূর্তে অপদেবতার অভিশাপ তাঁর ওপর নেমে এসেছিল।

সাবিত্রী আম্মা মাঝে মাঝে বিবাহ-বাসরের সাবিত্রীকে খুঁজে বার ক'রে প্রশ্ন করেন, এমন অসভ্য, বেহায়ার মত তাকিয়েছিলে কেন ?

উত্তর শুনতে পান, আয়নায় দেখতে পেলাম না যে।

প্রশ্ন করেন, দেখবার এমন নির্লজ্জ তাড়া ছিল কিসের ? সবুর সইল না ?

শুনতে পান, সবাই বললে, দেখ, তাকিয়ে দেখ। দেখতে গেলাম, অমনি সবাই হায় হায় ক'রে উঠল।

প্রশ্ন করেন, দেখতে গিয়েই ত সর্বনাশ করলে।

শুনতে পান, মোটেই নয়। দেখেছিলাম ব'লেই ত তুমি আজও একটু মনে করতে পার।

ঠিক মনে করতে পারেন না সাবিত্রী আম্মা। স্মৃতির আয়নায় যেটুকু আবছা ছবি অনেক কষ্টে আনতে পারেন, তার মধ্যেও কল্পনার ভেজাল।

বিবাহের পর পিতৃগৃহে বৎসরাধিক কাল সাবিত্রীর ভালই কাটল। নববিবাহিতা কন্যাকে পিসিমায়া আদরযত্নে রাখলেন ; শ্বশুরবাড়ীর জন্যে তৈরী করতে লাগলেন।

বিয়ের পাঁচ দিন যুবক স্বামীর সঙ্গে কয়েকবার সাবিত্রীর সাক্ষাৎ হয়েছে, অথচ কোন বাক্যালাপ হয় নি। যার সঙ্গে একত্র সে পুরোহিত-উচ্চারিত মন্ত্র পাঠ করেছে, সপ্তপদী হয়েছে, বহুবিধ স্ত্রী-আচারে বারম্বার যার অঙ্গ তার দেহ স্পর্শ করেছে, যার সঙ্গে বেশ কিছুটা হেঁটে মাঙ্গলিক ক্রিয়াকর্ম করতে হয়েছে, একত্র যেতে হয়েছে মীনাক্ষী-মন্দিরে, তার স্মৃতি সাবিত্রীকে অবর্ণনীয় কমনীয়তায় আরও সুন্দর ক'রে তুলেছিল। দৈনন্দিন জীবনের আনাচে-কানাচে আশ্চর্য বিস্ময়কর আনন্দের অপূর্ব অনুভূতিতে সাবিত্রীর অন্তর উদ্বেলিত হ'ত। সে লোকটি কে, কেমন, না জেনেও অপরিচয়ের দূরত্ব আপনা হতেই অনেকখানি অপসৃত হয়েছিল। সাবিত্রী সংগোপনে নিজেকে স্ত্রী-ভূমিকার জন্যে তৈরী

করেছিল। সন্ধ্যায় মীনাক্ষী-মন্দিরে সুন্দরেশ্বরের মূর্তির পানে তাকিয়ে দেহে তার পুলক লাগত ; মীনাক্ষীর বিলোলবিহ্বল হাসির রহস্য তার কাছে অনেকখানি খুলে যেত।

রামসুব্রাহ্‌মনিয়ম কন্যাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাবার আগে বিবাহিত জীবনের ন্যায়-নীতি সযত্নে শেখাতে শুরু করলেন! প্রতি রাত্রে সাবিত্রীকে কাছে ডেকে তিনি শাস্ত্র পাঠ করতেন ; মহাভারতের সাবিত্রী সত্যবান্ কাহিনী বার বার তিনি কেন পাঠ করতেন সে দিনের অনেক পরে সাবিত্রী তা বুঝতে পেরেছিল। তখন বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে বাবার ছোটখাট গোলগাল শরীরের দিকে তাকিয়ে (মুখের পানে তাকাতে তার লজ্জা হ'ত) সে গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনত, মহাভারতের সাবিত্রী বলবীর্যশালী শতপুত্র বরলাভের বর পেয়ে যমকে পুনরায় বলছেন, "হে মানদ, যে বর তুমি আমাকে দিয়েছ তা আমার পুণ্যবলেই সম্ভব হয়েছে। সেই পুণ্যবলে আমি আবার বর ভিক্ষা করছি, সত্যবান্ জীবনলাভ করুন, পতি বিনা আমি মৃত্যুতুল্যা। পতিহীন হয়ে কোনও সুখ আমি চাই নে, স্বর্গ চাই নে, প্রিয়বস্তু চাই নে, জীবন চাই নে। তুমি আমায় শতপুত্রের বর দিয়েছ, অথচ আমার স্বামীকে হরণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছ। তোমার নিজের বাক্যকে সত্যে পরিণত করতে হলে সত্যবানের বেঁচে ওঠা দরকার—সেই বর আমি তোমার কাছে চাচ্ছি।" বাবা যখন সংস্কৃত শ্লোক পাঠ ক'রে সাবিত্রীর শেষ বর কামনা বুঝিয়ে দিতেন, গৌর মুখখানা তার উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, যমের শেষ উত্তর নিজেই মনে মনে সে আবৃত্তি করত, সাবিত্রী, তোমার পতিকে মুক্তি দিলাম, ইনি নীরোগ, বলবান্ ও সফলকাম হবেন, চার শত বৎসর তোমার সঙ্গে জীবিত থাকবেন, যজ্ঞ ও ধর্মকার্য ক'রে যশস্বী হবেন।

তিপ্পান্ন বছর আগে তামিলনাদে দ্রাবিড় সংস্কৃতি ও দর্শনের চর্চা বেশী ছিল না ; সংস্কৃত চর্চারই প্রাধান্য ছিল। তামিল ভাষাও ছিল সংস্কৃতবহুল। রামসুব্রাহ্‌মনিয়ম কিন্তু দ্রাবিড় দর্শনেও বুৎপন্ন ছিলেন। 'কুরল' অর্থাৎ দু'লাইনের কবিতায় যে বিরাট প্রাচীন দ্রাবিড় সাহিত্য তালপাতার পুঁথিতে বন্দী, তার অনেকগুলি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। 'থিরুকুরল' তাঁর ভাল পড়া ছিল, মনুসংহিতার মতই তিনি তাকে শ্রদ্ধা করতেন। থিরুকুরল কোনও ব্যক্তি-বিশেষের রচনা নয় ; দ্রাবিড় সাধক ও সমাজনেতাদের জ্ঞানের নির্যাস। দু'লাইনের এক একটি কাব্য-কণিকায় জীবনবেদের সহজ সরল নির্দেশ। রাজা

থেকে সাধারণ মানুষ, প্রত্যেকের নীতি, ন্যায়, জীবন-বিধান থিরুক্কুরলে বর্ণিত। রামসুব্রাহ্মনিয়ম সাবিত্রীর কাছে নিয়মিত থিরুক্কুরল পাঠ করতেন ; ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দিতেন তার তাৎপর্য।

থিরুক্কুরলের যে অংশে স্ত্রী-ধর্ম, প্রেম, ধৈর্য, ক্ষমা, দয়া, পবিত্রতা ইত্যাদি গার্হস্থ্য-জীবনের নিত্যকার কর্তব্য নির্দেশিত, রামসুব্রাহ্মনিয়ম সেগুলি সাবিত্রীকে বিশেষ ক'রে শোনাতেন। কবিতা আবৃত্তি ক'রে বুঝিয়ে দিতেন ; যে নারী সুগৃহিণী, যে স্বামীর সম্পত্তিকে বাড়িয়ে তুলতে পারে, সেই সার্থক স্ত্রী ; সুগৃহিণী না হ'লে তার অন্য সমস্ত গুণ ব্যর্থ ; স্ত্রী যদি ধর্মপ্রাণা, গুণান্বিতা হয়, স্বামীর কোনও অভাব থাকে না ; স্ত্রী নির্গুণ, অধার্মিক হ'লে স্বামীর ভাগ্য সর্বদা অপ্রসন্ন। একটু থেমে রামসুব্রাহ্মনিয়ম পাঠ করতেন : 'পেন্নিন পেরেস্তাক্কা ইয়াওলা কার্পূ, ইন্নম তিন্ময় উণ্ডাহ্পেরিন'—স্ত্রী যদি স্থিরবুদ্ধি ও সতী হয় তার চেয়ে বড় গুণ আর তার দরকার নেই। প্রেম সম্বন্ধে কন্যাকে শিক্ষা দিতেন রামসুব্রাহ্মনিয়ম (আজ সাবিত্রী আম্মার সে কথা স্মরণে হাসি পায়) থিরুক্কুরল থেকে। পবিত্র প্রেম কোনও বাধা মানে না। প্রেমের অভাব মানুষকে নিঃস্ব, স্বার্থপর করে। ভালবাসলে মনে হয় তোমার অস্থিগুলি পর্যন্ত অন্যের। পবিত্র প্রেম সুস্থ কামনার সৃষ্টি করে। প্রেমজাত সুস্থ কাম স্বামী-স্ত্রীর জীবনে নির্মল, সুস্থির বন্ধুত্ব এনে দেয়। জীবনের পূর্ণ আস্বাদ পেতে হ'লে প্রেম চাই। কেননা, আন্বিন্ ওয়াঝিয়াড্ উয়র বিলাই, আঘদ্ ইলারক্ এনবু তোল পোর্তউড়াম্বু : শরীরে যে আত্মার বাস, তিনি আসেন প্রেমের পথে ; যার অন্তরে প্রেম নেই, তার দেহ আত্মাহীন, অস্থি-চর্মসার।

সাবিত্রী আম্মার এখনও রামসুব্রাহ্মনিয়মের সন্ধ্যাদীপালোকিত মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। দেখতে পান, ব্যথিত দৃষ্টিতে বাবা তাকিয়ে আছেন তার দিকে। সাবিত্রী আম্মার চোখ জ্বালা করে।

বিবাহের তের মাস পরে সাবিত্রী রজস্বলা হ'ল। শ্বশুরবাড়ী খবর গেল। রামসুব্রাহ্মনিয়ম সাবিত্রীর পতিগৃহ-যাত্রার জন্যে তৈরী হ'লেন। কিছুদিন তিনি ভুগছেন ; শরীর ভেঙ্গে আসছিল। এবার তিনি নিশ্চিন্ত হবার আশু সম্ভাবনায় সুখী হ'লেন।

সাবিত্রীর দেহে অপূর্ব পরিবর্তন এল। গৌরবর্ণ সোনালী আভায় হেম। আয়ত কালো চোখে নারীত্বের রহস্য ছায়া। দেহ পূর্ণতার ছোঁওয়া পেল। গতি ছন্দোময় মন্দ-তাল হ'ল। তারও বেশী পরিবর্তন এল তার মনে।

একদিকে গাঢ় শান্তি, অন্যদিকে জটিল অস্থিরতা ; দীর্ঘ-প্রতীক্ষা-শেষের ব্যাকুলতার সঙ্গে আরও অনেক প্রতীক্ষার অস্থির প্রস্তুতি।

এই সময়, সাবিত্রীর পতি-গৃহে যাত্রার ঠিক আট দিন আগে, মাদ্রাজ থেকে ত্রিরুভালুর ফিরবার পথে, ট্রেন-দুর্ঘটনায় সুন্দরম নিহত হ'ল।

সাবিত্রী আম্মা এখনও স্মৃতির পর্দায়, জীবনের অন্ধকারে, হাতড়ে বেড়ান, যেমন বেড়িয়েছিলেন সেই বহু বছর আগে, এ দুজ্ঞেয় রহস্যের দুর্ভেদ্য নীরবতা ভেদ করবার ব্যর্থ প্রয়াসে। বুঝতে পারেন না, এ রকম কেন হ'ল, কি প্রয়োজন ছিল, না হ'লে কার কি বিরাট ক্ষতি হ'ত। বারো বছরের একটি মেয়ের জীবনে নির্দয় ভূ-কম্প বিধান ক'রে বিধাতার কোন্ মহান উদ্দেশ্য সাধিত হ'ল? যে স্বামীকে সাবিত্রী দশ ভাগ বাস্তব ও নব্বুই ভাগ কল্পনা দিয়ে তের মাস ধ'রে গোপন যত্নে গ'ড়ে তুলেছিল, তার মৃত্যু-সংবাদে সেই সুদূর অতীতে সে যেমন নিশ্চল, নির্বুদ্ধি, নিস্পন্দ হয়ে গিয়েছিল, আজও সে দুর্ঘটনার কথা মনে হ'লে সাবিত্রী আম্মা প্রায় তাই হয়ে যান। তাঁর তেষট্টি বছরের দেহ-মনের গোপনতম গুহায় চরম-কঠিন দুর্ভাগ্যের হঠাৎ আক্রমণে নিদারুণ আহত বারো বছরের সদ্য-বিধবা সাবিত্রী এখনও বেঁচে আছে। পরবর্তী জীবনের বিচিত্র ঘটনা-বহুলতা তাকে সরাতে বা লুপ্ত করতে পারে নি। তার কাছে যমরাজ কোনওদিন এসে দাঁড়ান নি, কোনও বর-ভিক্ষার সুযোগ সে পায় নি।

এর পরের কয়েক বছর একটানা অন্ধকার। সাবিত্রী আম্মা সে কথা ভাবলে আজও শিউরে উঠেন। বিবাহ ও 'তেরাক্ষী'র মাঝখানে স্বামীর মৃত্যু কন্যার দুর্ভাগ্যের চরম প্রমাণ। এমনিতেই সেকালে তামিল সমাজে বিধবার সম্মান ছিল না ; সাবিত্রী, তার ওপর, মূর্তিমতী দুর্ভাগ্য। শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা জানিয়ে দিলেন, এ বিধবাকে ঘরে নেবার কোনও ইচ্ছে তাঁদের নেই। শুধু তাই নয়, একজন ব্রাহ্মণের হাতে যৌতুকস্বরূপ রামসুব্রাহ্মনিয়ম যে তিন হাজার টাকা দিয়েছিলেন তাও ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন। পিতৃদত্ত গহনা সাবিত্রীর সঙ্গেই ছিল। রোগক্লিষ্ট রামসুব্রাহ্মনিয়ম পর্যন্ত বীতরাগ হয়ে উঠলেন। কখনও তিনি সাবিত্রীকে কাছে ডাকতেন না, সে কাছে এলে নির্বাক্ থাকতেন। তার দিকে চেয়েও দেখতেন না।

পিসীদের কাছে দিনরাত দুর্ভাগ্যের জন্যে গালমন্দ শুনত। বিধবা হবার

সঙ্গে সঙ্গে তার চুল কেটে ছোট ক'রে দেওয়া হয়েছিল ; থান কাপড় পরতে হ'ত ; গায়ে জামা পরতে দেওয়া হ'ত না। একবেলা আহার করত সে ; মাসে অন্তত চার-পাঁচ দিন উপবাস।

এক বছর পর রামসুব্রাহ্মনিয়ম মারা গেলেন। সাবিত্রীর চোখে যেটুকু সামান্য আলো ছিল তাও এবার নিভল।

পিতার শ্রাদ্ধাদি কর্ম উপলক্ষ্যে দু' ভাই মাদুরাই এল। একজন বোম্বাই থেকে, অন্য জন কলকাতা। ক্রিয়াকর্ম শেষ হ'লে দু'জনকে একদিন অপরাহ্নে একত্র দেখতে পেয়ে সাবিত্রী এসে কাছে দাঁড়াল।

"আমার কিছু কথা আছে আপনাদের সঙ্গে।"

দুই ভাই বিরক্ত, স্নেহহীন জিজ্ঞাসায় তার মুখের দিকে তাকাল।

"আমার জীবন কি এমনি কাটবে ?"

হঠাৎ তাদের মুখে কথা জোগাল না। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বড় ভাই বলল, "উপায় কি ?"

"এমনি আমি জীবন কাটাতে পারব না।" সাবিত্রীর কণ্ঠস্বর মৃদু হলেও তাতে দৃঢ়তার সুস্পষ্ট ঝংকার ছিল।

"না পেরে কি করবে ? পারতেই হবে," বড় ভাই বলল।

"অসম্ভব।" সাবিত্রীর চোখে মরুর জ্বলন্ত শূন্যতা।

"তার মানে ?" বড় ভাই এবার রেগে উঠল। "তার মানে কি ? তোমার দুর্ভাগ্যের জন্যে তুমিই দায়ী। যতটা করা সম্ভব বাবা তোমার জন্যে সব ক'রে গেছেন। এখন আর কিছু করার নেই।"

সাবিত্রী আস্তে জবাব দিল, "আছে।"

"আছে ? কি আছে ? কোথায় আছে ?"

"আমি পড়ব।"

"পড়বে ?" আশ্চর্য হ'ল বড় ভাই। "এটা কি বেঙ্গল পেয়েছ ? এ মাদ্রাজ ! এখানে স্ত্রী-শিক্ষার চল নেই। তাছাড়া, তুমি কোথায় পড়বে, কেমন ক'রে পড়বে ?"

"তা জানি না। কিন্তু পড়তে আমাকে হবেই। শুধু তাই নয়। আমি চাকরি করব।"

ছোট ভাই এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিল। কলকাতায় তখন স্ত্রী-শিক্ষা বেশ প্রচলিত ; সমাজসংস্কারও অনেকখানি এগিয়ে গেছে। তার প্রভাব সে

একেবারে এড়াতে পারে নি। কিন্তু সাবিত্রী চাকরি করবে এমন দুঃসাহসী প্রস্তাব সেও কল্পনা করতে পারে নি। দু'জনেই এবার একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল। ওসব উদ্ভট অকল্যাণকর কথাবার্তা সাবিত্রী কদাচ যেন উচ্চারণ না করে। তার মাথায় শয়তানের বাস। দুর্ভাগ্য তার চিরসহচর। যদি সে কঠিন ভাবে নিজেকে শাসন না করে তাহলে সে সমস্ত পরিবারের মুখে কালি দেবে। তার পরিণাম ভয়ংকর হবে। পরিবারের নাম ডোবালে তারা চুপ ক'রে থাকবে না। কঠোর শাস্তি পেতে হবে সাবিত্রীকে।

এত ধমকে, শাসানিতেও সাবিত্রী ভয় পেল না।

"বাবা আমার নামে তিন হাজার টাকা ব্যাঙ্কে রেখেছিলেন। সেটা কি আছে?"

টাকা! কিসের টাকা?—দু'ভাই একসঙ্গে অবাক হ'ল—এসব কথা তাকে কে বলেছে? বাবা কোনও টাকা তার নামে রাখেন নি।

"রেখেছিলেন," সাবিত্রী বলল। "আমি জানি। তা কি আছে?"

"তোমার নামে কোনও টাকা নেই।"

"আমার গহনা।"

"তাতে তোমার কোন অধিকার নেই।"

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল সাবিত্রী। রাগল না, কাঁদল না, কাঁপল না।

তার পর বলল, "আমার টাকা, গহনা, সব আপনারা নিয়ে নিয়েছেন। বেশ, আমি ওসব কিছুই চাই নে। ও ছাড়াই আমার চলবে। আপনারা দু'জনেই এ সপ্তাহে চ'লে যাচ্ছেন। আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি, এ ভাবে আমি বাঁচব না। আমি পড়ব। কাজ করব।"

ব'লে, যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনি নিঃশব্দে প্রস্থান করল।

এ ঘটনায় বাড়ীতে তুমুল ঝড় উঠল। তার নিষ্ঠুর তাড়না সাবিত্রী নীরবে বহন করল। সে ঝড়ের কুৎসিত হাওয়া প্রতিবেশী, আত্মীয়মহলে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। তাতেও সাবিত্রী বিচলিত হ'ল না।

প্রথমে বড় ভাই বোম্বাই রওয়ানা হ'ল।

দু'দিন পর ছোট ভাই কলকাতা যাবে। যাত্রার দিন সে সাবিত্রীকে ডেকে বলল, "তোমার মৎলব কি?"

"পড়ব। কাজ করব।"

"কোথায় পড়বি ?"

"ভাবছি।"

"এখানে কিন্তু হবে না।"

"জানি।"

"কলকাতা যাবি ?"

চুপ করে রইল সাবিত্রী।

"ওখানে মেয়েরা স্কুল-কলেজে পড়ে।"

"আপনি নিয়ে যাবেন ?"

"তোর বৌঠানকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখি।"

"তিনি রাজী হবেন না।"

"সেখানেই তো বিপদ্। নইলে—"

"দরকার নেই। আমি নিজেই কিছু একটা করব।"

"কি করবি ?" অগ্রজের কণ্ঠে আতঙ্ক।

"পড়ার ব্যবস্থা !"

"বিপদে পড়বি।"

"এর চেয়ে বড় বিপদে পড়ব না।"

ভাই চুপ ক'রে গেল। সাবিত্রী চ'লে যাচ্ছিল, সে ডাকল।

"শোন।"

সাবিত্রী দাঁড়াল।

"বাবা তোর নামে তিন হাজার টাকা ঠিকই রেখেছিলেন।"

সাবিত্রী কিছু বলল না।

"সে টাকা তুই পাবি নে।"

"আপনারই নিয়ে নিয়েছেন," দাঁতে দাঁত চেপে আস্তে বলল সাবিত্রী।

"আমি তোকে কিছু টাকা দিতে পারি।"

"কত ?"

"শ' খানেক।"

সাবিত্রী বলল, "চাই নে।"

একদিন রাত্রের ট্রেন ধ'রে তের বছরের সাবিত্রী যখন মাদ্রাজ শহরে পৌছল তখন সবেমাত্র প্রভাত হয়েছে। স্টেশনে নেমে ঘোড়ার গাড়ীতে চাপল সে। বুক কাঁপছে। কিন্তু মুখে শঙ্কা বা ভয়ের চিহ্ন নেই।

সন্দেহের চোখে গাড়োয়ান তাকে দেখছিল। গন্তব্যস্থান জানতে চাইলে।

স্থির কণ্ঠে সাবিত্রী বলল, "আডিয়ার।"

স্টেশন থেকে অনেকখানি দূর। ছায়াশীতল মাদ্রাজ শহরের রাজপথে চলল ঘোড়ার গাড়ী ; অদূরে সমুদ্রের গর্জন। নিজের বুকের মধ্যে আরও বিরাট সমুদ্র উন্মত্ত তাণ্ডবে নাচছে, সাবিত্রী বঙ্গোপসাগরের গর্জন শুনতে পেল না। মাউণ্ট রোড ধ'রে গাড়ী চলেছে, পথের যেন আর শেষ নেই। যেন এক যুগ পরে আডিয়ার নদী পার হবার আগে গাড়োয়ান প্রশ্ন করল, কোথায় যাবেন ?

সাবিত্রী শুষ্ককণ্ঠে জবাব দিল, অ্যানি বেসান্তের কাছে।

গাড়ী এসে থামল থিয়োসোফিক্যাল সোসাইটির উদ্যান-ঘেরা বাড়ীর দরজায়। সাবিত্রী গাড়োয়ানকে প্রাপ্যের চেয়ে বেশী ভাড়া দিল।

প্রভাতের সূর্য তখন বাগানের সবত্র ছড়িয়ে পড়েছে। আকাশ ঘন নীল। নীরব উদ্যানে পাখীর সমবেত কূজন। সাবিত্রী বুকের কাঁপুনি দু'বাহুর চাপে বন্ধ করতে চাইল। বিবশ পা কিছুতে টেনে দরজার ভেতর নিতে পারল না। দরজার সামনে বাঁধান কালভার্টে ব'সে পড়ল।

বুড়ো এক মালী কাজ করছিল বাগানে। সে এসে দাঁড়াল পাশে। অনেকক্ষণ অগোপন কৌতূহলে সাবিত্রীকে সে দেখল। তারপর প্রশ্ন করল, কি চাই।

"অ্যানি বেসান্তকে," ভয়ে ভয়ে বলল সাবিত্রী।

বুড়ো কি যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। সাবিত্রী তার দৃষ্টিপথ অনুসরণ ক'রে দেখতে পেল অপূর্ব সুন্দরী শ্বেতচর্মা এক বৃদ্ধা দরজার দিকে এগিয়ে আসছেন। মাথার চুল শাদা, পরণে ঝুল ঝুল গাউন, চোখে চশমা। সঙ্গে তাঁর তেইশ চব্বিশ বছরের একটি যুবক।

বুড়ো মালী চটপট বাগানে অন্তর্হিত হ'ল।

অ্যানি বেসান্ত দরজার সামনে এসে তাকে দেখতে পেলেন। সাবিত্রী কাঁপতে কাঁপতে তাঁর সম্মুখে নিজেকে টেনে আনল।

"কে তুমি ?" মিষ্টি গলায় শুধালেন অ্যানি বেসান্ত।

"আমার নাম সাবিত্রী।" যেটুকু ইংরেজী বাবার কাছে শিখেছিল তার প্রথম ব্যবহার করল সাবিত্রী।

"কি চাও তুমি ?"

এবার তামিল ভাষায় সাবিত্রী ব'লে গেল, "আমি মাদুরাই থেকে আপনার

কাছে এসেছি। আমার স্বামী মারা গেছেন। আমি বিধবা। আমার বাবা নেই। ভাইদের ঘরে আমার স্থান নেই। আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই।”

অ্যানি বেসান্ত ছেলেটির দিকে তাকালেন। সে ইংরেজীতে তাঁকে কি সব বলল।

অ্যানি বেসান্ত প্রশ্ন করলেন, “তুমি কি করতে চাও?”

সাবিত্রী নিজেই এবার বলতে পারল, “আমি পড়তে চাই।”

অ্যানি বেসান্ত গম্ভীর হলেন। চিন্তা করলেন। সাবিত্রী আর্ত প্রতীক্ষায় তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে।

অ্যানি বেসান্ত ছেলেটিকে বললেন, “ধর্মরাজ, একে ভেতরে নিয়ে যাও। পরে আমি ওর সব কথা শুনব। স্নান সেরে, আহার ক'রে ও এখন বিশ্রাম করুক।”

যুবক সাবিত্রীকে বলল, “আমার সঙ্গে এসো।”

নম্র পদে, ক্লান্ত দেহে, তৃপ্ত অন্তরে সাবিত্রী নতুন জীবনে পা দিল।

আট

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যে নব-জাগরণের অরুণ-প্রভা সঞ্চারিত হয়েছিলো তামিলনাদ তাতে উদ্বেলিত হয়েছিল সবচেয়ে কম।

১৮২৮ সনে রামমোহন রায় কলকাতায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করলেন; সে বছরেই সতীদাহ প্রথা কানুন দ্বারা নিষিদ্ধ হল। দু'বছর পরে রামমোহন মুঘল বংশধর বাহাদুর শাহের দাবী প্রমাণ করতে যখন ইংলণ্ডে গেলেন, তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ফরাসী দেশের রাজধানী পারীতে গিয়ে ফরাসী বিপ্লবের উদাত্ত উদ্দীপক বার্তা—স্বাধীনতা, ঐক্য, ভ্রাতৃত্বের প্রতি পদানত ভারতের প্রণতি জানান। ইংরেজ নৃপতি চতুর্থ উইলিয়মের রাজ্যাভিষেকে স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে একাসনে বসবার সম্মান পেলেন রাজা রামমোহন রায়; পারীতে পেলেন গণ-সম্বর্ধনা; নব্যশিক্ষিত ভারতবাসীর চিত্ত সর্বপ্রথম অনাস্বাদিতপূর্ব উত্তেজনায় উদ্বেলিত হ'ল। একই সময়ে স্যার সৈয়দ আহমেদ খান উত্তর ভারতের মুসলমানদের মধ্যে নব-জাগরণের সূচনা করলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা ভারতবর্ষে নিশ্চিতভাবে প্রবাহিত হতে শুরু করল। ব্যাপক মানস-বিপ্লবে যাঁরা সুযোগ্য কর্ণধারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন, তাঁদের মধ্যে বোম্বায়ের দাদাভাই নৌরজী, ফিরোজ-শা-মেহতা, দীনশা ওয়াচা, তেলাঙ্গ, তিলক; বঙ্গে বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল; উত্তর ভারতে দয়ানন্দ, শ্রদ্ধানন্দ, লাজপৎ রায়।

তামিলনাদে অনুরূপ কোন সমাজ-মানস-সংস্কারক আন্দোলন গ'ড়ে উঠল না। স্তিমিত ধারায় খানিকটা আলো সঞ্চারিত হ'ল মাত্র।

ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে বোম্বাইয়ে প্রার্থনা-সমাজ স্থাপিত হ'ল, তার মাধ্যমে ভাণ্ডারকর, রাণাডে, নারায়ণ চন্দ্রভারকর সমাজসংস্কারে অবতীর্ণ হলেন। প্রায় একই সময়ে মহারাষ্ট্রে পরমহংস মণ্ডল নামে এক গুপ্ত সমিতি জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করল, বিধবাদের বিবাহের জন্যে আন্দোলন গ'ড়ে তুলল। ১৮৯০ সনে রাণাডে, তিলক প্রমুখ পঞ্চাশ জন ব্রাহ্মণ খ্রীষ্টান মিশনারীদের সঙ্গে একত্র চা-বিস্কুট আস্বাদ ক'রে সমাজ থেকে নির্বাসিত হলেন; শাস্ত্রীয় মতে

শুচি-শুদ্ধ হবার পর তাঁরা পুনঃপ্রবেশের অনুমতি পেলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সমাজ-সংস্কার বন্যার মত মহারাষ্ট্রকে প্লাবিত করে তুলল।

বঙ্গে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, ঈশ্বরচন্দ্রের সমবেত প্রচেষ্টায় যে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক মুক্তিপথ অনর্গলিত হ'ল, তার প্রেরণা অচিরে ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত ভারতবর্ষে। রামমোহনের কাজ অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গেলেন দাদাভাই নৌরজী; বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষের জন্য সম্মানিত স্থান অর্জিত হ'ল এঁদের দু'জনের প্রতিভায়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভাণ্ডারকর ও তিলক ভারতবর্ষের অতীত ঐতিহ্যের অমর সম্পদ্ পৃথিবীর কাছে খুলে ধরলেন; তৎক্ষণাৎ পশ্চিমের মনীষীগণ আকৃষ্ট হলেন; বহু শতাব্দীর ব্যবধানের পর ভারত ও ইয়োরোপের পুনরায় জ্ঞান বিনিময় শুরু হ'ল।

রমেশচন্দ্র দত্ত, রাণাডে ও নৌরজী ইতিহাস ও অর্থনীতি রচনার প্রবর্তন করলেন; আশুতোষের চেষ্টায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্রে পরিণত হ'ল; জগদীশ বসু ও রামানুজম্ বিজ্ঞান ও গণিতে ভারতের গৌরব প্রতিষ্ঠা করলেন। হ্যাবেল, অবনীন্দ্রনাথ ও আনন্দকুমার স্বামীর মাধ্যমে ভারতীয় কলা-শিল্প পুনর্জন্ম পেল। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও মহম্মদ ইক্‌বাল ভারতবর্ষকে সাহিত্য দিলেন। বাংলার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, পাঞ্জাবের আর্যসমাজ, মুসলমানদের আঞ্জুমান-ই-হিমায়াৎ-উল-ইস্‌লাম, মহারাষ্ট্রের গণপতি ও শিবাজী উৎসব: এসব মিলে সর্বভারতীয় আধ্যাত্মিক বিপ্লব তৈরী হ'ল। তার সঙ্গে বহুদিনের অবরুদ্ধ মনন-শক্তি ভাববন্যায় মুক্তি পেয়ে, পশ্চিমের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে আরম্ভ হ'ল ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলন।

১৮৮৫ সনের ২৮শে ডিসেম্বর বোম্বাই শহরের গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোডে গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজে, বাহাত্তর জন প্রতিনিধির একত্রিত সংকল্পে, অ্যালেন অক্টেভিয়ান হিউম নামে বহুদূরদর্শী জনৈক ইংরেজের পৌরোহিত্যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হ'ল। সভাপতি নির্বাচিত হলেন বঙ্গসন্তান উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডব্লু. সি. বোনার্জি।

যে তামিল-সমাজে নবোদ্ভিন্ন-যৌবনা সাবিত্রী বিদ্রোহ করল তাতে না ছিল ঈশ্বরচন্দ্র, না ব্রাহ্মসমাজ, না আর্য সমাজ। ভরতব্যাপী বিবর্তনবন্যা তামিলনাদে প্রাচীনতার বাঁধ ভাঙতে পারে নি। কংগ্রেসের প্রথম কয়েক অধিবেশনে তামিলনাদের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের অনেকে উপস্থিত ছিলেন; তাঁদের বেশীর ভাগ হাইকোর্টের বিচারপতি, অথবা বিখ্যাত আইনজীবী। প্রথম অধিবেশনে

সর্বপ্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন "হিন্দু" পত্রিকার সম্পাদক, জি. সুব্রাহ্মনিয়া আয়্যার। কংগ্রেসের শৈশবে যাঁরা নেতৃত্ব করতে এগিয়ে এসেছিলেন— স্যার এস. সুব্রাহ্মনিয়া আয়্যার, ভি. কৃষ্ণস্বামী আয়্যার, স্যার শংকরন্ নায়ার, স্যার ভেপা রামেশম্, টি. ভি. শেষগিরি আয়্যার, পি. আর. সুন্দর আয়্যার, স্যার পি. এস. শিবস্বামী আয়্যার, এমন কি স্যার সি. পি. রামস্বামী আয়্যার—এঁরা সকলেই নরমপন্থী, সংরক্ষণশীল; সমাজিক পুনর্গঠনে এঁদের সায় ছিল না; জাতীয় আন্দোলন উগ্র হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এঁরা সরে দাঁড়িয়েছিলেন।

ইতিহাসের পাতা অর্থপূর্ণ পরিহাসে ভরা। তামিলনাদে গত একশ' বছরে যে একটিমাত্র আন্দোলন বহুজনের চিত্ত আলোড়িত করেছে তার নায়িকা ইংরেজ রমণী অ্যানি বেসান্ত। কর্তমান কালের ইতিহাসে মানব প্রগতির জন্য যে কয়জন নারী আজীবন বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণা, অ্যানি বেসান্ত তাঁদের একজন। স্বদেশে এমন কোনও প্রগতিমূলক আন্দোলন ছিল না যাতে অ্যানি বেসান্ত সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। জন্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্যে প্রত্যক্ষ আন্দোলন চালিয়ে তিনি একদা বহু মানুষের নিন্দাভাজন হয়েছিলেন। পরবর্তী কালে সমাজতন্ত্রবাদ থেকে নারীর ভোটাধিকার পর্যন্ত একের পর এক প্রতিষ্ঠিত-স্বার্থের বুকে ভীতিসঞ্চারক কার্যে অ্যানি বেসান্ত আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অসামান্য বুদ্ধি, সুতীক্ষ্ণ বিচার শক্তি, গভীর মমতাবোধ, অসাধারণ বাগ্মিতা ও লেখন সৌকর্য তাঁকে সমস্ত ইয়োরোপ ও আমেরিকায় প্রসিদ্ধি দিয়েছিল।

পরিণত বয়সে অ্যানি বেসান্ত ভারতীয় আধ্যাত্মবাদে আকৃষ্ট হলেন। গ্রহণ করলেন রুশ মহিলা মাদাম ব্লাভাট্স্কির শিষ্যত্ব। মাদাম ব্লাভাট্স্কি বিশ্বাস করতেন পূর্বজন্মে তিনি ছিলেন ভারতীয়। ভারতবর্ষে এসে অ্যানি বেসান্ত বারাণসীতে থিয়োসোফিক্যাল কলেজ স্থাপনা করেন। কালে থিয়োসোফিক্যাল সোসাইটির কেন্দ্র মাদ্রাজ শহরে স্থানান্তরিত হ'ল। অ্যানি বেসান্তের নেতৃত্বে মাদ্রাজে এই কেন্দ্র পৃথিবীর মন আকর্ষণ করল। প্রথম কয়েক বছর অ্যানি বেসান্ত আধ্যাত্মিক কাজে নিমগ্ন রইলেন। থিয়োসোফিক্যাল আন্দোলনে তামিলনাদের অনেক বুদ্ধিজীবী যোগ দিলেন।

সাবিত্রী এসে অ্যানি বেসান্তের কাছে দাঁড়াল আধ্যাত্মিকতার টানে নয়, জীবনের সন্ধানে।

ধর্মরাজ নামে যে যুবককে অ্যানি বেসান্ত নির্দেশ দিলেন, তার পেছনে পেছনে সাবিত্রী ফটক অতিক্রম ক'রে উদ্যানের বুকচেরা রাস্তা পেরিয়ে, বড় দালানবাড়ীর মধ্যে ঢুকল। প্রবীণা একটি রমণীকে ডেকে ধর্মরাজ আদেশ করল সাবিত্রীকে ভেতরে নিয়ে স্নান, আহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে। নতদৃষ্টি সাবিত্রীকে উদ্দেশ করে ধর্মরাজ বলল, "আপনি স্নান করে কিছু খেয়ে নিন। তার পর বিশ্রাম করুন।"

সাবিত্রী দাঁড়িয়ে রইল।

ধর্মরাজ তার দিকে তাকিয়ে আশ্বাস দিল, "এখানে সব কিছু ব্রাহ্মণের হাতে তৈরী। খেতে আপনার আপত্তি হবার কথা নয়।"

সাবিত্রী এক পা এগিয়ে আবার থামল।

ধর্মরাজের চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করল, "উনি আমার জন্য কিছু করবেন ত ?"

ধর্মরাজ মৃদু হেসে বলল, "তাই ত মনে হচ্ছে।"

চব্বিশ ঘণ্টা ভয়ানক অস্থিরতার মধ্যে কাটবার পর অ্যানি বেসান্ত সাবিত্রীকে ডেকে পাঠালেন। কম্পিতবক্ষ সাবিত্রী তাঁর সামনে চেয়ারে বসল, ধর্মরাজের সহায়তায় অ্যানি বেসান্ত তাকে অনেক প্রশ্ন করলেন। পিতার কাছে ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে প্রাথমিক যে শিক্ষাটুকু সাবিত্রী পেয়েছিল, তার পরিচয় পেয়ে অ্যানি বেসান্ত সন্তুষ্ট হলেন।

সাবিত্রীর কাহিনী শুনে বেদনা-গম্ভীর অ্যানি বেসান্ত বললেন, "তোমার জন্যে ব্যবস্থা করেছি।"

আশা-তপ্ত চোখে সাবিত্রী তাকিয়ে রইল।

"আমার এখানে শিক্ষার্থীদের থাকবার ব্যবস্থা নেই। ম্যারিনার কাছে সরকার *উইডোস্ হোম স্থাপন করেছেন। তোমাকে সেখানে যেতে হবে। ওরা তোমার থাকা, খাওয়ার ব্যবস্থা করবেন। হাতের কাজ শিখলে কিছু অর্থ তুমি উপার্জন করতে পারবে।"

অ্যানি বেসান্ত শেষ না করতেই সাবিত্রী বলে উঠল, "আমার পড়া ?"

"তুমি পড়বেও," মৃদুহাস্যে উত্তর দিলেন বেসান্ত। তুমি নিশ্চয় পড়বে। আমাদের বিদ্যালয় আছে, তাতে তুমি পড়তে পারবে। সরকারী স্কুলেও পড়তে পার।"

"আপনার স্কুলে পড়ব।"

"তাই ভাল। তোমার বয়স হয়েছে, কিন্তু তোমাকে নীচে থেকে শুরু করতে হবে। তোমার কথা হেড মিস্ট্রেস্‌কে বলে দেব। যত্ন নিয়ে পড়াবেন।"

"কবে ভর্তি হব?"

"কাল তুমি উইডোস্‌ হোমে যাবে। ধর্মরাজ নিয়ে যাবে তোমায়। এক সপ্তাহের মধ্যে স্কুলে ভর্তি হতে পারবে।"

"এত দেরি?"

"এক সপ্তাহ খুব বেশী দেরি নয়।" প্রশ্রয়-হাসি ফুটল অ্যানি বেসান্তের মুখে। "তোমার বয়সে এক সপ্তাহ দীর্ঘকাল। বড় হলে দেখবে মোটেই দীর্ঘ নয়।"

সাবিত্রী উঠল। অ্যানি বেসান্ত আবার বললেন, "যেখানে যাচ্ছ স্থান ভাল নয়। বড় বিষণ্ণ। বড় চাপা। তোমার মনে জোর আছে ত?"

সাবিত্রী শুধু ঘাড় নাড়ল।

"তা হলে তুমি তৈরী থেকো। ধর্মরাজ কাল সকালে তোমায় নিয়ে যাবে।"

সাবিত্রী দরজার দিকে এগিয়ে গেল। পরক্ষণে কি মনে হ'ল, অ্যানি বেসান্তের কাছে এসে গড় হয়ে প্রণাম করল।

অ্যানি বেসান্ত সস্নেহে তার মাথায় হাত রাখলেন।

বৃদ্ধ বয়সেও সাবিত্রী আম্মা সে পরম-আশ্বাস হাতের স্পর্শ ভুলতে পারেন নি। এখনও, আজও, বহু দূর পথ অতিক্রান্ত জীবনের অন্তিম লক্ষ্যের বিষণ্ণ ব্যর্থতার কাছাকাছি এসেও, অনেক সময় সাবিত্রী আম্মা সেদিনের সেই হাতের স্পর্শ মাথায় অনুভব করেন। আজও তাঁর দেহ শিহরিত হয়। দেহে দেহে স্পর্শে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ জাগে, বিরাট শক্তি জন্ম নেয়। মানুষের অঙ্গস্পর্শে মানুষ বদলে যায়। সাবিত্রী আম্মার জীবনে একাধিকবার এ রকম আশ্চর্য বিভূতি-লাভ সম্ভব হয়েছে। তের বছর বয়সে অ্যানি বেসান্তের আশীর্বাদ হস্তের আশ্বাস-স্পর্শ যেমন তাঁকে সুদীর্ঘ সংগ্রামের জন্যে তৈরী করেছিল, তেমনি আর একদিন, আর একজনের পাথর-কঠিন কুসুম-কোমল হাতের স্পর্শ তাঁকে বৃহত্তর মহত্তর সংগ্রামের পথে নামিয়েছিল। সেদিনকার কথাও সাবিত্রী আম্মা বিস্মৃত হন নি। আবার অন্য একদিন অন্য একজনের দেহস্পর্শ তাঁকে বৃথা জ্বালিয়ে দিয়েছিল; নিজের দেহে যে এত আগুন সে খবর, তার আগে, কোনও দিন কি তিনি জানতেন?

ম্যারিনা মাদ্রাজ নগরীর সমুদ্র-সৈকত। প্রশস্ত রাজপথ বক্ররেখায় বিস্তারিত। সমুদ্রতীরের অদূরে, অপেক্ষাকৃত নির্জন পরিবেশে, বিধবা-ভবনের গোলাকার গৃহ! চারিদিকে উঁচু প্রাচীর। ভেতরকার কঠিন বিষণ্ণতা স্থাপত্যে মূর্ত। সন্ধ্যা নামলে চতুর্দিক জনবিরল হয়ে যায়। গোলাকার বাড়ীটা আরও বিষণ্ণ হয়ে ওঠে।

ধর্মরাজ ঘোড়ার গাড়ী ক'রে সাবিত্রীকে বিধবা-ভবনে পৌঁছে দিল। অ্যানি বেসান্তের নামে বিধবা-ভবনে খাতির পেল সাবিত্রী। বিপুলদেহা অধ্যক্ষা সাবিত্রীকে বসবার জন্যে চেয়ার দিলেন। ধর্মরাজ অ্যানি বেসান্তের নাম ক'রে সাবিত্রীর পড়াশোনার আশু ব্যবস্থা ক'রে দেবার জন্যে অনুরোধ জানাল। সাবিত্রীকে চমৎকৃত ক'রে আরও বলল, "মিসেস বেসান্তের ইচ্ছে টাকা-পয়সার অভাবে এঁর বিদ্যাশিক্ষার ব্যাঘাত না হয়। প্রয়োজন হ'লে টাকা তিনি পাঠিয়ে দেবেন।"

কাগজপত্র সই করে ধর্মরাজ বিদায় নেবার সময় সাবিত্রী তাকে বিনম্র ভঙ্গিতে বলল, "আপনি মাঝে মাঝে আসবেন ত?"

"আসতে ত হবেই," ধর্মরাজ জবাব দিল। "মিসেস বেসান্ত আপনার ভার আমার ওপরেই দিয়েছেন।"

অকারণ লজ্জায় কান গরম হ'ল সাবিত্রীর। মুখে বলল, "আপনার দয়া।"

এবার শুরু হ'ল সাবিত্রীর জীবন-সংগ্রাম। অনেকগুলি বছর, যার সমবেত স্মৃতি সাবিত্রী আম্মার জীবনে এক পরম অভিজ্ঞান। পুরুষ অনেক বিপর্যয় অতিক্রম ক'রে অনেক দুঃখ-কষ্ট পরাজয় ক'রে মানুষ হয়। প্রতি দেশে, প্রতি যুগে জীবন-যুদ্ধে পুরুষের জয় বারংবার বিঘোষিত। কিন্তু মেয়েদের সংগ্রাম একেবারে আলাদা। প্রতি মুহূর্তে তাদের লড়তে হয় দৃঢ়-শিকড় সংস্কারের সঙ্গে, পুঞ্জীভূত নিষেধ, পল্লবিত বাধার সঙ্গে। তার চেয়েও শক্ত, প্রতিদিন সংগ্রামী মেয়েকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় নিজের মান, মর্যাদা, শুচি, ন্যায়, নীতি। তার প্রস্ফুটিত দেহ হয়ে ওঠে সবচেয়ে বড় দুশমন। নিজেকে প্রকাশ করবার সঙ্গে সঙ্গে বহু যত্নে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে হয়। মুক্তির সন্ধানে বেরিয়ে প্রতি পদে বন্ধনের শৃঙ্খল আর্তনাদ ক'রে ওঠে।

বিধবা সাবিত্রীর কুমারী দেহ মন তাঁর সবচেয়ে বড় শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়াল।

উইডোস হোমে সাবিত্রীর সঙ্গে আরও একুশটি বিধবা। তাদের অধিকাংশ জীবনে পরাজয় মেনে নিয়েছে। কোনও মতে জীবিকাসংস্থান তাদের একমাত্র

উদ্দেশ্য। বার জন সাবিত্রীর চেয়ে অনেক বড়—বাইশ থেকে ত্রিশ বছর তাদের বয়স। পাঁচ জন সাবিত্রীর চেয়ে সামান্য বড়। দু'টি তার সমবয়সী। আর দু'টি তারও চেয়ে ছোট। যারা বয়স্কা, তাদের মন ক্ষুদ্র, দৃষ্টি ময়লা। যারা কুড়ির নীচে, তাদের মন বিষণ্ণ, নিরুৎসাহ। সাবিত্রীর সমবয়সীরা তবু একটু জীয়ন্ত। উইডোস হোমের সঙ্গেই হাত শিল্প কুটির। তাঁত বসান হয়েছে আটটা। অনেক রকম হাত-বোনা জিনিসের ব্যবস্থাও আছে। আশ্রিতাদের সবাইকে হাতের কাজ শিখতে হয়। তারা যে-সব পণ্য তৈরী করে তার বিক্রয়-লব্ধ অর্থ হোমের প্রাপ্য। বিধবা-ভবন অবশ্য চলে সরকারী ও বেসরকারী বদান্যতায়।

প্রথম দিন হ'তে সাবিত্রী গভীর মনোনিবেশে জীবন-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'ল। অল্পদিনে হস্ত-শিল্পের অনেক চারু কাজ তার আয়ত্তে এসে গেল। সকাল থেকে রাত্রি, নিষ্ঠুর অভিনিবেশে নিজের সবটুকু শক্তি সে নিযুক্ত করল ভবিষ্যৎ-নির্মাণে। হোমের ক্লেদ-ক্লিন্ন দিক্‌গুলির দিকে তাকিয়ে দেখবার সময়টুকু পর্যন্ত নিজেকে সে দিল না। তার বিরুদ্ধে অনেকবার অনেক নালিশ দানা বেঁধে উঠল; কোনটাই শেষ পর্যন্ত টিকল না। সেবাপরায়ণতায় সবার অন্তর সে অল্পবিস্তর জয় করল। অধ্যক্ষা পর্যন্ত তাঁর ওপর মোটামুটি খুশি হলেন। কাজে কর্মে তার নির্ধারিত অংশের অনেক বেশী সে ক'রে যেতে লাগল। কিন্তু তার প্রধান অভিনিবেশ পঠনে। অনেক দূরে স্কুল। হেঁটে যেতে আসতে হয়। সাবিত্রীর ক্লান্তি নেই। অখণ্ড প্রচেষ্টায় বিদ্যাভ্যাসে সে দ্রুত এগিয়ে গেল। পাঁচ বছর পরে সাবিত্রী বেশ ভালভাবে ম্যাট্রিক পাস করল।

ধর্মরাজ প্রতিসপ্তাহে একবার নিয়মিত তার খোঁজ নিতে আসত। সাধারণতঃ রবিবারে, যেদিন সাবিত্রীর ছুটি। কুশল প্রশ্ন করে, খোঁজ খবর নিয়ে চ'লে যেত। তাদের সম্পর্ক বেশ একটু অস্বাভাবিক ছিল! অ্যানি বেসান্তের নির্দেশে তাঁর আশ্রিতা একটি মেয়ের শুভাশুভ দেখবার দায়িত্ব পালনের বাইরে সাবিত্রীর প্রতি নিজস্ব, ব্যক্তিগত কোনও উৎসাহ ধর্মরাজ প্রকাশ করত না। সাবিত্রীও তার সঙ্গে কথা বলত শান্ত সংকোচে, কোমল দূরত্বের ব্যবধানে। সে যেন কারুর প্রতিনিধি মাত্র, তার স্বকীয় কোন সত্তা নেই। ব্যক্তিগত কোনও সংলাপ তাদের হ'ত না। সাবিত্রীর স্বাস্থ্য, পড়াশোনা, কাজ-কর্মের সংবাদ ধর্মরাজ নিরুত্তাপ নিষ্ঠার সঙ্গে সংগ্রহ করত। এ ছাড়া যা কথাবার্তা হ'ত তার সবটুকুই অ্যানি বেসান্তকে নিয়ে। ধর্মরাজ অ্যানি বেসান্তের

ভক্ত, তাঁর থিয়োসোফিক্যাল আন্দোলনের উৎসাহী কর্মী। তার কাছে সাবিত্রী শুনতে পেত, পৃথিবীর নানা দেশ থেকে কত নামজাদা নারী-পুরুষ বেসান্ত-দর্শনে সমাগত হন; কি ভাবে থিয়োসোফী পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারিত হয়। জিড্ড কৃষ্ণমূর্তিকে নিয়ে যে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন এ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে গ'ড়ে উঠেছিল তার আশ্চর্য কাহিনীও ধর্মরাজ সাবিত্রীকে শোনাত। কৃষ্ণমূর্তিকে থিয়োসোফীর জীবন্ত প্রামাণ্য নিদর্শনরূপে দাঁড় করিয়ে অ্যানি বেসান্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন তার বিবরণ দিতে দিতে ধর্মরাজ উত্তেজিত হয়ে উঠত; সাবিত্রী শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনে যেত, কিন্তু অন্তরে তার পুলক জাগত না। অ্যানি বেসান্তের ধর্মচর্চা সাবিত্রীর মন, সেই তারুণ্যের তরল দিনগুলিতেও, উদ্বেল করে নি। ধর্মরাজের সঙ্গে তার নিরুত্তাপ সম্পর্কের এও একটা প্রধান কারণ।

ম্যাট্রিক পাশ করার পর একদিন ধর্মরাজ এসে সাবিত্রীকে বলল, "আপনাকে সোসাইটিতে যেতে হবে।"

"কেন?"

"মিসেস বেসান্ত ডেকেছেন।"

আনন্দ হ'ল সাবিত্রীর। এতগুলি কঠিন বছরে একবারও তাকে অ্যানি বেসান্ত ডেকে পাঠান নি। ধর্মরাজ নিয়মিত খোঁজ-খবর করেছে, তাই সাবিত্রী জেনেছে তিনি তাকে বিস্মৃত হন নি। ম্যাট্রিক পাশ করার পর মনে মনে সে জীবনের আর এক সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হবার চঞ্চল সমস্যা অনুভব করছিল; কলেজে পড়বার বড় ইচ্ছে; রোজগার করবার বড় প্রয়োজন। বিধবা-ভবনের অধ্যক্ষা উপদেশ দিচ্ছিলেন ট্রেনিং নিয়ে স্কুলে চাকরির জন্যে তৈরী হতে। এ পরামর্শের ব্যবহারিক উৎকর্ষ সাবিত্রী জানত। কিন্তু অন্তর তার সমুদ্রের মত বিক্ষুব্ধ। বিদ্রোহে উদ্বেল বীচিমালার দূরদূরান্তগামী ব্যাকুল, নির্বোধ প্রবাহের আকর্ষণ অহরহ সাবিত্রীকে টানছে। সমুদ্রের পারে ব'সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কতদিন তার কেটে গেছে ঢেউ-এর বিশৃঙ্খল উন্মত্ততা দেখে দেখে। অজ্ঞাত-জন্ম এক একটা বিরাট ঢেউ হঠাৎ পাড়ের বালু-মসৃণ গা বেয়ে উঠে এসেছে। সাবিত্রীর মনে হয়েছে, তার বুকের ঢেউগুলিও অমনি উদ্দাম, মুক্তির জন্যে ব্যাকুল। সমুদ্র, বার বার সাবিত্রী বলেছে, তুমি আমার সখা; একমাত্র তোমারই দিকে তাকিয়ে আমি নিজেকে একটু চিনতে পারি। আমাকে প্রসারিত কর, আমিও দেখবে সমুদ্র হয়েছি। আমাকে প্রবাহিত হতে দাও,

দেখবে কত কূল ছাপিয়ে আমি বয়ে গেছি, আমার দিগন্ত আকাশে বিলীন। আমার বুকে কান পেতে শোন, লক্ষ বীচিমালার শাণিত ঐকতান।

রিক্সায় চেপে ধর্মরাজের সঙ্গে সাবিত্রী আডিয়ার এল। এই প্রথম ধর্মরাজের পাশে সে বসল, তার অঙ্গ ধর্মরাজের অঙ্গ স্পর্শ করল। জীবনে এই প্রথম যাকে পর-পুরুষ বলা যায় এমন একজনের অঙ্গে সাবিত্রীর অঙ্গ-স্পর্শ হ'ল; লজ্জা পেল সাবিত্রী, সংকুচিত হ'ল, ধর্মরাজের অতি সুভদ্র ঔদাসীন্যে আশ্বস্তও হ'ল, কিন্তু নিজেই অকিঞ্চিৎ বিস্ময়ের সঙ্গে অনুভব করল, পুলকিত হ'ল না।

বই-পত্র-কাগজে সমাকীর্ণ মস্তবড় টেবিলে অ্যানি বেসান্ত কাজ করছিলেন। সাবিত্রীর পানে তাকিয়ে তিনি বিস্মিত হলেন। দু'চার মুহূর্ত নীরবে দেখলেন তাকে। তার পর বললেন, "মাই গড্, তুমি ত বড় সুন্দর হয়েছ।"

সাবিত্রীর সর্বদেহে এ ক'টি কথা কেমন একটা জ্বালা ধরিয়ে দিল। তখন তার আঠার বছর পূর্ণ হয়েছে। সে যে সুন্দরী বার বার সবাই তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু নিজের মনে এ উপহাস করুণ সত্যকে প্রশ্রয় সে দেয় নি। বিধবা ভবনের প্রবুদ্ধ আত্মনিগ্রহ দেহবিলাসের পক্ষে নিতান্ত প্রতিকূল। এ প্রতিকূলতা সাবিত্রী শুধু মেনে নেয় নি, কল্যাণকর মনে করেছে। কোনও দিন সে সাজে নি, প্রসাধন করে নি, ভাল ক'রে নিজের দিকে তাকিয়ে পর্যন্ত দেখে নি। তথাপি সে জানতে পেরেছে প্রকৃতি কোন্ উদার অপচয়ে তার দেহকে পরিপূর্ণ সম্ভারে সাজিয়ে তুলেছে। দৃঢ় মজবুত দেহে সাবিত্রী রোগ কাকে বলে জানে নি। পরিশ্রমে সে অকাতর, কৃচ্ছ্রসাধনে তার সমকক্ষ বিধবা-ভবনে কেউ নেই। মোটা শাড়ী, মোটা কাপড়ের ব্লাউজ ছাড়া কিছু সে পরে নি। পায়ে কোন দিন জুতা ব্যবহার করে নি। তবু তার বর্ণ নিকষিতহেম, দেহ সুঠাম, সুগঠিত, সুছন্দিত; আয়ত চোখে গোধূলির বিষণ্ণ ঔজ্জ্বল্য।

অ্যানি বেসান্ত সাবিত্রীকে সামনে চেয়ারে বসালেন। অসমাপ্ত কাজ সেরে নিতে কয়েক মিনিট কেটে গেল। এ কম্পিত অবসরে সাবিত্রী তার হিতকারিণীকে নয়ন ভ'রে দেখল। পাঁচ ছ'বছরে বেশ খানিকটা বদলে গেছেন অ্যানি বেসান্ত; চুল আরও পেকেছে, চামড়ায় ভাঁজ। কিন্তু কি আশ্চর্য তেজোদীপ্ত কান্তি সর্বাঙ্গে বিচ্ছুরিত; কী অসামান্য মনীষায় উজ্জ্বল বড় বড় দু'টি চোখ। যৌবনে অ্যানি বেসান্ত সুন্দরী ছিলেন; যৌবন থেকেই তিনি বিদ্রোহী। বহু পথে সফল ব্যর্থ সে বিদ্রোহ এখন যেন আর এক সুদৃঢ় সংকল্পে তাঁর বার্ধক্য সুঠাম দেহে নতুন অদেহী তারুণ্য এনেছে।

কাজে শেষ ক'রে অ্যানি বেসান্ত সাবিত্রীর দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

বললেন, "এবার তুমি কি করবে?"

মৃদুস্বরে সাবিত্রী বলল, "ঠিক করতে পারছি না।"

"কলেজে পড়তে চাও?"

সাবিত্রীর চোখে ঝিলিক্ খেলে গেল। মুখে বলল, "নিজের পায়ে দাঁড়াবার ব্যবস্থা করা দরকার।"

অ্যানি বেসান্ত বললেন, "তার সময় আছে। তুমি পড়। কুইন্স্ কলেজে তোমার ভর্তির ব্যবস্থা ধর্মরাজ ক'রে দেবে। তুমি হস্টেলে থাকতে পার, যদি উইডোস্ হোমে ভাল না লাগে।"

"সে ত অনেক খরচ।"

"তার জন্যে ভেবো না। তোমার যাতে মাইনে না লাগে তার ব্যবস্থা করা যাবে। তুমি ত বেশ ভাল পাশ করেছ।"

সাবিত্রী কান পেতে বুকের মধ্যে সমুদ্র-গর্জন শুনতে পেল।

"ভারতবর্ষে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন মেয়েদের শিক্ষা," অ্যানি বেসান্ত বললেন। "শিক্ষা না পেলে তোমাদের মুক্তি নেই। মাদ্রাজে তোমরা বাংলা ও মহারাষ্ট্র থেকে অনেক পেছনে পড়ে আছ। এখানে কোন সংস্কারক আন্দোলন পর্যন্ত হয় নি এখনও। পুরাতনের শাসন সমান দাপটে চলছে। অথচ প্রাচীন রীতি-নীতির শৃঙ্খল না ভাঙলে ভারতবর্ষের অগ্রগতি অসম্ভব।"

সাবিত্রী প্রত্যেকটি কথার অর্থ বুঝতে চেষ্টা করল। মিসেস বেসান্ত বলে চললেন, "ভারতবর্ষ এক বিরাট সন্ধিস্থলে এগিয়ে চলেছে। তুমি কংগ্রেসের নাম শুনেছ?"

মাথা নেড়ে সাবিত্রী জানাল সে শুনেছে।

"কংগ্রেস তাড়াতাড়ি সংগ্রামের দিকে এগিয়ে চলেছে। যাঁরা এর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সে আবেদন-নিবেদনকারীরা সব পিছিয়ে যাচ্ছেন, অথচ নতুন কোনও নেতৃত্ব গ'ড়ে উঠছে না। এ অবস্থা বেশীদিন চলবে না। চারদিকে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠছে, হয়ত যে-কোন দিন য়ুরোপে লড়াই লেগে যাবে। লড়াই লাগলে ইংলণ্ড ভারতবর্ষের লোকবল ও প্রাকৃতিক সম্পদের সত্যিকারের মূল্য বুঝতে পারবে, আর তখন আসবে আমাদের প্রকৃত সুযোগ। সে সুযোগ পূর্ণ ব্যবহারের জন্যে দেশকে তৈরী করতে হবে।"

কথাগুলি অ্যানি বেসান্ত বলছিলেন নিজের মনে, সাবিত্রীকে নয়; সাবিত্রী

কিছু বুঝতে পারছিল না, শুধু স্তব্ধ বিস্ময়ে শুনছিল। হঠাৎ অ্যানি বেসান্ত থেমে গেলেন। চিন্তাকুল চোখে জানলার বাইরে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তার পর বললেন, "তুমি এসব বুঝবে না এখন। পড়াশোনা কর। নিজেকে বড় কিছুর জন্যে তৈরী কর। কেবল বেঁচে থাকবার জন্যে শৃঙ্খল ভেঙে সমাজ থেকে বেরিয়ে এসেছ, এমন যেন না হয়। বেরিয়ে যখন এসেছ তখন বড় কিছু করবে, যাতে তোমার মুক্তি আরও অনেককে প্রবুদ্ধ করে।"

সাবিত্রীর দেহ কেঁপে উঠল

অ্যানি বেসান্ত বললেন, "আমাদের সবার মধ্যে ঐশী শক্তি আছে। জন্ম-জন্মান্তর আমরা এগিয়ে চলেছি। তুমিও অনেক এগিয়ে চলবার জন্যে নিজেকে তৈরী কর। ভারতবর্ষের বড় প্রয়োজন শৃঙ্খল-ভাঙা নারীর।" একটু থেমে, সস্মিত দৃষ্টিতে, "হয়ত একদিন শীগ্‌গির আসবে যখন তোমাকে আমার দরকার হবে। সেদিন আমি হতাশ না হই।"

সে প্রয়োজন সত্যিই একদিন হয়েছিল। সাবিত্রী আম্মা এখনও শিহরিত মনে ভাবেন সে মহালগ্নের কথা। সেদিন তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় দিন। বড় আনন্দের, বড় বেদনার দিন। আজকের এই পরিণত দিবসের অপচিত রৌদ্রালোক, অগ্রসর অন্ধকার, সব কিছুর সূচনা সেদিন।

সাবিত্রী ভর্তি হ'ল কুইনস্‌ কলেজে। সাবিত্রীর মন এবার দ্রুত প্রসারিত হ'তে লাগল। পঠনে অপরিসীম আগ্রহ নিয়ে সে যা পেল তাই পড়ল। বিধবা-ভবন থেকে হস্টেলে স্থানান্তরিত জীবনের আস্বাদ তার জীবনতৃষ্ণা তীব্র করল। সবচেয়ে যা তাকে আনন্দ দিল তা হচ্ছে হস্টেল ও কলেজ-জীবনের উন্মুক্ত-আবহাওয়া। সাবিত্রী কেবল পড়ার বই-এ নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে রুচি যা চায় তাই পড়তে লাগল। প্রথম সে রাজনীতি পড়ল, পড়ল দেশ-বিদেশের ইতিহাস, সাহিত্য। তামিল সাহিত্যে অনুরাগ তার গভীর হ'ল। প্রাচীন তামিল মহাকাব্য 'সিলাপ্পাধিকরম্' পড়তে পড়তে তার চোখের সামনে জন্মভূমি মাতুরাই বার বার এসে দাঁড়াল। রাজপুত্র ইলাঙ্গো-আডিগল এক সাধারণ বণিক্-দম্পতির মর্মস্পর্শী কাহিনী নিয়ে এ মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে চের-বংশীয় নৃপতি সেনগুট্টুভমের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন ইলাঙ্গো-আডিগল; এক জ্যোতিষী এসে ভবিষ্যদ্বাণী করল যে তিনিই রাজা হবেন,

রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র নয়। ভবিষ্যদ্বাণী শুনে রাজা বিষাদে নিমগ্ন হলেন, আর পিতার সে দুঃখ দেখে ইলাঙ্গো সন্ন্যাসী হয়ে চ'লে গেলেন। বহুদিন পরে কবি-রূপে ফিরে এলেন তিনি। জ্যোতিষীর বাণী সত্যি হ'ল—চের রাজাদের কাউকে ইতিহাস স্মরণ-মাত্রের বেশী মর্যাদা দেয় নি, কিন্তু 'সিলাপ্পাধিকরমে'র মহাকবি ইলাঙ্গো আজও অমর।

ইলাঙ্গোর হাতে-গড়া কোভলম্ ও কেন্নাঙ্গীর মিলন-বিরহ-বিপর্যয়ের কাহিনী পড়তে পড়তে সাবিত্রীর চোখ জলে ভ'রে আসত, বিশেষ ক'রে রাজার আদেশে নিরপরাধ স্বামীর মৃত্যুর পরে কেন্নাঙ্গীর ভীষণ আক্রোশ, মাদুরাই শহরের রাস্তায় রাস্তায় তার নিষ্ঠুর অভিশাপ উচ্চারণ, সে অভিশাপের প্রভাবে তৎক্ষণাৎ হাজার অগ্নিশিখায় নগরীর ধ্বংস। রাজাকে লক্ষ্য ক'রে কেন্নাঙ্গীর শোক-দগ্ধ কথাগুলি সাবিত্রী কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারত না:

"যদি আমি সতী নারী হ'য়ে থাকি
তাহ'লে এ নগরীর আজই শেষ দিন,
যেমন আজই শেষ দিন অবিচার-দুষ্ট নৃপতির।
আমার অভিশাপে আজই এ নগরী
ধূলিসাৎ হবে, সত্যতা প্রমাণ করবে আমার কথার।"
এই ব'লে সে নিক্রান্ত হল প্রাসাদ থেকে,
শহরের পথে পথে সবাইকে চেঁচিয়ে বলল,
"চার-মন্দিরে সুশোভিত মাদুরাই নিবাসীগণ,
তোমরা শোনো, যেমন শুনছেন স্বর্গের দেবতারা,
যেমন শুনছেন মুনি-ঋষিগণ:
এ রাজার নগরীকে আমি অভিশাপ দিচ্ছি,
যে রাজা অন্যায়ভাবে আমার স্বামীকে হত্যা করেছে।"
কেন্নাঙ্গী যেই তার অভিশাপ উচ্চারণ করল,
অমনি অগ্নিদেবের জ্বলন্ত মুখ খুলে গেল,
যে দেবতারা নগরীকে রক্ষা করেছিলেন
তাঁরা সবেগে পলায়ন করলেন।"

সাবিত্রীর বার বার কেন্নাঙ্গীর কাহিনী পড়ত আর ভাবত, কই, কোথায় নারীর সে তেজ? সে কি শুধু কবির কল্পনা? সহস্র অন্যায় সহ্য করেও কি আমরা বিদ্রোহ করব না, জ্বলব না, জ্বালাব না? ভাবতে ভাবতে সাবিত্রী

উত্তেজিত হয়ে উঠত, পরক্ষণে ক্লান্তি নেমে আসত তার সবটুকু সত্তায়। নিজেকে মনে হত দুর্বল, অর্থহীন, নিস্তেজ।

সাবিত্রীর যুবতী অন্তরে গভীর ছাপ ফেলল আরও দু'জন তামিল-কবি একেবারে দু-কালের, একেবারে আলাদা জাতের। কবি-চক্রবর্তী কাম্বনের 'রামায়ণম্' তামিল সাহিত্যের উজ্জ্বলতম মণি। কাম্বনের 'রামকথাই' পড়তে পড়তে সাবিত্রীর মন সপ্তরঙে রঙীন হয়ে উঠত। রাম দেবাবিদেব বিষ্ণুর অবতার, কিন্তু কি অপূর্ব সুন্দর মানুষ! সাধারণ মানুষের কবি কাম্বনের হাতে গুহক, সুগ্রীব, বালী, বিভীষণ, এমন কি রাবণের চরিত্রও আশ্চর্য জীবন্ত মানুষ হয়ে সাবিত্রীর চোখে ভেসে উঠত।

সাবিত্রী আম্মার আজও মনে পড়ে, লজ্জারুণ অষ্টাদশী লুপ্ত সাবিত্রীকে সকরুণ কৌতুকে মনে পড়ে, যে-সাবিত্রীর দৃশ্যপটে রামায়ণের মহাকাব্যিক জনসঙ্গম ভেদ ক'রে রাম-সীতার প্রথম প্রেমের ছবি জ্বলন্ত সুষমায় সরস-রঙীন প্রলোভনে বার বার মূর্ত হয়ে উঠত। কাম্বনের রাম মিথিলার পথে চলতে চলতে হঠাৎ দেখতে পেলেন, রাজপ্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে আছে পরমযৌবনা সীতা :

"এক অপূর্ব সৌন্দর্য-স্বপ্ন
বন্যার প্লাবনের মত ব'য়ে গেল
রামচন্দ্রের চোখের সামনে।
যেন এক স্বর্গের প্রতিমা।
কুসুমের কুমারী কামনা।
অকৃত্রিম অনাদি সুষমা।
যে মধুর গন্ধে উন্মত্ত ভ্রমর,
যে ছন্দের সন্ধানে ব্যাকুল কবি।
অলিন্দে দাঁড়িয়ে আছে কুমারী কন্যা।
মৃত্যু-বর্ষী বর্শার চেয়ে ধারাল, অপরাজেয় তার দৃষ্টি।
সৃষ্টির সবটুকু মাধুরিমা পরিস্ফুট তার দেহে।
পাহাড় ও দুর্গ, প্রস্তর ও নবনী
গ'লে মিশে কোমল, নরম হয়ে
গড়েছে সে দেহ।

দু জোড়া আঁখি মিলল।

দু জোড়া আঁখি ক্ষুধার্ত আলিঙ্গনে মিলল।

হঠাৎ-উদ্বেল দুটি চিত্ত

মিলে মিশে এক হয়ে গেল।

রাম তাকিয়ে রইলেন কন্যার চোখে,

কন্যা তাকিয়ে রইল রাম-নেত্রে।

সে দ্বৈত-দৃষ্টিতে তাদের হৃদয়

শৃঙ্খলিত হল ;

ধনুর্ধর রাম, কৃপাণ আঁখি সীতা

আশ্চর্য বিনিময়ে একে অন্যের

অন্তর প্লাবিত ক'রে দিল।"

পড়তে পড়তে সাবিত্রী স্মৃতির গহনে খুঁজে বেড়াত একজোড়া চোখ। মনে আছে, মনে নেই, চেষ্টা করলে আজও মনে করা যায়, মুণ্ডিত মস্তক কৃষ্ণবর্ণ একটি যুবকের ছোট ছোট তরল দুটি চোখ। সে চোখ সাবিত্রীর আঁখি সন্ধান করার সুযোগ পায় নি, শুধু সলোভ কৌতূহলে কয়েকবার দেখেছে। সাবিত্রী কেবল একবার সে চোখ ভাল ক'রে দেখে নিয়েছিল, লুকিয়ে, দুর্দম্য কৌতূহলে। তার পর একদিন আসন্ন শুভ-লগ্নের প্রদীপ্ত দ্যোতনা মৃত্যুর করাল অন্ধকারে ডুবে গেল।

ইলাঙ্গো-আডিগল ও কাম্বন যেমন সাবিত্রীর মধ্যে চিরন্তনী নারীকে জাগিয়ে দিয়েছিল, তেমনি তার চিত্তের মৃদু-জলন্ত বিদ্রোহ ইন্ধন পেয়েছিল ভারতীর কবিতায়। সাবিত্রীর কলেজ-জীবনের প্রারম্ভে ভারতীর জাতীয় কবিতার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তামিলনাদে সাড়া প'ড়ে গেল ; ছাত্র-মহলে সে সব কবিতা পড়া হ'ত সবচেয়ে বেশী। পরবর্তীকালে ভারতীর সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল সাবিত্রী আম্মার ; যৌবনের উচ্ছ্বাস ও কল্পনা দিয়ে গড়া কবির চেহারার সঙ্গে বাস্তব জীবন্ত সুব্রাহ্মনিয়া ভারতীর অমিল দেখে তিনি ব্যথা পেয়েছিলেন। কিন্তু কুইন্‌স-কলেজে-পড়া আঠার-উনিশ বছরের সাবিত্রীর নিঃসঙ্গ অন্তর্জ্বালায় ভারতীর কবিতা অন্য পদার্থ ছিল। দেশপ্রেম ব'লে যে একটা চিত্তদাহী আদর্শ আছে, ভারতবর্ষ বলতে যে এক বাস্তব চিত্র চোখের সামনে ভেসে উঠতে পারে, স্বাধীনতার নাম উচ্চারণ করতে হৃদয়ে যে পুলকসঞ্চার হয়, ভারতীর কবিতা পড়ার আগে সাবিত্রী তা জানতে পারে নি।

কলেজ-জীবনে অ্যানি বেসান্ত মাদ্রাজে থাকলে মাঝে মধ্যে সাবিত্রীকে ডেকে পাঠাতেন ; কখনও-সখন সে নিজেও আডিয়ারে এসে হাজির হ'ত। এখানকার কাজকর্মের অনেক কিছু সে বুঝতে পারত না, কিন্তু অনুভব করত নতুন কিছুর উত্তেজনা থিয়োসোফীর শান্ত বাতাবরণকে উদ্বেলিত করেছে। বর্তমান শতাব্দী তখন মাত্র প্রথম দশক উত্তীর্ণ হয়ে দ্বিতীয় দশকে পা দিয়েছে। প্রাচ্যে জাপানের নতুন শক্তির চমকপ্রদ আবিষ্কার ভারতবর্ষে চিত্ত-চাঞ্চল্য এনেছিল, বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নবতর জাতীয় জাগরণে সমস্ত দেশে তা পরিব্যাপ্ত। নতুন কোন জীবনকাঠির স্পর্শে বহুশতাব্দী-নিদ্রিত দৈত্য জেগে উঠেছে ; অথচ এ নবলব্ধ শক্তি কোন্ পথে নিযুক্ত হবে নেতারা তার সন্ধান পাচ্ছেন না। নেতৃত্বের অভাবে বাংলায় সন্ত্রাসবাদ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তার অগ্নি-ঝিলিক ছড়িয়ে পড়েছে পঞ্জাবে, মহারাষ্ট্রে। পুরাতন নরমপন্থী কংগ্রেস-নেতারা হয় রঙ্গমঞ্চ থেকে স'রে পড়েছেন, নয় আত্মকলহে ডুবে আছেন ! এদিকে য়ুরোপে রণভেরী বেজে উঠছে।

এমন অবস্থায় একদিন সাবিত্রীর জীবনেও রণভেরী বেজে উঠল। কেন হ'ল, কেমন ক'রে হল সাবিত্রী আম্মা আজও ভাল বুঝতে পারেন না। আজ এই তেষট্টি বছরের স্তিমিত দীপালোকে সেদিনকার উত্তেজনার পরিহাসটুকুই যেন বেশী চোখে পড়ে। জীবন কখনও পরিপূর্ণ দেয় না, পরিপূর্ণ বঞ্চনা করে না। জীবনের বজ্রকঠোর রসিকতাবোধ আছে। অনেক দেবার মধ্যেও সে ফাঁকি রেখে দেয় ; অনেক বঞ্চনার মধ্যেও কিছু-পাওয়ার বীজ লুকিয়ে রাখে।

ধর্মরাজের সঙ্গে সম্পর্ক অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কখনই একেবারে নির্বাধ হয় নি। স্বভাব গম্ভীর আপাত-উদাসীন নিরুত্তেজ এই মানুষটিকে সাবিত্রী ঠিক বুঝতে পারে নি, বোঝাবার বড় কিছু কৌতূহলও হয় নি। সে নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেকে অ্যানি বেসান্তের একান্ত অনুগত অনুচরের নির্জীব ভূমিকায় আবদ্ধ রেখেছে, সাবিত্রীর সঙ্গে নিজস্ব কোন সম্পর্ক গ'ড়ে তোলবার চেষ্টা করে নি। যখন শান্ত আগ্রহে সে সাবিত্রীকে তার সমস্ত অসুবিধা, সমস্যার কথা জিজ্ঞাসা করেছে, এমন কোন ভাব দেখায় নি যে, সে নিজেই তার কল্যাণে, প্রগতিতে উৎসাহী ; কেবল বুঝতে দিয়েছে, অ্যানি বেসান্তের নির্দেশ সে মেনে যাচ্ছে মাত্র। গির্জায় গিয়ে কনফেশন করবার সময় ক্যাথলিক

দ্বিচারিণী যেমন পাদ্রীকে মানুষ মনে করে না, ধর্মরাজের কাছে নিজের সমস্যার কথা বলতে গিয়েও সাবিত্রীর মনে হয় নি সে রক্তে-মাংসে গড়া এক যুবকের সঙ্গে জীবনের নিগূঢ় অভিজ্ঞানের সেতু তৈরী করছে।

একদিন টাউন-হলে জনসভায় গিয়েছিল সাবিত্রী সুব্বারাও পান্তলুর বক্তৃতা শুনতে। ফিরবার পথে দেখতে পেল তার জন্যে মাউন্ট রোডের এক মোড়ে অপেক্ষা করছে ধর্মরাজ।

"আপনি কি ক'রে জানলেন আমি মিটিং-এ গেছি?" সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল সাবিত্রী।

"হস্টেলে গিয়েছিলাম।"

"কিছু কাজ আছে?"

"একটু কথা আছে আপনার সঙ্গে।"

"বলুন।"

"কথাটা আপনার সম্বন্ধে।"

"আমার সম্বন্ধেই ত সব কথা আপনার সঙ্গে।" মৃদু হাসল সাবিত্রী।

"সমুদ্রের পারে গিয়ে বসবেন?"

একটু বিস্মিত হ'ল সাবিত্রী। ধর্মরাজের গলার স্বর যেন সামান্য কাঁপল। তাছাড়া, সমুদ্রপারে ব'সে কথাবার্তার অনুরোধ এর আগে কখনও সে করে নি।

"চলুন। আমাকে আটটার মধ্যে ফিরতে হবে।"

"আমি জানি।"

টুকরো কথোপকথনে তারা সমুদ্র-সৈকতে উপনীত হ'ল। সমাগত সন্ধ্যায় সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ গাম্ভীর্য। পাতলা অন্ধকার নেমেছে দিকচক্রবালে; আকাশে একে একে তারা জেগে উঠছে—চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, অশ্বিনী, ভরণী, রোহিণী। হালকা অন্ধকার তরল রহস্যের আবরণ বিছিয়ে দিয়েছে অজ্ঞাতকুল সমুদ্রের গায়ে। ঢেউ-এর একটানা গর্জনের সঙ্গে অন্ধকারের গোপনীয়তা মিলে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে তার সঙ্গে সাবিত্রী নিজের অন্তরের সহজ যোগাযোগ আবিষ্কার করল।

সমুদ্রপারে জনবিরল একটি স্থান বেছে নিয়ে দু'জনে বসল।

কিছুক্ষণ কারুর মুখে কথা নেই। সাবিত্রী তন্ময় বিস্ময়ে সমুদ্র-গর্জন শুনতে লাগল। এক একটা ঢেউ হঠাৎ প্রগল্ভ উচ্ছলতায় অন্য ঢেউগুলির অঙ্কিত

সীমানা অতিক্রম ক'রে সাবিত্রীর পা পর্যন্ত এসে পড়ছে, তার নীরব নিষেধ কানে তুলছে না। সমুদ্রের ঢেউ দেখে সাবিত্রীর তৃপ্তি নেই। যেন সে দিনের পর দিন বসে বসে সমুদ্র দেখতে পারে; পরিবর্তিত বর্ণচ্ছটার প্রতিটি মূর্ছনা তার মনে রঙের তরঙ্গ তোলে। অথচ কি পরম গোপনীয়, কি সরমরমণীয় এ তরঙ্গ তা জানে কেবল সাবিত্রী, আর বুঝি জানে, অন্তত অভাসে, সমুদ্র।

ধর্মরাজ হঠাৎ ব'লে উঠল, "আপনাকে যা জিজ্ঞেস করব তা নিতান্ত ব্যক্তিগত। বড় প্রয়োজনে এ প্রশ্ন আমায় করতে হচ্ছে। যদি আপত্তি থাকে জবাব দেবেন না। অন্তত অপরাধ নেবেন না।"

এমন ভণিতা ক'রে ধর্মরাজ কোনদিন কথা বলে নি। সে গম্ভীর স্বল্পভাষী মানুষ; সহজ, পরিষ্কার ব্যবহার। সাবিত্রী অবাক হ'ল।

শুধু বলল, "বলুন।"

"আপনি কি বিধবা হয়েই সারা জীবন কাটাবেন?"

হঠাৎ সাবিত্রীর চোখের সামনে সমুদ্র দারুণ আক্রোশ-উল্লাসে গর্জে উঠল; অজ্ঞাত বাঁধন ছিঁড়ে ঢেউগুলি আকাশ পর্যন্ত তাণ্ডবে নেচে উঠল; সন্ধ্যার তরল অন্ধকার গভীর বিষাদে ঘনকালো হ'ল। উন্মত্ত বাতাস এসে সাবিত্রীর অন্তরে আকস্মিক-প্রজ্বলিত আগুনকে বহ্নিশিখায় প্রবাহিত করল।

ধর্মরাজ বলল, "স্বামীর ঘর আপনি করেন নি। বলতে গেলে আপনি কুমারী। সমাজের একটা ভয়ানক অন্যায় প্রবল বিদ্রোহে আপনি অস্বীকার করেছেন। পিতৃকুলে আপনার স্থান নেই। আপনি একা। আজ মিসেস বেসান্ত আছেন। তাঁর অনুগ্রহে আপনি নবজন্ম পেয়েছেন, পৃথিবীর কঠিন মাটিতে শক্ত হ'য়ে দাঁড়াবার শক্তি আপনার হয়েছে। কিন্তু মিসেস বেসান্ত চিরদিন থাকবেন না। তাঁর কাল শেষ হয়ে আসছে। এবার তিনি ধর্ম ও অধ্যাত্মবাদ ত্যাগ ক'রে রাজনীতিতে ঢোকবার আয়োজন করেছেন। তাতে তাঁর পতন অনিবার্য। জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়ে আপনি একেবারে একা হয়ে পড়বেন। একটু ভাবলে বুঝতে পারবেন এই একার অর্থ নিদারুণ। নানা রকম কুচরিত্র লোক আপনার পেছনে লাগবে। আপনি নিরপরাধ হ'লেও লোকে আপনার নামে কুৎসা দেবে। তামিল-সমাজ আপনি জানেন। কেউ আপনাকে গ্রহণ করবে না। স্কুলে কাজ পাবেন, জীবনে স্থান পাবেন না। শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় তিক্ত হয়ে যাবে আপনার মন, পৃথিবীকে আপনি

ঘৃণা করবেন, জীবনকে বিদ্রূপ। এই যদি পরিণতি, তা হলে আপনার এত সংগ্রামের কঠিন বিদ্রোহের দরকার ছিল কি?"

সাবিত্রী অতি কষ্টে নিজেকে শাসন ক'রে নীরব নিশ্চল রাখল।

ধর্মরাজ ব'লে গেল, "আজ সাত-আট বছর হ'ল আমি আপনার দেখাশোনা করছি মিসেস বেসান্তের নির্দেশে। ক'দিন পরে বি. এ. পাশ ক'রে আপনি স্বাধীন হবেন। আপনাকে দেখাশোনা করবার আর দরকার হবে না। আপনার সঙ্গে যোগযোগের সুযোগও আমার থাকবে না। রাজনীতি আমি পছন্দ করি না। মিসেস্ বেসান্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছি তাঁর আধ্যাত্মিকতার গুণে, তাঁর রাজনীতি আমাকে টানে না। তিনি রাজনীতিতে যোগ দিলে আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কি হবে তাও আমার এখন জানা নেই। স্বাভাবিক নিয়মেই, অতএব, আমি আপনার ভবিষ্যতের কথা ভাবছি। মিসেস বেসান্তের সঙ্গেও আমার কথাবার্তা হয়েছে। সারাজীবন নিজেকে বঞ্চিত রেখে শেষে একদিন আপনি নিঃসঙ্গ নিঃস্ব হয়ে পড়বেন, এ কথাটা আপনাকে ভেবে দেখতে বলি। একেবারে অরক্ষিত হয়ে জীবনে আপনি দাঁড়াতে পারবেন কিনা তাও ভেবে দেখতে হবে। আবার বলছি, আমাদের সমাজ বড় নিষ্ঠুর; পুরুষগুলি অত্যন্ত লোভী, মেয়েরা সহানুভূতিহীন। তা ছাড়া, সমাজে নতুন পথ তৈরী করবার লোকের বড় দরকার। বঙ্গদেশে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রসম্মত এ সত্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। নিজের ছেলের বিবাহ দিয়েছেন বিধবা মেয়ের সঙ্গে। বিধবা-বিবাহ বঙ্গে চালু হয়েছে। মহারাষ্ট্রে রাণাডে, তিলক প্রভৃতি নেতারা বিধবা-বিবাহের জন্য আন্দোলন করেছেন। পাঞ্জাবে আর্যসমাজ বিধবা-বিবাহ সমর্থন করেছেন। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে কোনও সমাজ-সংস্কারক আন্দোলন হয় নি। আমরা স্বামী বিবেকানন্দকে সম্মান করছি, অর্থ দিয়ে আমেরিকা পাঠিয়েছি, কিন্তু আমাদের মাটি থেকে বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন নি। আমরা চিরন্তনকে আঁকড়ে ব'সে আছি, তার চাপে আমাদের জীবন যে নিঃশেষ হতে চলেছে সেটুকু পর্যন্ত আমাদের চোখে পড়ছে না। আপনি পবিত্র জীবন-তৃষ্ণার দুরন্ত তাড়নায় গৃহত্যাগ করেছেন, কত কষ্ট, কত কৃচ্ছ্র সহ্য করেও বিদ্যা শিক্ষা করেছেন। আপনার বিদ্রোহ কি এখানেই শেষ হয়ে যাবে? কোনও একটা স্কুলমাস্টারী নিয়ে সমাজের সমস্ত নিন্দা, উপেক্ষা, লোভ ও প্রতারণা থেকে নিজেকে কোন মতে বাঁচিয়ে রাখবার ভীরু প্রয়াসের অন্ধকার পথে চলতে চলতে একদিন তিক্ত, ব্যর্থ,

অপচিত হয়ে এমন সংগ্রামশুভ জীবনটা নষ্ট ক'রে দেবেন ? এ কথাগুলি আমি আপনাকে ভেবে দেখতে বলি।"

এত কথা যে ধর্মরাজ একত্র একটানা বলতে পারে সাবিত্রী আগে জানত না ; মনে মনে সে কৃতজ্ঞ হয়েছিল সন্ধ্যার অন্ধকার ও সমুদ্রের গর্জনের জন্যে। অন্ধকার তাকে আড়াল দিয়েছিল, সমুদ্রগর্জন তার অন্তরের উদ্বেলতা লুকিয়ে রেখেছিল। ধর্মরাজের কথা শুনে সে বুঝল না তার আসল তাৎপর্য কি। শীতল নিরুত্তেজিত যুক্তিতে কান-জ্বালা মন-জ্বালা প্রসঙ্গের অবতারণা করেছে, নিজেকে তার আন্তরিক শুভানুধ্যায়ীর ভূমিকা ছাড়া অন্য কিছুতে দাঁড় করায় নি। তার কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থ এ প্রসঙ্গে আছে কি না সাবিত্রী ঠিক বুঝতে পারল না। একবার মনে হ'ল হয়ত অ্যানি বেসান্তের নির্দেশেই ধর্মরাজ কথাটা তার কাছে তুলেছে ; পরের মুহূর্তে ভাবল, তাহলে মিসেস বেসান্তের সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদের সম্ভাবনা সে কেন ইঙ্গিতে জানাল ? নারী-সুলভ কৌতূহল হ'ল ধর্মরাজের সাত্যিকারের অভীপ্সা জেনে নিতে, কিন্তু কৌতূহল, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা চেপে চেপে এমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল, কৌতূহল জেগেই ঘুমিয়ে পড়ল।

ধর্মরাজ উঠল। বলল, "আটটা বাজতে বড় দেরি নেই। চলুন, আপনাকে পৌছে দি।"

সাবিত্রী উঠে দাঁড়াল। শেষ ঢেউটা এসে লুটিয়ে পড়ল তার পায়ের তলায়। পাতলা অন্ধকারে চকচকে সফেন ঢেউ প্রসারিত উজ্জ্বল হাসিতে বালুর গায়ে ছড়িয়ে পড়ল। কান পেতে সাবিত্রী শুনতে পেল সমুদ্রের অতল বুক থেকে মহা-গম্ভীর সঙ্গীত ভেসে আসছে। তাকিয়ে দেখল লক্ষ বীচিমালায় সমুদ্র তাকে অজ্ঞাত অনাস্বাদিত সজ্যাতের পথে আহ্বান জানাচ্ছে।

সময় কম ছিল, তাই ঘোড়ার গাড়ী নিল ধর্মরাজ। পথে একটাও কথা হ'ল না। ধর্মরাজ অত্যন্ত গম্ভীর। সাবিত্রী আত্মমগ্ন।

এ ঘটনার তিন মাস পরে ধর্মরাজের সঙ্গে সাবিত্রীর বিবাহ হ'ল।

ধর্মরাজ সাবিত্রীর কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে নি। বিয়ে হ'ল অ্যানি বেসান্তের নির্দেশে। তিনি একদিন সাবিত্রীকে ডেকে অনেক কথা বললেন। সে কথাগুলি সাবিত্রী আম্মার আজও পরিষ্কার মনে আছে। তার আগে সাবিত্রী নিজেকে তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান ক'রে দেখেছে। তার বিবাহিত স্বামীর

কোনও চিহ্ন দেহে নেই, মনেও প্রায় নেই। আজ বার্ধক্যের অবসর-প্রাপ্ত মনে যদি বা সেই মুণ্ডিত মস্তক তরুণ কৃষ্ণবর্ণ ছেলেটির অর্ধেক-কল্পিত মুখখানা সাবিত্রী আম্মা অনেক খুঁজে কদাচিৎ বার করতে পারেন, সেদিনকার ভাবনা-তপ্ত সাবিত্রীর মনে তার ছায়াটুকু পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই। বিয়ে করবে না, এমন কোন কঠিন সঙ্কল্প সাবিত্রী তার অন্তরে দেখতে পায় নি। শান্ত বিচার-বিবেচনায় মনে হয়েছে বিয়ে করাই ভাল। তক্ষুণি প্রশ্ন জেগেছে, বিয়ে করব কাকে? ধর্মরাজকে? অন্তর পুলকিত হয় নি। ধর্মরাজ কি আমাকে বিয়ে করতে চায়? তার সঙ্গে জীবন-যাপনের আস্বাদ কেমন হবে? বহুদিনের পরিচিত হ'লেও তাকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ মানুষ ব'লে ভাববার প্রয়োজন হয় নি, সেও ভাবাবার অবকাশ দেয় নি। সমুদ্রেতীরে সেই সন্ধ্যার পরে আর তার সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্তা হয় নি। দু'বার সে এসেছে; একবার কুশল জানতে, দ্বিতীয় বার বেসান্তের আহ্বান জানাতে। সামান্যতম বিশৃঙ্খলতাও তার আচরণে প্রকাশিত হয় নি।

অ্যানি বেসান্ত সাবিত্রীকে আধ ঘণ্টা ধ'রে বিধবা-বিবাহের সপক্ষে নানা যুক্তি দেখাবার পর তাঁকে খানিকটা অবাক ক'রে সহজ কণ্ঠে সাবিত্রী প্রশ্ন করল:

"আপনি আমাকে বিয়ে করতে বলছেন?"

"বলছি।"

"আমি আজ যা সবটুকুই আপনার দয়ায়। আমার অকল্যাণ আপনি কখনও ভাববেন না। তবু প্রশ্ন করছি, আপনি কি বিধবা-বিবাহ নামক বাঞ্ছিত সংস্কারকে এগিয়ে নেবার জন্যে আমায় বিয়ে করতে বলছেন, না আমার ভালর জন্যে?"

"দুটোই।"

"আপনি যদি আদেশ করেন, আমার মনের অনেক সংশয় কেটে যায়।"

অ্যানি বেসান্ত গম্ভীর হয়ে একটু ভাবলেন। তারপর ধর্মরাজকে ডেকে পাঠালেন।

ধর্মরাজ এসে কাছে দাঁড়াতে অ্যানি বেসান্ত বললেন, "ধর্মরাজ, সাবিত্রী রাজী আছে। আজ থেকে তিন সপ্তাহ পরে শুভদিন আছে। তোমাদের সেদিন বিবাহ হবে।"

ধর্মরাজ উদ্দীপ্ত গম্ভীর চোখে সাবিত্রীর দিকে চেয়ে রইল। সাবিত্রী নিচু মাথা কিছুতেই তুলতে পারল না। ধর্মরাজ আনত হয়ে অ্যানি বেসান্তকে প্রণাম করল। সাবিত্রী তখনও নত-দৃষ্টি ব'সে রইল।

সিভিল ম্যারেজ আইনে তাদের বিয়ে হ'ল। শহরে বেশ কিছু আলোড়ন হয়েছিল বিয়ে নিয়ে, সাবিত্রী আম্মার সব মনে আছে। বিয়েতে কিছু উদারপন্থী মানী লোকেরাও উপস্থিত ছিলেন। অ্যানি বেসান্তের ইচ্ছে ছিল হিন্দু শাস্ত্রমতে বিবাহকে পাকা ক'রে দেন। কোন সদ্‌ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় নি ব'লে তা সম্ভব হ'ল না। মিসেস বেসান্ত নিজে দাঁড়িয়ে বিবাহ সম্পন্ন করলেন; বর-বধূকে আশীর্বাদ করলেন।

বিয়ে ক'রে ভাল হয়েছিল কিনা তেষট্টি বছরে সে প্রশ্ন অবান্তর। জীবনটা যে বদলে গিয়েছিল তাতে অবশ্য কোনও সন্দেহ নেই।

ধর্মরাজকে ভালবাসতে পারে নি সাবিত্রী; সে তার ভাগ্যের দোষ। অনেক বছর যে মানুষটিকে স্বয়ং-প্রতিষ্ঠ ব্যক্তি মনে হয় নি, স্বামীর ভূমিকায়ও তাকে কেমন যেন অবাস্তব, বেমানান মনে হয়েছিল। তা ছাড়া, সাবিত্রীর মন পরিষ্কার ছিল না। সর্বদাই সব কিছুর কাছে নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হ'ত। অপর্যাপ্ত খাদ্যসম্ভারের সামনে দাঁড়িয়ে অতি ক্ষুধার্ত যেমন মাঝে-মধ্যে খেতে পারে না, তার অবস্থাও ছিল তেমনি। জীবনে প্রথম দেহ-সম্ভোগের আশ্চর্য আনন্দেও সাবিত্রী কখনও পরিপূর্ণ অধীর হতে পারে নি। কেমন যেন মনে হয়েছে, তার সব পাওয়া চুরি ক'রে পাওয়া, সব আনন্দ নিষিদ্ধ ফল খাবার আনন্দ।

বিবাহিত জীবনে অমৃতের সন্ধান, তাই পায় নি সাবিত্রী। ধর্মরাজ তার এই গোপন যন্ত্রণার খবর রাখত না। স্বভাবত সে স্বল্পভাষী, আত্মনিমগ্ন; সাবিত্রী কৃচ্ছ্রসাধনের পথে চলতে চলতে আত্মদমনে অভ্যস্ত। ধর্মরাজ বিধবা-বিবাহে বিশ্বাসী হয়ে পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ ক'রে সাবিত্রীকে বিয়ে করেছিল, এ সত্য জানতে তার দেরি হয়েছিল। বিয়ের পরে বার বার আপনার রূপ-লাবণ্যে বিমুগ্ধ বিহ্বল ধর্মরাজের সন্ধান করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে সে ব্যথা পেয়েছে, বিস্মিতও কম হয় নি। মনে তার দুরন্ত প্রশ্ন উঠেছে, কেন ধর্মরাজ নিজের উৎসাহে আমায় বিয়ে করল? শুধু কি আমায় স্বামিত্বের পরিরক্ষণে নিরাপদ করতে? বিয়ে ক'রেও ধর্মরাজ এত সহজে নিজেকে দূরে রেখেছে, এ নিয়ে কোনও ঘনিষ্ঠ আলাপ-আলোচনাও তাঁদের মধ্যে হয় নি।

এমনি ক'রে বছর আড়াই কাটবার পর সাবিত্রী বুঝতে পারল ধর্মরাজের জনক হবার ক্ষমতা নেই।

মাতৃত্বের ক্ষুধায় তখন সে জ্বলে উঠেছিল। সে কি দুর্বিষহ জ্বালা! যে

জ্বালায় মাটির বুকের মধ্যে ফাটবার জন্যে বীজ কাঁদে, যে জ্বালায় মেঘ ফেটে বৃষ্টি নামে, কুমারী কুঁড়ি ফেটে ফুল হয়। সে জ্বালায় সাবিত্রী কি করত ঈশ্বর জানেন, যদি অ্যানি বেসান্তের ডাক না আসত; জীবনের আর একটা ভীষণ-উত্তপ্ত রাস্তা খুলে গেল, জমানো দুঃখ, কামনা, ব্যর্থতা নতুন বন্যায় গেল ভেসে। অ্যানি বেসান্তের ডাকে সাবিত্রী নামল রাজনীতিতে। ধর্মরাজ বাধা দিল না। শুধু বলল, আমাদের ব্যবধান আরও বেড়ে যাবে।

সে কথা সাবিত্রীর কানে পরিহাসের মত বাজল।

কয়েক বছর ধরেই ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনে পথ-সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। ১৯১৫ সনের প্রথম দিকে গোখেল মারা গেলেন, শেষ দিকে স্যার ফিরোজ শা' মেহতা। বৃদ্ধ দীনশা ওয়াচা প্রায় দৃষ্টিহীন। স্যার নারায়ণ চন্দ্র-ভারকর রাজনীতি ত্যাগ ক'রে জজিয়তী করছেন। হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, মুধলকর, সুব্বা রাও পান্তুলু, এঁদের কারুর নেতৃত্বের যোগ্যতা নেই। স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ইংরেজের কাছে পুরস্কারের জন্যে হাত বাড়িয়েছেন। পৃথক কারণে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য দু'জনেই কংগ্রেসের বাইরে, লালা লাজপৎ রায় আমেরিকায়। বোম্বাই কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করলেও সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ বস্তুতপক্ষে অন্য পথের মানুষ। তিলক সবেমাত্র জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন। পেয়েই নরম ও চরম পন্থীদের একত্র করবার কাজে লেগে গেছেন। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ভারতে নতুন এসেছেন, এখনও নির্দিষ্ট পথে কাজ শুরু করেন নি। মহাযুদ্ধের বিভিন্ন রণক্ষেত্রে ভারতীয় সৈন্যেরা অসামান্য বীরত্ব দেখিয়ে বিশ্বের প্রশংসা অর্জন করেছে। গান্ধী ও তিলক দু'জনেই যুদ্ধে ইংরেজের পূর্ণ সাহায্য ব্রতরূপে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যুদ্ধে ভারতের ভূমিকাকে কেন্দ্র ক'রে তিনটি মতবাদ তখন দেশে পরিস্ফুট। সুরেন্দ্র-নাথের মত নরমপন্থীরা যুদ্ধে সাহায্যের বিনিময়ে পুরস্কার দাবী করেছেন, তিলক সবেমাত্র ভারতবর্ষের "অধিকারের" কথা তুলেছেন, গান্ধী যুদ্ধে সাহায্যের বিনিময়ে কিছুই চাইছেন না, সম্রাটের সেবা করেই তিনি পরিতৃপ্ত।

এই যুগসন্ধিক্ষণে অ্যানি বেসান্ত রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন! ১৯১৪ সনে তিনি কংগ্রেসের সদস্য হলেন। সঙ্গে সঙ্গে চলল তাঁর হোম রুল লীগ। বিপন্ন মানব-সভ্যতাকে বীরোচিত সাহায্য ক'রে ভারতবর্ষ আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার অধিকার অর্জন করেছে, এই ছিল অ্যানি বেসান্তের রাজনীতির মূল কথা। স্বাধীনতা চায় না, ইংরেজ সাম্রাজ্যে স্বায়ত্ত-শাসন পেলেই ভারতবর্ষ পরিতুষ্ট।

স্বায়ত্ত-শাসন সে ভিক্ষা করছে না, এ তার দাবী, তার অধিকার। এই অধিকারের ধ্বনি তুলে অ্যানি বেসান্ত ভারতবর্ষকে জাগিয়ে তুললেন, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ভারতের সপক্ষে জনমতের সৃষ্টি করলেন। নরম ও চরম পন্থীদের একত্র করতে ব্যর্থ চেষ্টার পরে তিলকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অ্যানি বেসান্ত যুদ্ধকালীন ভারতবর্ষে চরমপন্থীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। ১৯১৭ সনে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে সভানেত্রীর ভাষণে অ্যানি বেসান্ত সগৌরবে ঘোষণা করলেন, "আমাদের হোম রুল আন্দোলন আশ্চর্য বলশালী হয়েছে দলে দলে মেয়েদের যোগদানে। নারীসুলভ বীরত্ব, ধৈর্য ও স্বার্থত্যাগ দিয়ে আমাদের আন্দোলনকে মেয়েরা দশগুণ এগিয়ে নিয়েছে। হোম রুল লীগের সবচেয়ে কর্মঠ ও নিষ্ঠাবান কর্মী ও নেতাদের মধ্যে সমস্ত ভারত থেকে এগিয়ে-আসা মেয়েরা বিশিষ্ট। আর মাদ্রাজের মেয়েদের সবচেয়ে গৌরব যে পুরুষদের শোভাযাত্রা যেখানে আটকে দেওয়া হয়েছে, সেখানে তাদের শোভাযাত্রা গেছে এগিয়ে, মন্দিরে মন্দিরে দেশমাতৃকার পুজো দিয়ে বহু মানুষের মনের অন্ধকার তারা ঘুচিয়েছে।"

প্রতিনিধিদের আসনে ব'সে সে ভাষণ শুনল সাবিত্রী।

কয়েক বছরের মধ্যেই অ্যানি বেসান্ত পিছিয়ে পড়লেন, ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলন নতুন পথে অভিনব নেতৃত্বে এগিয়ে চলল। সাবিত্রী ও চলল এগিয়ে। তখন সে প্রবাহিণী। পথ তার অনন্ত।

১৯১৭ থেকে ১৯২০, এই চার বছরে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চেহারা একেবারে বদলে গেল। সারা দেশের মানুষকে জাগিয়ে তুলে গান্ধী আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হলেন। দেশ জাগল ব্যথায়, অপমানে, উৎপীড়নের, প্রবঞ্চনার দহনে। গান্ধীর সঙ্গে হাত মিলালেন একদিকে প্রবীণ নতুন নেতাগণ—মতিলাল, চিত্তরঞ্জন, বিঠলভাই প্যাটেল—অন্যদিকে নতুন দীক্ষায় নতুন দৃষ্টি ও আদর্শে অনুপ্রাণিত নবীনের দল—জবাহরলাল, সুভাষ বসু, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সরোজিনী নাইডু, আবদুল গফুর খান। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের উদাত্ত আশীর্বাদ ও প্রশস্তিতে গান্ধী-ভূমিকা অধিকতর আলোকিত হ'ল।

এ আলোর ছটা পড়ল সাবিত্রীর জীবনে।

অ্যানি বেসান্তের হোম রুল আন্দোলন যুদ্ধান্তে ব্রিটিশ দমন-নীতির ধাক্কায় ভেঙে গেল। জালিয়ানওয়ালাবাগের পর কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করল,

মিসেস বেসান্ত এ দাবীর সঙ্গে পা ফেলে চলতে পারলেন না। কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই তিনি সংগ্রামের তীব্রতা প্রতিরোধের চেষ্টা করলেন, কিন্তু ইতিহাস তাঁকে পরাস্ত করল। দেশ এক অভিনব আলোকবন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, জাগল চাষী, মজদুর, যুবক, নারী ; এক কথায়, সমস্ত জনসমুদ্র জেগে উঠল। সাবিত্রী জেগেই ছিল, এবার বিরাটতর জাগরণে মিশে গেল। ধর্মরাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক তেলহীন দীপশিখার মত ব্যথাতুর ম্লান ; তাতে আলোর চেয়ে অন্ধকার বেশী। সে অন্ধকার থেকে মুক্তি পেতে সাবিত্রী মুক্তি-সংগ্রামের আলোয় ঝাঁপ দিল।

১৯১৯ সনে রাওলাট আইনের দৌরাত্ম্যে ভারতবর্ষ যখন আর্ত, বিহ্বল, গান্ধী একদিন আধ-নিদ্রা আধ-জাগরণে নতুন সংগ্রামপথের সন্ধান পেলেন। দেশব্যাপী হরতালের আহ্বান করলেন গান্ধী, আর তক্ষুণি দেশ জেগে উঠল ; এই হরতালের পরিণতি হ'ল, দু'বছর পরে, প্রথম অসহযোগ আন্দোলনে। আন্দোলনের জন্যে, দেশবাসীকে তৈরীর জন্যে, অক্লান্ত গান্ধী ভারতবর্ষ পর্যটন করতে করতে ১৯২১ সনের সেপ্টেম্বরে মাদ্রাজে উপস্থিত হলেন। শবরীর মত বুঝি সাবিত্রী এ মহাদিনের অপেক্ষা করছিল। অ্যানি বেসান্তের নির্দেশে গান্ধী অভ্যর্থনার বিরাট আয়োজনে সাবিত্রী উঠে-পড়ে লেগে গেল। আয়োজন যখন সমাপ্ত-প্রায়, এবং গান্ধী মাদ্রাজে আসবার পথে মাদুরাই শহরে, তখন সাবিত্রী আর এক নাটকীয় কাজ ক'রে বসল। তের বছর বয়সে লুকিয়ে মাদুরাই ত্যাগ করেছিল, আজ একত্রিশ বছর বয়সে সোজাসুজি সে মাদুরাই উপস্থিত হ'ল।

সে দিনটি সাবিত্রী আমার মনে ধ্রুবতারার মত উজ্জ্বল হয়ে আছে।

১৯২১ সনের ২২শে সেপ্টেম্বর। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী সেদিন অর্ধ-নগ্ন ফকির হয়ে মহাত্মা হলেন। পরের দিন কারাইকুড়িতে বক্তৃতা দিতে যাবার কথা। আগের দিন সকাল দশটায় নাপিত এসে গান্ধীর মাথা কামিয়ে দিল। দীর্ঘাকৃতি টিকি ও সামনের একটি ফোগলা দাঁতে গান্ধীকে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। ২২শে প্রত্যুষে গান্ধী শয্যাত্যাগ করলেন ; স্নানান্তে বাস-বসন চিরদিনের জন্যে বর্জন করলেন। এক হাত চওড়া এক টুকরা খদ্দর তাঁর লজ্জা নিবারণ করল।

সেদিন সকাল আটটায় সাবিত্রী মহাত্মার পায়ে প্রণাম করল। মাথায় হাত বুলিয়ে গান্ধী প্রশ্ন করলেন, "তুমি কে, বেটি ?"

সাবিত্রী শুধু বলল, "আমি আপনার শিষ্যা।"

মহাত্মা আবার তার মাথায় হাত বুলালেন। চোখের জলে সাবিত্রীর গাল ভেসে গেল।

মাদ্রাজে গান্ধী-অভ্যর্থনায় সাবিত্রী মুখ্য অংশ গ্রহণ করল। সাবিত্রী আম্মার আজও মনে আছে, অ্যানি বেসান্ত,—ছোট ছোট সাদা চুল ও আলখাল্লায় তাঁকে একজন বৃদ্ধ পুরুষের মত দেখাচ্ছিল—শ্রীনিবাস শাস্ত্রীদের সঙ্গে চেয়ারে বসে আছেন। খালি গায়ে চিন্তাকুল মহাত্মা, মুষ্টিবদ্ধ ডান হাতে চিবুক ন্যস্ত। মেয়েদের অভ্যর্থনা সভায়ও তেমনি নিরাবৃত-দেহ গান্ধী, কিন্তু মুখে কি প্রশান্ত হাসি! আরও মনে আছে জনসভায় অ্যানি বেসান্তের আগে আগে রসিকতা করতে করতে এগিয়ে যাওয়া গান্ধী, শুধু কোমরে একটুকরো শুভ্র খদ্দর, হাতে খদ্দরের ঝুলি!

দশ-বার বছর এক বিরাট নেশায় কেটে গেল সাবিত্রীর। দুই সত্যাগ্রহ আন্দোলনে তিন বার তার জেল হ'ল। গান্ধীর অনুমতি নিয়ে সে সবরমতী আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, সেখানকার গঠনমূলক কাজে নিজেকে পূর্ণ নিযুক্ত করল। এককালের নিঃসহায় নির্ভীক সাবিত্রী দেশনেত্রী হ'ল। এখন সবাই তাকে বলে সাবিত্রী বহিন্।

জীবন যে কোন্ অমোঘ রহস্যের চাপে কোন্ অজানা আশ্চর্য পথে মোড় নেয়, মানুষ তার কতটুকু বুঝতে পারে? দিনের বেলা প্রাচীর-গায়ে গাছের ছায়ার মত বার বার তার চেহারা বদলে যায়। জীবন বার বার পেছন থেকে এসে আমাদের চমকে দেয়।

সাবিত্রীকে যৌবন-উত্তর অধ্যায়ে জীবন যে আবার ভয়ানক চমকে দেবে তার জন্যে সে একটুও প্রস্তুত ছিল না।

শিষ্য-শিষ্যাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে গান্ধীর মনোযোগ সজাগ ছিল। সাবিত্রীর সবকথা তিনি জানতেন, স্বামীর সঙ্গে হিম-শীতল সম্পর্কের কথাও; সাবিত্রীর নিজস্ব প্রত্যয়ে হস্তক্ষেপ না ক'রে তাঁর উপদেশ ছিল, স্বামীর সঙ্গে সে যেন শান্ত, নম্র, শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখে। সাবিত্রীরও তাই ইচ্ছে। ধর্মরাজ ধর্মচর্চায় নিমগ্ন; সাবিত্রীর রাজনৈতিক ভূমিকার সে অনুমোদন করে নি, বাধাও দেয় নি! সাবিত্রীকে যে আদর্শের টানে সে বিবাহ করেছিল তা পূর্ণ হবার পরিতৃপ্তিকে সে যথেষ্ট পুরস্কার মনে করত। গত পনের ষোল বছরে বিধবা-বিবাহ যে তামিলনাদেও সম্ভব হয়েছে, তার

সাহসী কর্মের এ শুভ পরিণামে সে সন্তুষ্ট ছিল। সাবিত্রীকে যে সে মাতৃত্ব দিতে পারে নি, তাতে যদি বা তার দুঃখ ছিল, লজ্জা ছিল না। বস্তুতপক্ষে জন্মদানের শক্তি থেকে বঞ্চিত ছিল সে নিজে, না সাবিত্রী, এ নিয়ে তার কিছু নীরব সন্দেহ ছিল। সাবিত্রীর সন্দেহ ছিল না একটুও। কিন্তু কোনও দিন এ নিয়ে ধর্মরাজ বিবাদ করে নি। মনে কেবল বলেছে, সব কিছুর ক্ষমতা সবাকার থাকে না, সব কিছুর প্রয়োজনও না। তোমাকে পত্নীত্ব দিয়েছি, তাই যথেষ্ট। মা না হলেও তোমার চলবে।

উনিশ শ' বত্রিশ সনে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সাবিত্রী সবরমতী আশ্রমে ফিরে এসেছে। একদিন ধর্মরাজ এসে উপস্থিত হ'ল। বিস্মিত হ'ল সাবিত্রী, একটু ভয়ও পেল। ধর্মরাজ বলল, তার দেহ ভাল যাচ্ছে না, সাবিত্রীকে দেখবার ইচ্ছে হ'ল, তাই হঠাৎ চ'লে এসেছে। সাবিত্রী স্বামীকে যত্নের ত্রুটি করল না, সম্মানের কার্পণ্য করল না। কিন্তু দেখতে পেল, সম্পর্ক পাথরের মত জমে গেছে, কোনও উত্তাপেই আর গলছে না। তার আপত্তি অগ্রাহ্য ক'রে পঞ্চাশোর্ধ ধর্মরাজ সে সম্পর্কে দেহের আগুন লাগাল। সাবিত্রী গলল না। কিন্তু, হায় ভগবান, হায় ভগবান, ধর্মরাজ দু' মাস পরে বিদায় নেবার পর বিয়াল্লিশ বছরের সাবিত্রী জীবনে সর্বপ্রথম মাতৃত্বের পথে লজ্জায় অসহায় পা বাড়াল।

উনিশ শ' তেত্রিশ সনে জন্ম হ'ল সরোজার।

তাকে জন্ম দিতে সাবিত্রী মৃত্যুর দুয়ার পর্যন্ত চ'লে গিয়েছিল। কিন্তু সে বাঁচল। খবর পেয়ে ধর্মরাজ এসে উপস্থিত হ'ল। সাবিত্রী এবার তাকে গ্রহণ করতে পারল না।

"তুমি এ আমার কি সর্বনাশ করলে?" জ্বালাময় চোখে প্রশ্ন করল সাবিত্রী।

"কেন? সর্বনাশ কি হ'ল? তুমি ত মা হ'তে চেয়েছিলে?"

"সে একদিন ছিল। কোন্‌দিন তা আজ ভুলে গেছি। আজ এই বুড়ী বয়সে এ শাস্তি কেন দিলে আমায়? লজ্জায় আমি কারুর কাছে কতদিন দাঁড়াতে পারিনি। এই শিশুকে নিয়ে আমি কি করব? কে ওকে মানুষ করবে?"

"তুমি চ'লে এসো আমার সঙ্গে।"

"তা আর হয় না। আমার কর্তব্য এখন অন্য। সে কর্তব্য আমি ত্যাগ করতে পারব না। তা ছাড়া, এতদিন পর তোমার সঙ্গে—না, তা আর হয় না।"

"অর্থাৎ তুমি রাজনীতি ছাড়তে পারবে না! নিজের মেয়ের জন্যেও না।"

"রাজনীতি নয়। দেশের মুক্তি। গান্ধীজি ডাকলেই আমি আবার বেরিয়ে পড়ব।"

"তোমাকে ছাড়াও দেশের মুক্তি হবে।"

"হবেই ত। কিন্তু দেশের মুক্তি ছাড়া আমার মুক্তি হবে না। আমি বন্দী হয়ে আছি সে শৃঙ্খলে, যে-শৃঙ্খলে দেশ বাঁধা।"

"ওর কি ব্যবস্থা করবে?"

"তুমি ওকে মানুষ করবে। এটুকু তুমি আমার জন্যে ক'রো।"

"আমি?" অসহায় নির্বুদ্ধি দৃষ্টিতে তাকাল ধর্মরাজ। "আমি পারব কেন?"

"তোমাকে পারতেই হবে।"

সরোজা কেমন ক'রে কোথায় কবে মানুষ হ'ল সাবিত্রী আম্মা ভাল ক'রে জানেন না। তার এক বছর বয়সে তিনি আবার জেলে গেলেন। আশ্রমে রয়ে গেল সরোজা। আট মাস পরে সাবিত্রী আম্মা ফিরে এলেন। সরোজার বাল্যকাল কাটল সবরমতী আশ্রমে। আঁধারে-আলোকে ভারতবর্ষ মুক্তির পথ খুঁজছে। এমনি ক'রে কেটে গেল তৃতীয় দশক। উনিশ শ সাঁইত্রিশে সাবিত্রী আম্মা কংগ্রেসের মন্ত্রীত্ব গ্রহণের বিরোধিতা ক'রে রাজা গোপালাচারির বিরাগ-ভাজন হলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধবার সঙ্গে সঙ্গে আবার তিনি নতুন সংগ্রামের সম্ভাবনায় মেতে উঠলেন। বিয়াল্লিশে পুনরায় কারাবাস হ'ল। জেলে ব'সে জানতে পারলেন, সরোজাকে ধর্মরাজ মাদ্রাজে এক কনভেণ্টে ভর্তি ক'রে দিয়েছে। হস্টেলে সে বাস করে। ছেচল্লিশে মুক্তি পেলেন সাবিত্রী আম্মা, অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর। মাদ্রাজে গিয়ে বার বছরের সরোজাকে দেখে তার বহু অতীতের আর একটি সদ্য-বিবাহিতা দ্বাদশী মেয়ের কথা মনে পড়ল। দুই পৃথিবীর পারে তারা দু'জন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে! মাঝখানকার অনন্ত ব্যবধান একমাত্র সেতু সাবিত্রী আম্মা। বড় দুর্বল, বড় ক্ষীণ মনে হ'ল সেতুকে।

বছর খানেক পরে নেতাদের একজন সাবিত্রী আম্মাকে প্রশ্ন করলেন, "এবার আপনি কি করবেন?"

বিস্মিতা সাবিত্রী আম্মার মুখ দিয়ে জবাব বেরিয়ে এল, "কেন? কাজ কি সব ফুরিয়ে গেছে?"

"ফুরোয় নি। বদলে গেছে।" সুবিজ্ঞ দূরদৃষ্টি দেখিয়ে নেতা বললেন। "এতদিন আমরা ভেঙেছি। এবার গড়ব।"

"খুব বেশী কিছু ভেঙেছি বলে ত মনে হচ্ছে না। অবশ্য এক মাত্র দেশটাকে ছাড়া," বিষণ্ণ হাস্যে সাবিত্রী আম্মা জবাব দিলেন।

"ও কথা তুলে আর লাভ নেই," উষ্ণ হলেন নেতা। "যা হয়ে গেছে তা নিয়ে শোক বৃথা। এবার আমাদের দেশ শাসন করতে হবে। পুনর্গঠন করতে হবে।"

"আগে শাসন, পরে পুনর্গঠন ?" সাবিত্রী আম্মার কণ্ঠে শ্লেষ ফুটে উঠল।

"দুই-ই একসঙ্গে", দৃঢ়তার সঙ্গে টেবিল চাপড়ে ঘোষণা করলেন নেতা।

"আমি গান্ধীর চেলা। শাসনে লোভ নেই। এক আত্মশাসন ছাড়া।"

"গান্ধীর চেলা আমরা সবাই। ওতে একচেটিয়া দাবী কারুর নেই।"

"তা সত্যি।"

"আমাদের কিছু মহিলা মন্ত্রী চাই। আপনি মাদ্রাজে মন্ত্রী হতে রাজী আছেন ?"

"না।"

"কেন ?"

"প্রথম কথা, মন্ত্রিত্বে লোভ নেই। দ্বিতীয় মাদ্রাজে আমার স্থান নেই। মাদ্রাজ আমায় কোনও দিন ক্ষমার চোখে দেখবে না। তামিল সমাজ আপনি জানেন না।"

"তাহলে ?"

"আমি সবরমতীতে ফিরে যাব। আর, যদি গান্ধীজি ডাকেন, তাঁর পিছু নেব।"

গান্ধীজি ডাকেন নি সাবিত্রী আম্মাকে। পত্রের উত্তরে জানিয়েছিলেন, দুর্গম পথে জীবনের সায়াহ্নে তিনি পা বাড়িয়েছেন, সেখানে সাবিত্রী আম্মার মত বৃদ্ধার যাওয়া উচিত হবে না। তার চেয়ে হরিজন সেবা নিয়ে ওয়ার্ধায় কাজকর্ম করলে তিনি বেশী খুশি হবেন; আদেশ মেনে নিয়ে সাবিত্রী আম্মা ওয়ার্ধায় চলে এলেন। কিন্তু কাজে আর তেমন মন বসল না। কংগ্রেস দেশ শাসনের উদ্যোগে আর সব কিছু ভুলে গেছে। জনকল্যাণ, দেশ-গঠন, সমাজ-নির্মাণ সব নতুন রাষ্ট্রের গর্বিত দায়িত্ব। রাজদরবারের বাইরে সব কিছু অনাদৃত, অবহেলিত।

গান্ধীজির মৃত্যুর পর অনাদর অবহেলা আরও বেড়ে গেল। সাবিত্রী আম্মা এই নিঃসঙ্গ অবকাশ সইতে পারলেন না। কোন এক দুরন্ত নেশায় দেশ কোথায় যেন ধেয়ে চলেছে, কে পেছনে পড়ে রইল, কোন্ পুরাতন জীর্ণ আদর্শের টানে, তাকিয়ে পর্যন্ত দেখবার সময় নেই। পঁচিশ-ত্রিশ বছর দেশের অগ্রগামী সেনার সঙ্গে চলবার পর আজ এই নির্বাসিত জীবন তাঁর অসহ্য হ'ল।

একদিন সুযোগমত সেই দেশনেতার কাছে নিজের দুরবস্থার কথা নিবেদন করলেন সাবিত্রী আম্মা।

তিনি গম্ভীর মুখে বললেন, "যখন বলেছিলাম তখন কানে তোলেন নি, এখন ত কিছু করা মুশকিল। একটু অপেক্ষা করতে হবে।"

"কতদিন?"

"কি ক'রে বলি? খুব বেশী দিন হয়ত নয়। ভাববেন না, আপনাকে আমরা ভুলে গেছি।"

অর্থাৎ ভুলে যে যাই নি সে আমাদেরই মহত্ত্ব।

আমরা সহকর্মীদের মনে রেখেছি। না রাখলেও দোষ হ'ত না। কিছু অতীত-বিস্মৃত আমরা নই। সাবিত্রী আম্মার কান গরম হ'ল লজ্জায়, অন্তর আহত হ'ল দৈন্যে। বলবার, করবার কিছু নেই। চুপ ক'রে রইলেন।

বছরখানেক পরে কনস্টিটিউয়েণ্ট অ্যাসেম্বলির সভ্যা মনোনীত হলেন সাবিত্রী আম্মা। ষাটের কাছাকাছি এসে আবার নতুন জীবন শুরু হ'ল। ১৯৫২ সনের নির্বাচনে মাদ্রাজ তাঁকে টিকিট দিতে রাজী হ'ল না। কেন্দ্রীয় নেতাদের চেষ্টায় বোম্বাই থেকে তিনি স্বল্পায়াসে নির্বাচিত হলেন। তাতে সাবিত্রী আম্মা দুঃখিত হলেন না, বরং স্বপ্রদেশে স্বীকৃতি না পেয়ে চিত্ত প্রাদেশিক সীমানার বাইরে প্রসারিত হ'ল।

সরোজা কি ভাবে কোন্ প্রভাবে বড় হ'ল সাবিত্রী আম্মা তার সন্ধান রাখতে পারেন নি। যে আত্মজার জন্ম তাঁকে আনন্দ দেয় নি, নির্দিষ্ট প্রত্যাশা-জর্জর দিনের বহু পর এসে যে বিনাদোষে অভ্যাগত, তাকে বুকে চেপে মাতৃত্বের অবরুদ্ধ পিপাসা মেটাবার সুযোগ এ জীবনে আর তাঁর হ'ল না। তবু কালের গতিতে পরিবর্তিত মনে মাঝে মাঝে অসহায় কাতরতা অনুভব করেছেন, হঠাৎ অকারণে সব কিছু খালি খালি লেগেছে। সুযোগ হ'লে এমন অনুভূতির টানে মাদ্রাজে গিয়ে মেয়েকে কয়েকবার দেখে এসেছেন। তার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, হৃদয়ের গহন গোপন আর্ত কামনা হাত বাড়িয়ে সরোজাকে কাছে

টানতে চেয়েছে, কিন্তু পরক্ষণেই দুই পৃথিবীর মাঝখানে অতল সমুদ্রের ব্যবধান দেখতে পেয়েছেন। স্বল্পভাষিণী সরোজার চোখে-মুখে কুমারী সারল্যের অন্তরালে সাবিত্রী আম্মা দুর্বোধ্য কাঠিন্যের আভাস পেয়েছেন। মেয়ের সঙ্গে কথার চেয়ে নীরবতার আদান-প্রদান বেশী; নীরব সরোজার চোখে তাকিয়ে মনে হয়েছে, সে যেন অনেক কিছু দেখে নিচ্ছে, অনেক বেশী বুঝে ফেলেছে, যেন তার দৃষ্টির কাছে ফাঁকি ঢাকবার উপায় নেই। কোনও কিছুতেই সরোজার উৎসাহের উচ্ছ্বাস নেই, কোন কিছুই যেন সে জোর ক'রে চায় না। পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তার স্তিমিত, কিন্তু বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, মেধা ধারাল। হস্টেলে থেকেও সে প্রধানত নিঃসঙ্গ নিরুচ্ছ্বাস!

ধর্মরাজ নিয়মিত খোঁজ করেন, কিন্তু বাবার সঙ্গেও তার সমান ব্যবধান। একমাত্র বড়-মিল স্বল্পভাষণ তাদের ব্যবধানকে যেন আরও পাকা করেছে। ধর্মরাজ বার্ধক্যে ধর্ম নিয়ে মেতে আছেন, কিন্তু সরোজাকে সে পথে একেবারে টানতে পারেন নি।

একদিন বলেছিলেন, "তুমি তোমার মায়ের মত ধর্মে উদাসীন হয়েছ।"

উত্তরে সরোজা চট্ ক'রে বলে উঠেছিল, "আমি আপনার মত রাজনীতিতেও উদাসীন।"

সরোজা যেবার বি. এ. পাস করল সাবিত্রী আম্মা লোকসভায় নির্বাচিত হলেন। সরোজাকে অনুরোধ করে প্রথমবার দিল্লীতে আনালেন। ভাবলেন, একসঙ্গে বাস করলে ব্যবধান কমবে। তা হ'ল না। বরং ব্যবধান বাড়ল। সরোজার মধ্যে সাবিত্রী আম্মা বার বার নিজের যুবতী জীবনের প্রতিচ্ছবি খুঁজলেন পেলেন না। তাঁর নিজের সৌন্দর্য ছিল শান্ত, দীপশিখার মত কোমল। সরোজা বহ্নি-শিখার ন্যায় তীক্ষ্ণ, ধারাল। তাঁর অন্তরে ছিল বিদ্রোহের অদম্য দুঃসাহস। সরোজার মধ্যে জ্বলন্ত অস্থিরতা। তাঁর জীবনের গতি ছিল আদর্শের পথে প্রসারিত; সরোজা জীবনের উত্তাপই যেন অনুভব করে না। তিনি করেছিলেন বলিষ্ঠ কৃচ্ছ্রসাধন। সরোজা করছে কুপিত আত্ম-পীড়ন।

একদিন মেয়েকে কাছে ডেকে সাবিত্রী আম্মা জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তুমি এবার কি করবে?"

খানিকক্ষণ নীরব থেকে সরোজা উত্তর দিয়েছিল, "আমার কি কিছু করা দরকার?"

"কিছু একটা করবে ত জীবনে?"

"কেন?"

"কিছু না ক'রে জীবন তোমার কাটবে?"

"না কাটলে তখন দেখা যাবে।"

"বিয়ে করবে?"

এমন অকপট বিতৃষ্ণা সরোজার মুখে ফুটে উঠেছিল যে সাবিত্রী আম্মা চমকে উঠেছিলেন।

তবু আবার প্রশ্ন করেছিলেন, "করবে বিয়ে?"

সরোজা উত্তর দেয় নি।

"বিদেশে গিয়ে পড়বে?"

"ইচ্ছে নেই।"

"মাদ্রাজে এম. এ. পড়বে?"

"এখন ত নয়।"

"তবে?" বড় অসহায় বোধ করেছিলেন সাবিত্রী আম্মা।

পরের দিন লোকসভা থেকে ফিরে আসতে রামস্বামী বলেছিল, সরোজা বিকেলের গাড়িতে মাদ্রাজ চ'লে গেছে।

এক সপ্তাহ পরে মেয়ের চিঠি পেয়েছিলেন সাবিত্রী আম্মা। কন্যাকুমারী থেকে লেখা। "আমাকে নিয়ে কেউ ভাবলে আমি আরও অস্থির বোধ করি। তোমরা এতদিন আমাকে একা থাকতে দিয়েছ। ভবিষ্যতেও যদি দিতে পার, তা হলেই তোমাদের সঙ্গে মাঝে-মধ্যে দেখা হতে পারবে। আমার সমস্যা আমাকেই সমাধান করতে দাও।"

সরোজার কি সমস্যা সাবিত্রী আম্মা, মা হয়েও, জানেন না। এ যেন অন্য পৃথিবীর, অন্য গ্রহের সমস্যা।

সে ঘটনার পরে মেয়েকে তিনি ঘাঁটান নি। বছরে দু'তিনবার সে তাঁর কাছে আসে, এবার এসে এক দৈনিক কাগজে ছোট রকমের কাজও যোগাড় করেছে একটা। সে তার নিজের মনে থাকে। মাঝে-মধ্যে তাকে বন্ধু-বান্ধব সহকর্মীদের সঙ্গে পরিচিত করবার চেষ্টা করেন সাবিত্রী আম্মা, কিন্তু এমন বিদ্রূপাত্মক তার ব্যবহার যে তিনি নিজেই লজ্জা পান, শঙ্কিত হন, দুর্বল বোধ

করেন। দেববাণীকে পেয়ে কেন জানি তাঁর মনে হঠাৎ একটু নতুন আশা হ'ল। দেববাণী একালের মেয়ে হলেও তার সংগ্রাম, সমস্যার সঙ্গে সাবিত্রী আম্মা নিজের জীবনের যোগসূত্র দেখতে পান। যে সংগ্রামে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন, ভিন্ন কালে, অন্য পথে, বৃহত্তর, অন্যতর জীবন-বৃত্তে, দেববাণী যেন সে সংগ্রামই অন্যরূপে চালিয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া দেববাণী মা। সে তাঁর গোপন গভীর ব্যথা বুঝবে। এ সব ভেবে সাবিত্রী আম্মা দেববাণীর শরণাপন্ন হয়েছেন। সরোজা তাঁর কাছে অচ্ছেদ্য রহস্য, অজ্ঞাত শঙ্কা, সদাসঙ্গী বেদনা। দেববাণী হয়ত এ রহস্যের সমাধান করতে পারবে।

অন্তত তাঁকে বুঝিয়ে দিতে পারবে সরোজা কোন্ বৃত্তে প্রদক্ষিণ করছে, সে কে, সে কেন, কার।

ক্লান্তিতে চোখ বুজে এল সাবিত্রী আম্মার। জীবনে বহুদিন যা হয় নি, তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম আসবার ঠিক আগে দু'টি নারীমূর্তি তাঁর তন্দ্রা-জড়িত চোখের সামনে ভেসে উঠল। কুড়ি বছরের বিধবা কুমারী সাবিত্রী, আর কুড়ি বছরের কুমারী সরোজা। দু'জন চেয়ে আছে দু'জনের দিকে। অপরিচিতের বিস্মিত দৃষ্টি। দু'জন দু'জনকে বলছে, আমি তুমি নই। তুমি আমি নও।

নয়

দেবকুমার ও হিমাদ্রির চিঠি এক ডাকে এসেছে। একাধিকবার পঠিত পত্র দু'খানি টেবিলের ওপর সযত্নে রেখেছে দেববাণী। বাসন্তী দেবী স্নান সেরে পূজায় বসেছেন। রাইটিং প্যাডে ঝুঁকে দেববাণী পত্র লিখছে হিমাদ্রিকে। খোকনকে চিঠি লেখা হয়ে গেছে। দুটো চিঠি সঙ্গে নিয়ে দেববাণী বেরুবে। মনে মনে হিসেব ক'রে দেখেছে আজ নানা কাজের ভিড়। তবু সন্ধ্যার দিকটা খালি। মাকে নিয়ে আজ বেড়াতে যাবে। বেশীর ভাগ সময় মা ঘরে বন্দী। তাতে তাঁর নালিশ নেই। বই প'ড়ে, উল বুনে, কিছু না ক'রে দিব্যি তাঁর সময় কাটে। কিন্তু দেববাণীর মনে ক্ষোভ জমে ওঠে : মাকে নিয়ে সে যথেষ্ট বেড়াতে পারছে না। সন্দেহ হয়, মা বুঝি অনুক্ষণ তার কথাই ভাবেন। অনুভব করে মা'র দৃষ্টি বার বার তার মুখে নিবদ্ধ। মা যেন আমার মধ্যে কি খুঁজে বেড়ান। আমাকে জানতে চান, স্পষ্ট করে দেখতে চান। মা'র ধারণা আমি কোনও গোপন রহস্য আমার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি। মা সেই রহস্যের সন্ধান করেন। দেববাণীর অস্বস্তি লাগে, দুঃখ হয়। তুমি যে দেববাণীকে দেখতে চাইছ, মা, সে নেই, নেই। সে হ'তে পারত ; হয় নি। হ'তে গিয়েও সে হ'ল না।

কেন হ'ল না, দেববাণী জানে, তার কারণ সামনে টেবিলে সযত্ন-রক্ষিত দু'খানি পত্র কঠিন বাস্তবে রূপায়িত ক'রে রেখেছে। কাঁচা হাতের মিষ্টি-মধুর চিঠির কাছে দেববাণী মা ; পাকা হাতের গুরু-গম্ভীর স্নেহ-স্নিগ্ধ পত্রের নিকটে দেববাণী—কে ? নারী ? বান্ধবী ? দেবকুমার, খোকন, আর ছোট নেই ; দু'বছর পরে সে স্কুলে ছেড়ে কলেজে পড়বে। আপাতত সুইজারল্যাণ্ডে দল বেঁধে ভ্রমনে গেছে, চিঠিতে স্ফূর্তির আমেজ। তবু যেন ছত্রে ছত্রে দেববাণী একমাত্র আত্মজের নীরব নিঃশব্দ অনুচ্চারিত সদাসঙ্গী বেদনার মৃদু করুণ ঝংকার শুনতে পায়। যে-অতীত তার জীবনে অবলুপ্ত, দেবকুমার তার জীবন্ত প্রতিভূ। তার তরুণ দীর্ঘ চেহারায়, ভাসা ভাসা বড় বড় চোখে, রোমশ দেহে, মোটা ওষ্ঠাধরে, এমন কি ডান পায়ে ভর দিয়ে সামান্য বেঁকে দাঁড়াবার ভঙ্গিতে যে মানুষের

আতংকজনক ছবি ফুটে ওঠে, দেববাণীর অতীত জীবনে তার ধ্বংসলীলা এখনও চিত্রিত। দেবকুমার জানে তার জীবনে পিতার স্থান চিরদিনের জন্যে শূন্য। এ শূন্য সে এমন নিঃশব্দে মেনে নিয়েছে, এমন বিনাপ্রশ্নে, রাত্রি যেমন অন্ধকারকে মেনে নেয়, যে দেববাণী কোনও দিন তার কাছে তাকে পিতৃহীন করবার কোনও কৈফিয়ৎ পর্যন্ত দিতে পারে নি। দেববাণী জানে তার একমাত্র সন্তান অন্তুত্তর নির্বাক প্রশ্ন অন্তরে বহন করছে, নিঃসঙ্গ অবসরে হয়ত বা জীবনমঞ্চের অন্তরালে অজ্ঞাত-অস্তিত্ব জনককে ঘিরে কল্পনার অসত্য জাল বুনেছে, যা দেববাণীর সাধ্য নেই নিশ্চিহ্ন করে।

খোকন যত বড় হচ্ছে তত সে রহস্যময়। মা হয়েও দেববাণী তাকে বুঝতে পারে না, অব্যক্ত জিজ্ঞাসায় দূর-দূরান্তের ব্যবধানে তার প্রতি তাকিয়ে থাকে। নিজের জীবনটাকে, অপরাজেয় জীবনতৃষ্ণায়, আসন্ন ধ্বংস থেকে সে বাঁচিয়েছে, কৃপণ বিধাতার অনুদার হাত থেকে সার্থকতা যতটুকু সম্ভব ছিনিয়ে নিয়েছে। কিন্তু একমাত্র পুত্রকে গৃহের শান্ত উত্তাপে উন্মেষিত করতে পারে নি; পিতার তপ্ত স্নেহ থেকে বঞ্চিত করেছে। বিদেশে, অসমঞ্জ পরিবেশে, তাকে মানুষ করতে বাধ্য হয়েছে দেববাণী। আমেরিকায় প্রথম যখন নিয়ে গিয়েছিল খোকনের বয়স মাত্র সাত বছর; তখন থেকেই সে স্বভাব-নীরব; বড় বড় চোখের অব্যক্ত প্রশ্ন নিয়ে মা'র দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কোনও কষ্ট সে দেয় নি! সে দৃষ্টি দেববাণী বেশীদিন সহ্য করতে পারে নি। ভাঙা জীবনকে জোড়া দিয়ে পুনঃনির্মাণের তাগিদে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত একটানা পরিশ্রমের ফাঁকে সংক্ষিপ্ত অবসরের সবগুলি মুহূর্ত খোকনকে সমর্পণ করেও দেববাণীর নিজেকে অপরাধী মনে হয়েছে; খোকনের গম্ভীর বেদনাতুর চাহনি বার বার তার চোখে জল এনেছে। তিন বছর আমেরিকায় রেখে প্রথম সুযোগে সে খোকনকে লণ্ডনে ভাল স্কুলে দিয়েছে পাঠিয়ে। মার্কিন দেশের চেয়ে ইংলণ্ডে তার লেখাপড়া ভাল হবে, নিজেকে বুঝিয়েছে। কিন্তু কিসের, কোন অশরীরী দুঃখের তাড়নায়, যে সে পুত্রকে দূরে পাঠাতে বাধ্য হয়েছে এক মুহূর্ত নিজের কাছে তা গোপন থাকে নি।

এত বড় পৃথিবীর অনেক নগরে শহরে দেববাণীর জীবন আজ পরিব্যাপ্ত। তবু তার গভীরতম সত্তা বাঁধা পড়ে আছে খোকনের কাছে। বাপ থেকেও যে পিতৃহীন, মাতৃ-পরিচয়ে সে যেন গর্বিত বোধ করে এ আকাঙ্ক্ষা দেববাণীর চিত্তকে বহুদিন দগ্ধ করেছে। ছুটির অবসরে মা ও ছেলে মিলিত হ'লে দেববাণী

খোকনের সুখ ও আনন্দের বিন্দুমাত্র অবহেলা করে নি। নিশ্চিত প্রত্যয়ে সে জানে খোকন তাকে ভালবাসে। তার চরিত্রে উচ্ছ্বাস নেই, কিন্তু সে যে কত নিঃসহায় ভাবে মাকে একমাত্র বন্ধু ও আত্মীয় ব'লে জানে, দেববাণীর তা অজানা নেই। তার প্রতিটি চিঠিতে মা'র জন্যে নীরব আকুলতা সঙ্গোপনে প্রকাশিত। এই যে সুইজারল্যাণ্ডে সহপাঠীদের সঙ্গে একত্র আনন্দের অবকাশে লিখিত তার সদ্য-প্রাপ্ত পত্র, তাতেও সে ব্যাকুলতা প্রস্ফুটিত। খোকন লিখেছে, "ইণ্ডিয়া তোমার ভাল লাগছে, আশা করি! যদি ভাল না লাগে, ছুটি ত তোমার আছে, চলে এস এখানে।" খোকন ডাকছে, দেববাণী চোখ বুজে ভাবল, খোকন আমায় ডাকছে। এই বিরাট পৃথিবীতে অনেক আহ্বানের মধ্যে এ ডাক বুঝি সবচেয়ে নিবিড়।

কিন্তু, দেববাণী মনে করতে চমকে উঠল, আরও একজন তাকে ডেকেছে। সে আহ্বানও কঠিন, নির্মম। হিমাদ্রি লিখেছে, তুমি ফিরবার পথে কয়েক-দিনের জন্যে এখানে হ'য়ে যেয়ো। এ ডাকও গম্ভীর, অনুচ্ছ্বাস। পাহাড় যেমন মেঘকে ডাকে, তেমনি দুর্লঙ্ঘ্য। খোকন ও হিমাদ্রি, দুজনেই আমায় ডাকছে। একই পৃথিবীকে একসঙ্গে ডাকছে সূর্য, চন্দ্র। একজন ডাকছে তার ভয়ানক তেজ দিয়ে; অন্যজন অসীম কোমলতায়। দেববাণীর চিত্ত প্রগল্‌ভা নদীর মত দু'ধারায় বইতে চাইছে; কিন্তু সে জানে তা সম্ভব নয়। একসঙ্গে সে গঙ্গা-যমুনা হ'তে পারবে না। মাতৃস্নেহে পুণ্যতোয়া গঙ্গা, দরদী দয়িতের প্রেমে উচ্ছল যমুনা: দেববাণীর জীবনে বুঝি এ দু'য়ের মিল লেখা নেই। পূর্ণতা অসম্ভব জেনেও জীবন কেন যে নতুন ফুল ফোটাবার করুণ কামনায় কাতর হ'য়ে ওঠে বিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠ দর্শনে দেববাণী এ প্রশ্নের জবাব পায় নি। যে স্বামীকে জীবন থেকে সরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে, তার জীবন্ত প্রতিনিধির দাবীই সে মেটাতে পারছে না; এ দারিদ্র্যকে উপেক্ষা ক'রে কেন আবার হিমাদ্রির মত অমন আপাত-সম্পূর্ণ মানুষও তার কাছে হাত পাতল, কেনই বা নিজের দৈন্য মুহূর্তে বিস্মৃত হ'য়ে আত্মা তার দেবার ব্যাকুলতায় উদ্বেলিত হ'ল, দেববাণী জানে না। শুধু জানে, দিতে চেয়েও দিতে না পারার দুঃসহ দুঃখে জীবন তার ভারী হয়ে উঠেছে; এ ভার লাঘবের পথ নেই, পথ নেই।

হিমাদ্রি লিখেছে, বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা আনা বিজ্ঞানের কাজ। বৈজ্ঞানিক কেবল বিশ্লেষণ করে না, প্রতিনিয়ত বিভিন্ন বস্তুর সমন্বয় করে।

হিমাদ্রি তার নিজের জীবনে সবকিছুর সমন্বয় ক'রে নিয়েছে; বাইরে, পোশাকে-পরিচ্ছদে, চেহারায় সে যেমন বিশৃঙ্খল, ভেতরে সে তেমনি বিপরীত। তার মধ্যে দ্বন্দ্ব যদি বা থাকে, প্রচ্ছন্ন সংঘাত নেই; সে চিরপ্রসন্ন। অন্ততঃ দ্বন্দ্বের ভাগী সে কাউকে করে না, নিজের মধ্যে দ্বন্দ্বকে পরিপাক করে। তার মধ্যে সেজন্যে তপ্ত আকাঙ্ক্ষার জ্বালা কঠিন বাধার দেওয়ালে মাথা খুঁড়ে মরে না। দেববাণী শুধু একবার তাকে জ্বলে উঠতে দেখেছিল, দেখে তার বিস্ময়ের অবধি ছিল না। সে দহনও হিমাদ্রি হজম করে নিয়েছে। আজ সে শুধু শান্ত, সমাহিত আহ্বান। তার আহ্বানে কাড়াকাড়ি নেই। জুলুম নেই। জোর করার দাবী নেই। অগ্নিশিখা পতঙ্গকে ডাকছে না; তৃষ্ণার্ত ধরণী ডাকছে না বর্ষার ধারাকে। এ যেন সমুদ্র ডাকছে নদীকে, নদী ডাকছে নির্ঝরিণীকে। বলছে না, আমার মধ্যে তোমার সমাপ্তি। বলছে, আমার মধ্যে তোমার মুক্তি, তোমার বিকাশ।

প্রথম দিনই, অনেক, অনেক দিন আগের কথা সে, হিমাদ্রিকে দেখে দেববাণীর বুক কেঁপে উঠেছিল। তখন সে বি. এস-সির ছাত্রী। এক বান্ধবীর বাড়ী বেড়াতে গিয়ে দেখতে পেল হিমাদ্রিকে। বান্ধবীর টিউটর। বিজ্ঞান কলেজের ছাত্র। ভরা-সরা গোলগাল মুখে থমথমে গাম্ভীর্য; ছোট একজোড়া প্রজ্বলিত চোখে পুরু কাচের চশমা। দীর্ঘ ঋজুদেহ; প্রকাণ্ড মস্তক জঙ্গলাকীর্ণ। খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবী আধ-ময়লা।

হিমাদ্রি হঠাৎ এসে গিয়েছিল। সেদিন তার পড়াবার কথা নয়। নির্দিষ্ট দিনে আসতে পারবে না বলে এসে গিয়েছিল যদি সেদিন পড়ান হয়ে যায়। দেববাণীর বান্ধবী পড়তে চায় নি। বলেছিল, "আজ আমার বন্ধু দেববাণী এসেছে। আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে ভাল মেয়ে। আজ পড়ব না।"

হিমাদ্রি তাকিয়েছিল দেববাণীর চোখে। দেববাণী হাত তুলে নমস্কার করতে গিয়ে কেঁপে উঠেছিল। কি জ্বলন্ত দৃষ্টি! অমন থম্‌থমে মুখের ওপর অমন জ্বলন্ত চোখ লোকটিকে কেমন ভয়াবহ করে তুলেছে! সে যেন অনেক উঁচু থেকে অনেক কিছু গভীর ঔদাস্যে দেখে নিচ্ছে; পরিবেশ থেকে অনেক দূরে; মাঠের মাঝখানে প্রাচীন বট যেমন মাঠ থেকে অনেক দূরে।

বট যখন কথা বলল, দেববাণীর চমক লাগল। আশ্চর্য গম্ভীর কণ্ঠস্বর,

অথচ কি অদ্ভুত শান্ত! সে বলল, "তা হলে আমি যাই। আপনারা গল্প করুন।"

বান্ধবী বলে উঠল, "একটু বসবেন না? এক কাপ চা অন্তত খেয়ে যান।"

হিমাদ্রি বসল। ওরা দুজনেও বসল আড়ষ্ট, অপ্রতিভ হয়ে। বান্ধবী দু'-একটা টুকরো কথা বলল। হিমাদ্রি বিশেষ সাড়াশব্দ করল না। এক সময় বান্ধবী উঠে গেল চা আনতে। বটগাছের সঙ্গে একা বসে দেববাণী ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করল। এবার তাকে অবাক করে হিমাদ্রি কথা বলে উঠল।

"আপনাদের কলেজে প্রফেসর রমেশ চ্যাটার্জি আমার মাস্টার মশাই।"

দেববাণীর কেমন মজা লাগল। হিমাদ্রির স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বিবৃতি যেমন বেখাপ্পা, তেমন অবান্তর। তবু সে যে কথা বলল, তাতে দেববাণী খানিকটা আশ্বস্ত হ'ল।

"তিনি আমাদেরও পড়ান।"

"কলকাতায় অমন ভাল কেমিষ্ট্রির প্রফেসর আর নেই।"

"খুব ভাল পড়ান।"

"ওঁর স্ত্রী পাগল।"

এবার দেববাণী হাসি চাপতে পারল না। তাকে হাসতে দেখে হিমাদ্রি রীতিমত বিস্মিত হ'ল।

এমনভাবে তাকাল যার পরিষ্কার অর্থ, কারুর স্ত্রী পাগল শুনলে যে পাগল নয় তার হাসি পাবার কথা নয়।

সে জ্বলন্ত চাহনি দেববাণীর হাসিকে মুহূর্তে নির্বাপিত করল। অপ্রস্তুত হয়ে দেববাণী বলল, "তাই বুঝি?"

"অনেক দিন।"

"খুব ভালো নোট দেন।"

হিমাদ্রি কিছুক্ষণ নীরব রইল। তার পর আবার বলে উঠল, "ক্রিষ্ট্যাল নিয়ে ওঁর অনেক মৌলিক গবেষণা আছে। পৃথিবীর অনেক দেশে বৈজ্ঞানিক মহলে উনি সুপরিচিত।"

ভাগ্যিস হিমাদ্রি ক্রিষ্ট্যাল কথাটা উচ্চারণ করেছিল। দেববাণী অথৈ জলে মাটির সন্ধান পেল। ক্রিষ্ট্যাল—কেলাস—সম্বন্ধে তার ঔৎসুক্য অনেক, জ্ঞান কম। সে ব'লে বসল, মূল পাথর থেকে কেলাসন প্রথায় কি করে ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর উপাদানে গঠিত যৌগিক পদার্থ তৈরী হয় সে ভাল বুঝতে পারে না।

বলার সঙ্গে সঙ্গে হিমাদ্রি উৎসাহিত হয়ে উঠল ; হঠাৎ পাওয়া বটবৃক্ষকে নাড়া দিল। সে তৎক্ষণাৎ কেলাসন-প্রথার বিস্তারিত ব্যাখ্যায় মুখর হ'ল। গলিত প্রস্তর ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হবার সঙ্গে সঙ্গে তার থেকে বিভিন্ন উপাদান আলাদা হয়ে যায় ; যে সব উপাদানে লোহা ও ম্যাগনেসিয়াম বেশী, সেগুলি সর্বাগ্রে কেলাসিত হয়। দেববাণী এ সব কথা আগেও শুনেছে, কিন্তু আজকার ব্যাখ্যা মনে হ'ল অন্য রকম, কিছুটা বক্তার ব্যক্তিত্বের, অনেকখানি তার জ্ঞানের গভীরতায়, বর্ণনার প্রাঞ্জলতায়। ইতিমধ্যে বান্ধবী চা নিয়ে এসে তাদের আলোচনায় নিমগ্ন দেখে অতিশয় বিস্মিত। দেববাণীর মননের আগ্রহে, বুদ্ধির প্রখরতায় হিমাদ্রিও খুশি হয়ে উঠল। প্রায় ঘণ্টাখানেক চলল তাদের আলোচনা। উঠবার সময় সরল হাসিতে উদ্ভাসিত মুখে সে বলে ফেলল, "মন দিয়ে পড়ুন। বিজ্ঞানে আপনার নিষ্ঠা আছে মনে হচ্ছে।"

এ ভাবে হিমাদ্রি এল দেববাণীর জীবনে। না, ঠিক এল না, তার জীবনের সংকীর্ণ পরিধির এক পাশে এসে দাঁড়াল। এ ঘটনার কয়েক মাস পরে দেববাণী একদিন হিমাদ্রিকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করল। তার পর থেকে মাঝে-মধ্যে আসত ; বিজ্ঞানের কথা শোনাতে, দুরূহ সমস্যাকে সহজ সরল করে দিতে। তার সরল গম্ভীর আনন্দ দেববাণীকেও স্পর্শ করত। বিজ্ঞানকে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করবার প্রেরণা দেববাণী যাদের কাছে ছাত্রীজীবনে পেল তাদের মধ্যে হিমাদ্রির স্থান স্বকীয় গৌরবে বিশিষ্ট হয়ে উঠল।

হিমাদ্রি গুরুগম্ভীর পাহাড়ের নিশ্চল বিরাটত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ; দেববাণীর জীবন-ঝরণা তার পাশ দিয়ে বয়ে গেলেও তাকে যেন স্পর্শ করল না। বিজ্ঞান ছাড়া দেববাণীর অস্তিত্ব হিমাদ্রির কাছে এত অর্থহীন যে বিজ্ঞানের বাইরে হিমাদ্রির অস্তিত্বও দেববাণীর কাছে অর্থপূর্ণ মনে হবার সুযোগ পেল না। বি. এস-সি পরীক্ষার বছরে দেববাণীর জীবনে যে তুফান উঠল তার কোনও খবর হিমাদ্রির জানবার প্রয়োজন হ'ল না। মাসে একদিনের বেশী দেববাণীর ফ্ল্যাটে তার আসা হ'ত না। কুমারী-জীবনের তপ্ততম দিনগুলিতেও এই একটি দিনের প্রশান্ত মননশীলতার জন্যে দেববাণী উৎসুক হয়ে থাকত। কিন্তু বুদ্ধি ও বিদ্যাচর্চার বাইরে দেববাণীর জীবন যে আদিম ঝড়ের উন্মত্ত তাণ্ডবে উৎপাটিত হ'ল তার খবর হিমাদ্রি পেল না। যেদিন পেল সেদিনকার তার বেদনার্ত চাহনি আজও দেববাণী ভুলতে পারে না।

হিমাদ্রি দরজায় মৃদু শব্দ ক'রে অপেক্ষমাণ। দেববাণী গৃহত্যাগের জন্যে

তৈরী। বাসন্তী দেবী ও দেবযানী হতাশ বেদনায় পাথর। দ্বিতীয়বার দরজায় শব্দ হতে দেববাণীই এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল। অন্য দিন যেমন ধীর পদক্ষেপে ভেতরে আসে, তেমনি এল হিমাদ্রি। তাকে দেখে চমকে উঠল দেববাণী। নিতান্ত অপ্রত্যাশিত তার আগমন। বাসন্তী দেবী ও দেবযানী নির্বাক। অমন যে বাস্তব-উদাসীন হিমাদ্রি, তারও মুহূর্তে মনে হ'ল আজকের অপরাহ্ন অস্বাভাবিক সংকট-সংকুল। অপ্রস্তুত দৃষ্টিতে তাকাল তিনটি অপ্রকৃতিস্থ মুখে। কিছু বুঝতে পারল না। খোলা দরজার একটিতে ভর দিয়ে নির্বাক নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ দেববাণী বলে উঠল, "আমি চলে যাচ্ছি।"

দুর্বোধ্য লাগল কথাগুলি হিমাদ্রির কাছে। তবু সে কিছু না বুঝেই বলল, "কোথায়?"

উত্তরে দেববাণীর মুখে কথা এল না।

এবার কথা বলে উঠলেন বাসন্তী দেবী। বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন। এত বড় সংকটে এই প্রথম কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন তিনি সবার সামনে।

বুঝতে হিমাদ্রির সময় লাগল! কিন্তু বুঝতে সে পারল। নতদৃষ্টি দেববাণীকে বলে উঠল, "আপনার পড়া?"

উত্তর দিতে গিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেববাণী থমকে গেল। ব্যথায় বিকৃত সে মুখ। পুরু কাচের চশমা ফেটে দু'চোখ দিয়ে বেদনা ঝরছে।

মৃদু অর্ধ উচ্চারিত জবাব দিল দেববাণী, "পড়া চলবে।"

"পরীক্ষা দিতে পারবেন ত?" হিমাদ্রি আবার প্রশ্ন করল।

"আশা ত করছি।"

বাসন্তী দেবী চিৎকার ক'রে উঠলেন, "মিথ্যে কথা। ওর পড়া এই শেষ হ'ল। যেখানে যাচ্ছে সেখানে বিদ্যার নামলেশ নেই। ও জানে না, আমি জানি, ওর পড়াশুনা সব গেল।"

দেবযানী বলল, "মা তুমি চুপ কর। ও যেতে চাইছে ওকে যেতে দাও। ভাল মনে, আশীর্বাদ ক'রে ওকে যেতে দাও।"

বাসন্তী দেবী আবার কেঁদে উঠলেন, "না, না, আমি পারব না, পারব না

হিমাদ্রি বুদ্ধিহীন দৃষ্টিতে এ অবিশ্বাস্য নাটকের বিয়োগান্ত দৃশ্য দেখল। অল্প সময়ে সে বুঝতে পারল এ দৃশ্যাঙ্কে দর্শকের স্থান নেই। যাবার জন্যে পা

বাড়িয়ে ফিরে দাঁড়াল। দেববাণীকে সম্বোধন করে বলল, "আপনার মধ্যে বিজ্ঞান-চর্চার সম্ভাবনা ছিল। তা নষ্ট হ'লে বড় দুঃখের হবে।"

হিমাদ্রি সিঁড়ি দিয়েভারী পদক্ষেপে নেমে গেল।

এর পরে কয়েক বছর দেববাণী হিমাদ্রিকে দেখে নি। বাসন্তী দেবীর কাছে কয়েকবার যে সে তার খোঁজ নিয়েছে তাও দেববাণীর জানবার কথা ছিল না। একদিন পরাস্ত দেহমন ও অতিশয় অসুস্থ শিশুপুত্র নিয়ে সে যখন মা'র কাছে ফিরে এল, মা'র জোরে আবার পড়া শুরু করল, সেদিন পুনরায় তার হিমাদ্রিকে মনে পড়ল। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানতে পারল হিমাদ্রি তখন লণ্ডনে।

আরও তিন বছর কেটে গেল। দেববাণীর জীবনে কঠোর সংগ্রামের বছর সেগুলি। তাদের ইতিহাস, দেববাণী আজও মনে মনে বলে, কোনও দিন যেন লেখা না হয়। এক অপরাজেয় জননীর দুঃসাহসী কন্যার জীবনের পাতায় পাতায় তাদের অত্যাচারের চিহ্ন নীরবে চিরদিন লুকিয়ে থাক; কেউ যেন তাদের টেনে বাইরে না আনে।

এম. এস-সি পরীক্ষা দিচ্ছে দেববাণী। বিজ্ঞান কলেজের প্রবেশপথের সিঁড়ি বেয়ে উঠছে সে পরীক্ষার্থীর স্বাভাবিক ব্যস্ততায়, হঠাৎ একটা পুরুষ এসে তার গতিপথ অবরোধ করল। ভয়ে আতংকে পাণ্ডুর হ'ল দেববাণী, অত তাড়া সত্বেও, পা চলল না। লোকটা দেববাণীকে কিছু বলল, দেববাণী ভয়ানক আপত্তিতে ফিরে দাঁড়াল। লোকটা হাত বাড়িয়ে দেববাণীর হাত ধরতে গেল, দেববাণী তড়িৎ গতিতে আরও স'রে দাঁড়াল। তক্ষুণি তার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল, হঠাৎ অপ্রস্তুত লোকটাকে নতুন কিছু করবার সময় না দিয়ে দেববাণী দ্রুত পদক্ষেপে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল।

খানিক দূরে বারান্দা থেকে এ দৃশ্য আর একজন দেখছিল। সে নেমে এসে লোকটার সামনে দাঁড়াল। তাকে দেখে মানুষটা কেমন ঘাবড়ে গেল।

হিমাদ্রি বলল, "চ'লে যান এখান থেকে।"

সে প্রতিবাদ করল, "যাব? কেন যাব? আমি—"

হিমাদ্রি বলল, "আপনি কে আমি জানি। চলে যান। নইলে ভাল হবে না।"

লোকটা তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তার পর নেমে গেল।

প্র্যাক্‌টিকাল পরীক্ষা ছিল দেববাণীর। পরীক্ষা শেষ ক'রে হাত মুখ ধুয়ে সে বাইরে যাবার উদ্যোগ করছে। এমন সময় হিমাদ্রি এসে সামনে দাঁড়াল।

তাকে দেখে এমন অবাক হ'ল দেববাণী যে কয়েক মুহূর্ত কিছু বলতে পারল না।

যখন হাত জোড় ক'রে নমস্কার জানাতে গেল, দেখতে পেল চশমার পুরু কাচের আড়ালে হিমাদ্রির প্রদীপ্ত চোখ ব্যথায় থর থর কাঁপছে!

"আপনি এখানে?" প্রশ্ন করল দেববাণী।

"আমি এখানে কাজ করছি।" মৃদুস্বরে গম্ভীর জবাব দিল হিমাদ্রি।

"কতদিন হ'ল?"

"প্রায় এক বছর।"

"তাই নাকি? কৈ, জানতে পারিনি ত?"

অর্থাৎ, খবর করেন নি কেন? এ পরোক্ষ প্রশ্নের জবাব দিল না হিমাদ্রি।

"পড়াচ্ছেন?"

"রিসার্চ করাচ্ছি। নিজেও করছি।"

"আমি এখানে এসেছি জানলেন কি ক'রে?"

হিমাদ্রি একটু দেরি ক'রে জবাব দিল, "দেখতে পেলাম।"

"কখন?"

"যখন সকাল বেলা সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছিলেন।"

মুখের কথা ফুরিয়ে গেল দেববাণীর। চতুর্দিক কেমন অন্ধকার হয়ে এল। জোর ক'রে নিজেকে সামলে নিল দেববাণী। কিন্তু চোখ তুলে তাকাতে পারল না।

তার সেই লজ্জা-করুণ নীরবতায় যুক্ত হ'ল হিমাদ্রির বেদনা-মৌন গাম্ভীর্য। দু'জনে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

হিমাদ্রি বলে উঠল, "বাড়ী যাবেন?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায় থাকেন এখন।"

"সেই হাতিবাগানেই মা'র কাছে।"

"চলুন, পৌঁছে দি।"

"কেন? আপনি কেন কষ্ট করতে যাবেন?"

"চলুন। একা যাওয়া আপনার ঠিক হবে না।"

জীবনে এক পরম দুর্দিনে আবার হিমাদ্রি এসে উদয় হ'ল। সত্যি উদয় হ'ল ; সে খুব যে ঘন ঘন আসত তা নয়, নিজের কাজে ডুবে থাকত দিনরাত। মাসে দু'দিনের বেশী আসবার সময় তার হ'ত না। সে যে অনেক কিছু আগ্রহ দেখাত তাও নয়। উজ্জ্বল গাম্ভীর্যে প্রতিনিয়ত নিজেকে আকর্ষণীয় দূরত্বে সরিয়ে রাখত। কিন্তু দেববাণীকে সে বুঝতে দিত, জানতে দিত, মা ছাড়া তার আরও একজন হিতৈষী আছে, বন্ধু আছে। এম. এস-সিতে দেববাণীর খুব ভাল রেজাল্ট হ'ল না, দ্বিতীয় বিভাগে প্রথম হ'ল। ইচ্ছে রিসার্চ করে। দরকার চাকরি করার। বি. এস-সির পরে অনেকগুলি বছর কেটে গেছে। রিসার্চের সুযোগ পাওয়া প্রায় অসম্ভব হ'ল। তবু যে সে পেয়ে গেল, কেউ না বললেও দেববাণী জানত, সে কেবল হিমাদ্রির চেষ্টায়। রিসার্চ করতে গিয়ে দেখল বিজ্ঞান কলেজে কেবলমাত্র বিজ্ঞান-চর্চা হয় না, মনুষ্য-চর্চাও প্রচুর হয়ে থাকে। লেবরেটরীতে আর একটি মেয়েও রিসার্চ করত ; দেববাণী দেখতে পেলে সে তাকে এড়িয়ে চলে। রিসার্চে তার কাজকর্ম অপেক্ষাকৃত ভাল হবার অপরাধে সে এই সহকর্মিণীর বিরাগভাজন। একদিন সবার সামনে সে মেয়েটি দেববাণীকে ভয়ানক অপমান করে বসল। তার বিবাহিত জীবন নিয়ে এত বিশ্রী, বিস্বাদ কথাও যে কেউ বলতে পারে, দেববাণীর তা ধারণার বাইরে ছিল। সে প্রতিবাদ করল না, নিজের মনে কাজ ক'রে যেতে লাগল। পরের দিন ডিপার্টমেণ্টের অধ্যাপক তাকে ডেকে পাঠালেন! তাঁর কাছে দেববাণী যা শুনল, তার চেয়ে মৃত্যুও বুঝি ভাল ছিল। চোখ ফেটে জল আসতে চাইল, নিজেকে শাসন করতে গিয়ে সে একটা কথাও বলতে পারল না।

তার নীরবতাকে অধ্যাপক অভিযোগের স্বীকৃতি বলে ধ'রে নিলেন। কণ্ঠস্বরে দুঃখের ঝংকার তুলে বললেন, "আমাদের সব দিক মানিয়ে চলতে হয়। এদেশে এখনও রিসার্চের সুযোগ বড় কম। ছাত্রছাত্রীরাই এখানে কাজের সুযোগ সর্বাগ্রে পেয়ে থাকে। আপনার ছাত্রজীবনে ত অনেক বছরের ফাঁক পড়ে গেছে। আপনাকে নেওয়াই আমাদের উচিত হয় নি। তার ওপর যদি ছাত্রীরা আপনার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আপত্তি তোলে, তা হলে আমাদের অবস্থা আরও ডেলিকেট হয়ে ওঠে।"

"আপনি কি আমাকে রিসার্চ ছেড়ে দিতে বলেন?" দেববাণী এতক্ষণে কথা বলতে পারল।

"তাই বলি।"

"আমার কিছুই আপনি জানেন না। যদি বলি, যা শুনেছেন, তার মধ্যে একবিন্দু-সত্যি নেই, আপনি হয়ত বিশ্বাস করবেন না। আপনাকে বিশ্বাস করাতে পারি এমন ক্ষমতাও আমার নেই। তবু সত্যের খাতিরে আমি বলছি, যা শুনেছেন সব মিথ্যে। এ শুনেও যদি আপনার ইচ্ছে হয় আমাকে রিসার্চ করতে না দেবার, আপনি আমায় তাড়িয়ে দিন। স্বেচ্ছায় রিসার্চ আমি ছাড়ব না। আজ কেন, কোন দিন না।"

এক মুহূর্ত দাঁড়াল না দেববাণী। নমস্কার ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা বাইরে চলে এল। বাড়ীর পথে ট্রামে উঠতে গিয়ে হঠাৎ কি মনে ক'রে রাস্তা পার হয়ে অন্যপথের বাসে উঠে বসল। বৌবাজার ষ্ট্রীটের মোড়ে নেমে খুঁজতে খুঁজতে বার করল "শান্তি-নিবাস।" হিমাদ্রির মেস।

সামনে সারি সারি কাপড়, খেল্‌না, মনোহারী, দোকান। পাশ কাটিয়ে খানিক পেছনে শান্তি-নিবাসের অন্ধকার প্রবেশ-পথ। তখনও সন্ধার দেরি আছে, কিন্তু শান্তি-নিবাসে রজনীর অন্ধকার। কোনও মতে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় এসে দেববাণী দেখতে পেল খালি গায়ে লুঙ্গি-পরা একজন লোক অন্ধকারের সঙ্গে প্রায় মিশে ব'সে আছেন কাঠের চেয়ারে।

স্ত্রীলোক দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

"কাকে চাই?"

"এখানে ডাঃ হিমাদ্রি বসু থাকেন?

"থাকেন।"

"তিনি আছেন?"

"সে খবর তিনিই কেবল বলতে পারেন। আমি মাসকাবারে টাকা পাই বটে, কিন্তু তিনি কখন আমার মেসে থাকেন তা জানতে পারি নে।"

"ওর ঘর কোনদিকে?"

"বাঁ দিকে এগিয়ে যান। ত্রিশ নম্বর ঘর। দাঁড়ান আলো জেলে দি।"

ত্রিশ নম্বর ঘরের কাছে এসে দেববাণী দেখল তালা ঝুলছে। হিমাদ্রি নেই। এরকম সময়ে সে মেসে ব'সে থাকবে ভাবাই দেববাণীর ভুল হয়েছে। কিন্তু তার বড় ক্লান্ত, অসহায় মনে হ'ল নিজেকে। কাল হয়ত কলেজে গিয়ে দেখবে তার নাম কেটে দেওয়া হয়েছে, লেবরেটরীতে তার নির্দিষ্ট স্থানে অন্য কেউ কাজ করছে। তখন? তখন সে কি করবে? এমন সুন্দরভাবে তার কাজ এগিয়ে যাচ্ছিল, অধ্যাপক ভাদুড়ী এত খুশি, নিজের উৎসাহ নেশায় দাঁড়িয়েছে, এখন,

এইভাবে, বিনা অপরাধে, মিথ্যা অপবাদের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে, তাকে কি বেরিয়ে যেতে হবে?

সামনে একটা টুল ছিল, তার ওপর ব'সে পড়ল দেববাণী।

কতক্ষণ ব'সেছিল কে জানে, হঠাৎ হিমাদ্রির গলা শুনে চম্‌কে উঠল।

"আপনি? আপনি এখানে?"

অতি কষ্টে উঠে দাঁড়াল দেববাণী।

"আপনার কাছে এসেছিলাম।"

"আমার কাছে? এখানে? কেন?"

দেববাণী লক্ষ্য করল হিমাদ্রি তাকে ঘরে নিয়ে বসতে দিল না। জানতেও চাইল না কখন সে এসেছে, কতক্ষণ সে অপেক্ষা করছে।

"বড় বিপদে প'ড়ে এসেছি।"

"তা ত বুঝতে পারছি। কি বিপদ্ ঘটল আবার?"

দেববাণী কোনওমতে ঘটনার বিবরণ দিল। গুছিয়ে বলার শক্তি আর নেই।

হিমাদ্রি শুনল। কিছুক্ষণ ভাবল। তার পর বলল, "ঠিক আছে। আপনি যান।"

"আমার রিসার্চের কি হবে?" আর্তনাদ ক'রে উঠল দেববাণী।

"কি আবার হবে? রিসার্চ করবেন।"

"আমাকে তাড়িয়ে দেবে না ত?"

"না। তাড়াবে কেন?" কণ্ঠস্বর কোমল হয়ে এল হিমাদ্রির।

রিসার্চের দ্বিতীয় বছরে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা করতে হ'ল দেববাণীকে। জীবনের আর একটা কুৎসিত পরিচ্ছেদ। শুরুতে যা ছিল পরমরমণীয়, তার শেষ হ'ল কদর্যতার চরমে। নর-নারীর যে সম্পর্ক একান্ত নিজস্ব, যেখানে কৌতূহলী পৃথিবীর প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ, তাকে কলুষ-কালিমায়, গরল-হলাহলে জঘন্য ক'রে আদালত নামক নির্দয় হাটে সবার সামনে হাজির করার মধ্যে গভীর লজ্জা, তীব্র বেদনা, দাহিকা কুরুচি। অপজাত বিবাহের দুঃসহ বোঝা দেববাণী বইতে পারত যদি তাকে অপমান ও নোংরামির গভীরতম গহ্বরে তা টেনে না আনত। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা দাঁড়াল যে দেববাণীর শিশুপুত্রের জীবন নিয়ে সংশয় উপস্থিত হ'ল। তার নিজের শারীরিক নিরাপত্তাও বিপন্ন। আদালতের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সূত্রে বাঁধা সরকার, পুলিশ, উকিল-ব্যারিস্টার। একসঙ্গে একাধিক মামলায় জড়িয়ে পড়ল দেববাণী। লালবাজার

ও রাইটার্স বিল্ডিং, আলিপুর কোর্ট আর টেম্পল চেম্বার্স। কলকাতার জটিল মাহাত্ম্য ঘোষণা করে যে-সব প্রাচীন রহস্যময় প্রতীক্, তাদের সঙ্গে চাক্ষুষ বিস্বাদ পরিচয় হ'ল দেববাণীর। এক প্রকাণ্ড ঘূর্ণিবাত্যায় সে পাক খেল; নিংড়ে, চুষে বার ক'রে নিল শত্রু-মিত্র সবাই তার সবটুকু অবশিষ্ট জীবনরস। তবু সে শেষ পর্যন্ত মরল না, ভাঙল না, ফুরিয়ে গেল না; শুধু অন্তর হ'ল তার মরুভূমি, আত্মা উপবাসে শীর্ণ, দেহ পাথরের মত নির্জীব, কঠিন।

সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন টাকার। বাসন্তী দেবীর সারা জীবনের সবটুকু পুঁজি নিঃশেষ হয়ে গেল। তাঁর মাস্টারীর মাইনেতে সংসার চলে কোনমতে, বাড়তি দাবী মেটে না। মেডিকেল কলেজে পড়তে পড়তে দেবযানী তুটো ট্যুইশনি নিল। দেববাণীর সকাল বেলা ট্যুইশন, তুপুরে রিসার্চ, বিকেলে আবার ট্যুইশন। তাতেও ধর্মের কল নড়তে চাইল না। কোন সান্ধ্য-কলেজে কাজের জন্যে উঠে প'ড়ে লাগল দেববাণী।

চেষ্টা ব্যর্থ হতে চলেছে, এমন সময় কাজ জুটে গেল অপ্রত্যাশিত ভাবে। সান্ধ্য-কলেজ থেকে নয়। প্রতিষ্ঠিত কোন কলেজ থেকে ডাক এল একদিন বিনা দরখাস্তে।

কলেজের প্রিন্সিপাল নামকরা শিক্ষাবিদ্। পক্ককেশ, শান্ত-সৌম্য চেহারা। তাঁর সামনে চেয়ারে ব'সে অমন গভীর তুর্দিনেও দেববাণীর চিত্ত অকারণে নিজে থেকেই আশ্বস্ত হ'ল!

"আপনার চিঠি পেয়ে দেখা করতে এসেছি," বিনীত দেববাণী নিবেদন করল।

অধ্যক্ষ দেববাণীকে কিছুক্ষণ দেখলেন। নিরীক্ষণ শুরু হ'ল গুরুতর গাম্ভীর্যে, শেষ হ'ল অকৃত্রিম প্রসন্নতায়।

"তোমার নাম দেববাণী?" সহাস্যে প্রশ্ন করলেন অধ্যক্ষ।

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"খুব বিপদে পড়েছ?"

বিস্মিত চোখে তাকালো দেববাণী। কিছু বলতে পারল না।

"এখানে কাজ করবে?"

"কাজ পাব আমি?"

"পাবে। আমার একজন কেমিস্ট্রির লেকচারার চাই। তুমি কালই লেগে যাও।"

"কালই ?"

"কেন ? কিছু অসুবিধা আছে ?"

"আমি বিজ্ঞান কলেজে রিসার্চ করছি।"

"জানি।" দুপুরে দু'ঘণ্টা তোমার ক্লাস থাকবে না। রিসার্চ তুমি চালিয়ে যেতে পারবে। শুনেছি তুমি বেশ ভাল কাজ করছ ওখানে।"

"তা হ'লে বড় সুবিধে হয়।"

"আমাদেরও বেশ ভাল লেবরেটরী আছে। তুমি যদি চাও কলেজের পরে তোমার কাজের ব্যবস্থা ক'রে দেব।"

"সুযোগ পেলে আমি রাত্রেও কাজ করতে পারি।"

"অসুবিধে হবার কথা নয়। দারোয়ান রাত্রে ডিউটি দেয়। শুধু লেবরেটরী পিয়নকে তুমি কিছু টাকা দিয়ে দিও।"

"আপনার অসীম দয়া।"

"তা হ'লে কাল আসছ।"

"নিশ্চয়।"

"সোজা আমার কাছে চ'লে এস। আমি তোমায় ক্লাসে নিয়ে যাব।"

দেববাণীর ওঠার কথা, কিন্তু সে ব'সে রইল।

"কিছু বলবে ?" অধ্যক্ষ প্রশ্ন করলেন।

"আমার কথা আপনি সব জানেন ?"

"কিছু কিছু জানি।" তিনি মৃদু হাসলেন।

"কি ক'রে ?"

"ছোট্ট একটি পাখী এসে ব'লে গেল আমায়," জোরে হেসে উঠলেন তিনি। "কি ক'রে জানলাম তাতে তোমার দরকার নেই।" একটু থেমে বললেন, "মনে রেখ জীবন নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ নয়, সুখও নয়। গভীর অন্ধকারের মধ্যেও আলো আছে। এই হ'ল বিধাতার ব্যবস্থা। তা যদি না হ'ত, আমরা কেউ লড়তে পারতাম না, সত্য চিরদিন মিথ্যার কাছে হার মানত; অর্থ, দম্ভ হিংসা চিরদিন জয়ী হ'ত। জীবনে পদে পদে দেখতে পাবে এক কল্যাণময়ী শক্তি ঘোর বিপদের দিনে তোমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। সংগ্রামের পথে আলো ছড়িয়ে দেবেন তিনি। আচ্ছা, তুমি এস। আমার ক্লাস নিতে হবে।"

নতুন পরিতৃপ্তি, নবজাত আত্ম-বিশ্বাস, মানুষে পুনর্জাত শ্রদ্ধা নিয়ে দেববাণী বাড়ী ফিরল। শুধু এ জন্যে নয় যে তার বড় সমস্যার অনেকখানি সমাধান

হ'ল ; প্রধানতঃ এ জন্যে, যে তার দৃষ্টি গেল খুলে, অন্তরে অশুভের অন্ধকার ভেদ ক'রে শুভের আলো জলে উঠল। প্রিন্সিপাল বসাকের মত মানুষ পরবর্তী জীবনে বিদেশে দেববাণী অনেক দেখেছে! যাঁরা সহানুভূতি ও করুণার প্রদীপ অনুক্ষণ ব'য়ে চলেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে ভয় পান না, কোনও সংগঠিত ক্ষমতা, এমন কি রাষ্ট্রও, যাঁদের ন্যায়-বুদ্ধি বিচার-বোধকে ভয় বা প্রলোভনে দুর্বল করতে পারে না। এঁদেরই জন্যে বিদেশে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি এখনও জ্ঞানচর্চার পবিত্র স্বাধীন কেন্দ্র; রাজনীতি ও ক্ষমতানীতি, স্বার্থ ও লোভ বহু পথে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে তাদের পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ করতে পারে নি।

মাসখানেক দেববাণী কলেজে পড়াচ্ছে। দু'সপ্তাহ হ'ল কলেজের লেবরেটরীতে রাত্রে সে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছে। যে বিষয় নিয়ে বিজ্ঞান কলেজে রিসার্চ, তাই নিয়ে রাত্রেও তার কাজ। সন্ধ্যার পর সে এসে লেবরেটরীতে ঢোকে, দশটা পর্যন্ত কাজ করে। কয়েক দিন ধরে একটা জটিল এক্স্‌পেরিমেণ্ট তাকে এমন বেঁধে ফেলল, দশটা বেজে যাওয়া সে টের পেল না। পিওন মধুয়া দু'তিনবার ঘুরে গেল। তাকেও লক্ষ্য করল না দেববাণী। রাত্রি যখন এগারটা, মধুয়া এসে বলল, "আজ বাড়ী যাবেন না?"

দেববাণী ঘড়ি দেখে লজ্জা পেল।

"এগারটা! তোমার ত বড় দেরি হয়ে গেল মধুয়া"

"আপনার দেরি হ'ল না?"

"কিন্তু—" ইতস্ততঃ ক'রে দেববাণী যোগ দিল, "কিন্তু কাজ ত শেষ হ'ল না, মধুয়া।"

"বাকীটা কাল করবেন।"

হাসল দেববাণী। "তার উপায় নেই, মধুয়া।"

"তা হ'লে?" মধুয়ার কণ্ঠস্বর অপ্রসন্ন।

"তুমি এক কাজ কর।"

"বলুন।"

"এই টাকা নাও। আমার বাসায় একটা খবর দিয়ে বাড়ী চ'লে যাও।"

"আপনি?"

"আমি কাজ শেষ ক'রে দারোয়ানকে চাবি দিয়ে যাব। তুমি একটু তাড়াতাড়ি এসে কাল লেবরেটরী সাফ ক'রে রেখ কলেজ শুরু হবার আগে?"

আরও ঘণ্টা খানেক কাজের পর দেববাণী প্রত্যাশিত ফল পেল। আনন্দে

নেচে উঠল মন। নির্জন, নিস্তব্ধ লেবরেটরী কাঁপিয়ে উল্লাসে ব'লে ফেলল, "বাব্বাঃ, এতক্ষণে হল!"

দরজায় কে যেন বলে উঠল, "রাতও গভীর হ'ল।"

ভয়ানক চমকে গেল দেববাণী। কিছু দেখবার, বুঝবার আগেই আতঙ্কে পাণ্ডুর হয়ে দারোয়ানকে চেঁচিয়ে ডাকতে যাবে, এমন সময় দেখতে পেল হিমাদ্রিকে।

"এত রাত্রে আপনি এখানে এলেন কি ক'রে?" আশ্বস্ত, খুশি, দেববাণী ব'লে উঠল।

"অনেকক্ষণ ধ'রে আমি আপনার কাছাকাছি রয়েছি!"

"কোথায়? দেখতে পাই নি ত!"

"দেখতে পাবার কথা নয়। আমি ডাঃ বসাকের কাছে ছিলাম।"

কলেজের উপরে তেতলায় প্রিন্সিপালের বাসস্থান। বসবার ঘর থেকে লেবরেটরী দেখা যায়।

"উনি রাগ করেন নি ত!"

"বলছিলেন, এত বেশী পরিশ্রমে দেহ ভেঙ্গে যেতে পারে।"

দেববাণী নীরবে হাসল। হিমাদ্রি প্রশ্ন করল।

"বাড়ী যাবেন না?"

"যাব।"

"খেয়েছেন?"

"খেয়েছিলাম।"

"তা হলে চলুন।"

"এত রাত্রে আপনি—"

"তবে কি একা যাবেন?"

"দারোয়ানকে বললে সে পৌঁছে দেবে।"

"দারোয়ান পারবে না। তার অসুখ।"

"আপনি কি ক'রে জানলেন?"

"ডাঃ বসাক বললেন।"

"চাবিটা?"

"আমাকে দিন। দারোয়ানের ঘরে দিয়ে আসছি।"

এই হল হিমাদ্রি। চলতে চলতে দেববাণী ভাবল। পাহাড়ের মত উঁচু।

এসেছিল ডাঃ বসাকের সঙ্গে দেখা করতে বেশী রাত ক'রে। দেখতে পেয়েছে লেবরেটরীতে কাজ করছে দেববাণী। নিশ্চয় দেখেছে, পিয়ন মধুয়া চলে গেল। বোধ হয় ডাঃ বসাক উদ্বিগ্ন হয়েছেন তার বাড়ী ফেরা নিয়ে। দারোয়ান অসুস্থ। অমনি হিমাদ্রি বলেছে, আমি একটু অপেক্ষা ক'রে যাই। ওঁকে বাড়ী পৌঁছে মেসে চলে যাব। হিমাদ্রি চিরকল্যাণদাতা শিব। উপকার করে, সাহায্য এনে দেয় নীরবে, উদাসীন দাক্ষিণ্যে। তাকে ধন্যবাদ জানান, কৃতজ্ঞতা নিবেদন করা বৃথা। বট গাছের ছায়া যারা উপভোগ করে বটকে তারা ধন্যবাদ দেয় না। কেউ উপেক্ষা করে, কেউ-বা পূজা করে। হিমাদ্রিকে ধরা যায় না, ছোঁওয়া যায় না, শুধু অনুভব করা যায়। দেববাণীকে কলেজে চাকরি পাইয়ে দিয়েছে ; ডাঃ বসাকের মনে স্নেহ ও সহানুভূতি তৈরী ক'রে রেখেছে। সব জেনেও দেববাণী এ প্রসঙ্গ তুলে হিমাদ্রিকে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে নি। হিমাদ্রি দেবে, দেববাণী হাত ভ'রে নীরবে গ্রহণ করবে, এই নিয়ম। হিমাদ্রিকে দেবার কিছু নেই। তার চাইবার কিছু নেই।

চলতে চলতে হিমাদ্রি প্রশ্ন করল, "থীসিস কবে দাখিল করছেন ?"

"আরও মাস ছয়েক লাগবে।"

"কাজ ভাল এগোচ্ছে ?"

"মন্দ নয় একেবারে।"

"আপনার কাজ সফল হ'লে খুব নাম হবে। ফাইলেরিয়া নিয়ে বিশেষ কাজ হয় নি এখনও।"

"জানি। কিন্তু আমি কতটুকু করতে পাচ্ছি ?"

"এই ত প্রথম ধাপ। এর পর বিদেশে গিয়ে রিসার্চ করবেন।"

"বি-দে-শে !" চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল দেববাণী।

"যেতেই হবে। বিজ্ঞান বড় কঠিন মনিব ; যদি বিজ্ঞান চান আরও রিসার্চ করতে হবে। রিসার্চ করতে হ'লে বিদেশে যেতে হবে। অত্যন্ত সোজা কথা।"

"আপনি মানুষকে বড় নাচতে পারেন।"

"যে নাচবার সে নিজেই নাচে। তাকে নাচাতে হয় না।"

কিছুক্ষণ দু'জনে নীরব। কলেজ থেকে হাতিবাগান বেশী দূর নয়। মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে, কিন্তু কলকাতা এখনও স্বাভাবিক হয় নি। ট্রাম বন্ধ হ'য়ে গেছে। বাস চলছে দু-একটা। ট্যাক্সি ভাড়ার নিশান জ্বালিয়ে চ'লে যাচ্ছে। হিমাদ্রি আর দেববাণী হাঁটছে। এমন জনতামুখরিত কলকাতা এখন অনেক

শান্ত। আকাশে ম্লান চাঁদ উঠেছে। কলকাতা মহানগরীর আলোকিত বুকে তার ক্ষীণ রশ্মি লজ্জায় মিশে গেছে। চলন্ত ভিক্টোরিয়ার হিন্দুস্থানী গাড়োয়ান ঘোড়ার গতি থামিয়ে ওদের সামনে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করছে, কোথা যাবেন বাবু? আসুন না পৌঁছে দি। আরামে যাবেন।

দু'জনে ফুটপাথে স'রে গেল। দেববাণী বলল, "আপনি ত খান নি এখনও?"

"খেয়েছি?"

"দুপুরে?"

"না। রাত্রেই।"

"ডাঃ বসাকের ওখানে?"

"হ্যাঁ।"

"উনি আপনার খুব চেনা?"

"উনি আমার গুরু। আমার মাস্টার মশাই।"

"তাই আপনাকে এত স্নেহ ক'রেন?"

"অমন লোক ভারতবর্ষে খুব বেশী নেই।"

"তাই মনে হচ্ছে।"

"এমন নিরহঙ্কার, সহানুভূতিশীল দরদী শিক্ষক কলকাতায় দ্বিতীয় আছেন কি না জানি নে। এমন প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিকও খুব বেশী নেই।"

"অথচ তেমন কিছু ত করলেন না জীবনে।"

"তার একটা করুণ ইতিহাস আছে।"

দেববাণী আগ্রহে চুপ ক'রে রইল। কিন্তু হিমাদ্রি সে ইতিহাস বলল না। প্রশ্ন করতে সাহস হ'ল না দেববাণীর। হঠাৎ হিমাদ্রি জিজ্ঞেস করল:

"আপনার গোলমাল সব মিটে গেছে?"

"প্রায়।"

"তার মানে, সব মেটে নি।"

"সহজে এসব নোংরা ব্যাপার মিটতে চায় না। অসংখ্য জালে এক নোংরা অন্য নোংরার সঙ্গে বাঁধা। একবার জড়িয়ে পড়লে আর রক্ষে নেই।"

"হাইকোর্টের রায় ত আপনার সপক্ষে হ'ল।"

"তা হ'ল।"

"খোকনের পূর্ণ ভারও আপনি পেয়ে গেছেন।"

"তা পেয়েছি।"

"এখন বাকি মামলাগুলো ?"

"দুটো মিটেছে। দুটো এখনও ঝুলছে।"

"উনি কোথায় ?"

"জেলে।"

"কতদিনের জন্যে ?"

"শুনছি ত সাত-আট বছর।"

"তাহলে দীর্ঘদিনের জন্যে আপনি নিশ্চিন্ত।"

"কে জানে ? কোথা থেকে কখন আবার কোন্ বিপদ এসে যায় কে বলতে পারে ?"

"টাকাকড়ির ব্যবস্থা করতে পেরেছেন ?"

"সবটা পারিনি। উকিল-ব্যারিস্টারের টাকা মা'র গয়না বেচে দেওয়া হয়েছে। ধার-কর্জগুলি কিস্তিতে শোধ করার ব্যবস্থা করেছি। একটা বাদে।"

"দেবযানী ট্যুইশন ছেড়ে দিয়েছে ?"

"দিচ্ছে কৈ ? দেওয়া বড় দরকার। পড়ার সময় পাচ্ছে না। পাস করা মুস্কিল হবে।"

বাসার কাছে এসে দেখা গেল ফ্ল্যাটে আলো জ্বলছে। বাসন্তী দেবী জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন।

"মা'র কাণ্ড দেখুন !"

"আপনার কাণ্ডটা আগে দেখা দরকার।"

"আমি আবার কি করলাম ?"

"রাত বারোটায় বাড়ী ফিরলেন।"

"একা ত ফিরিনি।"

"একাই ফিরতে হ'ত আজ।"

"হ'ত না। আপনি ঠিক এসে যেতেন।"

বলে ফেলেই দেববাণী লজ্জা পেল। কিন্তু বুঝতে তার সময় লাগল না, লজ্জার কোনও কারণ নেই। হিমাদ্রিকে সব বলা যায়। যেমন সব বলা যায় বটগাছকে। সে শোনে না, শুনেও বোঝে না, বুঝেও দোলে না।

বাড়ীর ছোট গলির মধ্যে ঢোকবার সময় হিমাদ্রি বলল, "কলেজ থেকে আপনি হাজার দুই টাকা পেতে পারেন।"

"কি ক'রে ?"

"ডাঃ বসাককে বললে তিনি ব্যবস্থা ক'রে দেবেন।"

"অমন কিছু ফাণ্ড আছে বুঝি ?"

"অত জানবার দরকার নেই আপনার। আজ ত বুধবার, সোমবার আপনি ওঁর সঙ্গে দেখা ক'রে টাকার কথা বলবেন। মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা শোধ করলেই চলবে।"

দরজা খুলতে বাসন্তী দেবী নীচে নেমে এলেন।

হিমাদ্রি বলল, "উনি বারোটা পর্যন্ত কলেজে লেবরেটরীতে কাজ করছিলেন। পিয়ন চ'লে গিয়েছে, দারোয়ান অসুস্থ। ভাগ্যিস আমি ডাঃ বসাকের ওখানে খেতে এসেছিলাম তাই পৌছতে পারলাম।"

বাসন্তী দেবী দেববাণীকে কাছে টেনে নিলেন।

হিমাদ্রিকে বললেন, "বেঁচে থাকো বাবা। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।"

দেববাণী বলল, "খোকন ঘুমুচ্ছে, মা ?"

"না, তোর জন্যে জেগে ব'সে আছে!"

হিমাদ্রি বলল, "আমি চলি।"

দেববাণী জিজ্ঞেস করতে গেল, কি ক'রে যাবেন ? করল না। প্রশ্ন অবান্তর।

সিঁড়িতে উঠতে উঠতে বলল, "মা, সোমবার দু' হাজার টাকা পাব।"

"কোথা থেকে ?"

একটু চুপ থেকে দেববাণী বলল, "কলেজ থেকে ধার। মাসে পঞ্চাশ টাকা শোধ দিতে হবে। কাল থেকে দেবযানীকে আর পড়াতে যেতে দিও না।"

বাসন্তী দেবী বললেন, "আজ মাসের একুশে। এ ক'টা দিন যাক। ও মাস থেকে ছেড়ে দিতে বলব।"

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে দেববাণী মনে মনে বলল, এ দু' হাজার টাকাও কে দিচ্ছে আমি জানি। শুধু নিচ্ছি, দু'হাত পেতে কেবল নিচ্ছি। দেবার আমার কিছু নেই, কিছু নেই।

দশ

পরের বছর ডক্টরেট পেল দেববাণী।

ডাঃ বসাক ওকে সিনিয়র লেকচারার পদে নিযুক্ত করলেন। বললেন, "ডক্টরেট পেয়েছ ব'লে রিসার্চ ছেড়ে দিও না বাণী। এবার আলাদা লেবরেটরী বানিয়ে নাও। কাজ ক'রে যাও। এখনও কিছুই হয় নি তোমার।"

খোকনকে দেববাণী স্কুলে ভর্তি ক'রে দিল। বাসন্তী দেবী আপত্তি করেছিলেন। মাত্র পাঁচ বছরের ছেলে, এখনই স্কুল।

আপত্তি শুনল না দেববাণী। "স্কুলে যাক্, মা," সে বুঝিয়ে বলল, "একটু তাড়াতাড়িই শুরু করুক। আমরা বড় দেরিতে স্কুলে গেছি।"

বহু বছর পরে জীবনে কিছুটা আলো দেখতে পেল দেববাণী। সময় হ'ল নিঃশ্বাস নিয়ে নিজের চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখবার! দেখল, তার দেহ রুক্ষ, কৃশ, কালো হয়ে গেছে, চোখের নিচে কালি, মাথার চুল অর্ধেক খালি। দেখল, মুখের চামড়ায় বয়সের নির্দয় কুঞ্চন। দেখতে পেল, ক' বছরে মা'র চুল পেকে গেছে, মা বুড়ী হয়ে যাচ্ছেন। মুখে যতটা সম্ভব হাসি রেখে চলেন বাসন্তী দেবী, খোকনকে নিয়ে খেলা করেন, খোকনের কাছে রূপকথার গল্প বলেন, আর বলেন গ্রামের কথা, তাঁর বাবার কথা। কিন্তু, দেববাণী দেখল, মা ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত। দেববাণী আরও দেখল, দেবযানী গম্ভীর হয়ে গেছে, আগের মত উচ্ছল নেই। জীবনের ক্লেদক্লিন্ন দিকটা এ-বয়সে সে বড় বেশী জেনে ফেলেছে। মনে হ'ল, সে বড় ক্ষতি ক'রে ফেলেছে দেবযানীর। যে-বয়সে জীবনকে তার জানা উচিত রঙিন, সুন্দর, আশ্বাসময়, সুস্থ, সবল, পরিপূর্ণ আনন্দ ব'লে, সে দেখতে পেয়েছে নোংরার স্তূপ, পঙ্কিল কামনা, খল ছলনা, কুটিল প্রতারণা। সে গান ছেড়ে দিয়েছে, বন্ধুবান্ধবীদের সঙ্গ ছেড়েছে, শান্ত কমনীয় তার দু'টি চোখে নীরব ব্যথা, অব্যক্ত নালিশ।

দেববাণী আরও দেখল, দুরু দুরু বুকে, চাপা আতঙ্কে দেখল, খোকন, তার একমাত্র সম্বল দেবকুমার, তাদের জীবন-প্রাঙ্গণ হতে কলঙ্কে অপসৃত তার জন্মদাতার সুপ্রকাশ ছাপ নিয়ে বেড়ে উঠছে। যে মানুষটা ঝড়ের মত এসে

দেববাণীর জীবন তচ্নচ্ ক'রে দলিত ধ্বংসাবশেষ পেছনে ফেলে চিরদিনের মত পলাতক, তারই প্রতীক হয়ে একমাত্র আত্মজ দেববাণীর চোখের সামনে বিকশিত হবে, ভাবতেও তার অন্তর অস্থির হয়ে উঠল। যে-কোন উপায়ে দেবকুমারকে, তার খোকনকে, মানুষ করতে হবে, সত্যিকারের মানুষ। পিতৃপরিচয় সে বহন করবে না জীবনে; সে শুধু তার মায়ের ছেলে। মা ছাড়া পৃথিবীতে আপনার তার থাকবে না কেউ। সন্তান জীবনের রসদ পায় পিতার কাছে। পিতার হাত ধ'রে সে প্রথম চলতে শেখে জীবনের পথে। বড় হয়ে হাত পাতে, বলে, দাও আমায় তোমার অভিজ্ঞান। মা লালন করে, পিতা পালন করে। দেববাণী বুঝল, তাকে দুই-ই করতে হবে। তাকে হতে হবে খোকনের বাবা, মা। তারই হাত ধ'রে খোকন জীবনের পথে প্রথম চলতে শিখবে; তারই কাছে হাত পেতে অভিজ্ঞান চাইবে। কি দেবে তাকে দেববাণী? দিতে হলে দেববাণীকে সঞ্চয় করতে হবে। কেবল ব্যথা, অপমান, লাঞ্ছনা, প্রতারণার অভিজ্ঞান পুত্রের হাতে সে তুলে দিতে পারবে না। দেববাণী বুঝল, তার সামনে এখনও অনন্ত সংগ্রাম। খোকনের প্রাণ ভ'রে যায়, এমন মা তাকে হতে হবে; শুধু খোকন ভাববে না, জানবে না তার মা প্রবঞ্চিতা দুঃখিনী। তাকে জানতে হবে, তার মা জননী, সে জন্ম দেয়, পালন করে, পথ দেখায়, প্রেরণা দেয়, জীবনের পূর্ণতা আনে।

১৯৪৭ সনের গ্রীষ্মে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বাতাবরণ ভয়ানক উত্তপ্ত। রাজনীতিতে দেববাণীর আকর্ষণ নেই, কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার আশু সম্ভাবনায় সেও খানিকটা উত্তেজিত। ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশের ওপর দিয়ে গত ক' বছরে যেসব গুরুতর ঘটনার প্লাবন বয়ে গেছে, জীবনের জটিল সমস্যায় জড়িত দেববাণী তাদের সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ রাখতে পারে নি। কিন্তু পাখী প্রভঞ্জনে উদাসীন হলেও উন্মাদ পবন উল্লসিত অত্যাচারে তার ছোট্ট বাসাটুকুকে পর্যন্ত বিপর্যস্ত করে। তেমনি সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ দেববাণীর জীবনকে ছিন্নভিন্ন করেছে। মহাযুদ্ধ নামক ঘোরকৃষ্ণ কুটিল দুর্ঘটনা অশ্লীল অন্যায় পথে অর্থ রোজগারের পথ সুগম না করলে দেববাণীর বিবাহিত জীবন হয়ত এত সহজে ভেঙে যেত না। যে মানুষটিকে সুর-সঙ্গীতের সম্মোহনে স্বেচ্ছায় সে স্বামীত্বে বরণ করেছিল, অর্থ ও বিলাসের দুষ্ট আমন্ত্রণ তাকে লালস ক'রে তুলল, দেববাণী তার দ্রুত বিপথগতি প্রতিরোধ করতে পারল না। বিশ্বযুদ্ধের প্রতি দেববাণীর অতিশয় বীতরাগ ছিল; যুদ্ধের অন্তর্বর্তী রাজনীতি তার মনকে বিশেষ

আকর্ষণ করে নি। কিন্তু ইংলণ্ডে শ্রমিক দল শাসনভার পাওয়ার পর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যখন হঠাৎ আশু সম্ভাব্য বাস্তবে পরিণত হ'ল, কলেজে, লেবরেটরীতে, বাড়ীতে সর্বদাই এই নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা, দেববাণীও কিছুটা উত্তেজিত হ'ল, মনে আশা জাগল, দেশ স্বাধীন হলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো দিগন্ত-প্রসারিত হবে, ভারতবর্ষেই সে উচ্চতর রিসার্চ শেষ করার সুযোগ পাবে। একদিন হিমাদ্রি এলে সোৎসাহে দেববাণী আসন্ন স্বরাজ-প্রসঙ্গের অবতারণা করল।

হিমাদ্রি কিন্তু তেমন উৎসাহ দেখাল না। দেববাণীর সংযত স্বপ্নবিন্যাসের উত্তরে শুধু বলল, "আপনার মা'র শরীর বড় খারাপ হয়ে গেছে।"

যেমন দ'মে গেল দেববাণী তেমন আশ্চর্য হ'ল।

"খুবই খারাপ হয়েছে," সে সায় দিল। "যতটা বাইরে থেকে দেখায়, তারও বেশী।"

"দেবযানীকেও খুব ভাল মনে হচ্ছে না।"

"ওর শরীর মন দুই-ই খারাপ।"

"একটা কাজ করুন।"

"কি ?"

"মাসখানেকের জন্যে কোথাও বেড়িয়ে আসুন সবাই।"

"আমিও দু'একবার ভেবেছি কথাটা।"

"গিরিডিতে আমাদের একটা ছোট বাড়ী আছে। বাবা তৈরী করেছিলেন। এখন ওটা খালি। আপনারা ওখানে অনায়াসে থাকতে পারেন। নোংরা হয়ে আছে। সাফ ক'রে নিতে হবে।"

"মা কি যেতে রাজী হবেন ?"

"রাজী করিয়ে নিন।"

"দেবযানী বলবে ওর পড়ার ক্ষতি হবে।"

"শরীর ভেঙে গেলে পরীক্ষা দেবে কি ক'রে ?"

চারজনে প্রস্তাবটা নিয়ে আলোচনা হ'ল। দেখা গেল, বাসন্তী দেবীর উৎসাহ আছে, দেবযানীও রাজী। দেববাণী টাকার কথা তুলল, কিন্তু বাড়ীভাড়া যখন লাগবে না, খরচ তখন শাসনের বাইরে নয়।

"কলেজের ধার মাসদুই শোধ না করলেও চলবে," হিমাদ্রি উপায়ে বাৎলে দিল।

দেববাণী বিষণ্ণ হাসল। "জানি। না শোধ করলেই বা কি ?"

বাসন্তী দেবী ভাবলেন, চেঞ্জে গেলে মেয়ের ভেঙেপড়া শরীর তাজা হবে। মনে নতুন শক্তি পাবে। তিনি সোৎসাহে রাজী হলেন। দেবযানীও তাই ভাবল, সঙ্গে সঙ্গে আরও ভাবল, এ শ্বাসরোধ-করা পরিবেশ থেকে একটু মুক্তি পাওয়া যাবে। দেববাণী ভাবল, মা'র দেহমনের উপকার হবে। বেচারা দেবযানী হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। আমিও একটু অবসর পাব ভাববার, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের নতুন সমীক্ষা করবার।

জুন মাসের মাঝামাঝি ওরা গিরিডি গেল। জুলাই মাসে কলকাতায় বাধল হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। গিরিডির স্বাস্থ্যকর জলহাওয়ায় সবার দেহ-মনের উন্নতি হয়েছিল। সবচেয়ে আনন্দে ছিল খোকন। কিন্তু দাঙ্গা বাধবার সঙ্গে সঙ্গে সবাই চঞ্চল হয়ে উঠল। চিন্তা হ'ল হিমাদ্রির জন্যে।

বৌবাজারের মেস ত্যাগ ক'রে হিমাদ্রি এন্টালিতে দু'খানা ঘর নিয়েছিল। নিজেকে বাঁচিয়ে চলবার বুদ্ধি হিমাদ্রির একেবারে নেই। বাসন্তী দেবী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলেন! দেববাণীকে বললেন, "চিঠি লিখে দেখবি ?"

"তুমি লিখতে পার।"

"কোথায় লিখব ?"

"মেসে লিখে লাভ নেই। কলেজও হয়ত বন্ধ হয়ে গেছে। তবু কলেজেই লেখ।"

চিঠির উত্তর এল না।

দেববাণী ডাঃ বসাককে লিখল। কলেজ কবে খুলবে জানতে চেয়ে চিঠির অবতারণা ক'রে হিমাদ্রির খবর চেয়ে শেষ করল। ডাঃ বসাক জবাব দিলেন। কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ। অবস্থার উন্নতি হলে দেববাণী জানতে পারবে। হিমাদ্রি দিন পনের আগে বেঁচে ছিল তিনি নিশ্চিত জানেন, কারণ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। এখন সে কোথায় কেমন আছে তার জানা নেই। যেভাবে সে ধর্ম-নির্বিশেষে প্রাণ রক্ষার কাজে লেগে গেছে, তার নিরাপত্তা সম্বন্ধে জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না। সান্ত্বনা এই, সে ভাল করছে, মঙ্গল করছে, ভগবানের কাজ করছে, যার চেয়ে বড় কাজ মানুষ করতে পারে না।

গিরিডির পাহাড়ী নির্জনতায় দেববাণী তার জীবনে হিমাদ্রি-ভূমিকার সমীক্ষা করতে সাহস পেল। শুধু দেববাণী নয়, বাসন্তী দেবী, দেবযানীও হিমাদ্রি-মুখর।

তিনজনে একত্র হলে প্রধান আলোচনার বিষয় হিমাদ্রি; তিনজনের একক অবসরেও তার নিত্য আসা-যাওয়া। দেববাণী দেখতে পেল, তার জীবনের কঠিনতম সংগ্রাম অধ্যায়ে হিমাদ্রি নামক মঙ্গলময় মানুষটি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে। বলতে গেলে এমন কোনও সার্থকতা সে অর্জন করে নি যাতে হিমাদ্রির সৃষ্টিশীল সহায়তা নেই। রিসার্চ করবার সুযোগ থেকে কলেজে চাকরি পাওয়া পর্যন্ত প্রতিবার সঙ্কটের সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে পেয়েছে হিমাদ্রির প্রসারিত হাত, দাক্ষিণ্যে উজ্জ্বল। অথচ কি নৈর্ব্যক্তিক হিমাদ্রির এই বন্ধু-ভূমিকা! জানতেও দিতে চায় নি নিজের অস্তিত্ব, বাহবা দূরের কথা, কৃতজ্ঞতা পর্যন্ত পাবার আকাঙ্ক্ষা নেই; যেন নদীর গতির মত স্বাভাবিক তার সহানুভূতি, মমতা, করুণা।

শূন্যতার ব্যথা নিয়ে দেববাণী দেখতে পেল, হিমাদ্রির খুব কিছু সাংসারিক পরিচয় পর্যন্ত সে জানে না। সাধারণত হিমাদ্রি নিজের কথা বলে না। কথা আজকাল সে অনেক বলে, কিন্তু সবটাই প্রায় বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকদের নিয়ে, নয় ত কোন বুদ্ধিগত সমস্যা। মা মাঝে মাঝে বাড়ী-ঘর, পরিবার-পরিজনদের কথা জিজ্ঞেস করেছেন, স্বল্পতম জবাব দিয়েছে হিমাদ্রি। তা থেকে শুধু জানা গেছে হিমাদ্রি শৈশবে মাতৃহীন, যৌবনে পিতৃহীন। উত্তর কলকাতায় তার একখানা পৈত্রিক বাড়ী আছে; সেটা ভাড়া খাটছে। বাবা তার জন্যে কিছু অর্থ রেখে গেছেন। এলাহাবাদে কাকা ও দ্বারভাঙ্গায় পিসী ছাড়া, সে পৃথিবীতে প্রায় নিরাত্মীয়। বাবা দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন; সংসারে উদাসীন, শেষ জীবনে প্রায় সাধু হয়ে গিয়েছিলেন। হিমাদ্রি অনেককে চেনে, কিন্তু বন্ধু তার কম। এটুকু বাহ্যিক পরিচয় যে হিমাদ্রি-চরিত্র বুঝবার পক্ষে অপর্যাপ্ত, দেববাণী তা জানে। যেমন, দেববাণী জানে, বেশভূষায় উদাসীন, আহারে-বিহারে-শয়নে-আরামে নিরাকাঙ্ক্ষ হলেও, জীবনকে হিমাদ্রি প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। চিত্ত তার কোমল, প্রাণ স্পর্শকাতর, মন ভাবালু। দেববাণী দেখতে পেল তার অন্তরের নিভৃতে হিমাদ্রির জন্যে সঙ্গোপনে একটি বিশিষ্ট স্থান তৈরী হয়ে আছে। সে লজ্জিত হ'ল না। হিমাদ্রি ত পুরুষ নয়, মানুষ। সে কোনও দিন জানবে না, বুঝবে না, দেববাণীর শ্রদ্ধা। যে দেববাণীকে সে প্রায় নিজের মাহাত্ম্যে সৃষ্টি করল, তার প্রস্ফুটিত বিকাশে সে তৃপ্ত হবে, তার নিভৃত মনের সন্ধান করবে না।

সেপ্টেম্বর মাসে ডাঃ বসাকের চিঠিতে কলেজ খোলার নোটিশ পেয়ে

দেববাণীরা কলকাতায় ফিরে এল। এসেই দেববাণী হিমাদ্রির খোঁজ পেল। সে শান্তি সেনার অন্যতম অধিকর্তা হয়ে কলকাতার গুরুতর আহত মানবের সেবা করছে।

দেখা হতে প্রায় একমাস। সেদিনের কথা দেববাণী ভুলতে পারে না।

কলেজ থেকে বাড়ী ফিরছে দেববাণী! বাসের জন্যে দাঁড়িয়েছে, হঠাৎ দেখতে পেল অন্য ফুটপাথে চলন্ত ট্রাম থেকে নেমে পড়ল হিমাদ্রি।

দিগ্‌বিদিক্ খেয়াল না করে দেববাণী রাস্তা পার হতে গেল? ছুটে-আসা মোটর গাড়ী চীৎকার তুলে ব্রেক কসল তার এক-ইঞ্চি নিকটে। রাস্তার লোক হৈ হৈ ক'রে উঠল; চোখের নিমেষে ভিড় জ'মে গেল। অথচ বিব্রত, হৃদ্-কম্পিত, ত্রস্ত দেববাণী ভিড়ের মধ্যেও দেখতে পেল, হিমাদ্রি এগিয়ে আসা-বাসে উঠবার জন্যে তৈরী হচ্ছে।

কোনও মতে দৌড়ে এসে হিমাদ্রির পাশে দাঁড়াল দেববাণী।

"হিমাদ্রিবাবু।"

এতক্ষণে হিমাদ্রির নজর পড়ল। দেববাণীকে দেখে সে অবাক হ'ল, খুশিও হ'ল।

"আচ্ছা! আপনি? এতদিন কোথায় ছিলেন?"

অসহ্য লাগল দেববাণীর।

"বেশ লোক আপনি। গিরিডিতে পাঠিয়ে দিলেন, ব্যস্। কোন খোঁজ-খবর নেই। চিঠি লিখে জবাব পাওয়া যায় না। এক মাস হ'ল কলকাতায় ফিরেছি, দেখা নেই। আজ আপনাকে ট্রাম থেকে নামতে দেখে রাস্তা পার হতে মারা যাচ্ছিলাম। এত লোক ভিড় করল, আর আপনি দিব্যি ট্রাম থেকে নেমে বাসে উঠে হাওয়া হচ্ছিলেন!"

এতগুলি কথা উত্তেজিত হয়ে বলতে গিয়ে হাঁপাতে লাগল দেববাণী।

হিমাদ্রি কেমন হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠল। "আপনারই অ্যাক্‌সিডেণ্ট হতে যাচ্ছিল? কি সর্বনাশ! লাগে নি ত?"

"না। লাগে নি। লাগলেও আপনি দেখতে পেতেন না। আমি গাড়ী চাপা প'ড়ে মরে গেলেও আপনি বাসে উঠে দিব্বি চ'লে যেতে পারতেন?"

আমতা আমতা করে হিমাদ্রি বলল, "আমি কি ক'রে জানব আপনি রাস্তা পার হচ্ছিলেন? কলকাতায় ত রোজ অ্যাক্‌সিডেণ্ট। আমার বড় তাড়া।

এক্ষুণি হাওড়া স্টেশনে যেতে হবে।”

“তবে যান উঠুন। ঐ ত বাস আসছে হাওড়া স্টেশনের।”

“হ্যাঁ, চলি। বাসায় আসব’খন।”

“সে আপনার দয়া।”

“আসব, কালই আসব। সন্ধ্যের পর।”

তাকে এগোতে দেখে দেববাণী জামা ধ’রে টানল।

“কিছু বলবেন ?”

“হ্যাঁ। বলব। যাদের এত দয়া করেন, তারাও মানুষ, এ কথাটা মনে রাখবেন।”

বড় অপমান হয়েছিল দেববাণীর। কিন্তু ট্রামে ব’সে রাস্তা অতিক্রম করতে করতে অপমান বোধ কেটে গেল। লাভ নেই, সে বলল নিজেকে, লাভ নেই। হিমাদ্রির ওপর রাগ ক’রে কোনও লাভ নেই। তাকে সাধারণ মানুষের স্তরে টেনে আনবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা আহত হয়ে দেববাণীকে অপমান করেছে। চেষ্টা না করলে, অপমান নেই। পাহাড় কেটে মূর্তি তৈরী হতে পারে, পুরো পাহাড়টাকে ত মূর্তি ব’লে ভাবা যায় না। হিমাদ্রি এক জমাট মাহাত্ম্য। তাকে শুধু মানতে হবে, তাকিয়ে দেখতে হবে। বন্ধুত্বে বিগলিত করা যাবে না।

পরের দিন সন্ধ্যের পর ঠিক এল হিমাদ্রি।

সবাই ঘিরে বসল তাকে। অনুযোগ অভিযোগ শেষ হতে চায় না বাসন্তী দেবীর ও দেবযানীর। ওরা এত বলল যে দেববাণীকে আর কিছু বলতে হ’ল না।

হিমাদ্রি দাঙ্গার কথা বলতে গিয়ে ব্যথায়, দুঃখে, লজ্জায় অস্থির হয়ে উঠল। মানুষকে সে চিরদিন বড় ক’রে দেখে এসেছে ; সে যে এত নীচ, এত জিঘাংসু, এত প্রাণহীন, কোনও দিন ভাবতে পারে নি। হিংসা যে এত বীভৎস, কোনও দিন জানে নি হিমাদ্রি। মানুষের পশুত্ব যে হিংস্রতম পশুকেও বহু গুণ হার মানায়, সে যে সবটুকু সভ্যতা বিসর্জন দিয়ে অনায়াসে নৃশংস বর্বর হতে পারে, ফিরে যেতে পারে হাজার হাজার বছর নিমেষে পেরিয়ে আদিম অরণ্য যুগে, যেখানে দয়া নেই, মায়া নেই, নেই নারীর সম্মান, শিশুর অসহায় কান্নায় দুঃখ-বোধ, নেই স্নেহ, মমতা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা, বন্ধুত্ব, শুধু আছে রক্তের প্রতি রক্তের পাশব আহ্বান, আর কঠোর উলঙ্গ হিংসা, হিমাদ্রি কোনও দিন জানে

নি, জানতে চায় নি। সংঘবদ্ধ কাপুরুষতার চরম নিদর্শন তাকে গভীর ভাবে আহত করেছে। দাঙ্গার মরুতপ্ত দিনগুলি সে কেমন ক'রে কাটিয়েছে ভাল মনে নেই। শুধু মনে আছে বিপন্ন মানুষের করুণ আর্তনাদ, ভীরু কাপুরুষ মানুষ-পশুর জঘন্য হিংস্রতা। সে সব দিন ত কেটে গেছে, কিন্তু তার মনে এখনও মরুর দহন; চোখ বুজলে বীভৎস দৃশ্যগুলি বার বার ভেসে ওঠে অন্ধকারের পর্দায়!

হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা নিয়ে বাসন্তী দেবীর মনোভাব অন্য রকম, কিন্তু হিমাদ্রির যন্ত্রণা এত স্পষ্ট যে তিনিও ওর কোনও কথার প্রতিবাদ করেন নি। হিমাদ্রির কথা শেষ হলে তিনি বললেন, "তুমি কিছুদিনের জন্যে বাইরে যাও।"

"আগুন থেকে পালিয়ে শান্তি নেই। আগুন না নিভলে পালান যাবে না।"

অর্থাৎ হিমাদ্রি কোথাও যাবে না। আগুন থেকে পালাবে না।

আপন মনেই এক সময় হিমাদ্রি ব'লে উঠল, "শীগ্‌গির শুনছি দেশ স্বাধীন হবে!"

"তাতে আমাদের কি?" বাসন্তী দেবী বললেন, "আমরা ত পাকিস্তানে যাব।"

"দেশ স্বাধীন হবে, এই স্বপ্ন নিয়ে কত যুগ কেটে গেল। কত বীর প্রাণ দিল, কত মা পুত্র হারাল, কত স্ত্রীর সিঁদুর মুছল। আর যখন সেই অতি-কাম্য স্বাধীনতা দরজায় এসে দাঁড়াল, আমরা চমকে উঠলাম তার বীভৎস চেহারা দেখে। ঘৃণা, হত্যা, আত্মকলহ দিয়ে যদি স্বাধীনতাকে বরণ করতে হয়, দেখা যাবে, তার মধ্যে অনেক গলদ লুকিয়ে আছে, সে স্বাধীনতা আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে না, কেবল পিছু টানবে।"

সেদিন সন্ধ্যায় সবচেয়ে নীরব ছিল দেববাণী। তার কেবল ইচ্ছা হচ্ছিল, হিমাদ্রিকে ভাল ক'রে দেখে। দেখতে পেল, পাহাড়ের গা বেয়ে কোমল ঝর্ণা নেমে গেছে মৃদু কলতানে। অথচ পাহাড় বুঝি তা জানেও না। অমন কমনীয় ধারা তার পাথরকে বিন্দুমাত্র নরম করে নি। রুক্ষতাকে করে নি একটুও স্নিগ্ধ।

যাবার আগে দেববাণীকে একা পেয়ে হিমাদ্রি বলল, "একটু কাজ আছে আপনার সঙ্গে।"

দেববাণী অপেক্ষার দৃষ্টিতে তাকাল।

"বিদেশে যাবেন?"

"বি—দে—শে ?"

"আমেরিকায়।"

"কেন ? কি করে ?"

"পড়তে। রিসার্চ করতে।"

হিমাদ্রি না হয়ে অন্য কেউ এমন অসম্ভব কথা বললে দেববাণী হেসে উঠত। হিমাদ্রির কথায় হাসা যায় না। সে ব্যাকুল হ'ল। "কি বলছেন আপনি ?"

"শিকাগো য়ুনিভারসিটিতে পড়বার ও রিসার্চ করবার একটা স্কলারশিপ আছে। আপনি পাচ্ছেন। আগামী মাসেই যেতে হবে। তৈরী হোন।"

ঘরের দেয়ালগুলি কেমন ন'ড়ে উঠল। দেববাণী দাঁড়িয়েছিল, ব'সে পড়ল। "আমি স্কলারশিপ পাচ্ছি মানে ? আমি কেন পেতে যাব ? কে দেবে আমায় ?"

হিমাদ্রি হেসে ফেলল। "আপনি পাচ্ছেন আপনার কাজের স্থনামে। দিচ্ছে আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট।"

"না। এ হতে পারে না।"

"হতে পারে না মানে ? যাবেন না ?"

"স্কলারশিপ আমি পেতে পারি না। নিশ্চয় আপনি পেয়েছিলেন, না নিয়ে আমায় দিচ্ছেন। বলুন, সত্যি করে বলুন।"

হিমগিরির গাম্ভীর্যে হঠাৎ অনেক দূরে স'রে গেল হিমাদ্রি। কথা বলল যেন আকাশ থেকে।

"আমার পক্ষে এখন যাওয়া অসম্ভব। যাওয়ার ইচ্ছেও নেই আমার। তাছাড়া, আমি ইংলণ্ডে কাজ ক'রে এসেছি, দ্বিতীয়বার বিদেশে যাবার এখন আমার প্রয়োজন নেই। আপনার প্রয়োজন আছে। অনেক কাজ আরও আপনাকে করতে হবে। বিদেশে না গেলে বড় রিসার্চের স্থযোগ পাবেন না। আপনি যান।"

চোখে জল এসে গেল দেববাণীর।

হিমাদ্রি আবার বলল, "আপনার ক্ষমতা আছে, পরিশ্রম করার আগ্রহ আছে, নিষ্ঠা আছে। বৈজ্ঞানিকের যে তিনটি গুণ সবচেয়ে বেশী দরকার সবই আছে আপনার ; তাছাড়া—" একটু থামল হিমাদ্রি—"তাছাড়া, অনেক বড় ভাল কিছু করতে না পারলে অতীত থেকে আপনি মুক্তি পাবেন না।"

দেববাণী স'রে গিয়ে জানলার পাশে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল

বাইরের আধ-অন্ধকার বাড়ীগুলির দিকে। তার পর ফিরে এসে চেয়ারে বসল।

"কলেজে ছুটি পাব?"

"পাবেন। ডাঃ বসাকই স্কলারশিপের জন্যে পাত্র নির্বাচন করেছেন।"

"আপনাকে নির্বাচন করেছিলেন?"

"আপনার কথাও তাঁর মনে ছিল।"

"ক' বছরের স্কলারশিপ?"

"দু' বছর।"

"সব খরচ কুলিয়ে যাবে?"

"মনে ত হচ্ছে।"

"যাওয়ার খরচ?"

"ওদের।"

"থাকার ব্যবস্থা?"

"ওরাই ক'রে দেবে।"

"আমার ধারগুলো যে সব শোধ হয় নি এখনও? এখানকার খরচ চলবে কি ক'রে?"

"সে কথা আমরা ভেবেছি। সম্ভবত শিকাগো গিয়ে আপনি পার্ট-টাইম পড়াবার কাজ পেয়ে যাবেন।"

"যদি না পাই?"

"পাবেন।"

"অর্থাৎ যেতে আমাকে হবেই?"

"যাওয়া আপনার দরকার। যাওয়া আপনার উচিত।"

"আগামী বছর দেবযানীর পরীক্ষা। টাকা বেশী লাগবে। এই দেড় বছর এখানকার খরচ। মাসে মাসে ধার শোধ···"

"ওসব ভাবলে আর যেতে পারবেন না। আপনার মা ত কাজ করছেন। দরকার হলে কলেজ থেকে আরও কিছু ধার পেয়ে যাবেন। হাজার খানেক টাকা মা'র কাছে রেখে যান। তিন মাসের মধ্যে এত টাকা রোজগার করবেন যা এখানে দশ বছর পরেও মাইনে পাবেন না।"

"কলেজ থেকে ধার? মানে, আপনার টাকা।"

"আমি কেন দেব? ডাঃ বসাক দেবেন আপনাকে।"

সকরুণ হাসল দেববাণী।

হাতিবাগানের ছোট্ট ফ্ল্যাটে সে-রাত্রে নিদ্রা এল না। হিমাদ্রি চ'লে যাবার পর দেবযানী ও বাসন্তী দেবী অপ্রত্যাশিত খবর শুনে যুগপৎ অবাক্, আনন্দিত ও বিষণ্ন হলেন। বাসন্তী দেবী দেববাণীকে উৎসাহ দিলেন। "হিমাদ্রি ঠিক বলেছে। তোর যাওয়া দরকার। এদিক্কার কথা ভাবিস নে। আমার কাজটা ত যায় নি এখনও। চ'লে যাবে খরচ।"

"তুমি ত বলবেই।" দেববাণীর কণ্ঠস্বরে দুশ্চিন্তা। "তোমার না আসছে বছর রিটায়ার করার কথা?"

"চাইলে দু'এক বছর টিঁকে থাকা যাবে।"

"আমি অতদূরে চ'লে গেলে তুমি—তোমরা—থাকতে পারবে?"

"তুই ত আরও অনেক দূরে চ'লে গিয়েছিলি।"

"তোমার শরীরটা ভাল নেই।"

"খুব ভাল আছে! আমরা কি তোদের দাল্দা ও কাঁকর-যুগের মেয়ে? খাঁটি দুধ-ঘি খেয়ে ছোটবেলায় আমাদের দেহ তৈরী হয়ে গেছে। সহজে এ দেহ ভাঙবার নয়।"

"তাই যেন হয় মা, তাই যেন হয়। তুমি অনেক বছর, অনেক যুগ বেঁচে থাক। তোমার সব দুঃখ, সব অপূর্ণতা পূর্ণ করবার সুযোগ আমাদের দাও।"

"আমার সুখ-দুঃখ, পূর্ণতা-অপূর্ণতা সব তোদের নিয়ে। তোরা সুখী হলে, সার্থক হলে আমার সব সাধ শেষ। সুখী তুই জীবনে আর হবি না। অন্তত সার্থক হ'।"

দেবযানীর দিকে তাকিয়ে দেববাণী বলল, "তুমি কিন্তু হুট ক'রে একটা যা-তা বিয়ে ক'রে বস না।"

"সম্ভাব্য পাত্রদের লিস্ট তোমায় পাঠিয়ে দেব, তুমি নির্বাচন ক'রো।"

"না, ইয়ার্কি নয়। এম-বি পাস করলেই ডাক্তার হয় না।"

"ডক্টরেট পেলেই বৈজ্ঞানিক হয় না।"

"হয় না-ই ত। তাই দেখছিস না আমি আমেরিকা যাচ্ছি।"

"আমিও বিলেতে গিয়ে এফ-আর-সি-এস পড়ব।"

"পড়বিই ত। কিন্তু বিয়ে করলে আর পড়া হবে না।"

"হতেও ত পারে।"

"তেমন কাউকে যদি পাস তাহলে অন্য কথা।"

"দেখছ, মা ? ইনি এখুনি শিকাগো থেকে আমাকে পরিচালনা করছেন।"

বাসন্তী দেবী হাসলেন ! কিন্তু মন তাঁর তখন হেমন্ত-আকাশের মত উদাস হয়ে গেছে। বর্তমানের ওপর ভবিষ্যৎ ক্ষীণ ছায়া ফেলছে ; তিনি যেন হঠাৎ-পাওয়া নতুন চোখে বহু দূর দেখতে পাচ্ছেন। জীবনের তাড়না কি প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে ! তাঁরই মেয়ে দেববাণী সার্থকতার সন্ধানে চলল সুদূর শিকাগো। সমুদ্র, মহাদেশ, বিচিত্র সভ্যতা, ভাষা, মানুষের ব্যবধান নেমে আসছে তাঁর ও দেববাণীর মধ্যে। একদিন, বেশী দেরি নেই সেদিনের দেবযানীও হয়ত চ'লে যাবে বিদেশে। যাবেই, দেববাণী তার উচ্চ-শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। ঐ যে শিশু ছেলেটি বিছানায় নিদ্রিত, সেও চ'লে যাবে। সে বড় হবে বিদেশের অচেনা-অজানা পরিবেশে, মাতৃভাষা ভুলে যাবে, কোন দিন দেশে ফিরবে কি না কে জানে ? সমস্ত পৃথিবী গ্রাস করতে বসেছে, একদিন ক'রে ফেলবে, যা ছিল একান্তরূপে বাসন্তী দেবীর নিজের। নিজের দেহের অন্তস্তলে দু'টি কন্যার জন্ম দিয়েছিলেন তিনি ; কত দুঃখে, কত আনন্দে তাদের গ'ড়ে তুলেছেন। কিন্তু রক্ষা করতে পারছেন না, পারা যাবে না। তাঁদের জীবনের পরিধি ছিল গ্রামে সীমিত ; শহরে তার অতিরিক্ত বিনীত বিস্তার। এরা যেন সারা পৃথিবীর। এরা চ'লে যাবে। প'ড়ে থাকবেন শুধু তিনি, অতীতের বন্দী। প'ড়ে থাকবেন স্মৃতি নিয়ে, স্নেহ ও দুশ্চিন্তা নিয়ে।

"কি ভাবছ মা ?"

"ভাবছি, তুই যখন মস্ত নাম-করা বৈজ্ঞানিক হবি, মা'র কথা মনে থাকবে ?"

"না, তা ভাবছ না। এমন নিষ্ঠুর মিথ্যে প্রশ্ন তোমার মনে আসতে পারে না। তুমি কি ভাবছ আমি জানি।"

"বল্ ত ?"

"তুমি ভাবছ, আজ আমি আমেরিকা যাচ্ছি, কাল দেবযানী বিলেত যাবে। তখন তুমি একেবারে একা।"

"বুঝলি কি ক'রে ?"

"আমিও যে তাই ভাবছি, মা !"

যাওয়ার ব্যবস্থা শেষ হতে তিন সপ্তাহ কেটে গেল। চতুর্থ সপ্তাহে দেববাণীর যাত্রা। বিদায় নিতে গেল সে ডাঃ বসাকের কাছে।

আদর ক'রে বসালেন তিনি দেববাণীকে। কলেজের তিনতলায় প্রশস্ত ফ্ল্যাটে ডাঃ বসাক একা থাকেন।

ঠিক একা নয়, তিনি, চাকর রামদীন, আর হাজার পাঁচেক বই। বই ছড়ান ফ্ল্যাটের সর্বত্র, বিছানায়, কার্পেটে, আরাম-কেদারায়, বারান্দার টেবিলে।

"এস দেববাণী। বিদায় নিতে এসেছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"বস। একটু কফি খাবে ত? না, না, তোমাকে গিয়ে তৈরী করতে হবে না। রামদীন বেশ ভাল কফি বানায়।"

দেববাণী ডাঃ বসাকের পাশে সোফায় বসল।

"সব ঠিক-ঠাক?"

"আজ্ঞে।"

"কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেছে?"

"না। এখনও হয় নি।"

"হবে, এমন আশা আছে ত?"

"মা সহজে কাঁদেন না। খুব সাহস আছে মা'র।"

"শুনে সুখী হলাম। মা'দের সাহস থাকলে সন্তানরাও সাহসী হয়।"

"ছোট বোনটা বোধ হয় কেঁদে ফেলবে।"

"কাঁদতে দাও। বড় মিষ্টি, দেববাণী, বুঝলে, বড় মিষ্টি আমাদের এই কান্না। বিদায়ের দিনে চোখের জল বড় মিষ্টি। পশ্চিমে বিয়ের পর মেয়েরা হাসতে হাসতে বিদায় নেয় বাপ-মা'র কাছে; আমাদের মেয়েরা নেয় চোখের জলে। তাই আমাদের বিয়ে ভাঙে না।"

"ফিরে এসে আমি আপনার কাছে কাজ করতে চাই। সে সুযোগ আমার থাকবে ত?"

"থাকবে, নিশ্চয় থাকবে। ফিরে ত এস আগে! হয়ত দেখবে বিদেশেই রয়ে গেলে।"

"না, না। আমার মা আছেন যে।"

"মা'র চেয়েও বড় জিনিস, দেববাণী, জীবন। জীবন টানলে তুমি ফিরবে কি ক'রে? ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছ না?"

"দু'বছরের জন্যে—"

"এখন অবশ্য নিতে পারবে না। বছরখানেক বাদে নিয়ে নিয়ো। এখানে ফেলে রেখ না।"

"এ কথা কেন বলছেন?"

"ছেলে কাছে থাকলে তোমার ও ছেলের দু'জনারই ভাল হবে। তোমার দায়িত্ববোধ সজাগ থাকবে। ছেলে মানুষ হবে।"

"মা একেবারে একা হয়ে যাবেন।"

"হবেনই ত। জীবনের নিয়মই এই। বাবা-মা একা হয়ে যায়। বার্ধক্য মানেই একা।"

"আপনাকে চিঠি লিখলে উত্তর পাব ত?"

"পেতে পার কখনও কখনও। চিঠি লেখা আমার খুব একটা আসে না।"

"গিরিডি থেকে যে চিঠি দিয়েছিলাম তার উত্তর পেতে কিন্তু দেরি হয় নি।"

ডাঃ বসাক বললেন। "তাই নাকি? তুমি যে হিমাদ্রির খবর চেয়েছিলে! আমিও ওর জন্যে চিন্তিত ছিলাম, তোমার দুশ্চিন্তা দেখে চুপ থাকতে পারলাম না।"

দেববাণী বলল:

"আপনি আমার জন্যে অনেক করেছেন। ভগবানের আশীর্বাদে আপনার স্নেহ পেয়েছি। আমার জীবনের খুব বড় পাওয়া। আমাকে আশীর্বাদ করুন আপনি।"

গড় হয়ে প্রণাম করল দেববাণী।

তার পিঠে হাত বুলোতে গিয়ে ডাঃ বসাক দেখতে পেলেন, অনেক, অনেক দূরে, বিলীয়মান বিদেশী পরিবেশে অদেখা-অচেনা অতি-পরিচিত অত্যন্ত-আপনার একটি মেয়ে একবার দৃষ্টিপথে ভেসে উঠে মিলিয়ে গেল।

যৌবনে এক বিদেশিনীকে বিবাহ করেছিলেন ডাঃ বসাক। একটি কন্যা হয়েছিল। স্ত্রী একদিন কন্যাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন এক ইতালিয়ান আর্টিস্টের সঙ্গে। তাঁদের খোঁজ তিনি আর রাখেন নি। তারপর আর বিয়েও করেন নি। সারাজীবন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় কেটে গেছে। স্ত্রীর কথা মনে পড়ে না বিশেষ। কিন্তু, যে শিশু-কন্যাকে এক অস্থিরচিত্ত ফরাসী মহিলা পিতার বুক থেকে একদিন ছিনিয়ে নিয়েছিলেন, কল্পনার কুয়াশাঘন পথে তার ছায়া মাঝে মাঝে যাওয়া-আসা করে। অতীতের সঙ্গে ডাঃ বসাকের

একমাত্র সংযোগ এই অস্পষ্ট, হঠাৎ-আসা, তক্ষুনি-হারিয়ে-যাওয়া, ছায়া।

এয়ারপোর্টে যেতে পারবে না হিমাদ্রি, কাজ আছে জরুরী ; তাই দেববাণীর যাত্রার আগের দিন দেখা করতে এল। এমন সময় এল যখন তাকে নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল দুই বোনে আর মায়ে। বাসন্তী দেবী বলেছিলেন, "হিমাদ্রি যাবে না এয়ারপোর্টে ?"

দেববাণী জবাব দিয়েছিলো, "জানি না ত।"

"নিশ্চয় যাবে।"

"কিছু বলা যায় না, মা। দিনরাত গান্ধীজীর কাছে বেলেঘাটায় প'ড়ে থাকেন। হয়ত খেয়ালই থাকবে না কাল আমার যাবার দিন।"

"তোর যত বাড়াবাড়ি! আমি ত দেখতে পাই ভদ্রলোকের সব বিষয়ে পুরো খেয়াল।"

"সব বিষয়ে ?"

"অন্ততঃ তোর বিষয়ে।"

রঙিন হয়ে উঠল দেববাণী। যত না রঙীন তার চেয়ে বেশী বিব্রত।

"বড় ফাজিল হয়েছিস তুই।"

"সত্যি কথা বললেই ফাজলামি হয়। তোর রিসার্চ করা দরকার, হিমাদ্রি-দার পুরো খেয়াল ছিল না ? তোর চাকরি চাই, টাকা ধার চাই, এমন কি তোর আমেরিকা যাওয়া চাই—এ সব খেয়াল ওঁকে কে করিয়ে দিয়েছিল ?"

"চুপ কর।" চেঁচিয়ে উঠল দেববাণী।

বাসন্তী দেবী মৃদু হেসে বললেন, "হিমাদ্রিকে দেখে আমার ছোটবেলার একজনকে মনে পড়ে। সেও ছিল এমনি গম্ভীর, এমনি কোমল, এমনি উদার।"

"সেই তোমার দেশপ্রেমিক দাদা, না মা ?"

বাসন্তী দেবী এ প্রসঙ্গ চাপা দিলেন। বললেন, "বাণী, একটা কথা বলি। তোর কি মনে হয় হিমাদ্রি একেবারে নিঃস্বার্থ হয়ে এত উপকার করছে ?"

দেববাণীর বুক কাঁপল। "জানি নে, মা। আমার মনে হয় না ওঁর কোনও স্বার্থের দাবী আছে কারুর ওপর।"

"কথাটা ক'দিন হ'ল আমি ভাবছি," বাসন্তী দেবী বললেন। "তোর জীবনে প্রতিষ্ঠার প্রধান পুরোহিত হিমাদ্রি। এত কিছু তোর জন্যে সে করেছে, করছে। একদিন যদি কিছু দাবী ক'রে বসে ?"

"কি দাবী করবে মা? আমার কি আছে? কি উনি পেতে পারেন?"

"তাই ত। তবু কি জানিস? দিনকাল বদ্‌লে গেছে, জীবনের রীতি-নীতিও নতুন হয়েছে।"

"মা, তুমি কি বলছ?" আর্তনাদ করে উঠল দেববাণী।

"আজ কিছু বলছি না। শুধু এটুকু ছাড়া, একদিন যদি তোর প্রয়োজন হয় আমাকে জিজ্ঞেস করার, অনুমতি আমি এখুনি দিয়ে রাখছি। কে জানে, কখন আছি, কখন নেই।"

"সে প্রয়োজন হবে না, মা।"

"না হ'লে ত কথাই নেই। জীবনে এই ছিল তোর প্রকৃত পাওয়া। আমি চিরদিন পথ চেয়েছিলাম এমনি একটি ছেলের, যে আসবে বিজয়ী বীরের মত তোর জীবনে, শান্ত, নির্ভীক, উদার কোমল। সে এল, কিন্তু বড় দেরি ক'রে এল।"

"মা, তুমি আজ আমায় এমন ক'রে ব্যথা দিচ্ছ?"

"অনেক ব্যথা তোকে আরও পেতে হবে বাণী, সত্যকে যদি গ্রহণ করবার সাহস না পাস।"

দেবযানী বলে উঠল, "বড় নাটুকে হয়ে উঠছে আবহাওয়া।"

হেসে ফেললেন বাসন্তী দেবী। "তোরাই ত বলিস, জীবন নাট্যশালা, আমরা সবাই অভিনেতা।"

"আমি বলি না। আমি ডাক্তার, কবি নই। তোমাদের দুজনেরই অসুখ করেছে।"

"কি অসুখ?"

"অসুখের নাম হিমাদ্রি।"

এমন সময় খোলা দরজা দিয়ে ভারী ভারী পা ফেলে ঢুকল হিমাদ্রি। তিনজনে বিস্ময়ে হতবাক্ হ'ল।

"আমার কথা হচ্ছে মনে হ'ল?"

"আপনি একশ' নব্বুই বছর বাঁচবেন, হিমাদ্রিদা," দেবযানী চেঁচিয়ে উঠল। "দাঁড়ান, দশ বছর গ্রেস দিয়ে দুশো বছরই ক'রে দিলাম।"

"একেবারে যযাতি ক'রে দিলে যে!" বলল হিমাদ্রি। "তা, হঠাৎ আমার প্রতি ডাক্তার এত সদয় কেন?"

"আমরা ভাবছিলাম বাণীদির যাত্রাদিনের তারিখটা আপনি বেদম ভুলে গেছেন; মাস খানেক পরে হঠাৎ উদয় হয়ে একদিন হয়ত প্রশ্ন করবেন, তোমার দিদি কবে-যেন আমেরিকা যাচ্ছেন?"

সকলে হেসে উঠল। হিমাদ্রি বলল, "আমাকে এমন অখেয়ালি মনে হ'ল কেন?"

"আমার হয় নি, মা'র হয়েছে।" দেবযানী উঠতে উঠতে জবাব দিল, "আমি প্রতিবাদ করছিলাম। বলছিলাম, আসল ব্যাপারে আপনার পুরোপুরি খেয়াল আছে।"

"আসল ব্যাপারে!"

"মানে বড় বড় কাজে। এই ধরুন, হিন্দু-মুসলমানদের ছেঁড়া হৃদয় জোড়া লাগান, প্রফুল্ল ঘোষের সঙ্গে সঙ্গে শান্তি-চাই, মৈত্রী-চাই, শ্লোগান তুলে মুচি-পাড়ায় ঘুরে বেড়ান, কারুর চাকরির দরকার হ'লে..."

বলতে বলতে বেরিয়ে গেল দেবযানী। তার স্বভাব এমনিতেই একটু উচ্ছল। হিমাদ্রির সঙ্গে এ বাড়ীতে সে সব চেয়ে স্বাভাবিক ব্যবহার করে। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর বাসন্তী দেবীও স'রে গেলেন।

হিমাদ্রি বলল, "কাল সন্ধ্যে থেকে আমি আটকা। আপনাকে সি-অফ্ করতে দমদম যেতে পারব না। তাই আজ দেখা ক'রে গেলাম।"

"এসে ভাল করেছেন," দেববাণী নিবেদন করল। "দু'একটা দরকারী কথা ছিল।"

"তাহ'লে ওগুলো আগে হয়ে যাক।"

"অনেক দূরে চলে যাচ্ছি; আপনিই পাঠিয়ে দিচ্ছেন। আপনার কিন্তু একটা দায়িত্ব থেকে যাচ্ছে।"

"এমন ভাবে বলছেন যেন খুব কিছু অন্যায় ক'রে ব'সে আছি।"

"অন্যায় করেছেন, কি করেন নি, আপনি বুঝবেন। আমি দায়িত্বের কথা বলছি।"

"বলুন।"

"দেবযানী ও মাকে দেখাশোনা করতে হবে।"

"খোঁজখবর রাখব।"

"চিঠি লিখবেন।"

"তা লিখব। আপনিও কোন বিপদ্-আপদ্, অভাব-অসুবিধার কথা

লিখতে সঙ্কোচ করবেন না।"

"তেমন অবস্থায় পড়লে লিখতে হবে বৈ কি।"

"আর কিছু কাজের কথা আছে?"

"আছে। সাবধানে থাকবেন। নিজেকে বাঁচিয়ে চলবেন।"

কথাগুলি কেমন অদ্ভুত ঠেকল হিমাদ্রির কানে। ছোটবেলা মাতৃহীন, নারীর স্নেহ-প্রীতির তাপ গায়ে বিশেষ লাগে নি।

আস্তে জবাব দিল হিমাদ্রি, "চলব।"

"কবে যাবেন আমেরিকা?"

"কৈ? আমার যাবার ত কোন কথা নেই! যাচ্ছেন ত আপনি?"

"আপনি যাবেন না?"

"কি ক'রে বলি? যদি দরকার ও সুযোগ হয়, যাব।"

"যেখানেই যান, যাবেন কিন্তু। নিজের সুযোগ আমাকে দিলেন। এবার নিজের ব্যবস্থা ক'রে নিন তাড়াতাড়ি।"

"দরকার বোধ করলে আপনাকে লিখব। চাকরির ব্যবস্থা ক'রে রাখবেন, আমি চ'লে যাব।"

"খোকনকে এখন রেখে গেলাম। পরে হয়ত ওকে নিয়ে নেব। এ কাজটাও আপনাকে করতে হবে।"

"এমন কিছু কাজ নয়।"

"এটুকু ছেলে একা যেতে পারবে?"

"খুব। বি, ও, এ, সি-তে পাঠিয়ে দেব। ওরা বাচ্চাদের খুব যত্ন ক'রে পৌঁছে দেয়। এখানে তুলে দেব, আপনি ওখানে নামিয়ে নেবেন।"

"ব্যস্, কাজের কথা আর নেই।"

"আমি এখন যাচ্ছি নে। একেবারে খেয়ে যাব।"

খুশি হয়ে দেববাণী মাকে বলতে গেল।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত সবাই মিলে গল্প হ'ল সেদিন। হিমাদ্রি এর আগে কখনও এত দীর্ঘকাল এমন খোলা প্রাণে এ বাড়ী ব'সে গল্প করে নি!

কাল দেববাণী চ'লে যাবে। বড় শূন্য হয়ে যাবে এ বাড়ী। তাই প্রয়োজনের সময় সে কাছে স'রে এল। কথাবার্তায় পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল, আমি আছি। তোমাদের পাশে আমি আছি।

এগারোটা বাজলে সে বিদায় নিল। যাবার আগে, যা, কখনও কোনদিন

করে নি, এমন অনেকগুলো কাজ কয়েক মিনিটে সে ক'রে গেল।

খোকনকে কোলে তুলে আদর করল। কোলে বসিয়ে রাখল কিছুক্ষণ।

দেবযানীকে একবার 'তুই' ব'লে ফেলল। আবার তুমি বলতেই দেবযানী ভয়ংকর আপত্তি জানাল। হিমাদ্রি বলল, "বেশ, তোকে তুই-ই বলব। তোকে কখনো তুমি বলব না।"

যাবার আগে বাসন্তী দেবীর খুব কাছে এসে বলল, "দেববাণীর জন্যে ভাববেন না, মা। অনেক বড় হয়ে উনি ফিরে আসবেন। মাঝে মাঝে আমি আসব। দরকার হ'লে খবর দেবেন। একটা কার্ড লিখে দেবেন, নয়ত ডাক্তারকে দিয়ে কলেজে ফোন করাবেন।"

'মা' বলতে গিয়ে হিমাদ্রির কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল। বাসন্তী দেবী তার মাথায়, মুখে, পিঠে ও বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন।

সিঁড়ি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল দেববাণী একা। নীচের দরজার সামনে দু'জনে বিদায় নিল।

"চলি। পৌছে চিঠি দেবেন।"

"দেব।"

"সব ঠিক হয়ে যাবে ভাববেন না। ভয় পাবেন না।"

"না।"

"আমি তা হ'লে।"

"একটা কথা।"

"কি ?"

"এত যে করলেন আমার জন্য, এ ভার আমি বইব কেমন ক'রে ?"

"ভার ? বুঝলাম না।"

"আজ না বুঝলেও একদিন বুঝবেন। আমি ত কিছু করতে পারলাম না আপনার জন্যে ? কোনও দিন পারব না। এ ভার আমাকে শুধু ব'য়েই বেড়াতে হবে।"

"ও। ঋণ শোধ করার কথা বলছেন ?" হাসল হিমাদ্রি। "সে সুযোগ অনেক পাবেন। আপনি মস্ত বৈজ্ঞানিক হবেন, পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে আপনার খ্যাতি, অনেক টাকা হবে আপনার। তখন হিসেব ক'রে ঋণ শোধ দেবেন। হিসেব আমিও রাখছি। সুদ-আসল সব আদায় ক'রে নেব।"

দু'জনে মুখোমুখি দাঁড়াল। হিমাদ্রি হাত তুলে নমস্কার করল। "চলি।

আবার দেখা হবে।”

“আসুন।”

হিমাদ্রি চ'লে গেল। দীর্ঘ দেহ তার ল্যাম্প-পোস্টের আলোয় দীর্ঘতর দেখাল। বড় বড় পা ফেলে, একবারও পেছনে না তাকিয়ে, চ'লে গেল হিমাদ্রি।

দরজায় দাঁড়িয়ে দেববাণীর মনে হল, যে ইচ্ছে, যে কর্তব্য, সে চেপে গেল, তা না চাপলেই বুঝি ভাল করত। বড় ইচ্ছে ছিল, হিমাদ্রির পদধূলি নেয়। পারল না। আর কোনও দিন পারবে কি না কে জানে।

এগারো

আমেরিকা যাবার সময় দেববাণী একদিনও ভাবে নি সুদীর্ঘ দশ বছর তার বিদেশে কাটবে, জীবন এত অভিনব পথে পল্লবিত হবে, অনাস্বাদিতপূর্ব সার্থকতার নতুন দিগন্ত খুলে যাবে।

যে কাজ নিয়ে সে গিয়েছিল, সুফলপ্রসূ সাফল্য তাকে আরও বড় কাজের মধ্যে টেনে নিল ; এমন সম্মোহনী আকর্ষণে বিজ্ঞান-সাধনায় সে ডুবে গেল যে, অতীত তাকে আর টানতে পারল না। কেমন করে মাসে মাসে বছর কাটল, বছরের পর বছর, সে টের পেল না। খোকনকে পাঠিয়ে দিল লণ্ডনে ; চলল তার একাকী জীবনের নিশ্ছিদ্র সাধনা। বহুদূরে, দেশদেশান্তর, সাগর সমুদ্রের ওপারে, দেববাণীর জননী তাকে উৎসাহ দিয়ে গেলেন, তার সার্থকতার গৌরবে তিনিও মেতে উঠলেন। তবু দেববাণী মা'র প্রতি পত্রে প্রচ্ছন্ন বেদনার, বিধাতার বিরুদ্ধে রুদ্ধকণ্ঠ নালিশের, সুর শুনতে পেত। দেববাণী বড় হচ্ছে, তার মান বাড়ছে, পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞান ক্ষেত্রে সে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে, বাসন্তী দেবী তাতে গর্বিত হলেও পরিতৃপ্ত নন। তাঁর অনেক আদরের, অনেক লুকান ইচ্ছার প্রতিমূর্তি কন্যা যে সুখে, তৃপ্তিতে স্বামীর ঘর করতে পারল না, বিনা অপরাধে কঠিন কলঙ্ক চিরমলিন করে দিল তার শুচি-শুভ্র জীবনকে, বাসন্তী দেবী কিছুতে সে কথা ভুলতে পারেন না।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বছরে দেববাণী আংশিক সময়ের জন্যে আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট ক্লাসের এ্যাসিস্টেণ্ট অর্থাৎ টিউটর নিযুক্ত হ'ল। তৃতীয় বছরে তার ডক্টরেট হয়ে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার সে পুরো সময়ের শিক্ষকতা পেল, সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে রিসার্চের স্বকীয় দায়িত্ব। একই বছরে সাপের বিষ নিয়ে তার গবেষণা মার্কিন বৈজ্ঞানিক মহলে স্বীকৃতি পেল। চতুর্থ বছরে দেববাণী ম্যাসাচ্যুসেটস্ ইনস্টিটিউট অব টেকনলজিতে অধ্যাপনা ও গবেষণার বৃহত্তর সুযোগ পেয়ে শিকাগো ত্যাগ করল।

তার মার্কিন প্রবাসের পঞ্চম বছরে হিমাদ্রি চলে গেল আমেরিকায়।

কলকাতা থেকে হিমাদ্রি দেববাণীর উল্লেখযোগ্য খবর নিয়মিত রাখত।

চিঠিপত্রে তাদের বন্ধুত্ব নিবিড় হয়ে উঠেছিল। স্থাপিত হয়েছিল সুস্থির পারস্পরিক আস্থা ও নির্ভরশীলতা। কোন উচ্ছ্বাসের অতিরিক্ত উত্তাপ ছিল না তাদের বন্ধুত্বে। দেববাণী জানত, হিমাদ্রি তার পরম সুহৃদ্ ; নিজের কাজ-কর্মের বিস্তারিত বিবরণ হিমাদ্রিকে সে পাঠাত। সমস্যায় পড়লে পরামর্শ চাইত। হিমাদ্রির অগোছাল পত্রের স্বল্প বাক্যগুলির মধ্যে দেববাণীর জন্যে অকৃত্রিম মমতা ঝিল্‌মিল্ করত। নিজের কথা হিমাদ্রি কখনও বিশেষ লিখত না। বরং তার 'খবর' দেববাণী পেত অনেক বেশী, মা ও দেবযানীর চিঠিতে। তাদের কাছে সে জানতে পেরেছিল, হিমাদ্রির সঙ্গে বিজ্ঞান কলেজের কর্তৃ-পক্ষের বনিবনাও হচ্ছে না। হিমাদ্রিকে চিঠি লিখে এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানতে পারে নি। কর্মব্যস্ত দিনরজনীর ফাঁকে ফাঁকে হিমাদ্রির জন্যে দুশ্চিন্তা একটুকরো কালো মেঘের মত তার মনের আকাশে জমা হয়ে উঠেছিল। এমন সময় একদিন দেববাণী 'তার' পেল হিমাদ্রির কাছ থেকে। সে নিউইয়র্কে আসছে। পৌছবার তারিখটাই কেবল জানিয়েছে হিমাদ্রি ; দেববাণীকে ডাকে নি এয়ারপোর্টে দেখা করবার জন্যে। 'তার' পেয়ে দেববাণী অতিশয় উত্তেজিত হয়ে উঠল। উচ্চকণ্ঠে কথা বলতে লাগল, হাঁটা-চলার গতি বেড়ে গেল, আচারে-ব্যবহারে কেমন ব্যস্ত-সমস্ত ভাব দেখা দিল। ছাত্র-ছাত্রীরা অবাক্ হ'ল, কিন্তু নিজে সে বুঝতে পারল না, যতক্ষণ না একজন সহকর্মী বলে বসল, "আপনাকে একটু উত্তেজিত মনে হচ্ছে। নতুন কিছু আবিষ্কার করলেন নাকি ?"

"আবিষ্কার" করল দেববাণী নিউইয়র্ক এয়ারপোর্টে ; বিরাট আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে, বহু লোকের সমাগমে। তাদের মধ্যে খোঁজাখুঁজি ক'রে দেববাণী জায়গা নিয়েছে অপেক্ষমাণদের জন্যে নির্দিষ্ট স্থানে। দেববাণীর মনে চাপা উত্তেজনা।

চতুর্দিকের চাপা কথাবার্তার কিছু তার কানে আসছে না ; মানুষের ভিড় তার কাছে অর্থহীন। সে কান পেতে আছে আগতপ্রায় বিমানের উপস্থিতি ঘোষণার জন্যে। আকাশের বুকে উড়ন্ত বিমান খুঁজে বেড়াচ্ছে তার চঞ্চল চোখ। হঠাৎ সে ঘোষণা শুনতে পেল সে-বিমান এক্ষুণি আসবে। ধূসর আকাশে আবিষ্কার করল তার সরব উপস্থিতি। স্তব্ধ প্রতীক্ষায় কাটল আরও পাঁচ মিনিট। বন্দরের আকাশে বিমান দু'বার পাক খেল। তার পর চতুর্দিক কাঁপিয়ে নেমে এল ভূমিতে। দূর থেকে দ্রুতগতিতে 'ট্যাক্সি' ক'রে বিমান এসে

দাঁড়াল দেববাণীর অনতিদূরে। সিঁড়ি লাগল। যাত্রীরা একে একে নামতে শুরু করল। তাদের মধ্যে তিনজনকে হিমাদ্রি বলে ভ্রম করল দেববাণী। তার পর কম্পিত আনন্দে দেখল, সত্যিকারের জলজ্যান্ত হিমাদ্রি সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে। মাথা-ভরতি এক ঝাঁক চুল, চোখে পুরু কাঁচের চশমা, গলাবন্ধ মোটা পশমের কোট, দীর্ঘ ঋজু দেহ, ধীর ভারী পদক্ষেপ।

হিমাদ্রি একবারও ভাবে নি বস্টন থেকে দেববাণী নিউইয়র্ক আসবে তাকে স্বাগত করতে। তবু তার চোখ দু'একবার জনতার মধ্যে কার যেন অন্বেষণ করল। দেববাণীকে সে দেখতে পেল না। হিমাদ্রি যখন একেবারে কাছাকাছি, দেববাণী তখন মুহূর্তে এক ভয়ানক নতুন সত্য হঠাৎ আবিষ্কার করে বসল। আশ্চর্য আনন্দ, অসহ্য ব্যথা তার বুকে আচমকা জমে উঠে তাকে অভিভূত করে ফেলল। তার যুগপৎ ইচ্ছে হ'ল হিমাদ্রির কাছে, অনেক কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, হিমাদ্রির কাছ থেকে দূরে, অনেক দূরে, পালিয়ে যায়। ব্যথা আনন্দের ভার বুক থেকে গলায় উঠে এল, দেববাণী বিস্মিত হয়ে দেখল, তার চোখ জলে ভরে গেছে। ভাগ্যিস্ হিমাদ্রি তাকে দেখতে পায় নি, তাই রুমালে চোখ মুছে ভিড় কেটে, সে নিঃশব্দে গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়াল।

দেববাণীকে হঠাৎ দেখে এমন আশ্চর্য লাগল হিমাদ্রির যে, সহজে সে কথা বলতে পারল না। দেখতে পেল মুখের হাসি দেববাণীর চোখের জল সম্পূর্ণ গোপন করতে পারে নি।

দেববাণীর চোখে চোখ রেখে হিমাদ্রি অবশেষে বলল, "তুমি—আপনি এসে হাজির হলেন ?"

"হলাম," আস্তে উত্তর দিল দেববাণী। "বিদেশে একা একা—" কথা শেষ করতে পারল না।

"শরীর ভাল আছে ?" শুধাল হিমাদ্রি। "কবে ফিরতে হবে ?"

"পরশু।"

"কাল তাহলে আছেন নিউইয়র্কে।"

"আজও আছি।"

"কোথায় ? হোটেলে ?"

ঈস্ট তিন শ' কুড়ি নম্বর স্ট্রীটে একটা ছোটমত হোটেলে উঠেছি।

"আমি আপাতত ওয়াই. এম. সি. এ.-তে উঠব।"

"ভাড়া কম লাগবে।"

"শরীর ভাল আছে ?"

"কি মনে হচ্ছে দেখে ?"

"ভালই ত মনে হচ্ছে। একটু যেন ফ্যাকাসে—"

"ফ্যাকাসে নয়, ফর্সা।"

"খোকন লণ্ডনে ?"

"হ্যাঁ।"

"কাজকর্ম ত খুব ভাল চলছে, না ?"

"মন্দ চলছে না।"

"দেশে ফেরার কথা মনে হয় না বুঝি ?"

এবার হেসে ফেলল দেববাণী। বলল, "একবার 'তুমি' বলে ফেললে, 'আপনি' বলা কঠিন। তাই আপনি আমার সঙ্গে পরোক্ষে কথা কইছেন। আমাকে 'তুমি' বললে আপনার কোনও অন্যায় হবে না।"

হেসে ফেলল হিমাদ্রিও।

বলল, "তাই ভালো। অনেকদিন 'আপনি' বলেছি। এবার 'তুমি' শুরু করি। পরিচয় ত আজকের নয়।"

হাসি-খুশি দেববাণী প্রশ্ন করল, "এখানে চাকরি নিয়ে এসেছেন ?"

"তবে কি বেড়াতে ? কর্নেলে ভিজিটিং প্রফেসরের কাজ পাওয়া গেছে।"

"নিউইয়র্ক নামলেন যে ?"

"আমি লণ্ডনে যাঁর কাছে গবেষণা করেছি সেই প্রফেসর নভটনি এখন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক। তাঁর সঙ্গে দেখা করে কর্নেল যাব। কাজে যোগ দিতে আরও এক সপ্তাহ দেরি আছে।"

"তাহলে বস্টন হয়ে যান দু'এক দিনের জন্যে।"

"প্রস্তাব মন্দ নয়। কিন্তু কয়েকটা অসুবিধে আছে।"

"শুনি।"

"প্রথমতঃ ডলারের অভাব।"

"ইচ্ছের অভাব নেই ত ?"

"খুব বেশী নেই," ব'লে হেসে ফেলল হিমাদ্রি।

"তাহলে তাই করুন। আমার কাজকর্ম একটু দেখে যান। শহরটাও বেশ। সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ হবে। তা ছাড়া আমার একটি বান্ধবী আছে, নাম আইরীণ; আইরীণ পোস্ট। স্বামী ডাক্তার। শিকাগোয় আমরা

খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম। এখন ওঁরাও এখানে। দুটো দিন আপনার ভালই কাটবে, কথা দিচ্ছি।”

“ভাল যে কাটবে তাতে সন্দেহ নেই।”

“তাহলে আসছেন ত?”

“এত তাড়া কিসের? এখনও ত পুরো দুটো দিন সময় আছে।”

“যান, আপনাকে ডাকছে। আপনার মালপত্র দেখা হয়ে গেছে। চলুন, তুলে নিয়ে বাইরে যাওয়া যাক। ওদের বাসেই শহরে পৌছান যাবে।”

হিমাদ্রি কাস্টমস্ দপ্তরে এগিয়ে গেল। দেববাণী হাসি চেপে ভাবল, ‘তুমি’ বলতে রাজী হয়েছে হিমাদ্রি, কিন্তু বলে নি এখনও।

প্রায় দুটো দিন নতুন আবেশে মুহূর্তে কেটে গেল দেববাণীর। হিমাদ্রিকে নিয়ে বাসে বিমান বন্দর ছাড়ার থেকে পরের দিন বিকেলে নিজের বস্টন রওনা হওয়া পর্যন্ত যতক্ষণ সম্ভব সে হিমাদ্রির সঙ্গে কাটাল। কত কথা বলল তার হিসেব নেই। এত কথা যে তার বলার ছিল, একজন মানুষকে এত কিছু যে বলা যায়, তা আগে কখনও দেববাণী জানত না। বিজ্ঞানের কথা, মার্কিন দেশের কথা, গোটা পৃথিবীর কথা সে বলে গেল অবিরাম। আর কত যে বলল নিজের কথা। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে দেশের কথা অতৃপ্ত ক্ষুধায় সে জেনে নিল। মা'র ও দেবযানীর কথা শুনতে শুনতে চোখে জল এল দেববাণীর। হিমাদ্রি যখন বলল, “মাসীমাকে বললাম, আমার সঙ্গে চলুন, মেয়েকে দেখে আসবেন,” সে পরম ব্যাকুলতায় বলে বসল, “সত্যি, নিয়ে এলেন না কেন?”

তার ছেলেমানুষিতে হিমাদ্রি উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল।

“তিনি রাজী হলেন না।”

“মা এলে কিন্তু অতি সহজে মানিয়ে নিতে পারতেন।”

“পারতেন বৈ কি?”

“দেবযানীকে ফেলে আসেন কি করে?”

“শুধু কি দেবযানী? তোমার পাঠান টাকায় যে বাড়ী হচ্ছে তার ভারই বা কাকে দিয়ে আসবেন?”

“মা কি নিজেই সব দেখা-শোনা করছেন?”

“সব কিছু। আরকিটেক্ট নিযুক্ত করে প্লান তৈরী থেকে নিজে দাঁড়িয়ে রাজমিস্ত্রীদের কাজ দেখা পর্যন্ত।”

“হাতিবাগান থেকে লেকের ধারে রোজ যেতে হচ্ছে তাহলে?”

"রোজ। স্কুল থেকে তিন মাসের ছুটি নিয়েছিলেন এজন্যে।"

"বাড়িটা ত শেষ হয়েছে, না?"

"খুব সুন্দর দোতলা বাড়ি হয়েছে। গৃহ-প্রবেশের দিন আমি গিয়েছিলাম। মাসীমার সে কি রূপ! চোখে জল, মুখে হাসি।"

গম্ভীর হয়ে গেল দেববাণী। "মা বললেন না, যার ঘর-সংসার নেই, বিদেশে একা একা পচে মরছে, তার আবার বাড়ী!"

"ঐ ধরনের কিছু একটা বলেছিলেন, মনে পড়ছে।"

"দেবযানীর বিলেত যাবার সব ঠিক হয়ে গেছে?"

"এত দিনে হ'ল। মাকে একা ফেলে কিছুতেই যেতে চাইছিল না। তোমার তাগাদায় অনেক কষ্টে রাজী করান গেল।"

"বেচারী মা।" ভারী গলায় দেববাণী বলল, "একেবারে একা হয়ে যাবেন।"

"কিন্তু কি সৎসাহস! জোর করে দেবযানীকে রাজী করালেন শেষ পর্যন্ত!"

"আমার মা'র সত্যি তুলনা হয় না।"

"ওঁর খুব ইচ্ছে তুমি কলকাতায় ফিরে যাও। কিন্তু কখন তা প্রকাশ করতে চান না। বলেন, দূরে আছে বেশ আছে। এখানে এলেই—।"

বলতে পারল না হিমাদ্রি।

"জানি।" আস্তে আস্তে বলল দেববাণী। "আমাকেও তাই লেখেন। মা'র ধারণা দেশে ফিরলে অতীত আমাকে আবার ঘিরে ধরবে। আত্মীয়-বন্ধুরা সবাই মিলে কিছুতেই আমায় ভুলতে দেবে না। আমার কাজকর্মের কোন মর্যাদা তারা দিতে চাইবে না। তাদের কাছে আমি হয়ে দাঁড়াব স্বামী-বিবর্জিতা অভাগা রমণী।"

"অমন কিছু একটা ভয় তাঁর আছে।"

"আমার আরও কি মনে হয় জানেন?" দেববাণী ধীরে ধীরে বলল। "মনে হয়, মা-ও আমার অতীতটাই বড় ক'রে দেখছেন। এ জন্যেও তিনি আমার দেশে ফেরবার পক্ষপাতী নন।"

হিমাদ্রি অন্যমনস্ক হয়ে মন্তব্য করল, "তা হবে।"

সেণ্ট্রাল পার্কে বিকেল বেলা দু'জনে ব'সে কথা হচ্ছিল। সেণ্ট্রাল পার্ক নিউইয়র্ক শহরের সবুজ, ছায়াঘন, সযত্ন সজ্জিত ফুসফুস। আছে ছোট ছোট

পাহাড়, পরিচ্ছন্ন ঘন ঝোপ, কৃত্রিম লেক, অনেক ফোয়ারা। ছেলেমেয়েরা বাহুতে বাহু বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যারা প্রেমিক তারা প্রকাশ্যে অথবা আড়ালে ভালবাসছে। এমনি একটি যুগল ওদের কাছাকাছি এসে বসল। বসবার কিছু পরেই আলিঙ্গনাবদ্ধ হ'ল।

দেববাণী হিমাদ্রিকে বলল, "আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে।"

"করে ফেল।"

"আপনি কোনও দিন এ বিষয়ে কিছু বলেন নি।"

"কোন্ বিষয়ে?"

"আমার অতীত নিয়ে।"

"আমি?" হিমাদ্রি অপ্রস্তুত হ'ল। "আমি কি বলব?"

"আপনিও কি আমার অতীতকেই বড় করে দেখেন?"

"না ত!"

"সত্যি বলছেন?"

"নিশ্চয় সত্যি বলছি। যা হয়ে গেছে, তা নিয়ে মাথা ঘামানর কোন মানে নেই। তা ছাড়া—"

"তাছাড়া কি?"

"তোমার অতীতের চেয়ে তুমি অনেক বড় হয়ে উঠেছ।"

"কি জানি?" মাটির দিকে চোখ রেখে দেববাণী আপন মনে বলল, "কি জানি? যে ভুল একদিন করেছি, তাকে ছাপিয়ে উঠবার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করিনি। তার জন্য দামও কম দিই নি। তবু বুঝতে পারি তার সব ক্ষত-গুলি এখনও শুকোয় নি। হয়ত কোনও দিন শুকোবে না।"

রাত্রে ওরা একসঙ্গে রেস্তোরাঁয় আহার করল। অনতিপ্রসর রেস্তোরাঁ, শহরের অপেক্ষাকৃত জৌলুসহীন অঞ্চলে। কাউণ্টারের ডান পাশে বাজনা বাজছে। কাছাকাছি উঁচু প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে একটি স্বল্পবসনা মেয়ে গান গাইছে। বিভিন্ন টেবিল ঘিরে আন্তর্জাতিক মানুষের জটলা। একদল নর-নারী গান ও বাজনার সঙ্গে নাচছে। দেববাণী ও হিমাদ্রির এসব কিছু চোখে পড়ছে না। তাদের কথা এখনও শেষ হয় নি।

"পৃথিবীটা কি ভয়ানক আশ্চর্য," হিমাদ্রি বলছে। "এই ত পরশু আমি ছিলাম কলকাতা। আজ আমি নিউইয়র্কে। এইটুকু মাত্র সময়ের ব্যবধান।

অথচ কলকাতা আর নিউইয়র্ক যেন দুই পৃথিবী।”

“আমারও এদেশে এসে তাই মনে হ’ত, মনে হ’ত মানুষে মানুষে কত প্রভেদ, কত তফাৎ! পৃথিবীর এখনও বহু বছর লাগবে নিজেকে চিনতে, জানতে, বুঝতে। বিজ্ঞান হঠাৎ পৃথিবীকে অত্যন্ত ছোট ক’রে ফেলেছে, কিন্তু ভূগোলের দূরত্বই কমিয়েছে, মানুষের মনের দূরত্ব কমাতে পারে নি।”

“ইতিহাসের কতগুলি যুক্তিহীন নিষ্ঠুর নিয়ম আছে।” হিমাদ্রি বলল। “একটা হচ্ছে, মানুষ বন্ধুত্বের ভেতর দিয়ে মানুষকে যতটা জানে, তার চেয়ে বেশী জানে শত্রুতার মধ্য দিয়ে। যুদ্ধ যত পৃথিবীকে ছোট করেছে, শান্তি তার অর্ধেকও পারে নি। দেখছ না, আমেরিকা আর রাশিয়া! শান্তির সময়ে এরা একে অন্যের চেয়ে হাজার হাজার মাইল তফাৎ ছিল, হঠাৎ যুদ্ধের চাপে মিত্র হ’ল। যুদ্ধ থামবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই পুনরায় মূষিক। কিন্তু ততক্ষণে এমন চমৎকার জানা-চেনা হয়ে গেছে যে, নতুন শত্রুতায় পর্যন্ত গা ঘেঁষাঘেঁষি না ক’রে উপায় নেই।”

“অথচ আমার বড় আশ্চর্য লাগে!” দেববাণী যোগ দিল, “দেশে দেশে, সভ্যতা-সভ্যতায় দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও মানুষে-মানুষে কিন্তু সুন্দর মিল হয়ে যায়। আমেরিকানদের কথাই ধরুন। ভারতবর্ষকে এরা জানে না, বোঝে না, জানবার ইচ্ছে যদিবা আছে বোঝবার ক্ষমতা নেই। ওরা রাশিয়া নিয়ে এমন মেতে আছে যে, সমগ্র পৃথিবীর দেশগুলোকে বিচার করবে মাত্র এক মাপ-কাঠিতেঃ রাশিয়ার পক্ষে, না বিপক্ষে। ভারতবর্ষকে ত এরা কম্যুনিস্ট ব’লে প্রায় বর্জন ক’রে রেখেছে। তবু আমি ভারতবর্ষের একটি মেয়ে, আমাকে এরা মোটামুটি সহৃদয়তা ও বন্ধুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছে। সবাই সব সময় সমান ভাল ব্যবহার নিশ্চয় করে নি, কিন্তু নালিশ করবার মতো কিছু নেই আমার।”

“তোমার বুঝি অনেক বন্ধু-বান্ধবী হয়েছে এদেশে?”

“পাঁচ বছর আছি এদের মধ্যে। খুব একটা মেশবার সময় পাই নি, আগ্রহও অনুভব করিনি। কিন্তু তবু বন্ধু-বান্ধবী একেবারে নেই তা নয়। যাঁদের কাছে কাজ করেছি তাঁরা সাহায্য করেছেন; সহকর্মীরা কখনও বিশেষ নির্দয় হন নি, ছাত্র-ছাত্রীরা খুব একটা কষ্ট দেয় নি। আইরীণ ব’লে যে মেয়েটির নাম করেছি, সে আমায় সত্যি ভালবাসে।”

“আমি দু’বছর লণ্ডনে ছিলাম। কলেজের বাইরে কারুর সঙ্গে ভাব হয় নি।”

"আপনার পক্ষে সব সম্ভব।"

"ইংরেজের সঙ্গে আলাপ হয় আবহাওয়া দিয়ে। ভাব জমাতে যে কাঠখড় পোড়াতে হয় তার বদলে ব্রিটিশ মিউজিয়মে সময় কাটান অনেক বেশী লাভজনক।"

"কোনও মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় নি আপনার ?"

প্রশ্ন ক'রে দেববাণী ভাবল, নিউইয়র্কে ব'সেই এটা সম্ভব হ'ল। কলকাতায় হিমাদ্রিকে কোনও দিন এ প্রশ্ন সে করতে পারত না।

"কেন ? মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হ'তে যাবে কেন ?"

"বাঃ। ছেলেদের ত মেয়েদের সঙ্গেই বেশী বন্ধুত্ব হয়ে থাকে।"

"ও, সেকথা ! না, সে সৌভাগ্য আমার হয় নি।"

"খুব একটা আপসোস থেকে গেছে দেখতে পাচ্ছি।"

"আপসোস ক'রে লাভ নেই। সবার ভাগ্যে সব কিছু হয় না। আমার চেহারা দেখেই মেয়েরা ভয় পায়।"

"তা পেতে পারে।"

"তুমি কিন্তু খুব ভয় পাও নি।"

"আপনি কিছু জানেন না। পেয়েছিলাম।"

"ভয় ভেঙে গেছে ?" হেসে প্রশ্ন করল হিমাদ্রি।

"কি জানি ? অন্ততঃ কলকাতা থেকে যেদিন চ'লে আসি সেদিন পর্যন্ত ভাঙে নি।"

"কেন ? ভয় কিসের ? আমি ত নিজেকে ভয়ংকর মনে করি নে।"

"সে আপনি বুঝবেন না।"

হিমাদ্রি কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। কিছুক্ষণ কোন কথা নেই। যখন সে কথা বলল, যেন সে অনেক দূরে।

"আমাকে ভয় করার মত কিছুই নেই। আমি খুব একটা কারুর কাছে যেতে পারি নে। ছোটবেলা মা মারা যাওয়ার জন্যেই বোধ হয় আমি কেমন নিঃসঙ্গ, একা। বাবা আমাকে বড় ভালবাসতেন। কিন্তু কোনও দিন খুব কাছে টানেন নি। তিনিও আমার অল্প বয়সে মারা যান। তাই আমার নিঃসঙ্গতা কোনও দিন ঘুচল না। কিন্তু তার মানে এই না যে আমি ভয়ংকর কিছু। সবার মত আমারও সব কিছু আছে।"

হিমাদ্রি যে এ ধরনের কথা বলতে পারে দেববাণীর জানা ছিল না। সে

দেখল, হিমাদ্রির বড় বড় উজ্জ্বল চোখ দু'টি কাঁপছে।

দেববাণী বলল, "আপনার মন যে কত বড় তা আর কেউ না হোক আমরা জানি। আমার জন্যে আপনি যা করেছেন তা আর কেউ করতে পারত না।"

"ওসব কোনও কাজের কথা নয়।" প্রতিবাদ করল হিমাদ্রি। "তোমার জন্যে আমি কিছু হয়ত করেছি। সেটুকু জীবনে তোমার পাওনা ছিল; আমি না করলে আর কেউ করত।"

"মা বলতেন, হিমাদ্রি তোর জীবনে ভগবানের আশীর্বাদ।"

"মা-রা ওরকম বলে থাকেন। আমার নেই, থাকলে তিনিও তোমার সম্বন্ধে অমনি কিছু একটা বলতেন।"

"আমার সম্বন্ধে ? কেন ? আমাকে নিয়ে ত বলার কিছু নেই ! আপনি দিয়েছেন, আমি নিয়েছি। আমার কিছু দেবার নেই জেনেই আপনি দিয়েছেন। তাতে আমার ঋণ আরও বেড়েছে।"

"তোমাকে তুমি কিছুই জান না, দেববাণী।" হিমাদ্রি এই প্রথম দেববাণীকে নাম ধ'রে ডাকল। "তোমার দেবার অনেক কিছু আছে। তুমি কাউকে ঋণী কর নি।"

"কি বলছেন আপনি ? আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"আজ না পারছ, কাল পারবে। আমার কথা এবার থাক। তোমার কথা বল।"

নিজের মার্কিন-প্রবাসের কথা দেববাণী হিমাদ্রিকে শোনাল। যে-সব কথা চিঠিতে কাউকে লেখে নি, মনের মধ্যে কেবল পুষে রেখেছে, বিনিময়ের অভাবে যে-সব ভাবনা অস্পষ্ট, দুবল মনে হয়েছে, আজ তারাও মুক্ত-অর্গল কলস্বনে প্রবাহিত হল। দেববাণী বলল শিকাগো শহরের কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ে তার প্রথম বছরগুলির কথা, মার্কিন সমাজে মানুষের বিচিত্র জীবন ধারার কথা।

শিকাগোর নর্থ-ওয়েস্টার্ণ য়ুনিভারসিটিতে রিসার্চ করবার সুযোগ পেয়েছিল দেববাণী। আসল শিকাগো য়ুনিভারসিটি শহরের ত্রিশ মাইল উত্তরে; দেববাণী যেখানে কাজ করত সেটা শহরের মধ্যে। বারো-তলা সিমেণ্ট রং-এর বাড়ী, সম্মুখে অপ্রশস্ত লন। তাকে থাকতে হত ছাত্রছাত্রীদের জন্যে নির্মিত আঠার-তলা ডরমিটরীতে, একখানা ছোট ঘরে, একটি থাই মেয়ের সঙ্গে। এই বিরাট বাড়ীর নীচে ব্যাংক, দপ্তর, কাপড়-চোপর ধোবার ব্যবস্থা; দোতলায় প্রশস্ত ক্যানটিন ও লাউঞ্জ। তিন থেকে দশ তলা ছাত্রদের জন্যে নির্দিষ্ট; চৌদ্দ থেকে

আঠার তলা মেয়েদের জন্যে। এমনি সারা সপ্তাহ ছেলে মেয়েরা একে অন্যের ঘরে যেতে পারত না, কিন্তু সপ্তাহে একদিন বিকেল থেকে উত্তীর্ণ সন্ধ্যা পর্যন্ত এ নিষেধ তু'লে দেওয়া হত। অবশ্য হস্টেলের বাইরে ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশার কোনও বাধা ছিল না।

দেববাণী প্রথমেই লক্ষ্য করেছিল মার্কিন সমাজে ভারতীয় মেয়েদের ওপর বেশ একটু অলিখিত বৈষম্য আরোপিত হ'য়ে থাকে। ভারতীয় মেয়েদের সঙ্গে আমেরিকান মেয়েদের এক ঘরে রাখা হ'ত না। দু'দিন দেববাণীর রুম-মেট ছিল একটি মার্কিন শ্বেতাঙ্গিনী; তৃতীয় দিনে তাকে অন্য ঘর দেওয়া হল। ভারতীয় মেয়েদের রুম-মেট হ'ত হয় নিগ্রো মার্কিন মেয়ে, নয় এশিয়ান অন্য কোন মেয়ে। অথচ ছুটির দিনে মার্কিন পরিবারে দেববাণীর নিয়মিত নিমন্ত্রণ থাকত; আইরীণের সঙ্গে বন্ধুত্ব হবার পর, সে বড় একটা অন্য কোনও বাড়ীতে যেতে চাইত না। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সাধারণ মার্কিন নরনারীর অজ্ঞতা যেমন অগাধ, কৌতূহল তেমনি প্রখর। তাদের ধারণা ভারতবর্ষে এখনও সতীদাহ হয়, উলঙ্গ সাধুরা সবদা রাস্তায় বেড়ায়, প্রত্যেক ভারতবাসী গরুকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করে। তারা ভাবে প্রত্যেক ভারতবাসী যোগ জানে! নতুন-আলাপ মার্কিন পরিবারের সঙ্গে দেশ নিয়ে আলোচনায় দেববাণী যেমন মাঝে মাঝে রেগে যেত, তেমন বেশির ভাগ মজা পেত। হিমাদ্রিকে সে বলল:

"অবাক হবেন শুনে, দু-একজন আমেরিকান আমাকে নিগ্রো ভেবে বসেছে।"

"চোখের নজরে দোষ ছিল, বুঝতে পারছি।"

"আমার রং দেখে যদি-বা তাদের সন্দেহ হয়," দেববাণী হেসে বলল, "শাড়ী দেখে ভাবা উচিত ছিল আমি আর যাই হই, নিগ্রো নই।"

"শাড়ী দেখে এরা খুব অবাক হয়, না?"

"ভীষণ! কত মার্কিন আলবামে যে আমার ছবি আছে তার ইয়ত্তা নেই। এ শুধু শাড়ীর গুণ।"

"নিগ্রো মেয়েদের কথা বলো, শুনি।"

"শিকাগো শহরে নিগ্রো অনেক, যদিও য়ুনিভারসিটিতে খুব বেশী নেই। য়ুনিভারসিটিতে যে সব নিগ্রো মেয়ে পড়ত, তাদের কেউ কেউ পুরো নিগ্রো নয়—অর্থাৎ রক্তে ও রং-এ ভেজাল। নিজেদের সমাজ থেকে নির্বাসিত—শ্বেত-সমাজেও প্রবেশের অধিকার নেই। যেহেতু এরা কালো ব'লে নিজেকে

হীন মনে ক'রে, অন্য দেশের কালো মানুষদের সঙ্গে এদের ব্যবহার মোটেই ভালো নয়। আমার সঙ্গে যে নিগ্রো মেয়েটি একঘরে থাকত, সে আমাকে একেবারে দেখতে পারত না।"

"ঝগড়া হ'ত ?"

"ঝগড়া হবে কেন ? ভাব হয় নি কোনওদিন। ক্লাস থেকে ফিরে খুব রং-চং মেখে সে বেরিয়ে যেতো, ফিরত অনেক রাত ক'রে।"

"তাইতে তুমি চটে যেতে ?"

"অসুবিধা একটু হ'ত বৈ কি ? কিন্তু চটবার অধিকার আমার ছিল না। শ্বেতাঙ্গ মার্কিনদের সঙ্গে আমার সদ্ভাব সে সহ্য করতে পারত না।"

"হিংসে করত।"

"একদিন খুব মজা হল। মেয়েটা মাঝরাত পেরিয়ে ঘ'রে ঢুকেছে। আমি তখনও পড়ছি। ঘরে ঢুকে, সাজ-পোশাক ছেড়ে সটান বিছানায় শু'য়ে পড়ল। মুখের রং না ধুয়েই। আমি অবাক হ'য়ে তাকাতে, শুধু বলল, মাথাটা বড় ধরেছে, আজ একটু তাড়াতাড়ি শুতে পারলে ভাল হয়। আমি বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। আমার তো শুয়েই ঘুম। ঘণ্টা তিনেক পরে তার ধাক্কায় আমার ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠতে সে বলল, আমি ম'রে যাব, একটু পরেই ম'রে যাব, আমি আজ বাইশটা স্লিপিং পিল খেয়েছি। ভয়ানক ঘাবড়ে গেলাম। তার প্রলাপ না শুনে ছুটে গেলাম মেট্রনের ঘরে। মেট্রন এসে তাকে অনেক প্রশ্ন করল। সে বলল, ষোলটা আঠারটা স্লিপিং পিল সে প্রায়ই খেয়ে থাকে, আজ বাইশটা খেয়েছে তবু ঘুম আসছে না; এখন তার ভয় করছে। মেট্রন ডাক্তারকে খবর দিল। ডাক্তার এসে আমাদের সবাইকে বার ক'রে দিয়ে মেয়েটার সঙ্গে কি-সব কথা বলল। তারপর মেট্রনকে ডেকে ব'লে গেল—এর অভ্যেস আছে মুঠো মুঠো স্লিপিং পিল খাবার; বাইশটায় কোনও বিপদ হবে ব'লে মনে হচ্ছে না। স্লিপিং পিল না খেয়ে ঘুম হয় এমন আমেরিকান অবশ্য খুব কম আছে। আর, প্রায় প্রত্যেকে এরা মাথা-ধরার যন্ত্রণা পায়। মুঠো মুঠো অ্যাসপ্রো বা ঐ জাতীয় বড়ি খায় রোজ! আপনি তো জানেনই এদের মধ্যে মানসিক ব্যাধির প্রকোপ কতখানি! শতকরা কুড়িজন মানসিক গোলমালে ভুগছে।"

"সভ্যতার অভিশাপ," হিমাদ্রি মন্তব্য করল।

"চৌদ্দ পনের বছরে ছেলেমেয়েরা স্বাধীন! বাবা-মা'র আয়ত্তের একেবারে

বাইরে। অনেক ক্ষেত্রে বাপ মাই সন্তানদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে অন্য রাজ্যে পড়তে পাঠিয়ে দেয়। নবীন ছেলেমেয়েরা বৃদ্ধদের দিকে একেবারে ফিরে তাকায় না। যৌবন যেন এদের সর্বস্ব। যৌবনকে কতখানি, কতভাবে, কত বেশী ভোগ করবে সে নেশায় সবাই মেতে আছে। বুড়ো মানুষদের অবস্থা দেখলে কষ্ট হয়। তাদের কেউ নেই। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই বললেই হয়। তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার্কে ব'সে থাকে, উদাস মনে আকাশের পানে তাকিয়ে। অনেকের মাথা খারাপ হ'য়ে যায়। অথচ কেউ এ নিয়ে নালিশ ক'রে না। যেন, এই নিয়ম। বাপমার কিছু পাবার নেই ছেলে-মেয়েদের কাছে। যে-মেয়ের বয়স ত্রিশ অথচ বিয়ে হয় নি, তার অবস্থাও বড় শোচনীয়। যৌবনের কঠিন প্রতিযোগিতায়, সে আর 'ডেট' পায় না। কোনও ছেলে তাকে নিয়ে বেড়াতে যাবে না, সে ক্রমাগত একা হয়ে পড়ে। সে জন্যে মেয়ে বারো বছরে পা দিতেই মা তাকে ছেলেবন্ধুদের প্রভাবিত করবার উপযুক্ত শিক্ষা দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠে। আজকাল স্কুলে পর্যন্ত মেয়েদের এসব শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।"

মার্কিন দেশে কর্মজীবনের প্রথম সংগ্রাম-সংকুল বছরগুলির কথাও দেববাণী হিমাদ্রিকে শোনাল। সৌভাগ্যক্রমে যে মার্কিন অধ্যাপকের সঙ্গে তার গবেষণার কাজ পড়েছিল তিনি ছিলেন অত্যন্ত সজ্জন এবং বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক—এ দুয়ের সংমিশ্রণ, দেববাণী হেসে বলল, "যেমন আমাদের দেশে, তেমনি এদেশে, বেশী নেই।" কোনও কোনও অধ্যাপক ছাত্রছাত্রী ও জুনিয়র সহ-কর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন—নিজেদের ক্ষমতা ও গৌরব প্রচার এবং প্রতিষ্ঠার অদম্য আগ্রহে সর্বদা উত্তেজিত হ'য়ে থাকেন। আবার অনেকে ছাত্র-ছাত্রী ও সহকর্মীদের সঙ্গে সুমধুর সম্পর্ক স্থাপন ক'রে নেন। দেববাণীর অধ্যাপক, ডাঃ হিলটন ছিলেন দ্বিতীয় প্রকৃতির। দেববাণী ছাড়া, আরও পাঁচজন বৈজ্ঞানিক তাঁর সঙ্গে রিসার্চ করত, তাদের দুজন আমেরিকান, দুজন সুইডিস এবং একজন ডেনিশ। প্রত্যেকের সঙ্গে ডাঃ হিলটনের সহজ বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল, তাতে রিসার্চের কাজ বেশী তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেত। ডাঃ হিলটন কাজ ছাড়া আর কিছু জানতেন না; বিপত্নীক, নিঃসন্তান নিঃসঙ্গী জীবনে বিজ্ঞান ছিল তাঁর একমাত্র সাধনা। নিজে যেমন কাজ করতেন, চাইতেন তাঁর ছাত্রছাত্রীরাও তেমনি কাজ করুক। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সুইডিস একটি মেয়ে ডাঃ হিলটনকে একরকম পূজা করত, কাজের মাঝে মাঝে

এমন ভাবে তাকিয়ে থাকত তাঁর মুখে যে দেববাণীরা আর সবাই লজ্জা পেত, বিব্রত হ'ত। কিন্তু সামান্য অমনোযোগের জন্যেও ডাঃ হিলটনের কাছে তার লাঞ্ছনার অবধি থাকত না। বলে উঠতেন, "তোমার কবি হওয়া উচিত ছিল, মিস বার্গমেন; অর্ধেক মন নিয়ে বিজ্ঞান সাধনা চলে না।"

"কাজ করতে আমার খুব ভাল লাগত," দেববাণী ব'লে চলল, "বিশেষ ক'রে ডাঃ হিলটনের মত অধ্যাপকের সঙ্গে। কিন্তু আমার যে একান্ত ব্যক্তিগত একটা সমস্যা ছিল তার খবর তিনি তো রাখতেন না। সমস্যা আর কিছু না —ক্ষিধে। সকালে কোনও মতে ব্রেকফাস্ট ক'রে লেবরেটরীতে হাজির হতাম, দুপুরে দুঘণ্টা ছুটি ছিল, ক্যান্‌টিনে লাঞ্চ খেয়ে নিতাম। কিন্তু সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে রাত দশটা পর্যন্ত ডাঃ হিলটন কাজ করতেন, আমাদেরও থাকতে হত। অত রাত্রে ক্যান্‌টিনে খাবার পাওয়া যেত না। আর সবাই রেস্তোরাঁয় ডিনার সেরে নিত, কিন্তু আমার হাতে অত পয়সা থাকত না। আমি করতাম কি জানেন? দশটার পর ডাঃ হিলটন বাড়ী চ'লে গেলে, লেবরেটরীতেই চাল ডাল আলু পেঁয়াজ সেদ্ধ ক'রে খিচুড়ি তৈরী করতাম—খেয়ে দেয়ে এগারটা নাগাদ হস্টেলে ফিরতাম।"

"চাল ডাল আলু রোজ সঙ্গে নিয়ে যেতে নাকি?" অবাক হ'য়ে হিমাদ্রি প্রশ্ন করল।

"রোজ নেব কেন? লেবরেটরীতে আমার যে ফ্রিজ্ ছিল সেটা হল ভাঁড়ার ঘর। আমি যে রান্না করতাম এ খবর একমাত্র লেবরেটরীর রক্ষক ছাড়া কেউ জানত না। তার পরামর্শেই একাজ সম্ভব হয়েছিল। দুদিন রাত্রে প্রায় উপোস দেবার পর তাকে দুঃখের কথা জানিয়েছিলাম। সেই বলেছিল, আপনি তো এখানেই কিছু একটা রান্না ক'রে নিতে পারেন। সেই থেকে লেবরেটরীতে আমার রান্না শুরু হল। একদিন পেটে নিদারুণ ক্ষিধে নিয়ে হাঁড়িতে ডিম আর খিচুড়ি চাপিয়েছি, জিভে বার বার জল আসছে, এমন সময় ডাঃ হিলটন হঠাৎ ফিরে এলেন! কি একটা দরকারী নোট ফেলে গিয়েছিলেন। আমাকে তখনও লেবরেটরীতে দেখে বিস্মিত হলেন, 'আমার বিজ্ঞানচর্চার নমুনা দেখে স্তম্ভিত হ'লেন। মনে হল খুব বুঝি রেগে গেছেন। তাঁকে অমন গম্ভীর দেখে আমার ক্ষিধে তখন পালিয়েছে, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, বুক কাঁপছে। হঠাৎ গাম্ভীর্য ভেদ ক'রে হাসি ফুটে উঠল। বললেন, "রেস্তোরাঁয় খাওয়ার পয়সা নেই বুঝি?"

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

বললেন, "তা মন্দ কি ? বৈজ্ঞানিকের কর্তব্য সমস্যার সমাধান করা। যে বার্নারে কেমিকেল পোড়ে তাতে ইণ্ডিয়ান কারীও তৈরী হ'তে পারে। কি রান্না হচ্ছে ?"

"চাল ডাল মিলিয়ে খিচুড়ি। সঙ্গে ডিম সেদ্ধ।" ভয়ে ভয়ে বললাম।

"গন্ধটি তো বেশ আসছে! কতো দেরী রান্নার ?"

"হ'য়ে গেছে। এবার নাগাতে হবে।"

"বাড়তি হবে একটু ?"

"নিশ্চয়।"

"তাহ'লে দেখা যাক তোমাদের ভারতীয় খাওয়া কেমন, কি বল ? খুব ঝাল নয় তো ?"

"একেবারে না।"

"তুমি খেতে শুরু কর। আমাকে একটু দিতে পারো। বেশ ক্ষিধে পেয়েছে।"

"খিচুড়ি আস্বাদ ক'রে ডাঃ হিলটনের সে কি আনন্দ! কিন্তু একবারের বেশী নিলেন না। বললেন, 'না না, তোমার কম পড়বে। তা ছাড়া, আমি আবার পেট-রোগা মানুষ, অনভ্যস্ত খাবারে ক্ষতি হ'তে পারে।' আর আমার লেবরেটরীতে রান্না ক'রে খাওয়ায় বাধা রইল না। শেষটা এমন জানাজানি হ'য়ে গেল যে মাসে এক একদিন লেবরেটরীতে খিচুড়ি পার্টি হ'ত আমাদের সবার।"

হিমাদ্রিকে ওয়াই এম. সি. এ-তে পৌছে দিয়ে দেববাণী যখন হোটেলে ফিরল রাত তখন একটা। সারাদিনের ঘোরাঘুরি ও উত্তেজনায় তারও দেহমন ক্লান্ত। বিছানায় শুয়ে, তথাপি, ঘুম এল না। পাঁচ বছর পর হিমাদ্রিকে কাছে পেয়ে মন তার পুলকিত, কিন্তু এখন সে বুঝতে পারল, এ পুলক কেবল হিমাদ্রিকে পেয়ে নয়, হিমাদ্রির মধ্যে মা-কে পেয়ে, বোনকে পেয়ে, স্বদেশকে পেয়ে। হিমাদ্রি এসেছে ভারতবর্ষকে সঙ্গে নিয়ে সুদূর আমেরিকায়। তার মধ্যে জীবন্ত সে নিজে, শহর কলকাতা, বাংলা দেশ, জননী বাসন্তী দেবী, দেবযানী। তার মধ্যে দেববাণী পেয়েছে ডাঃ বসাককে, অধ্যাপক ভাদুড়ীকে, আরও কত পরিচিত-পরিজনকে। রজনীর অন্ধকারে তারা সবাই, নিদ্রাহীন

দেববাণীকে ঘিরে দাঁড়াল। চোখের সামনে ভেসে উঠল একান্ত আপনার কত মুখচ্ছবি। সামনে এসে দাঁড়ালেন মা, পাশে দেবযানী, ঐ ত একটু দূরে চেয়ারে বসে ডাঃ বসাক, আর কি আশ্চর্য, সবাইকে ছাড়িয়ে সব কিছুকে আড়াল করে, দীর্ঘ-দেহ বিরাট পুরুষ হিমাদ্রি। লণ্ডন থেকে ছুটে এসে খোকন দাঁড়ালো হিমাদ্রির পাশে, হাত ধ'রে। মনে মনে সুগভীর তৃপ্তির হাসি হাসল দেববাণী। পাঁচ বছরে কি ভীষণ বদলে গেছে হিমাদ্রি! কানের দু পাশে চুলে পাক ধরেছে, কপালে চিন্তার রেখা দেখা দিয়েছে।

সবচেয়ে যে পরিবর্তন হিমাদ্রির, তা যেমন রহস্যময় তেমন ভয়াবহ। দেববাণীর মনে হল, পাঁচ বছর পরে একটা বড় কিছু সংকল্প নিয়ে হিমাদ্রি এসে আমেরিকায় উপস্থিত হয়েছে, চাকরি করা তার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। প্রথম দিনেই দেববাণী তার মধ্যে নতুন উত্তেজনা লক্ষ্য করেছে, তার সঙ্গে নতুন কোন সংকল্পের সুস্থির আত্মবিশ্বাস। সে যেন হঠাৎ অনেক উঁচু থেকে মাটিতে নেমে আসতে চাইছে, দীর্ঘ দূরত্ব কাটিয়ে চাইছে কাছে আসতে। হিমাদ্রিকে রক্ত-মাংসের সাধারণ মানুষ দেববাণী আজই যেন প্রথম ভাবতে পারছে! যাকে মনে হয়েছে হিমাচলের মত স্বয়ংসম্পূর্ণ, আত্মবলিষ্ঠ, সে যেন নিজে থেকে ধরা দিতে চাইছে তার এতদিনের গোপন সংরক্ষিত সবটুকু দুর্বলতা নিয়ে। হিমাদ্রির এই নতুন পরিচয়ে দেববাণী যেমন পুলকিত হ'ল, তেমনি এক অজানা, অচেনা ভয় তার মনে ভিড় করল। যার গম্ভীর দূরত্বে দেববাণী বিনা কারণে ব্যথিত হ'ত, তার কাছে আসার প্রথম ইঙ্গিতে আজ সে শঙ্কিত হ'ল। এতগুলি বছর কেটে গেছে কেবল কর্মের তাড়নায়, শুধু নিজের প্রতিষ্ঠা তৈরীতে, ব্যর্থ-ম্লান অতীতের অস্তিত্ব দূর ক'রে স্বকীয় মর্যাদায় পুনঃস্থাপিত জীবন গড়তে; এর মধ্যে নিজের নারীচিত্তের সঙ্গে বোঝাপড়ার সময় বা প্রয়োজন হয় নি। অনিবার্য নিয়মে নিভৃত-অবসরে মন তার যদিবা কখনও কোন ঈষৎ চপল কল্পনায় সামান্য রঙিন হয়ে উঠেছে, সে কোমল বিলাসটুকু নিয়ে সংগোপন আত্মরমণের অবকাশ পর্যন্ত জোটে নি। অথচ আজ রাত্রির ফিকে অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে দেববাণী দেখতে পেল, অবাধ্য চিত্ত তার গোপন অসংযমে কত কিছু প্রগল্ভ কল্পনাকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে! ক্রিস্টাল আর গিনিপিগ্, সাপের বিষ আর লেবরেটরী, মোটা মোটা বই আর রাশি রাশি ম্যাগাজিন: এসবের বাইরেও যে দেববাণী নারী, তার আদিম মানবিক কামনা যে এখনও অতৃপ্ত, সে যে এখনও বৈজ্ঞানিক সার্থকতার সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে নারী-জীবনের পরিপূর্ণতার

জন্যে নীরব আগ্রহে অপেক্ষা করছে, এই কঠিন, নিষ্ঠুর ভয়নক সত্য আবিষ্কার ক'রে তার দেহ কম্পিত হ'ল, হৃদয় অশান্ত-অস্থির।

এক বছর ধ'রে দেববাণী নিজের সঙ্গে হিসাব-নিকাশ করল। এর মধ্যে তিনবার দেখা হ'ল হিমাদ্রির সঙ্গে; বন্ধুত্ব তাদের আরও জোরালো হ'ল। কিন্তু দুজনেই এক অদৃশ্য মতৈক্যে চরম সংঘাত এড়িয়ে গেল। এর মধ্যে ছ' মাসের নিমন্ত্রণে দেববাণী চলে গেল লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে। লণ্ডনে খোকনকে সে আবার কাছে পেল দীর্ঘদিন। স্যুইস কটেজের কাছাকাছি একটি ছোট ফ্ল্যাট নিয়ে খোকনকে সে নিজের কাছে রাখল। দ্রুত-বর্ধমান পুত্রের সঙ্গে নানা গল্পের ফাঁকে ফাঁকে খোকনকে গভীর ভাবে বুঝতে চেষ্টা করল দেববাণী। কিন্তু যেখানে ভয়ে সে প্রবেশ করতে পারল না, সেই খোকনের সবচেয়ে নরম অবচেতন তার অজানাই রয়ে গেল। দেববাণী শুধু আতঙ্কের সঙ্গে অনুভব করল, তার মাতৃত্ব ও নারীত্ব একই ধারার প্রবাহিত; হিমাদ্রিকে সে গ্রহণ করতে পারবে না, যদি খোকন তাকে গ্রহণ না করে। হিমাদ্রিকে খোকন ভালবাসে; কিন্তু দেববাণী জানে, হিংসাও করে। হিংসা করে মায়ের বন্ধু হিমাদ্রিকে। খোকনের বালক-মনে হয়ত ভয় আছে, একদিন হিমাদ্রি মাকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে। এই কচি বয়সেই সে এমন সতর্ক যে, কখনও কথাবার্তায় এ ভয়ের আভাস মাত্র মাকে সে জানতে দেয় নি। অথচ মা'র মুখে হিমাদ্রির কথা শুনলেই তার চোখে-মুখে, অঙ্গভঙ্গিতে এমন স্বতঃস্ফূর্ত কাঠিন্য ধরা পড়ত যে দেববাণীর বুকের স্পন্দন যেত থেমে, হাত-পা আসত অবশ হয়ে। নিজে কিন্তু সে হিমাদ্রির কথা বলতে ভালবাসত, হিমাদ্রির চিঠি দেববাণীকে পড়ে শোনাত, তার উপহার জার্মান ক্যামেরায় ছবি তুলতে তার উৎসাহের অন্ত ছিল না। লণ্ডন-প্রবাসে দেববাণী পরিষ্কার বুঝল, হিমাদ্রি যদি কোনও দিন তার চরম দাবী ঘোষণা করে, তাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। যে-বয়সে খোকন বুদ্ধিজাত ঔদার্যের সঙ্গে মা'র নিঃসঙ্গ জীবনের দারিদ্র্য বুঝতে পারবে, সেদিনের অপেক্ষায় দেববাণীর দেহে বার্ধক্য আসবে, জীবনের উত্তাপ যাবে স্তিমিত হয়ে।

খোকন যদি তার বাবার কথা মন খুলে জিজ্ঞেস করত, দেববাণীর পক্ষে হয়ত সম্ভব হ'ত তাকে সঙ্গে ক'রে হিমাদ্রির পাশে দাঁড়ান। কিন্তু দেববাণীর মনে পড়ে না, খোকন কোনও দিন তার বাবাকে নিয়ে প্রশ্ন করেছে। শিশু

বয়সেই সে বুঝে নিয়েছিল, তার বাবাকে নিয়ে ভীষণ একটা গোলমাল ; নিঃশব্দে সে অত বড় প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেছে। তার পাঁচ-ছয় বছর বয়স পর্যন্ত কলকাতার বাসায় দেববাণীর জীবনে বিভীষিকার মত হঠাৎ উদয় হয়ে যে পুরুষটি সবকিছু লণ্ডভণ্ড ক'রে দিয়ে গেল, তার প্রসঙ্গ উত্তেজনা ও কটুভাষণের মধ্যে উত্থাপিত হয় নি এমন দিন বড় যায় নি। খোকন সে-সব আলোচনা নীরবে শুনেছে ; যতটুকু তার শিশুমন বুঝতে পেরেছে তাতে সে জেনেছে, তার বাপকে ঘিরে একটা ভীষণ কুৎসিত কলঙ্ক জমাট হয়ে রয়েছে। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছে খোকন, তার পিতৃ-পরিচয় নেই, সে কেবল মায়ের সন্তান। হয়ত আরও বুঝেছে, যে-বাবাকে সে চেনে না, জানে না, তারই জন্যে মাকে পেতে হয়েছে নিদারুণ লাঞ্ছনা। সব বুঝে-শুনে সে নিজেই নিজের হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত করেছে। বাবার কথা কোনও দিন তোলে নি মা'র কাছে।

কিন্তু দেববাণী জানে, বাবার সম্পূর্ণ অনুপস্থিত অস্তিত্ব খোকন বিস্মৃত হয় নি। শিকাগোয় একদিন দেববাণী কলেজ থেকে ফিরে হঠাৎ দেখতে পেয়েছিল, খোকন একখানা ছবি নিয়ে তন্ময় হয়ে ব'সে আছে। ছবিটা দেববাণীর বিয়ের পরে তোলা, স্বামীর সঙ্গে। জীবন থেকে স্বামীকে পূর্ণ নির্বাসন দিয়েও কেন যেন ছবিটা সে ফেলতে পারে নি। নব-বিবাহিত নিজের আবেশ-ঘন পরিতৃপ্ত মুখখানাই বোধ হয় তাকে আকর্ষণ করেছে। ফেলতে গিয়ে মনে হয়েছে, থাক, এ ত আমারই জীবনের এক পরম মুহূর্তের প্রতিচ্ছবি, যা একেবারে মিথ্যে হয়ে গেল তাও যে একদিন সত্যি ছিল, তার স্মারক হিসাবে এ ছবিটা থাক। আমেরিকা যাবার সময় একটা বই-এর মধ্যে ছবিটাকে সে রেখে দিয়েছিল। তার পর ভুলে গেছে। সে বই থেকে ছবিটা মেঝেয় পড়েছিল ; দেববাণী ঘরে ঢুকে দেখল, খোকন তাই নিয়ে তন্ময় হয়ে আছে।

প্রথম কিছুটা আঁৎকে উঠল দেববাণী ; কিন্তু পরক্ষণে ভাবল, অনেকদিন সে যে-সুযোগের সন্ধানে ছিল তার হঠাৎ উপস্থিতি ভালই হ'ল। যে বস্তুতে খোকন গভীর মনোনিবেশ করেছিল দেববাণী তা নিয়ে কোনও কৌতূহল দেখাল না। আলতো আদরে খোকনকে একবারটি ডেকে সে সোজা স্নানঘরে চলে গেল। ফিরে এসে দেখল, ছবি খোকন সরিয়ে ফেলেছে, অপেক্ষা করছে তার জন্যে।

এ সময় রোজ দেববাণী খোকনকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসত। সেদিনও তাই করল। ফিরে এসে দেববাণী চটপট রাত্রের খাবার তৈরী ক'রে নিল। খোকনকে নিয়ে খেতে বসে হঠাৎ এক সময়ে প্রশ্ন করল, "খোকন তুমি কার

ছবি দেখছিলে?"

দেবকুমার এমন হতভম্ব অপরাধী চোখে তাকিয়ে রইল যে, দেববাণীর বুক ব্যথায় টন্‌টন্ করল।

"ওটা কার ছবি তুমি জান?"

দেবকুমার মাথা নেড়ে জানাল, সে জানে।

"নিয়ে এসো ত ছবিটা!"

স্পষ্ট অনিচ্ছায় দেবকুমার উঠে একটা বই থেকে ছবিটা নিয়ে এল।

ছবিতে নিজেকে লক্ষ্য ক'রে দেববাণী বলল, "একে চিনতে পারছ?"

দেবকুমার আবার ঘাড় নাড়ল।

"তোমার মা তখন কেমন কচি ছিল, না?" দেববাণী ব্যাপারটা লঘু করবার প্রয়াস পেল। "এখন কেমন বুড়ী হয়ে গেছে।"

দেবকুমার একবার ছবির দেববাণীকে আর একবার মাকে তাকিয়ে দেখল।

"ছবিতে অন্য লোকটিকে তুমি চেন?"

মাথা নাড়ল দেবকুমার। সে চেনে।

"কে বল ত'?"

"বাবা।"

এমন আশ্চর্য অদ্ভুত লাগল ছেলের কণ্ঠে এই অনুচ্চারিত-পূর্ব শব্দ যে, দেববাণীর মুখে আর কোন কথা বেরুল না। খোকনের মুখে 'বাবা' ডাক প্রস্ফুটিত হবার আগেই দেববাণীকে স্বামীগৃহ ত্যাগ করতে হয়েছিল। আজ সে প্রথম বুঝতে পারল, জীবনে কত বড় রোমাঞ্চ থেকে সে চিরদিনের জন্যে বঞ্চিত হয়ে গেছে।

লণ্ডন থেকে দেববাণী বড় বিষণ্ণ মন নিয়ে আমেরিকায় ফিরে গেল। তার আসল সমস্যা আরও জটিল হয়ে তাকে ঘিরে ধরল। জীবনের কোনও সমস্যা থেকে পালিয়ে যাবার মনোভাব তার ছিল না, তাই কর্মের অবসরে এ চরম সমস্যা তাকে পেয়ে বসল। শেষে এমন অবস্থা হ'ল দেববাণীর যে, নিজের মধ্যে নিজেকে সে আর আটকে রাখতে পারল না। হিমাদ্রির সঙ্গে বোঝাপড়া করার তাগিদে অস্থির হয়ে উঠল।

কি জানি কোন্ যাদুমন্ত্রে হিমাদ্রি বুঝি দেববাণীর অবস্থা জানতে পেরেছিল। তাই কোনও কিছু অগ্রিম সংবাদ না দিয়ে এক সপ্তাহ-শেষে এসে হাজির হ'ল দেববাণীর সামনে।

কলেজের লেবরেটরীতে কাজ করছিল দেববাণী। শনিবারের উত্তীর্ণ বিকেল। হিমাদ্রি সোজা তার সামনে এসে দাঁড়াল।

অবাক হয়ে দেববাণী প্রশ্ন করল, "আপনি! আপনি এভাবে হঠাৎ?"

স্মিতমুখে হিমাদ্রি বলল, "হঠাৎ ইচ্ছে হ'ল।"

"খুব ভাল করেছেন। ক'দিন ধ'রে আমি বড্ড ভাবছিলাম আপনার কথা।"

"অথচ আজ দেড় মাস হ'ল চিঠিও লেখ নি।"

"দেড় মাস? আমি ত ভাবছিলাম দেড় বছর!"

"ব্যাপার কি? তোমাকে এত ক্লান্ত, বিষণ্ণ লাগছে কেন?"

"জানি না। চলুন বেরিয়ে পড়া যাক।"

"কোথায় যাবে?"

"আমার ঘরে চলুন। আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।"

"চল। তোমার সঙ্গে আমারও অনেক কথা রয়েছে।"

কলেজের কিছু দূরে দেববাণীর দুই-কামরার ছোট্ট ফ্ল্যাট। পথে দু'জনে কোন কথা হ'ল না। দেববাণী চাবি দিয়ে ঘরের দরজা খুলল।

ভেতরে ঢুকে বলল, "বসুন। আমি একটু মুখ-হাত ধুয়ে আসি।"

"দেরি ক'রো না।"

"আপনি কিছু খাবেন ত? নিশ্চয় ক্ষিদে পেয়েছে।"

"ইলিশ মাছের ঝোল আর ভাত পেলে খাই।"

"পেলে আমিও ছেড়ে দি' না। আপাতত ফ্রিজ খুলে স্যাণ্ডউইচ্ নিয়ে নিন। আমি এসে কফি বানাব।"

"তুমি এস। একসঙ্গে যা হোক খাওয়া যাবে।"

দেববাণী স্নানঘরে গিয়ে শুধু হাত-মুখ ধুলো না, শাড়ীও বদল করল। আয়নায় তাকিয়ে দেখল, সত্যি বড় ক্লান্ত, শুকনো, মলিন হয়ে গেছে সে। মুখে মৃদু প্রসাধন করল।

ঘরে ঢুকে দেখল হিমাদ্রি জানলার বাইরে আকাশের দিকে চেয়ে আছে।

"খুব দেরি হ'ল?"

"অ্যাঁ! না, খুব আর কি?"

"দাঁড়ান, কফির জল এক্ষুনি হয়ে যাবে।"

"তুমি যে বললে অনেক কথা আছে।"

"আছেই ত। তার আগে একটু কফি পান করা যাক। গায়ে জোর

হবে।"

দু'জনে কফি খেল স্যাণ্ডউইচের সঙ্গে। কিচেনে গিয়ে হিমাদ্রিও পেয়ালা-প্লেট ধুয়ে রাখল।

"বিদেশের আদব-কায়দা সব শিখে গেছেন দেখছি।"

"লঙ্কায় গেলে রাবণ হতে হয়, ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি।"

বসবার ঘরে ফিরতে ফিরতে দেববাণী বলল, "আপনার যে একটা ছোটবেলা ছিল সহজে তা ভাবা যায় না।"

"আমি বুঝি জন্মেই ঘটোৎকচ?"

একটু অপ্রস্তুত হয়ে দেববাণী বলল, "না, না, তা বলছি না।"

দু'জনে হঠাৎ একসঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেল।

নীরবতা ভেঙে হিমাদ্রি বলল, "কি অনেক কথা আছে তোমার এবার বল।"

দেববাণী উত্তর দিল, "আপনারও ত অনেক কিছু বলার আছে, আপনি আগে বলুন।"

দু'জনে আবার একসঙ্গে নীরব হ'ল।

হঠাৎ হিমাদ্রি গম্ভীর ভারী গলায় ব'লে উঠল, "তুমি যখন বলবে না, তখন আমিই বলি। অনেক কথা আমার বলবার নেই, দেববাণী। শুধু একটা কথা বলবার আছে। আজ বলব। আজকের জন্যে আমি বহুদিন, বহুবছর নিজেকে তৈরী করেছি। অনেক ভেবেছি, অনেক বিচার করেছি। ভেবে, বিচার ক'রে বুঝতে পেরেছি, না বলার কোন মানে হয় না। তাই আজ বলতে এসেছি।"

দেববাণীর শরীর থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল।

হিমাদ্রি ব'লে চলল, "আমি আমার কথা যত না ভেবেছি, তোমার কথা ভেবেছি তার চেয়ে অনেক বেশী। ভেবে ভেবে আমার মনে দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে, নিজেকে এমনি ক'রে আমার কাছ থেকে দূরে রাখবার অধিকার তোমার নেই। প্রয়োজনও নেই।"

দেববাণীর মনে হ'ল, আশ্রয় না পেলে সে এক্ষুণি এলিয়ে পড়বে। শক্ত ক'রে চেয়ারের হাতল চেপে ধরল।

হিমাদ্রি গুরু-গম্ভীর বেদনায় ব'লে চলল, "তুমি চ'লে আসবার পর পাঁচ বছর আমি তোমার কথা ভেবেছি। তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করবার জন্যেই

আমি এদেশে চ'লে এসেছি! তাও আজ এক বছর হয়ে গেল। অনেকবার ভেবেছি তোমায় বলব ; কিন্তু তোমার কাছে এলে মনে হয়েছে, তুমি অন্তর্দ্বন্দ্বে কষ্ট পাচ্ছ, মীমাংসায় পৌঁছতে পার নি। তোমাকে আরও সময় দিয়েছি। এমনি ক'রে আমাদের জীবনের অবশিষ্ট মূল্যবান দিনগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই আজ আমি এসে হাজির হয়েছি তোমার কাছে। আর নষ্ট করবার মত সময় নেই দেববাণী।"

তার কামনা-কাতর চোখের পানে তাকিয়ে দেববাণী দুর্বল স্বরে প্রশ্ন করল, "কি চান আপনি ?"

"আমি তোমাকে চাই," মেঘমন্দ্রিত ধ্বনি করল হিমাদ্রি। "আমি তোমাকে চাই।"

দেববাণীর দু'গাল বেয়ে অশ্রু নামল।

"আমার কি আছে আপনাকে দিতে পারি ?"

"আমার কাছে তোমার সব আছে। আমি তোমার সবটুকু চাই। তোমার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। তোমার গৌরব, তোমার কলঙ্ক ; তোমার বিজয়, তোমার পরাজয়। আমি তোমার কিছু বাদ দিয়ে তোমাকে নেব না, দেববাণী। তুমি এ নিয়ে কোনও সংশয় ক'রো না।"

"কিন্তু আপনি জানেন না, কি ভয়ানক নিঃস্ব দরিদ্র আমি।" দেববাণী আর্তনাদ ক'রে উঠল। "মেয়েরা যা দিয়ে ধন্য হয় তার কিছু আমার নেই।"

"ওটা তোমার ভারতীয় সংস্কার, দেববাণী।" হিমাদ্রি নিঃসংশয়ে অভিমত দিল। "আজকের দিনে কুসংস্কার। এত বছর বিদেশে আছ, এখনও তোমার চোখ খুলল না ? জীবন কখনও একেবারে শেষ হয় না, দেববাণী। বার বার সে নতুন ক'রে পল্লবিত হয়। তোমার যা নেই, তা আমি চাই নে। তোমার যা আছে তাই চাই।"

দেববাণী বলল, "আপনি আমার আসল সমস্যা জানেন না।"

"জানি। তোমার আসল সমস্যা খোকন।"

"খোকন নয়, খোকনের মা। আমার বড় সমস্যা, আমি মা। আরও সমস্যা আছে, তাদেরও সমাধান আমি ক'রে উঠতে পারিনি। কিন্তু যখন, যদি-বা, পারব, তখনও এই বড় সমস্যা থেকেই যাবে।"

"খোকন আমাদের দু'জনের হতে পারে না, দেববাণী ?"

"পারে, কিন্তু হবে না। হতে চাইবে না।"

"কেন? খোকন ত আমায় ভালবাসে!"

"বাসে। হিংসেও করে।"

"ওকি ওর—"

"বুঝতে পারি না। মুখ ফুটে বাবার কথা কখনও বলে না। কিন্তু মনে যে ওর কি, মা হয়েও আমি জানতে পারি না।"

"কিন্তু খোকন ত বড় হচ্ছে, আজ না হলে কাল সে বুঝবে। একদিন সে নিজেও যখন ভালবাসবে, বিয়ে করবে, তখন তোমার শূন্য জীবনের কথা ভেবে তার দুঃখ হবে। তুমি যদি খানিকটা পূর্ণতা পাও, আজ না হলেও কাল সে তোমায় গ্রহণ করবে।"

"কিন্তু আজ? একরত্তি শিশুকে আমি বাপের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছি। জন্মে অবধি ওর একান্ত আপনার বলতে কেবল মা। আমিই ওর একমাত্র স্নেহের বন্ধন। কোনও কারণে এ বাঁধনও যদি ছিঁড়ে যায়, তাহলে খোকন দাঁড়াবে কি ক'রে? হয়ত সে নোঙরহীন হয়ে জীবনের স্রোতে ভেসে যাবে। ওর দেহে সর্বনাশের বীজ আছে। ওর রক্তে লালসা ও লোভের লুকান বীজাণু যদি অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে?"

"তাহলে? তাহলে দেববাণী?" ভাদ্র মাসের মেঘগর্জনের মত ব্যথাতুর শোনাল হিমাদ্রির প্রশ্ন।

দেববাণী ব'সেছিল হিমাদ্রির সামনে চেয়ার টেনে। দু'জনে দু'জনের পানে তাকিয়ে কথা বলছিল। হিমাদ্রির কাতর-দুর্বল প্রশ্নের উত্তরে দেববাণীর মুখে কথা সরল না। দুহাতে মাথা রেখে সে ব'সে রইল। কিন্তু মন তার অনেক কথা ব'লে গেল। হিমাদ্রি একটি কথাও শুনতে পেল না।

দেববাণীর মন প্রগল্‌ভা ঝর্ণার মত নীরব কলতানে বলে উঠল: "বহুদিন, কতদিন তার বুঝি হিসেব নেই, মনে হ'ত তুমি অনেক উঁচুতে, আমার নাগালের একেবারে বাইরে। মনে হ'ত তুমি কত দূরে, কত ব্যবধানের আড়ালে। আজ আমি যা, তার প্রায় সবটুকু তোমার তৈরী। পদে পদে তুমি দয়া করেছ, সাহায্য করেছ, আমি হাত পেতে গ্রহণ করেছি। তুমি নিজের করুণা প্রচার কর নি, আমি সব বুঝেও প্রশ্ন করিনি। মনে হয়েছে, তুমি পাহাড়ের মত মহান্, মৌন, সমাহিত। তোমার কাছে সাহায্য নিতে আমার সঙ্কোচ হয় নি, কারণ, তুমি যা দিয়েছ, নিঃস্বার্থ বন্ধুত্বে স্বর্ণ ক'রে তবে দিয়েছ। বুঝতে পেরেছি, তুমি আমায় স্নেহ কর, আমার বিপদে তুমি নিজের থেকে এসে পাশে

দাঁড়াও, আমার সমস্যা সমাধান ক'রে দাও। তোমার কাছে দাঁড়াতে নিজেকে ক্ষুদ্র, দীন, দরিদ্র মনে হয়েছে; মনে হয়েছে, সারা জীবন তোমার দানের বোঝা বইতে হবে, তোমাকে কিছু দেবার সুযোগ কোনও দিন হবে না।

"কলকাতা থেকে রওয়ানা হবার আগের দিন তুমি দেখা করতে এলে, বিদায় নেবার আগে ইচ্ছে হয়েছিল তোমায় গড় হয়ে প্রণাম করি। ডাঃ বসাকের কাছে শুনেছিলাম, তুমি কত পরিশ্রম ক'রে আমার জন্যে এদেশে কাজ করার সুযোগ সংগ্রহ করেছিলে। তুমি সিঁড়ি দিয়ে নামলে, আমি তোমার পিছু পিছু এলাম প্রায় রাস্তা পর্যন্ত। কিন্তু তোমাকে প্রণাম করবার সাহস আমার হ'ল না। মনে হ'ল তুমি মহীরুহ, আমি ছোট্ট আগাছা; তোমাকে প্রণাম করেও বুঝি অধিকারের বাইরে চলে যাব। এদেশে এসে সবকিছু তুচ্ছ ক'রে কাজে ডুবে গেলাম, শুধু নিজেকে তৈরী করার অসহ্য তাগিদে নয়, তোমার দানের পূর্ণ মর্যাদা দেবার বাধ্যতায়ও। বার বার আমার আত্মা আমায় কেবল বলেছে, আমার দিকে তাকিয়ে আছে একটি নিষ্পাপ শিশু, এক দুঃখিনী জননী, আর একজন, যে মানুষের চেয়ে বড়, জীবনের মত কঠিন। যখন ধাপে ধাপে আমি সুনাম, প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছি, প্রত্যেকটি নতুন সার্থকতা এক একটি নব-জাত ফুলের মত তোমাকে নীরবে উৎসর্গ করেছি। ভেবেছি, যাঁকে আমার কিছু দেবার অধিকার নেই, ক্ষমতা নেই, তাঁকে আমার সার্থকতা সঁপে দি'।

"কিন্তু বুঝতে পারিনি, গোপনে গোপনে আমার মনও লোভী হয়ে উঠেছে। বুঝতে পারলাম, তুমি যেদিন নিউইয়র্ক বিমান বন্দরে প্লেন থেকে নেমে আমার কাছাকাছি এসেও আমাকে দেখতে পেলে না। আমি ধরা প'ড়ে গেলাম। নিজের সেই প্রলুব্ধ রূপ দেখে আমি কেঁপে উঠলাম, আমার যেন নতুন করে জন্ম হ'ল। আবার আমি ভালবাসলাম। আর সেই ভালবাসার চোখ নিয়ে তোমার দিকে তাকাতে তোমাকেও আমি নতুন ক'রে চিনলাম। তুমিও ধরা প'ড়ে গেলে আমার কাছে। দেখলাম, যে আলো আমার প্রাণ থেকে আচমকা ঝরছে, সে আলো প্রবাহিত হচ্ছে তোমারও সমস্ত সত্তা থেকে। তুমি কেন এসে হাজির হয়েছ এই দূর দেশে, বুঝতে আমার দেরি হ'ল না।

"তোমার মত মানুষ বলেই তুমি এক বছরেরও বেশী নিজেকে ধ'রে রাখলে। আমি বুঝলাম, সময় দিচ্ছে তুমি আমাকে। নিজের সঙ্গে বোঝাবুঝি, হিসাব-নিকাশ ক'রে কূল-কিনারা পেলাম না। লণ্ডনে গিয়ে খোকনকে কাছে পেয়ে

শুধু দেখলাম, আমার আসল সমস্যার কোনও সমাধান নেই। ফিরে এসে আরও বেশী অস্থিরতায় প'ড়ে গেলাম। বুঝলাম, আমার একমাত্র উপায় তোমাকে সব খুলে বলা। বিচার-সিদ্ধান্তের ভার তোমার ওপরে ছেড়ে দেওয়া। কিন্তু তুমি ত আমায় ডাক নি! তোমার ডাক না এলে আমি যাই কি ক'রে? তাই আজকের এই পবিত্র সন্ধ্যার জন্যে আমি অস্থির প্রতীক্ষায় মুহূর্ত গুনছিলাম। তুমি এলে। আমি ধন্য হলাম। তুমি তোমার অনেক উঁচু থেকে আমার কাছে নেমে এলে। আমার প্রতীক্ষা সফল হ'ল। তুমি আমায় চাইছ। এই আমাকে তোমায় দিলাম। কিন্তু এখন থেকে সব কিছু নির্দেশ তোমাকে দিতে হবে। আমার দৈন্য, আমার শূন্যতা, দ্বিধা, সমস্যা, কলঙ্ক, অপচয় সব তোমার হাতে তুলে দিলাম। আমার দেবকুমারকেও তোমার হাতে দিলাম তুলে। তোমার দাবী কখন কি রূপ নেবে আমি জানি নে। তোমার স্ত্রী হবার সৌভাগ্য হয়ত কোনও দিন আমার হবে না। এমনও হ'তে পারে যে, তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে আমার বাকী জীবন কাটাতে হবে। কিন্তু সে সব পরের কথা। আজ, এ মহাক্ষণে তোমাকে শুধু বলতে চাই, আমি যা, আমার যতটুকু আমি আছি, তা তোমার।"

তন্ময় হয়ে দেববাণী বলছিল, তার অন্তরে প্রবাহিতা ঝর্ণার কথা; বুঝতেও পারে নি সে, হিমাদ্রির প্রশ্নের জবাব পর্যন্ত দেয় নি; বসিয়ে রেখেছে নীরব প্রতীক্ষায়।

সে চমকে উঠল তার আনত দেহে হিমাদ্রির জ্বলন্ত স্পর্শে। তাকিয়ে দেখল হিমাদ্রি দু'হাত বাড়িয়ে তাকে ধরেছে। এ মৌন-সুস্থির হিমাদ্রি নয়। বিরাট পাহাড় হঠাৎ আগ্নেয়গিরি হয়ে উঠেছে। হিমাদ্রির চির-প্রসন্ন মসৃণ ললাটে নীল শিরা ফুটে বেরিয়েছে, চোখ থেকে আগুন ঝরছে। বলিষ্ঠ দুই হাতে হিমাদ্রি দেববাণীকে চেয়ার থেকে তুলে কাছে টেনে নিয়ে কঠিন কর্কশ স্বরে বলে উঠল, "তোমাকে আমার চাই। যে প্রতিমা আমি নিজের হাতে গড়েছি, তা আমার, আর কারুর নয়।"

হিমাদ্রির বজ্র-কঠিন দেহে মিশে গেল দেববাণী।

যে মহা-লগ্নের কামনায় দেহমন তার অজ্ঞাতে সংগোপনে প্রতীক্ষা করছিল তার এমন আকস্মিক আগমনে বিহ্বল হয়ে পড়ল দেববাণী।

কিন্তু শুধু ক্ষণিকের জন্যে; একটু পরেই শান্ত কণ্ঠে সে বলল, "ছাড়ুন। ছেলেমানুষি করবেন না।"

হিমাদ্রি তাকে ছেড়ে দিল। তার অসহায় পৌরুষের কামনার্ত নগ্ন চেহারা দেখে পুলকিত হ'ল দেববাণী।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল হিমাদ্রি।

তার পর বলল, "আমি যাচ্ছি।"

"কোথায়?" মৃদু প্রশ্ন করল দেববাণী।

"রাত দশটায় প্লেন আছে।"

দেববাণীকে নীরব দেখে হিমাদ্রি যাবার জন্যে পা বাড়াল।

"একটু দাঁড়ান।"

ফিরে দাঁড়াল হিমাদ্রি।

দেববাণী গড় হয়ে প্রণাম করল।

"এর মানে?"

"মানে পরে বুঝবেন।"

নতজানু হয়ে দেববাণী হিমাদ্রির চোখে চোখ রাখল।

হিমাদ্রি চ'লে গেলেও সে ভাবে ব'সে রইল দেববাণী।

কাজে বেরুবার জন্যে দেববাণী তৈরী হচ্ছে এমন সময় আইরীণ ঘরে ঢুকল।

"তোমার যে দেখাই পাওয়া যায় না, বাণী," আইরীণ বলল অনুযোগের সুরে। "এখানে আছ তাই বোঝা যাচ্ছে না।"

"অপরাধ স্বীকার করছি," দেববাণী হাত ধ'রে আইরীণকে বসাল। "আমিও ভাবছিলাম তোমার সঙ্গে দু'তিনদিন একেবারে দেখা হয় নি।"

"খুব ব্যস্ত আছ বুঝি?"

"বিনা কাজে ব্যস্ত। কেবল ঘুরে বেড়াচ্ছি। কাজ কিন্তু খুব এগোচ্ছে না।"

"তোমার সেই পেট্রন এম. পি. কি করছেন?"

"তাঁর যা করবার তিনি করেছেন। বরং বেশীই করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে একটি সমস্যাও আমার ওপর চাপিয়েছেন।"

"বা, বা। লেনদেন শুরু হয়ে গেছে? তাঁর কোন্ সমস্যার তুমি সমাধান করতে পারবে?"

"কন্যা-সমস্যা।"

"মেয়ের বর খুঁজে দেওয়া?"

"না, না, অত সহজ নয়। ওঁর একটি মাথা-বিগড়ানো কন্যা আছে। তার মাথা সহজ করে দেওয়া।"

"মাথা খারাপ?"

"তার চেয়ে কিছু কম নয়। স্পয়েল্ট চাইল্ড।"

"কেমন দেখতে বল ত!"

"বেশ সুন্দর দেখতে। লম্বা, ছিপছিপে, ফর্সা, বড় বড় চোখ।"

"বুঝলাম। গতকাল সে তোমার খোঁজে এসেছিল।"

"বল কি? সরোজা এসেছিল আমার খোঁজে?"

"নাম বুঝি সরোজা? হ্যাঁ, এসেছিল। তাতে অবাক্ হচ্ছ কেন? তার মা তোমার জিম্মায় দিয়েছেন, সে ত আসবেই!"

"অত সহজ মেয়ে সে নয়। তাছাড়া, আমার সময় কোথায় পরের মেয়ে নিয়ে মাথা ঘামাবার?"

"আরও একজন দু'তিনবার তোমার খোঁজ ক'রে গেছে।"

"কে ?"

"বল ত কে ?"

"আমি কি ক'রে বলব ?"

"মিস্টার লিওনার্ড হোপ।"

দু'জনে হেসে উঠল।

আইরীণ বলল, "নাম হোপ হ'লে কি হয়, মানুষটা একেবারে হোপলেস্।"

"নিজে কিন্তু বলে, আমি হোপ ইটরনেল।"

"ইটরনেল নয়, ইনটরনেল। বর্তমানে এক্স্‌টরনেল কিছু চাইছে।"

"তোমার স্বভাব আর গেল না আইরীণ। সব কিছুতে রসের সন্ধান।"

"লিওনার্ড হোপের একটা কিন্তু বড় গুণ আছে। ভারতীয় মেয়েদের ওর ভয়ানক ভাল লাগে। বলে তোমরা না কি রহস্যময়ী।"

"সর্বনাশ!"

"কাল সন্ধ্যায়ও এসেছিল। তোমার খোঁজ করল। তুমি নেই শুনে বড় দুঃখিত হ'ল বেচারা।"

"রাখো তোমার ফাজলামি।"

"সত্যি বলছি। ভেবেছিল তোমাকে কোথাও বেড়িয়ে নিয়ে আসবে।"

"যাই বল আইরীণ, হোপের সঙ্গে বেড়ান একেবারে নিরাপদ্।"

"যদি ওর বড় বড় কথাগুলি নিঃশব্দে সহ্য করতে পার।"

"শোন আইরীণ, তোমাকে দু'একটা কথা বলার আছে।"

"আমাকে ?"

"হ্যাঁ, তোমাকে। আমি বুঝতে পারছি না রিসার্চ সেণ্টারের ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কিরকম দাঁড়াবে। কোথাও কিছু একটা গোলমাল বেধেছে।"

"আবার গোলমাল কিসের ?"

"ঠিক জানি না। কিছুদূর এগিয়ে সরকারী কল আর নড়ছে না। সাবিত্রী আম্মার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তিনিও আর কিছু করতে পারছেন না।"

"বব্ বলছিল, সরকারী সাহায্য না চাইলেই তুমি ভাল করতে। তোমরা সব কিছুতে গভর্ণমেণ্টকে কেন ডেকে আন বুঝতে পারি না।"

"তুমি ত জান রিসার্চ সেণ্টারের আইডিয়া আমার নয়, হিমাদ্রির। তার তৈরী প্ল্যান। হিমাদ্রির ধারণা, ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় সরকারী সাহায্য,

অন্তত আশীর্বাদ, ছাড়া বড় কিছু করা অসম্ভব।"

"তাহলে হিমাদ্রিকে লেখ না এখানে এসে তদ্বির করতে। নিজে বসে রইল ভিয়েনায়; আর তুমি বেচারা তার প্ল্যান নিয়ে দিনরাত ঘুরে মরছ। বড় অন্যায়।"

"তোমাকে ব'লে রাখি, ঐ যে চিঠিটা দেখছ টেবিলে, ওতে হিমাদ্রিকে আসতে বলেছি।"

"চমৎকার। হিমাদ্রির আসা একান্ত দরকার।"

"চুপ কর। কাজের কথাটা বলতে দাও।"

"বল।"

"হিমাদ্রিকে লিখেছি, এখানকার বড় বড় কর্তাব্যক্তিরা মেয়েদের কথায় কাজ হাসিল করতে অপমানিত বোধ করেন। সুতরাং যদি রিসার্চ সেণ্টার তৈরী করা তার একান্ত ইচ্ছে, নিজে এসে চেষ্টা না করলে কাজ এগুবে না, আমার ছুটিও শেষ হয়ে আসবে।"

"ঠিক লিখেছ।"

"বব্ ত ট্যুরে গেছে! কবে ফিরবে?"

"পরশু।"

"দিন পনের পর আমাকে মাদ্রাজ যেতে হবে। ভাবছি মাকে নিয়ে যাব।"

"খুব ভাল হবে। ওখানে শীতও কম।"

"যদি হিমাদ্রি আসে, তাহলে এরই মধ্যে এসে যাবে। অন্তত আমি তাই লিখেছি।"

"বেশ ত।"

"এখন আসল কথায় আসা যাক্। মার সঙ্গে হিমাদ্রিকে নিয়ে তোমার কোনও কথাবার্তা হয়েছে?"

"কিছু হয়েছে।"

"মা তোমাকে কি ধরনের প্রশ্ন করেছেন তা আমি আন্দাজ করতে পারি। তুমি কি বলেছ জানতে পারলে ভাল হয়।"

"আমি বলেছি, মনের দ্বন্দ্ব না কাটলে তুমি হিমাদ্রিকে বিয়ে করতে পারবে না।"

"ধন্যবাদ। তুমি যে এ ধরনের কিছু বলবে তাতে আমার সন্দেহ ছিল না।"

সেক্রেটারীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে প্ল্যান সম্বন্ধে তিনজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকের মন্তব্য চাওয়া হয়েছিল। দেববাণী খবর পেয়েছে, তাঁরা মোটামুটি পরিকল্পনাকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু তার পর কি হল, কোথায় কি কারণে কি আটকে গেল, দেববাণী বুঝতে পারল না। এদিকে তার ছুটির দিনগুলি একে একে শেষ হয়ে আসছে, আর হিমাদ্রি চিঠির পর চিঠিতে খবরের জন্যে ব্যস্ততা প্রকাশ করছে। সাবিত্রী আম্মাও কেমন নিঃসহায় অপারগ হয়ে পড়েছেন। বলছেন, "আমার যা করবার তা ত করেছি, দেববাণী ; এবার ভগবানের ইচ্ছে।"

শ্রীবাস্তব সোনা-বাঁধান দাঁত বার ক'রে হাসিমুখে দেববাণীকে বসতে দিলেন; চা আনিয়ে আপ্যায়ন করলেন; চোখ বুজে বেশ কিছু কথাও বললেন ; কিন্তু আসল খবর কিছু দিতে পারলেন না, বা দিতে চাইলেন না। বললেন, ব্যাপারটা বিবেচনাধীন, আণ্ডার অ্যাকৃটিভ কন্‌সিডারেশন।

দেববাণী বলল, "বিবেচনা করতে যে বড় বেশী সময় লেগে যাচ্ছে।"

শ্রীবাস্তব চোখ বুজে বললেন, "জনসাধারণের কাজ, সময় একটু লেগেই থাকে।"

"আমার ছুটি যে শেষ হয়ে আসছে।"

"তার আগে আশা করি আমরা আপনাকে নিশ্চয় কিছু জানাতে পারব।"

"ব্যক্তিগত ভাবে আপনার কি মনে হয়? প্ল্যান অনুমোদিত হবে?"

"ব্যক্তিগত ভাবে আমি ব্যাপারটা ভেবে দেখিনি, ডাঃ রায়।"

"আপনি কি মনে করেন সেক্রেটারীর সঙ্গে আমি আবার দেখা করব?"

"এ সিদ্ধান্তও আপনাকে নিতে হবে। তবে, উনি আজকাল বড় ব্যস্ত আছেন।"

"ব্যস্ত ত আমিও আছি, মিঃ শ্রীবাস্তব," একটু উষ্মার সঙ্গে বলে উঠল দেববাণী। "আমারও সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত একটানা কাজ।"

"তা ত নিশ্চয়," চোখ বুজে সায় দিলেন শ্রীবাস্তব।

"আচ্ছা, উঠি। আপনার সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আপনিও ত ব্যস্ত মানুষ।" দেববাণী উঠল।

লিফ্‌টের জন্যে না দাঁড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল দেববাণী। শীতের পূর্বাহ্ণ। মোলায়েম রোদ দিল্লী শহর আরামে উপভোগ করছে। বাইরে

গাড়ীর দরজা খুলতে খুলতে দেববাণী মনে মনে রেগে গেল। গাড়ীতে ব'সে চাবি লাগিয়ে স্টার্ট দিতে গিয়ে ভাবল, একটা কিছু হেস্তনেস্ত করতে হয়। এবার সে সোজা মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবে। এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে আর থাকা চলে না। কয়েকদিন পরে তাকে মাদ্রাজ যেতে হবে; সেখান থেকে কলকাতা গিয়ে দু'দশ দিন থাকতে না থাকতে ছুটি শেষ। হিমাদ্রি আসতে পারবে কি না কে জানে? চিঠি প'ড়ে দুঃখ পাবে হিমাদ্রি। ভাববে আমি অকর্মণ্য। অথচ কি শক্ত কাজের বোঝা আমার ওপর চাপিয়েছে তার কোনও খোঁজ সে রাখে না। এ ত আমেরিকা ইংলণ্ড নয়, যে যা হবার চট্‌পট্ হবে, নয়ত হবে না। এখানে একমাসে সপ্তাহ, এক বছরে এক মাস, এক যুগে বছর। মানুষ কথা ব'লে আর উপদেশ দিয়ে কাজের সময় পায় না। একটা লোককে একশ' বার ঘুরিয়ে মারবার মধ্যে যে মনুষ্যত্বের অবমাননা, তা এরা জানে না, বোঝে না। রিসার্চ সেণ্টার ত একটা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান নয়, যে বছরে বছরে আমরা মুনাফা লুঠব? নিজেদের টাকায়, হিতৈষী বিদেশীদের সাহায্যে এমন একটা সংগঠন করতে চাইছি যা, তোমরা বলছ, দেশের সবচেয়ে প্রয়োজন। তোমরা বিজ্ঞান-চর্চার নিদারুণ প্রয়োজনীতা সম্বন্ধে দিনরাত তারস্বরে চেঁচাচ্ছ। অথচ একটা বাস্তব জলজ্যান্ত কিছু করতে চাইছি, তোমরা কোথায় উৎসাহী হয়ে, কৃতজ্ঞ হয়ে বলবে, কর, জলদি কর, না কেবল ঘোরাচ্ছ আর টালবাহানা করছ। দেববাণী নিজেকে বলল, এ ব্যাপারের ভার নেওয়াই তোমার উচিত হয় নি। মেয়েদের কথা তোমার দেশের পুরুষরা যে অর্ধেক শোনে, অর্ধেক শোনে না, তোমার জানা উচিত ছিল।

সেক্রেটারিয়েট থেকে দেববাণী রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গেল। দেবকুমারকে কিছু টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। তাতেও ঝামেলা কম নয়। পর পর তিনজন অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে হ'ল। আসবার সময় দেববাণী কিছু ডলার সঙ্গে এনেছিল; রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা রেখেছে। তার থেকে কিছু স্টার্লিং পাঠাতে হবে দেবকুমারকে। তৃতীয় অফিসার সহৃদয়তার সঙ্গে কাজটা প্রায় সব করে দিলেন। যেটুকু বাকী রইল, বললেন, দু-এক দিনে হয়ে যাবে।

"আবার আসতে হবে আমাকে?" দেববাণী প্রশ্ন করল।

"না না। আপনি পরশুর পরে কোনও দিন আমায় ফোন করবেন। আপনাকে বলে দেব যে টাকা লয়েডস্-এ চলে গেছে।"

এবার জি. পি. ও-তে গিয়ে দেববাণী চিঠি দু'খানা ডাকে দিল। কিছু ডাক

টিকেট, এয়ারোগ্রাম কিনল।

গাড়ীতে বসে দেববাণী ব্যাগ থেকে নোট বই বার করে একটা ঠিকানা দেখল। গাড়ী ঘুরিয়ে কনট্ সার্কাস হয়ে কার্জন রোডে ঢুকল। দু পাশে বাংলোগুলি দেখতে দেখতে কুড়ি নম্বর বাড়ীর ফটকে গাড়ী নিয়ে ঢুকল দেববাণী।

বিরাট বাংলো বাড়ী। সামনে প্রশস্ত সবুজ লন। ম্লান চন্দ্রমল্লিকার সারি সারি টব! শীতের ফুল ফুটেছে সগৌরবে রং-এর বাহার প্রচার ক'রে। দেববাণী বাগানে চোখ বুলিয়ে সোজা সামনের বারান্দায় চলে এল। ঘড়িতে দেখল, এগারোটা চল্লিশ। দরজার গায়ে কলিংবেল। দেববাণী বেশ জোরেই বেল টিপল।

যে লোকটি মিনিট দুই পরে দরজা খুলল, দেববাণী তাকে জিজ্ঞেস করল, "ডাঃ ভগবানদাস আছেন?"

"আছেন। আপনি বসুন। কি বলব তাঁকে?"

দেববাণী ব্যাগ থেকে কার্ড বার করে লোকটির হাতে দিল।

একটু পরে ড্রেসিং গাউনে দেহ আবৃত ছোটখাট এক বৃদ্ধ দ্বারপথে দেখা দিলেন। মাথা-জোড়া টাক, দেববাণী দেখল, একেবারে কেশহীন। ভাঁজ-পড়া মুখের চামড়ায় আশ্চর্য সজীবতা। ছোট ছোট চোখের ওপর দুই গুচ্ছ সাদা ভ্রূ। বলিষ্ঠ সুগঠিত নাকের নীচে পাকা গোঁফ। নাকের দু পাশ থেকে ওষ্ঠ বেয়ে চিবুক পর্যন্ত গভীর ভাঁজ।

দ্রুত পদক্ষেপে দেববাণীর কাছে এগিয়ে এসে তিনি বললেন, "ডক্টর রয়?"

দেববাণী আনত হয়ে নমস্কার করল।

"আসুন, আসুন। আমি আজ কদিন থেকে আপনার আগমন প্রতীক্ষা করছি।"

"আমি পরশু ডাঃ বসুর চিঠি পেয়েছি।"

"মাত্র পরশু! আমি ত সপ্তাহের বেশী হল হিমাদ্রির চিঠি পেয়েছি।"

"অসময়ে এসে পড়লাম। আপনার স্নান-আহারের সময় নিশ্চয় এখন।"

"না, না। বুড়ো মানুষের কোনও সময়ই অসময় নয়, বা সর্বদাই অসময়," মিষ্টি হাসলেন ডাঃ ভগবানদাস। "স্নান আমার হয়ে গেছে। একটার আগে কখনও খাই নে।"

ব্যস্ত হয়ে বললেন, "চলুন, রোদে বসা যাক্। ভেতরের উঠোনে আমি রোদেই বসে ছিলাম।"

লনে চেয়ার পাতা ছিল। দেববাণীকে বসালেন। নিজেও বসলেন।

দেববাণী বলল, "আপনার শরীর সুস্থ আছে ত?"

"বুড়ো হয়ে গেছি," সহাস্যে বললেন ভগবানদাস, "এখন ও-কথার কোনও মানে নেই। শরীর যেটুকু ঠিক আছে তারই জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে হয়। বয়স ত কম হল না। চুয়াত্তর পূর্ণ হয়ে পঁচাত্তর চলছে।"

দেববাণী দেখল, বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে কথাগুলি বললেন ডাঃ ভগবানদাস।

"ডাঃ বসুর চিঠিতে আপনি সব জেনেছেন। আপনাকে পেলে আমরা বড় উপকৃত হব।"

"হিমাদ্রি আমার ছাত্র ছিল," ভগবানদাস বললেন, "আমার সবচেয়ে ভাল ছাত্রদের মধ্যে একজন। তার কাছে আমি অনেক কিছু আশা করি। হিমাদ্রি লিখেছে, সে ও আপনি দু'জনে মিলে দিল্লীতে একটা এ্যাড্‌ভান্সড্‌ সায়ান্টিফিক রিসার্চ সেণ্টার খুলতে চাইছেন। আমাকে তার চীফ ডাইরেক্টর হবার জন্যে হিমাদ্রি লিখেছে। তার—আপনাদের—প্রস্তাবে আমার সম্মতি আছে কি না, আপনি জানতে এসেছেন। কেমন ঠিক ত? অ্যাম আই রাইট?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"রিসার্চ সেণ্টারের জন্যে আপনারা কিছু বেসরকারী বিদেশী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন, প্রধানত আমেরিকান। আপনাদের প্ল্যান বর্তমানে ভারত সরকারের বিবেচনাধীন। আপনারা সরকারের কাছে বিনামূল্যে জমি চেয়েছেন ইনস্টিটিউটের বাড়ীর জন্যে। সরকার এখনও কোনও স্থির সিদ্ধান্ত দেন নি। তবে আপনাদের আশা আছে, সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত নৈরাশ্যজনক হবে না। অ্যাম্ আই রাইট্?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"রিসার্চ সেণ্টারে স্নাতকোত্তর গবেষণা হবে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে, বিশেষত ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রিতে। আপনারা বাইরে থেকে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক আনবার চেষ্টা করছেন। পিওর ও অ্যাপ্লায়েড উভয় দিকেই আপনাদের কাজ চলবে। ইনস্টিটিউটকে কালক্রমে একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান-বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা আপনাদের চরম উদ্দেশ্য। অ্যাম্ আই রাইট্?"

''ভারতবর্ষে একটাও সায়ান্স য়ুনিভারসিটি নেই।"

"জানি, জানি। ইংলণ্ডেও নেই। জার্মেনীতেও নেই। আমেরিকায় আছে, রাশিয়ায় আছে। শুনছি চীনেও হচ্ছে। কিছুদিন আগে চীনের একজন বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ হয়েছিল। ওরা যেভাবে বিজ্ঞানকে গ্রহণ করেছে আমরা তার অর্ধেকও করিনি।"

দেববাণী বলল, "আপনার পরিচালনা পেলে আমরা সত্যি বড় আনন্দিত হব।"

"তা ত হবেন, বুঝলাম," মৃদু হেসে বললেন ভগবানদাস। "কিন্তু এ বয়সে আমি আর কতটুকু করতে পারব ? তাছাড়া, আপনারা এ যুগের নতুন মানুষ। বুড়োদের ডেকে না এনে নিজেরাই দায়িত্ব নিন না কেন ?"

"দায়িত্ব আমরা যতখানি সম্ভব নেব।" দেববাণী উত্তর দিল। "ডাঃ বসু ভিয়েনার চাকরি ছেড়ে এখানে চলে আসবেন। আমিও হয়ত আসতে পারি। কিন্তু বড় কিছু পরিচালনার অভিজ্ঞতা তো আমাদের নেই ? আরও একটা কথা আছে। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক হিসেবে সবাই আপনাকে শ্রদ্ধা করে। আপনি আমাদের উদ্যোগের কর্ণধার হলে সহজে আমরা জাতে উঠব।"

হেসে উঠলেন ভগবানদাস। "আপনি কদিন হল দেশে এসেছেন ?"

"মাস খানেক।"

"নিশ্চয় অনেক দিন পর।"

"দশ বছর।"

"তাই এ কথা বলতে পারছেন। স্বদেশ সম্বন্ধে আপনার কোন অভিজ্ঞতা নেই।"

"তা আমি অস্বীকার করতে পারি নে।"

"অস্বীকার করে লাভ হ'ত না। বৈজ্ঞানিক হিসেবে আমার যেটুকু খ্যাতি, প্রায় সবটাই বিদেশে। দেশে নয়।"

"সে কি করে সম্ভব ?"

"দুনিয়ায় সবই সম্ভব। ভারতবর্ষ এখন একটা বিচিত্র লেবরেটরী। নানা বিষয়ের একস্‌পেরিমেণ্ট চলছে। সে অবশ্য খুব ভাল কথা। বৈজ্ঞানিক হিসেবে আমি তাতে আনন্দিত। কিন্তু একটা বড় খুঁত থেকে যাচ্ছে আমাদের।"

"কিসের খুঁত ?"

যাঁরা একস্‌পেরিমেণ্ট করছেন তাঁরা সবাই রাজনৈতিক মানুষ। কিংবা তাঁরা ব্যুরোক্র্যাট। রাজনীতি ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে এঁদের একস্‌পেরিমেণ্ট

করবার পূর্ণ অধিকার আছে। ভুল হোক, ঠিক হোক, এঁরা কাজ করছেন, এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভুল-ভ্রান্তির অভিজ্ঞতা অর্জন করতে করতে দেশটা এগিয়েও যাচ্ছে। কিন্তু শিক্ষা, জ্ঞান, মননশীলতার ক্ষেত্রে রাজনীতির প্রভাব বড় ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ দেশের জ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে যে রকম বিশৃঙ্খলা, খুব কম দেশেই তা দেখতে পাবেন। অথচ রাজশক্তি যেমন গর্বিত ও দাম্ভিক, শিক্ষাবিদ্‌রা তেমনি দলে ভিড়বার জন্য উৎসুক। আমার দুর্ভাগ্য, আমি এঁদের শিক্ষানীতি, বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষানীতির সঙ্গে মোটেই একমত নই। আমার মতামত আমি গোপন করিনি। ফলে আমি আজ যাকে ডিপ্লোম্যাটিক ভাষায় বলা হয়, পার্‌সোনা নন গ্রাটা। অর্থাৎ আমার পাত্তা নেই কোথাও।"

"আমাদের ইনষ্টিটিউট ত সরকারী ব্যাপার হবে না," দেববাণী বলল, "সুতরাং আপনার চিন্তা করবার কারণ নেই।"

"ওখানে আপনি আবার ভুল করছেন। ভারতবর্ষে আজ কোনও কিছু সরকারী না হয়ে উপায় নেই। তার কারণ খুব সোজা। আমাদের দরিদ্র অনগ্রসর দেশকে চট্‌পট্‌ গড়ে তুলতে হলে যে ব্যাপক ও বিরাট উদ্যোগের প্রয়োজন, সরকার ছাড়া তা হবার উপায় নেই। জনকল্যাণ রাষ্ট্র গঠন করতে হলে গভর্ণমেণ্টকে অবশ্যই সক্রিয় ও সচেতন অভিভাবকের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। এমন কি আমাদের সাধু-সন্তরা পর্যন্ত সরকারী আশীর্বাদ নিয়ে সঙ্ঘ তৈরী করেছেন। অমন যে রামকৃষ্ণ মিশন, তাঁদের কাজকর্মের প্রয়োজনীয় মোটা টাকাও আসছে সরকারী তহবিল হতে। তাঁদের সভাসমিতিতে পর্যন্ত সরকারী নেতার পৌরোহিত্য অবশ্য প্রয়োজনীয়।"

"আপনার কি মনে হয় আমাদের রিসার্চ সেণ্টারে গভর্ণমেণ্ট প্রভাব বিস্তার করবেন?"

"কেন করবেন না? গভর্ণমেণ্ট জমি দেবেন। আজ না হ'লেও পরে আপনারা গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে অর্থসাহায্যও চাইবেন। আপনাদের ফাংশনেও, এখানকার প্রচলিত প্রথা মত, সর্বদাই আপনারা সরকারী নেতাদের ডেকে আনবেন। বৈজ্ঞানিক বা বুদ্ধিজীবী হয়ে যদি সরকারের দ্বারস্থ হতে লজ্জিত বোধ না করেন, গভর্ণমেণ্ট কেন আপনাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করবেন? যে কোন দেশের গভর্ণমেণ্ট চাইবেন, বুদ্ধিজীবীদের প্রভাবিত করতে। আমাদের দেশে এ কাজটা যত সহজ অন্য কোন বড় দেশে তা নয়। তার কারণ, আমরা,

যারা বুদ্ধি খাটিয়ে জীবিকা অর্জন করি, আমরা বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাবিদ্, লেখক, অধ্যাপক—আমরা সর্বদা যৎসামান্য সরকারী দাক্ষিণ্যের জন্যে হাত পেতে আছি।"

"সব ক্ষেত্রে তা ক্ষতিকর নাও হ'তে পারে।"

"ঠিক বলেছেন। ধরুন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। সরকারী সাহায্য না হ'লে তাদের প্রসার অসম্ভব। কিন্তু এ সাহায্য কোন পথে আসবে তা নিয়ে মতভেদের অবকাশ আছে। সরকারকে আমি একটুও দোষ দি' না। আমরা কোনও দিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে জ্ঞানবিজ্ঞানের পবিত্র মন্দির হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত নই। দেশ যখন পরাধীন ছিল, ইংরেজ সরকার এগুলোর ওপর সতর্ক প্রভাব বিস্তার ক'রে রাখত। তখন আমরা আমাদের আহত, অপমানিত আত্মসম্মান দিয়ে দাবী করতাম বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত—অ্যাকাডামিক ফ্রিডম্। কিন্তু স্বাধীন হবার পর সে দাবী আমরা আর করি নে। করি নে বলেই গভর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে অমন সহজে সক্ষম হয়েছেন। অথচ, দুঃখের বিষয় এ প্রভাবও কোন প্ল্যান নিয়ে বিস্তৃত হচ্ছে না। কম্যুনিস্ট দেশগুলি একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করেছে। আমরা তা করিনি। আমরা কেবল ভেজাল মিশিয়েছি। কিন্তু এসব আলোচনা আপনার নিশ্চয় ভাল লাগছে না।"

"ভাল লাগার কথা নয়। কিন্তু আমি এসব বিশেষ জানি নে। আপনি বলুন।"

"বলার বিশেষ কিছু নেই। আমাদের দেশে বিজ্ঞানের প্রসার হচ্ছে না, এমন কথা আমি বলছি না। হচ্ছে। কিন্তু যে পরিমাণে অর্থ ব্যয় হচ্ছে, উদ্যোগের বাইরের আড়ম্বর যত বড়, আসল কাজ তার চেয়ে অনেক কম। আমরা লেবরেটরী করবার আগে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় ক'রে বিরাট অট্টালিকা তৈরী করি—ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল লেবরেটরীর প্রশস্ত অডিটোরিয়মে নাচগানের জলসা হয়। অথচ রাশিয়ায় দেখে এসেছি ছোট্ট ছোট্ট বাড়ীতে বিজ্ঞানের তন্ময় সাধনা চলেছে। এক চীনে বৈজ্ঞানিক বলেছিলেন, তাঁরা টিনের চালের ঘর তৈরী করে তাতে লেবরেটরী বসিয়েছেন। আমরা বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের মোটা মাইনের ফাইল-ঘাঁটা ব্যুরোক্র্যাট ক'রে তুলেছি। হাজার হাজার বিজ্ঞানের ছাত্র কেরানীর ভাঙ্গা কলম পিষছে। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের দেশে পলিটিশিয়ান এবং ব্যুরোক্র্যাট ছাড়া আর কেউ মানুষের সম্মান পায় না।

আমরা দি' না।"

"আমার নিজের সামান্য অভিজ্ঞতাও অনেকটা ঐ রকম। বিদেশে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকরা ঐ একই কারণে দেশে ফিরে আসতে চান না।"

"জানি। কিন্তু আবার বলছি, এজন্যে সরকারকে দোষ দেওয়া অন্যায়। রবীন্দ্রনাথ টাগোর শান্তিনিকেতনে বড়লাটকে নিমন্ত্রণ করেও পুলিশ ঢুকতে দেন নি; ভাইসরয়কে বলে দিয়েছিলেন, পুলিশ নিয়ে বিদ্যায়তনে আসার চেয়ে না-আসা বরং ভাল। গান্ধীজী নেংটি পরে বাকিংহাম প্যালেসে ইংরেজ সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। আজ এমন কোন ভাইস-চ্যান্সেলর আমাদের দেশে আছেন কি, যিনি প্রধানমন্ত্রীকে বলতে পারেন, পুলিশ পাহারা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার চেয়ে না-আসা ভাল? দেখতে পাই বুদ্ধিজীবীরা সর্বদা সরকারী দাক্ষিণ্যের জন্যে হাত পেতেই রয়েছেন। এর ফলে বুদ্ধিজীবী-দের স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য বলতে কিছু আর বাকী নেই।"

"একটা আশ্চর্য ব্যাপার আজকাল লক্ষ্য করছি," দেববাণী এবার বলল, "পৃথিবীর প্রায় সব দেশে। তা হ'ল বুদ্ধিজীবীদের পতন। ডিক্লাইন্ অব দ' ইনটেলেকচুয়াল। আমেরিকায় বুদ্ধিজীবীরা কখনও খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করেন নি; কিন্তু য়ুরোপে পর্যন্ত কবি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপকদের প্রভাব ফুরিয়ে গেছে। এমন কোন বুদ্ধিজীবী নেই যাঁর কথা পলিটিশিয়ানরা শ্রদ্ধার সঙ্গে শোনে, দেশের লোক ভেবে দেখে, মানে। মার্কিন মুলুকে স্বাধীন জ্ঞানচর্চার কতগুলি সাবেকী বাধা আছেন। আজকাল রাজনৈতিক কারণে আরও নতুন বাধার সৃষ্টি হয়েছে। রুজভেল্ট মারা যাবার পর থেকেই শুরু হয়েছিল, এখন, রিপাবলিকান গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হবার পরে, আরও বেড়েছে। যাকে চলতি-ভাষায় 'রেড-হাণ্ট' বলা হয়, তার নামে বহু বুদ্ধিজীবীদের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার চলছে। এর ফলে ক্ষতি সবচেয়ে বেশী যে আমেরিকার নিজেরই হচ্ছে, সে কথা যাঁরা জানেন, বোঝেন তাঁরাও ভয়ে কিছু বলতে পারছেন না।"

ডক্টর ভগবানদাস বললেন, "মানুষের চরিত্র জানবার একটা সহজ নিয়ম আছে। দেখতে হয়ঃ কিসে সে আঘাত পায়, কোন চ্যালেঞ্জ সে সাহসের সঙ্গে গ্রহণ করে, কি ভাবে সে তার মোকাবিলা করে। জীবন-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অর্ধশতাব্দী ধ'রে আমরা পরাধীনতার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলাম। পরাধীনতার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা বুঝি সহজ ছিল। স্বাধীনতার চ্যালেঞ্জ কিন্তু আমরা সেভাবে গ্রহণ করিনি। স্বাধীন দেশের নাগরিক হবার যে একট

নতুন অর্থ আছে, আমাদের আচারে-ব্যবহারে, পরস্পরের সঙ্গে আদান-প্রদানে জীবন-দর্শনে, তার কোনও পরিচয় পাই নে। তার বদলে হঠাৎ জীবনটাকে লুটেপুটে উপভোগ করবার মাতলামি দেখা দিয়েছে।"

"আপনি ত এ গড্ডলিকা-প্রবাহ থেকে নিজেকে দূরে রেখেছেন," দেববাণী বলল। "ডাঃ বসু লিখেছেন, দেশে সবাই আপনাকে শ্রদ্ধা করে।"

"হিমাদ্রি হয়ত করে," হেসে বললেন ভগবানদাস। "সে আমার প্রিয় ছাত্র। শ্রদ্ধা আমায় কেউ করে না, এমন অকৃতজ্ঞ কথা আমি বলতে চাই নে। এই শ্রদ্ধাটুকু বাঁচাবার জন্যে আমি একেবারে রিটায়ার করেছি।"

"যদি মার্জনা করেন তবে বলি, এ কথা আপনার মত বৈজ্ঞানিকের মুখে শোভা পায় না।"

"ধন্যবাদ। অপ্রিয় সত্য শুনবার মত সৎসাহস আমার এখনও আছে। আমি বিজ্ঞান থেকে রিটায়ার করিনি। বাড়ীতে লেবরেটরী বানিয়েছি। গত বছরও রয়্যাল সোসাইটির জর্ণালে আমার অরিজিনাল কাজকর্মের বিবরণ ছাপা হয়েছে। রিটায়ার করেছি আমি এডুকেশনাল পলিটিক্স থেকে।"

"আমাদের সেণ্টারে পলিটিক্স্ আসবে না।"

"আসবে। হয়ত এরই মধ্যে এসে গেছে।"

"না, না," আতঙ্কিত হ'ল দেববাণী। "আসবে কেন?"

"ঐ যে বলেছি, ভারতবর্ষের এখন এমন কিছু নেই যা পলিটিক্সের বাইরে।"

"আমি তা মানতে রাজী নই।"

"আপনি জানেন না।"

"তাহলে আমাদের অনুরোধ আপনি রাখতে পারলেন না?"

"হিমাদ্রি ও আপনাকে হতাশ করতে আমার দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু আমি নিরুপায়।"

"বড় হতাশ হলাম।"

"কিন্তু আমার সাহায্য আপনারা পাবেন। বাইরে থেকে যতটুকু পারি আমি আপনাদের নিশ্চয় সাহায্য করব।"

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে দেববাণী আবার রাস্তায় বেরুল। ডক্টর স্যার ভগবান-দাস বিশ্ববিদিত বৈজ্ঞানিক। হিমাদ্রিকে তিনি কেবল সায়ান্স কলেজে পড়ান

নি, সে যখন লণ্ডনে, ডঃ ভগবানদাস অক্সফোর্ডে অধ্যাপক, তখনও হিমাদ্রি তাঁর কাছে রিসার্চে সাহায্য পেয়েছে। গাড়ী চালাতে চালাতে দেববাণী ভগবানদাসের কথাগুলি মনে উল্টেপাল্টে দেখল। ভারতবর্ষের স্বাধীন মানস এখনও তার বহুলাংশে অজ্ঞাত। কিন্তু নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় সে জানে, সমালোচনা করা যত সহজ, হৃদয়ঙ্গম করা তার চেয়ে অনেক বেশী কঠিন। যে চ্যালেঞ্জ ও রেস্‌পন্স্‌ সম্বন্ধে ভগবানদাস এত বললেন, তিনি নিজেই তা এড়িয়ে যাবার অপরাধে অপরাধী। পঁচাত্তর বছর বয়সের অজুহাতে তিনি জীবনে নতুন কোনও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে চাইছেন না। দু'চারটে তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁকে সংগ্রাম থেকে নিরস্ত করেছে। যে শ্রদ্ধা দেশে তাঁর আছে, বাদ-বিসম্বাদের বাইরে ব'সে সেটুকু তিনি উপভোগ ক'রে যেতে চান। তাই তার কথায় ঝাঁজ বেশী, সার কম। দেববাণী ভাবল, দেশে এসে যাদের সঙ্গে সে কথা বলেছে, প্রায় সবাকার মধ্যে কেমন একটা ঝাঁজ। বর্তমান অবস্থায় পরিতৃপ্তি নেই কোথাও। স্বাধীন গণতন্ত্রী সমাজের সুবিধে নিয়ে সবাই সবাইকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করছে। সংবাদ-পত্র থেকে শুরু করে বিদ্যায়তন পর্যন্ত শান্ত শালীন বস্তুনিষ্ঠার মর্মান্তিক অভাব। সবাই যেন সর্বদা ভারতবর্ষে জনসভায় বক্তৃতা করছে। বলছে বেশী, ভাবছে কম; বেশী বলতে গিয়ে এমন অনেক কিছু বলছে যার মানে নেই, যা পরস্পর বিরোধী, যা আয়ত্তের বাইরে। মার্কিন দেশে দীর্ঘকাল কাটিয়ে দেববাণী অনেক কথার কোলাহলে অভ্যস্ত। কিন্তু আমেরিকা বিবশ্বব্যাপী ক্ষমতা-সংগ্রামে প্রত্যক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ; তার দৃষ্টিতে, মানসে, চিন্তাধারায় যুদ্ধরত সৈনিকের তরল একদর্শিতা। অন্যের কথা সে শুনতে চায় না, বুঝতে চায় না, জানতে চায় না। তেমনি অপ্রিয় বাস্তবের দিকে, কোপেনহাগানে নেলসনের মত, আমেরিকা অন্ধ চক্ষু নিক্ষেপ করতে অভ্যস্ত। এবং, দেববাণী এও জানে, আমেরিকায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ঘাটতি নেই আসলে। বড় কাজ, আসল কাজ, সর্বদাই এগিয়ে চলেছে। ভারতবর্ষ কিন্তু সংগ্রামের সঙ্গে প্রত্যক্ষ জড়িত নয়। তার বিঘোষিত নীতি, দুনিয়ার সর্বত্র থেকে ভাল জিনিস গ্রহণ করা। যে পর-সহিষ্ণুতা বিশ্বের দরবারে সে দাবী করছে, স্বক্ষেত্রে তার বর্ধমান অভাব তাকে ভাবিয়ে তুলছে না। অসহিষ্ণু, অনুদার, উত্তেজিত বাতাবরণে, আর যাই হোক, দেববাণী জানে, জ্ঞানচর্চা হয় না।

তের

ডাঃ ভগবানদাসের পরিণত-বয়সের পলাতকী সার্থকতাবিলাস দেববাণীকে হঠাৎ স্মরণ করিয়ে দিল যে, ভারতবর্ষে এই স্বল্প দিনের অবস্থানে বার বার সে পুরাতন গৌরবে নিরুপদ্রব বিশ্রামের ব্যাপক আকাঙ্ক্ষা দেখতে পেয়েছে। অথচ বিদেশে অতীত গৌরবের দোহাই বড় একটা কানে বাজে নি। মার্কিন জাতটা আধুনিক, তার স্বকীয় অতীত নেই, সুতরাং পুরাকালের ছায়া পড়ে নি তার মানসে। কিন্তু ইংরেজ, ফরাসীর অতীত আছে, রাজনৈতিক নেতারা মাঝে-মধ্যে অতীত-গৌরবের গুণগান করেও থাকেন; সাধারণ মানুষ, তা হলেও, ক্বচিৎ কখনও অতীতকে স্মরণ করে। ভারতবর্ষে একেবারে অন্য ব্যাপার। এখানে সর্বদা, প্রতিদিন, বহু কণ্ঠে অতীত কালের জয়গান, যে অতীত রোজ মরছে, দিনের পর দিন আরও বেশী অতীত হচ্ছে। স্বল্পচিহ্ন অতীতের দিকে এই সংঘবদ্ধ পিছুটান দেববাণীকে বিস্মিত করে। এর একটা কারণ হয়ত বর্তমানের দারিদ্র্য; কিন্তু তার চেয়ে বড় কারণ সংগ্রাম-বিমুখ ভাববিলাস। রাজনৈতিক নেতারা প্রতিদিন অতীত, প্রাচীন ভারতবর্ষের বেদীমূলে ফুলচন্দন দিয়ে তাঁদের অফুরন্ত বক্তৃতা শুরু করেন; তাঁদের দেখাদেখি বুদ্ধিজীবীরা পর্যন্ত অতীতের অন্ধকার পক্ষপুটে আশ্রয় খোঁজেন। এককালে ভারতবর্ষের সুমহান সভ্যতার কাছে পৃথিবী মাথা হেঁট করেছিল কি না দেববাণীর জানা নেই, করে থাকলেও সে পৃথিবী আজ প্রত্নতাত্ত্বিকের অনুসন্ধানের বিষয়; কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ যে-পরিমাণ অতীত-বিলাসী তাতে দেববাণী খুশি হতে পারে না। অতীতের এই দুরপনেয় প্রভাবের জন্যেই, দেববাণীর মনে হয়, স্বল্প সার্থকতায় ভারতবাসী এত সন্তুষ্ট। জীবন-নদীতে ভাসতে ভাসতে কোনও একটা আশ্রয় জুটে গেলেই হ'ল, তার পর আবার নদী-পাড়ির প্রশ্ন উঠবে কেন? একবার ভাগ্যলক্ষ্মী সাফল্যের মালা পরিয়ে দিলেই সংগ্রামের পথ সমাপ্ত। জীবন যে অফুরন্ত সংগ্রামের চিরন্তন আহ্বান, প্রত্যেক বন্দরে যে অন্য বন্দরের অনুপেক্ষণীয় টান, স্বাধীন ভারতবর্ষে তার প্রমাণ বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না।

এ প্রসঙ্গ ডাঃ ভগবানদাসের বাড়ী থেকে বেরিয়ে দেববাণীর মন জুড়ে ছিল; মধ্যাহ্ন আহারের অনুকূল সমাবেশে তার আলোচনা আরও জোরালো হয়ে উঠল।

দেববাণীকে মধ্যাহ্ন আহারের নেমন্তন্ন করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন-বিভাগের অধ্যাপক সমীর ঘোষ। কনট প্লেসের একটি মাঝারি অভিজাত রেস্তোরাঁয় উপস্থিত হয়ে দেববাণী দেখতে পেল সমীর ঘোষ আরও চারজনকে ডেকে এনেছেন। এঁরা সকলে কমবয়সী অধ্যাপক। সমীর ঘোষ তাঁদের সঙ্গে দেববাণীর পরিচয় করিয়ে দিলেন। শশধর চট্টোপাধ্যায় অর্থনীতি পড়ান দিল্লী স্কুল অব ইকনমিক্স-এ; সন্তোষ ভাটিয়া ইংরেজী পড়ান সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজে; মহীতোষ দত্ত বাংলা পড়ান মিরান্দা হাউসে; আর শিবশংকর ত্রিপাঠী রাজনীতির অধ্যাপক দিল্লী কলেজে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবার সময় সমীর ঘোষের সঙ্গে দেববাণীর আলাপ হয়েছিল; পরেও দু' তিনবার দেখা হয়েছে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, বর্তমানে স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকা যাবার চেষ্টায় আছে। শশধর চট্টোপাধ্যায় লণ্ডন য়ুনিভারসিটির ডক্টরেট, লম্বা চেহারা, মাথায় প্রশস্ত টাক, দেখলে মনে হয় বয়স পঁয়তাল্লিশ, আসলে আটত্রিশ। সন্তোষ ভাটিয়া কেবল ইংরেজী সাহিত্য পড়ায় না, ইংরেজীতে কবিতা লেখে, তার একখানি কাব্যগ্রন্থ ম্যাকমিলন কোম্পানী প্রকাশ করেছে। চেহারাও কবি-সুলভ, মাথায় একরাশি অশাসিত চুল, বড় বড় চোখে আকাশচারী কল্পনা। শিবশংকর ত্রিপাঠী এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, স্থূল দেহ, গোলগাল মুখখানা থমথমে গম্ভীর। মহীতোষ দত্ত, বলা বাহুল্য; কলকাতার মানুষ, মুখের আদলে কোমলতা, একটু লাজুক-লাজুক স্বভাব।

এঁদের সঙ্গে আহারে বসে দেববাণীর ভাল লাগল। পরিচয়ের পর্ব শেষ হলে মনে মনে সে বলল, আমার দেশের এই বুদ্ধিজীবীদের আমি কতটুকু জানি! কলকাতায় আমার অধ্যাপক-জীবন এত সংক্ষিপ্ত যে, এঁদের মত বন্ধুবান্ধব নেই বললেই চলে। দিল্লী এসে এ পর্যন্ত যাদের সঙ্গে সময় কেটে গেল তারা অন্য জাতের মানুষ। এঁরা আমার জাতের। এঁদের সঙ্গে আমার বুদ্ধি ও হৃদয়ের যোগাযোগ। ভারতবর্ষকে জানবার এঁরা হলেন প্রশস্ত পথ।

দেববাণীর মনে অনেক প্রশ্ন একসঙ্গে উজিয়ে উঠল।—আমি কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠেছি; একটু লজ্জা পেয়ে নিজেকে সুস্থির করল দেববাণী।

সমীর ঘোষ বলল, "আপনার রিসার্চ সেণ্টারের প্ল্যান কতদূর এগোল ?"

"কিছুটা এগিয়ে আর এগোচ্ছে না," দেববাণী উত্তর দিল। "সরকারী কাজে বড় সময় লাগে দেখতে পাচ্ছি।"

"পার্কিনসন সাহেবের ব্যুরোক্রেসী-নীতি যদি কোনও দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে সে হচ্ছে স্বাধীন ভারতবর্ষ," শিবশংকর ত্রিপাঠী মন্তব্য করল।

"পার্কিনসন্স্ ল কথাটা আমি শুধু শুনেছি। আমার কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই," বলল দেববাণী।

"ব্যাপারটা খুব সহজ।" ত্রিপাঠী গলা পরিষ্কার করে বলল। "ব্যুরোক্রেসীর স্বভাব হ'ল নিজেকে বিস্তার করা। কাজ না থাকলে কাজ বাড়িয়ে নেওয়া। ব্যুরোক্রেসীর আসল কাজ যত কম, সে তত অপ্রয়োজনীয় কাজ বাড়িয়ে নেয়।"

"পার্কিন্সনস্ ল বর্তমান যুগের কল্যাণকামী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য নয়," যোগ দিল শশধর চট্টোপাধ্যায়। "বিদ্রূপের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার চলে, বুঝে দেখতে সাহায্য করে না।"

"তা ছাড়া," মহীতোষ দত্ত বলল, "আমাদের দেশে সরকারের কাজ বা অকাজ, যত বাড়ে তত ভাল। তাতে বেশী লোকের চাকরি হয়।"

"তা বটে," সায় দিল সন্তোষ ভাটিয়া। "প্রতি পাঁচ বছরে যত মানুষ চাকরি পায় তার বেশির ভাগই সততপ্রসারমান সরকারী অপকার্য-ক্ষেত্রে।"

"যাই বলুন আপনারা," সমীর ঘোষ বলল, "আমার এ বিষয়ে নিজস্ব একটা মত আছে। গণতন্ত্র গজেন্দ্রগতি। তাতে মোটামুটি প্রজার ভাল বই খারাপ হয় না। গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট অসংখ্য নিয়ম-কানুন বিধি-বিধানের শৃঙ্খল স্বেচ্ছায় নিজের পায়ে পরিয়ে রাখে। তাতে তার মঙ্গল করার ক্ষমতা যেমন স্তিমিত হয়, অমঙ্গল করার শক্তিও তেমনি ব্যাহত থাকে। চট করে আপনাকে সে সুখী করতে পারে না, সামান্য দাক্ষিণ্যের জন্যে তার দ্বারে হানা দিয়ে আপনার জুতোর সোল ক্ষয়ে যায়; তেমনি হুট করে আপনার গভীর অমঙ্গলও সে করতে পারে না।"

খাবার এসে গিয়েছিল। আলুভাজা ও মটর সেদ্ধর সঙ্গে মাছ ভাজা খেতে খেতে সন্তোষ ভাটিয়া উত্তর দিল, "যত সম্ভব কম শাসনের যুগে আপনার থিয়োরীটা খেটে যেত। কিন্তু এ হচ্ছে যত সম্ভব বেশী শাসনের যুগ। সরকার এ যুগে বৈঠকখানা থেকে রান্নাঘর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। তাকে ছাড়া এক মুহূর্ত আমাদের চলবার জো নেই। জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে তার খবরদারী শুরু, ম'রে তবে

সে খবরদারী থেকে রেহাই। এ অবস্থায় তার গজেন্দ্রগতি আমাদের সবাইকে ধীর-মন্থর অথবা একেবারে স্থবির-স্থাণু করে রেখেছে।"

দেববাণী মজা পেয়ে বলল, "মিঃ ভাটিয়া ঠিক বলেছেন। ভারতবর্ষকে আপনারা বড় বেশী সরকারীনির্ভর করে রেখেছেন। গভর্ণমেণ্টের হাত ধরে হাঁটতে শেখার বিপদ্ আছে; হাত খসে গেলে আছাড় খাবার ভয়ে পা আর চলতে চায় না।"

সমীর ঘোষ বলল, "তা ছাড়া উপায় কি, বলুন! ভারতবর্ষকে হাঁটতে শেখাবার পেশাদার অভিভাবকের অভাব ছিল না। তাঁরা সবাই বললেন, বাছা, তুমি দুর্বল, বেশী শ্রম ক'রো না, ভেঙে পড়বে। চাষ-বাস কর, তোমার এতকালের পুরানো কৃষি, আমরা না হয় তোমাকে কিছু রাসায়নিক সার এনে দেব। স্কুল-কলেজ খোল—সবার আগে গ্রামে স্কুল বসাও, অজ্ঞানতা দূর কর। রোজকার ব্যবহারের জিনিসপত্রও চাও ত কিছু বানাও, তাতে তোমাদের মেয়েরা খুশি হবেন। কিন্তু বড় বড় শিল্প-কারখানায় হাত দিও না, অত মেহনত তোমার সইবে না। আমরা দশজন আছি, তোমার সব চাহিদা মেটাতে পারব। তা ছাড়া অমন প্রাচীন তোমার সভ্যতা, তাকে আধুনিক কলকারখানা বসিয়ে নষ্ট করলে পৃথিবীর সমূহ ক্ষতি হবে।"

সমীর ঘোষের বলার ভঙ্গীতে সকলে হেসে উঠল।

সে বলে চলল, "দেশে যারা খবরদারী করতে চেয়েছিলেন তাঁরা সায় দিয়ে বললেন, লড়াই-এর আমলে যা দু'পয়সা করেছিলাম তা এখনও আছে। ছোট-খাট কারখানা ত আমরাই তৈরী করতে পারব। বিদেশী মূলধন ডেকে আনব বড় কিছু করতে হ'লে, এক-আধটু অংশ আমরা নিশ্চয় পাব। তাতেই গ'ড়ে উঠবে ভারতবর্ষের জাতীয়-বিজাতীয় মিশ্রিত শিল্প। তা ছাড়া আমাদের সাবেকী ব্যবসা ত রয়েইছে—ভেজাল ঘি আর মানুষের ক্ষুধা। এ অবস্থায়," সমীর ঘোষ এবার দেববাণীর দিকে তাকিয়ে বলল, "এ অবস্থায়, সরকার এগিয়ে না এলে ভারতবর্ষের যেটুকু সমৃদ্ধি দেখছেন তাও তৈরী হ'ত না।"

দেববাণী বলল, "হয়ত আমি এসব কম জানি। কিন্তু সরকারী প্রচেষ্টার অমঙ্গলটাও ত আছে!"

শশধর চট্টোপাধ্যায় বলল, "আমরা আপাতত মঙ্গলটাই বেশী দেখছি। মজা কি জানেন? এদেশে যারা সরকারী প্রচেষ্টার সবচেয়ে তীব্র সমালোচক, উপকৃত হয়ে থাকে তারাই সবচেয়ে বেশী। সরকারী সাহায্য পেয়ে তাদের

সমৃদ্ধি এত বেড়েছে যে তারা রীতিমত একটা সংগঠিত শক্তিতে পরিণত হ'তে পেরেছে। তারা যা উৎপাদন করে তাই বিক্রী হয়—মাল তাদের যত বাজে হোক না কেন। অথচ তারাই সর্বদা ঘরে-বাইরে সরকারী উদ্যোগের মুখরতম নিন্দুক হয়ে উঠেছে।"

দেববাণী বলল, "তাদের কথা ছাড়ুন। আমি যা জানতে চাই তা হচ্ছে আপনাদের কথা। বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে সরকারী উদ্যোগ কি মঙ্গলকর হয়েছে? আমরা কি বহু ভাবে সরকারী দাক্ষিণ্য পাবার জন্যে অতিরিক্ত লোভী হয়ে উঠি নি? তাতে আমাদের চরিত্রের অবনতি হচ্ছে না? আমাদের স্বাধীন বিচারবুদ্ধি ও মতবাদের ওপর কি সরকারী প্রভাব বড় বেশী এসে যায় নি?"

সন্তোষ ভাটিয়া জবাব দিল, "দেখুন, ডাঃ রায়, ভারতবর্ষের মত দেশে বুদ্ধিজীবীদের মাথার চেয়ে পেটের দায় বেশী। সরকারী উদ্যোগে পেটের দায় কিছুটা মেটাবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। সুতরাং আমরা আপাতত বিচারবুদ্ধি ও মতবাদ স্থগিত রেখে পার্থিব জীবনটাকে একটু আস্বাদ করবার চেষ্টায় আছি।"

সমীর ঘোষ বলল, "আপনি মার্কিন মুলুকে বহুদিন কাটিয়েছেন, য়ুরোপও আপনার অজানা নেই। ওসব দেশের মানুষ, রাজনীতি তাদের যাই হোক না কেন নানা রকমের, জীবনের আদিম, কতগুলি সমস্যার সমাধান ক'রে ফেলেছে। ক্ষুধায় কেউ মরে না, সর্বহারা কেউ আর নেই। সকলেই কাজ-কর্ম করে, বেকারেরা সরকারী সাহায্য পায়। অশিক্ষা আছে, নিরক্ষরতা নেই; মাথা পাতবার ঘরের অভাবে রাস্তায় কেউ রাত কাটায় না। ধনী-গরীবে তারতম্য নিশ্চয় আছে, আমেরিকায় য়ুরোপ থেকে অনেক বেশী; কিন্তু আমাদের দেশের মত এত দরিদ্র ও এমন ধনী বোধকরি আর কোথাও নেই। বুদ্ধিজীবীরা ওসব দেশে ভদ্র জীবনযাপনের উপযুক্ত রসদ থেকে বঞ্চিত হয় না; পড়াশুনার সুযোগ, রিসার্চের ব্যবস্থা, ভদ্রোচিত বেতন, সবকিছু তাদের বুদ্ধিকে পরিপুষ্ট করে। আমাদের দেশে অবস্থা একেবারে আলাদা। এখানে বুদ্ধিজীবীদের দাম নেই, তারা পদে পদে প্রবঞ্চিত। স্বাধীন হবার পরে স্বক্ষেত্রে তাদের প্রতিষ্ঠা বাড়ে নি, কিন্তু যারা উদ্যোগী তাদের এরই মধ্যে একটু গুছিয়ে নেবার সুযোগ হয়েছে। সে সুযোগের সদ্ব্যবহার নিশ্চয় অন্যায় নয়।"

"স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা বাড়ে নি কেন বলছেন?" দেববাণী প্রশ্ন করল। "অনেক নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে, স্কুল-কলেজ বেড়েছে প্রচুর। উচ্চশিক্ষার সুযোগও কম বাড়ে নি। একমাত্র আমেরিকায়ই দু'হাজারের বেশী ভারতীয় ছাত্র পড়ছে।"

"প্রতিষ্ঠা বাড়ে নি মানে এই নয় যে, চাকরির ক্ষেত্র প্রসারিত হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয় বেড়েছে নিশ্চয়—যদিও আমাদের দেশের চেয়ে ইংলণ্ডেও এখন বিশ্ববিদ্যালয় বেশী—অনেকের চাকরিও হচ্ছে আগেকার চেয়ে অনেক সহজে। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রীডার বা প্রফেসর হওয়া সম্ভব। মাইনে, মাগ্‌গিভাতাও কিছু নিশ্চয় বেড়েছে। কিন্তু এসব নিয়েও আমাদের প্রতিষ্ঠা হয় নি। আমরা এখনও সমাজের উপেক্ষিত হয়ে রয়েছি। রাজনীতি ঢুকেছে বিদ্যায়তনের আনাচে-কানাচে; মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী ছাড়া আমাদের সামান্যতম অনুষ্ঠানও অচল; শিক্ষিত হিসাবে আমরা দুর্বল ও অকেজো, ছাত্রদের কাছে আমাদের সম্মান নেই, মূল্য নেই। অপর্যাপ্ত রোজগারের দৈন্য থেকে পরিবারকে বাঁচাবার জন্যে আমরা সকাল-সন্ধ্যা ছাত্র পড়াই, সস্তা নোট লিখি, নয়ত সংবাদ-পত্রের দপ্তরে রচনা প্রকাশের জন্য ধরনা দিই বা বেতারে প্রবন্ধ পড়বার উমেদারী করি। অবসর পেলে তাস খেলি, রাজা-উজির মারি, অথবা (সন্তোষ ভাটিয়ার দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে) কবিতা লিখি।"

শশধর চট্টোপাধ্যায় বলল, "ভারতবর্ষে, লক্ষ্য ক'রে থাকবেন, আদর্শবাদ প্রায় নেই। ভারতবর্ষে কেন, আদর্শবাদ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পৃথিবীর বহুদেশে মারা গেছে। এ যুগ বুঝি পরম কুবুদ্ধির যুগ। প্রথম মহাযুদ্ধের পরেও আদর্শ-বাদ অনেকখানি বেঁচে ছিল। অনেক বুদ্ধিজীবী বিশ্বাস করত, আর বুঝি যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটবে না। রাশিয়ায় বিপ্লব হ'ল তাতেও হাজার হাজার বুদ্ধিজীবী নেচে উঠেছিল। বার্ণড শ' রোলাঁ, জিদ, আইনস্টাইন, টাগোর, এঁদের কথা মানুষ কান পেতে শুনত। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আদর্শবাদ ব'লে আর কিছু রইল না। এ যুগ হ'ল পরমাণুশক্তির চিরন্তন হুমকির যুগ। চোখ বুজলে পৃথিবীর যে ভয়াবহ চিত্র দেখতে পায় মানুষ, সে হচ্ছে আণবিক বোমায় পুড়ে-ছাড়খার মহাশ্মশানের ছবি। এমন একজন বুদ্ধিজীবীও কি আছেন আজকার পৃথিবীতে, যার কথা মানুষ একটু থেমে শুনতে চায়? পৃথিবীর এই মরু-মধ্যাহ্নে বুদ্ধিজীবীর কোনও স্থান নেই।"

দেববাণী সন্তোষ ভাটিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, "বৈজ্ঞানিক হিসাবে আমি মিঃ চ্যাটার্জির অভিযোগ মানি না। কবি হিসাবে আপনি মানেন কি?"

"আগে আপনার উত্তরটা শুনি," বলল, সন্তোষ ভাটিয়া।

"আমার উত্তর সহজ। আজকালকার আণবিক বিজ্ঞানকে মানুষের হঠাৎ-

কিছু আবিষ্কার ব'লে গ্রহণ করা ঠিক হবে না। পরমাণু-শক্তির সন্ধান বহুকাল ধ'রে চ'লে এসেছে। সে শক্তির সন্ধান দিয়ে বিজ্ঞান মানব-সভ্যতার অনন্ত বিকাশের পথ খুলে ধরেছে। এ শক্তির ব্যবহার ধ্বংসের জন্যে হবে না নির্মাণের জন্যে হবে, তার দায়িত্ব বৈজ্ঞানিকের নয়। সে দায়িত্ব প্রত্যেক মানুষের। আমরা প্রত্যেকে নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ হলে রাজনৈতিক নেতাদের সাধ্যি নেই পৃথিবীকে ধ্বংস করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথাই বলি। ওদেশের প্রত্যেক নাগরিক যদি দাবী করে আণবিক শক্তি পৃথিবীকে নতুন পথে গড়বে, ধ্বংস করবে না, তাহলে সরকারের সাধ্য কি অন্যপথে দেশকে চালিত করে? বিজ্ঞান চিরদিন মানুষের হাতে নতুন শক্তি এনে দিয়েছে। সে শক্তির ব্যবহার মাঙ্গলিক কি অমাঙ্গলিক তাও বলে দিয়েছে। যারা রাষ্ট্রের নামে সে শক্তিকে ব্যবহার করেছে যুদ্ধে, ধ্বংসে, তারা বৈজ্ঞানিক নয়। পরমাণু-শক্তি ধ্বংসের উদ্দেশ্যে বিনিযুক্ত হলে তার ফল যে কি ভয়ানক হবে সে কথাও বৈজ্ঞানিকরা পরিষ্কার ক'রে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছেন। এর বেশী তাঁদের আর কি করার আছে? তবু তাঁরা এর বেশীও করেছেন, করছেন। পৃথিবীর নানা দেশে হাজার হাজার বৈজ্ঞানিক এক হয়ে আণবিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলন গ'ড়ে তুলেছেন। সুতরাং বর্তমান কালের আদর্শহীনতার জন্যে বিজ্ঞানকে দোষ দেওয়া পলায়নী মনোবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়।"

সন্তোষ ভাটিয়া বলল, "আমি অনেক সময় ভাবি, ভারতবর্ষ যে আজ পেছিয়ে আছে, সে যে ইয়োরোপ-আমেরিকার মত এগিয়ে যায় নি, সে আমাদের সৌভাগ্য। পেছিয়ে আছি বলেই এগিয়ে যাব কিনা ভেবে দেখবার সময় আমাদের এখনও আছে। আমি ভারতবর্ষে ঘুরে বেড়াই আর ভাবি, এই যে এখনও আমাদের দেশে আধুনিকতা সর্বগ্রাসী হয়ে জাঁকিয়ে বসে নি, তা বুঝি বিধাতার আশীর্বাদ। এখনও আমাদের সময় আছে পূর্ণ চাঁদের মায়ায় নিঃশব্দে ভেসে যাবার; ভোরের রাত্রে তারার সঙ্গে কথা বলার। এখনও আমাদের জীবনে দুর্দমনীয় তাড়া আসে নি দিনরাত্রির প্রতিটি মহামূল্য মুহূর্তকে তথাকথিত কাজের চাপে গলা টিপে মারার। বিধাতার আশীর্বাদ, আমাদের মেয়েরা এখনও লাজুক, তারা নগ্নপ্রায় হয়ে সমুদ্রের তীরে রৌদ্রচর্চা করে না; ভালবাসা এখনও তাদের লজ্জারুণ করে, বুকের কথা এখনও তারা মুখে আনতে রক্তিম হয়। সৌভাগ্য আমাদের, প্রেম এখনও তাদের হৃদয় কাঁপায়; আরও সৌভাগ্য, তারা পুরুষের সঙ্গে প্রতিনিয়ত পাল্লা দিয়ে চলে না। তাই আমাদের

বিবাহ ভেঙে যায় না। ভগবানের আশীর্বাদ, সন্ধ্যায় তুলসীতলায় আমাদের বধূরা প্রদীপ জ্বালে ; গৃহকোণে দেবতার কাছে মায়েরা সকল সন্তানের কল্যাণ কামনা করেন। আমরা এখনও আকাশ-ছোঁওয়া দালান তুলে সূর্যকে আড়াল করিনি ; মোটর গাড়ীতে আমাদের দেশ এখনও ভ'রে যায় নি, আমাদের দেশের মানুষের পা এখনও মাটির স্পর্শ পায় ; চাষী চলমান গরুর গাড়ীতে ব'সে মেঠো সুরে গান ধরে। অন্ধের মত এগিয়ে গিয়ে ওরা সভ্যতার ভারে দম আটকে মারা যাচ্ছে ; আমাদের অনগ্রসরতার মধ্যে সুযোগ রয়েছে দেখেশুনে পা ফেলবার। বৈজ্ঞানিক সভ্যতার কতটুকু চাই বা না চাই, ভাববার সময় এখনও আমাদের রয়েছে।"

দেববাণী আকৃষ্ট হয়ে সন্তোষ ভাটিয়ার কথা শুনছিল। সে কি বলছে তার জন্যে যতটা নয়, ততটা তার বলার ভঙ্গিতে, কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্যে। এবার সে বলল, "কিন্তু সত্যিই কি আমরা ভেবেচিন্তে পা ফেলছি ? আমাদের সাধ্যমত পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণ করছি না।"

শিবশঙ্কর ত্রিপাঠী এতক্ষণ কথা বলে নি। এবার বলল, "ভারতবর্ষ নিয়ে চট ক'রে কোনও সিদ্ধান্ত দিতে যাওয়া অন্ধের হস্তীদর্শন নয় কি ? এত বড় দেশে এত বিভিন্ন মানুষের বাস, এমন বিভিন্ন স্তরের মানুষ ও তার সমাজ, এত বিভিন্ন তাদের চিন্তাধারা, যে আমাদের বিচার সহজে ভ্রান্ত হতে পারে। বর্তমানে কেবলমাত্র একটা কথা খানিক জোর দিয়ে বলা যায়, পুরাতন প্রাচীন-স্থবির ভারতবর্ষ বিজ্ঞানের আঘাতে সবেমাত্র নতুন ক'রে জাগতে শুরু করেছে। তার প্রাচীন অবরোধ ভেঙে যাচ্ছে। নতুন রাস্তাঘাট, রেলপথ, বিমানপথ, শিল্প-কারখানা, সকল রকম গঠন-উদ্যোগে প্রকৃতির সুপ্রাচীন অবরোধ ভাঙছে, ভারতবর্ষকে সর্বপ্রথম নিজের বিভিন্নতার সঙ্গে নতুন পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। এখনও আমরা এমন স্তরে এসে পৌছই নি যেখানে আমাদের মৌলিক আত্ম-স্ফূর্তি শুরু হতে পারে। এখনও অনেকদিন আমরা অনুকরণ করব, অনুসরণ করব ; অন্যের বৈভব দেখে আমাদের হিংসে হবে, ক্ষুধার্ত মানুষের মত যা পাব তাই তুলে মুখে দেব। অনেক যুগ পর প্রথম বাঁচবার সুযোগ পেয়ে আমরা এখন লোভী, অসংযত, বেসামাল হয়ে পড়েছি। যে কোন উপায়ে জীবনটাকে গুছিয়ে নিতে পারলেই আপাততঃ আমরা পরিতৃপ্ত। একদিন এই লোভ আমাদের কাটবে।"

মহীতোষ দত্ত যোগ দিল, "এই যে জীবন গুছিয়ে নেওয়ার দেশব্যাপী

জীবন-দর্শনের কথা অধ্যাপক ত্রিপাঠী আপনাকে বললেন, তার মধ্যে যদি কোথাও ফাঁক থাকে, তা বাংলা দেশ।"

দেববাণী উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করল, "কেন ? একথা কেন বলছেন ?"

"ভারতবর্ষে ঘুরে বেড়ালে দেখতে পাবেন অধ্যাপক ত্রিপাঠীর বক্তব্য মোটামুটি ঠিক। সকল প্রদেশের লোকেরা জীবনটাকে গুছিয়ে নিতে চাইছে। শুধু আমরা বাদে। জীবনের নিত্য-নূতন সুযোগ আমাদের সামনেই অন্যেরা তুলে নিচ্ছে, কেবলমাত্র জান্তব বলিষ্ঠতার দাবীতে। পাঞ্জাবী যেভাবে স্বাধীন ভাবতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে তার নজির ইতিহাসে খুব কম। সুদূর আন্দামানে, বিপদসঙ্কুল নাগা পর্বতে, হিম-শীতল লাদকে জীবিকার জন্যে সে ছুটে গেছে ; ভাগ্যলক্ষ্মী তাকে দু'হাত ভ'রে বর দিয়েছেন। আর আমরা বাংলার বাইরে পশ্চিম বাংলার চেয়ে বড় এক বাঙালী উপনিবেশ গ'ড়ে তোলবার সব রকম সুযোগ-সুবিধা পেয়েও ঘরের বার হ'তে রাজী নই। এ মনোবৃত্তির সপক্ষে যতই যুক্তি থাকুক না কেন এর আসল কারণ আমাদের জীবন-তৃষ্ণার অভাব। আমাদের সাহিত্যে আমরা দারিদ্র্য, অক্ষমতা, ব্যর্থতা, পঙ্গু-জীবনের সব রকম দুর্বলতাকে রোমান্টিক রং লাগিয়ে ক্ষয়িষ্ণু মানুষের আত্ম-প্রতারণার অপূর্ব উপাদানে পরিণত করেছি। সাহিত্যের মাধ্যমে কল্পনাপ্রবণ ভাববিলাসী একটা জাতিকে কেমন ক'রে জীবন-যুদ্ধে পরাঙ্মুখ করা যায়, আমরা বোধ করি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অথচ কি বঙ্কিমচন্দ্রে, কি রবীন্দ্রনাথে, কি বিবেকানন্দ-শ্রীঅরবিন্দে, আমাদের সাহিত্যিক-ঐতিহ্য জীবনের কাছে জয়-লাভ করা, হেরে যাওয়া নয়। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে শুরু হ'ল দুর্ভিক্ষ, অনাচার, হাহাকার ও পতনের সাহিত্য—যাতে মানুষ কেবল মার খায়, উল্টে মারে না ; কেবল হারে, কখনও জেতে না। দুর্ভিক্ষে যেমন আমরা নীরবে লক্ষ লক্ষ লোক কঙ্কালসার হয়ে রাস্তায় মরলাম, সাহিত্যেও তেমনি আমরা কেবল হারলাম, ভেঙে পড়লাম। তারপর এল দাঙ্গা, এল দেশ-বিভাগ, লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা বেরিয়ে পড়ল নতুন জীবনের সন্ধানে। এসব বিরাট ঘটনাসংঘাত থেকে মহান্ সাহিত্য বাংলা দেশে তৈরী হ'তে পারত। কিন্তু আমাদের লেখকরা গল্পের রসদ পেলেন রিফিউজি পরিবারের স্খলিত নীতিতে, হঠাৎ-ধনীর নারীদেহ-লোভে ; জীবনের ব্যাপক ক্ষয়িষ্ণুতায়। এ সাহিত্য পাঠ ক'রে বাঙালীর মন ভেঙে গেল, জীবন তার কাছে নিষ্ঠুর-নির্মম প্রতারণা হয়ে উঠল, আমরা তা ভেবে দেখলাম না।"

সন্তোষ ভাটিয়া বলল, "সাহিত্যিকরা হঠাৎ ডেকাডেন্ট হয়ে গেলেন কেন? তারও নিশ্চয় কোনও সামাজিক কারণ আছে।"

"নিশ্চয় আছে," বলল মহীতোষ দত্ত। "কিন্তু বলিষ্ঠ সাহিত্যিক সামাজিক কারণের কাছে আত্মসমর্পণ করেন না, তার উর্ধ্বে মাথা তুলে দাঁড়ান।"

দেববাণী বলল, "আপনি যে জীবন-জয়ী সাহিত্যের কথা বলছেন তা আজ পশ্চিমেও বিশেষ লেখা হচ্ছে না। অবশ্য সাহিত্য বিষয়ে আমার পক্ষে কিছু বলা ধৃষ্টতা।"

মহীতোষ দত্ত বলল, "দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশকের আদর্শবাদ এই পঞ্চম দশকে চলবে না, বলা বাহুল্য। কিন্তু পশ্চিমের কোনও বড় সাহিত্য জীবনের কাছে ক্লীব পরাজয় স্বীকার করে নি, আজও করে না। মানুষের ধর্ম হ'ল সে লড়বে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে, অন্য মানুষের বিরুদ্ধে, নিজের বিরুদ্ধে। অল্পে সে তৃপ্ত হবে না। তার আরও চাই, যা আছে তা ছাড়া আরও অনেক কিছু। পশ্চিমের আর আমাদের অবস্থা এক নয়। ওরা জৈবিক সমস্যাগুলির প্রায় সমাধান ক'রে ফেলেছে। ওদের সংগ্রাম এখন অন্য স্তরের। ওরা অস্তিত্ববাদ নিয়ে মাথা ঘামাতে পারে, রাষ্ট্রের রীতি-নীতি নিয়ে পরিহাস করতে পারে, আন্তর্জাতিক কূটনীতি নিয়ে উপন্যাস লিখতে পারে, ওরা স্থাপত্য-নীতি নিয়ে মতবিরোধকে কেন্দ্র ক'রে সাহিত্য রচনা করলে তাকেও সংগ্রামী সাহিত্য বলব। আমাদের জীবনের আসল সমস্যা এখনও জৈব। নূট হামসুন ওদের দেশে এখন জন্মাতে পারেন না, কিন্তু আমাদের দেশে পারেন। আমাদের দেশে এমিল জোলারও স্থান আছে, ওদের দেশে আর নেই। আমাদের সহিত্যে যদি জীবনের শ্রেষ্ঠতা, বলিষ্ঠতা অতৃপ্ত তৃষ্ণা ফুটে না ওঠে তাহলে সাহিত্যিকের দুর্বলতা ও ব্যর্থতা ছাড়া আর কি বলা যায়?"

সমীর ঘোষ বলল, "আমাদের সবাকার কথা শুনে আপনার নিশ্চয় অবাক লাগছে। ভারতবর্ষের বর্তমান জীবনে সবচেয়ে লক্ষণীয় হচ্ছে: আমাদের বিরাট মতভেদ। কোনও দুজন ভারতবাসী সববিষয়ে একমত নয়। আসলে আমরা সবে মাত্র চলতে শুরু করেছি। এখনও কোনও নির্দিষ্ট পথে নির্দিষ্ট মতে আমরা চলছি না। দেখুন না আমাদের রাষ্ট্রীয় চেহারা: আমরা গণতান্ত্রিক দেশ; কিন্তু এ দেশে নেতারা যত অন্ধ পূজা পান, পশ্চিমে তার একশতাংশও সম্ভব নয়। গণতন্ত্র হ'য়েও আমরা এক এবং অদ্বিতীয় রাজনৈতিক দল দ্বারা দীর্ঘকাল শাসিত। আমরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি, কিন্তু আসলে আমাদের দেশে

ধনতন্ত্রের জয়জয়কার। ধনী-দরিদ্র এমন প্রভেদ আজ পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে নেই। আমাদের কংগ্রেস দল সমাজতন্ত্রের নামে ধনতন্ত্রকে বলিষ্ঠ করছে, আমাদের সমাজতন্ত্রীরা মার্কিন মুখাপেক্ষী, কম্যুনিস্টরা সংগ্রামপলাতক ভদ্রলোক। অর্থাৎ আমাদের কোনও কিছুই নির্ভেজাল নয়। আমরা এখন এক বিরাট লেবরেটরী ; এখানে কেবল নানা পরীক্ষা চলছে। আমরা ফুটছি—মানে, সেদ্ধ হচ্চি, ফুটে উঠছি না।"

সকলে হেসে উঠতে সমীর ঘোষ আবার বলল, "প্রকৃত সংগ্রাম আমাদের এখনও শুরু হয় নি। দেরী আছে। প্রকৃত সংগ্রাম হল সাধারণ মানুষের অধিকারের সংগ্রাম। একদিন আমাদের বর্তমান প্রচেষ্টার ফাঁকি ধরা পরে যাবে। আমরা হঠাৎ দেখব শিব গড়তে গড়েছি বাঁদর। সমাজতান্ত্রিক কাঠামোয় দেখব ধনতন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সমাসীন! গণতন্ত্রের পোশাক প'রে দেখব সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ধনীদের রাজত্ব। তখন আমাদের নজর খুলবে। তখন ভারতবর্ষে হবে প্রকৃত সংগ্রাম। আজ আমাদের কারুর দল বেছে নেবার দরকার নেই। তখন দরকার হবে। তখন জীবন নিজেই প্রশ্ন করবে তুমি কোন দলে? অনেকের দলে, না কয়েকজনের দলে? তখন সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, বৈজ্ঞানিক ; সবাইকে দল বেছে নিতে হবে। এখন আমরা ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ সবকিছুকে গালাগাল দি। আমেরিকা ও রাশিয়াকে এক মানদণ্ডে বিচার ক'রে নিজেদের অদলীয় নিরপেক্ষতার বাহাদুরি দেখাই। দম্ভ ক'রে বলি, আমরা কোনও দলের নই, সকলের কাছ থেকে আমরা ননীর জন্যে হাত পাতি। আজ সবাই আমাদের মিত্র। আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে পশ্চিমের ধনতন্ত্র, প্রাচ্যের সাম্যবাদ। এমন দিন চিরকাল থাকবে না। ইতিহাসের নিয়মে আমাদের দল বেছে নিতে হবে। তখন আমরা নতুন সাহিত্য লিখব, আমাদের অর্থনীতি, জীবনদর্শন অন্যরকম হবে, আমাদের বিজ্ঞান অন্য পথে, অন্য লক্ষ্যে চলবে।"

মহীতোষ দত্ত সহাস্যে বলল, "বুঝতেই পারছেন, অধ্যাপক ঘোষ লাল চশমা ধারণ করেন।"

সমীর ঘোষ জবাব দিল "লাল নয়। অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ।"

খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। দেববাণী হাত-ঘড়ি দেখল, প্রায় তিনটে বাজে। এবার তাকে উঠতে হবে। সাড়ে তিনটেয় আর একজনের সঙ্গে দেখা করার কথা।

কফির পাত্র শেষ ক'রে দেববাণী বলল, "আপনাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় আমার অনেক লাভ হ'ল।"

সমীর ঘোষ বলল, "আশা করি আপনি দিল্লী ত্যাগ করার পূর্বে আরও দেখা হবে আমাদের।"

"নিশ্চয় হবে," দেববাণী সায় দিল। "আমাদের বাসায় আপনারা একদিন চা খেতে আসুন সবাই। আগামী সপ্তাহে একদিন আসুন। আমি ফোনে আপনার সঙ্গে সময় ঠিক করব।"

ত্রিপাঠী বলল, "কিছুদিন আছেন ত আরও ?"

"কি জানি ?" দেববাণী উঠতে উঠতে জবাব দিল। "সব নির্ভর করছে গভর্ণমেণ্ট কি বলেন, তার ওপর।"

এবার দেববাণী কনট সার্কাস থেকে বার হয়ে পুরাতন শহরের পথ ধরল। ভিড়ের মধ্যে গাড়ীর গতি বাড়ান যায় না, অথচ হাতে সময় কম। দরিয়াগঞ্জ, রেড ফোর্ট, কাশ্মীরী গেট পার হয়ে সে যখন মেইডেন্‌স হোটেলে হাজির হ'ল তখন সাড়ে তিনটে বেজে আরও দশ মিনিট উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

রিসেপশন কাউণ্টারে দেববাণী প্রশ্ন করল, "মিঃ তালুকদার আছেন ?"

যে-কমবয়সী মেয়েটি ঠোঁটে রং মেখে, পুরুষের-মত-ছাঁটা চুলের হালকা মাথা দুলিয়ে তার নাম জানতে চাইল, দেববাণী লক্ষ্য করল, তার পরনে আঁট-সাট পাঞ্জাবি কামিজ ও সালোয়ার, চোখ সুর্মায় কৃষ্ণায়িত, বড় বড় দুটি ভ্রূ পেন্সিলে অঙ্কিত।

টেলিফোন নামিয়ে মেয়েটি বলল, "একশ' বারো নম্বর স্যুইট। তিন তলা। তিনি আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। লিফ্‌ট ঐ বাঁ দিকে।"

তিন তলায় উঠে একশ' বারো নম্বর স্যুইট খুঁজে পেতে দেরি লাগল না। দরজায় মৃদু আঘাত করতে ভিতর থেকে আহ্বান এল, "আসুন।"

ভিতরে ঢুকে দেববাণী প্রথমেই বলল, "মাপ করবেন, দেরি হয়ে গেল।"

গম্ভীর মুখে মৃদু হাসি এনে তালুকদার বললেন, "খুব নয়। বসুন।"

ঘরখানা তালুকদারের আপিস। মস্ত বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিল কাগজ-পত্র দোয়াত-কলমে সুসজ্জিত। তিনি নিজে রিভলবিং চেয়ারে উপবিষ্ট। মোটাসোটা গোলগাল দেহ, চুলে পাক ধরেছে। দামী পোশাকে দিল্লীর শীত থেকে সযত্নে আত্মরক্ষা করছেন। নাম করা বিদেশী সলিসিটরর্স্‌ ফার্মের

প্রতিনিধি এ্যাটর্নী সরোজকুমার তালুকদার। তাঁর মুখোমুখিই দেববাণী বসল।

তালুকদার বললেন, "আমি সিগার খেলে আপনার অসুবিধা হবে না ত?"

"কিছুমাত্র না," দেববাণী জবাব দিল।

"আপনি স্মোক্ করেন?"

"না।"

সিগার জ্বালিয়ে তালুকদার বললেন, "আপনার চিঠিমত হেড আপিস আমার কাছে কাগজপত্র পাঠিয়েছেন। এখন বলুন কি করতে হবে?"

"ডাঃ বসুর চিঠি পেয়েছেন?"

ফাইল থেকে একটা চিঠি বার ক'রে, তার ওপর চোখ রেখে তালুকদার বললেন, "পেয়েছি। তিনি লিখেছেন, আপনি যা বলবেন সেইমত কাজ করতে, তাতেই তাঁর পূর্ণ সম্মতি। চিঠিটা দেখবেন?"

"না, দরকার নেই," দেববাণী বলল। "লেকের ধারে যে বাড়ীটা তৈরী হয়েছে তা আমাদের দু'জনের টাকায়। ওটা দু'জনের নামে রেজিস্ট্রি করতে হবে।"

"তা করা যাবে।"

"জি. টি. রোডের ওপর পাঁচ একর জমি আপনারা যা কিনেছেন, আমি দেখে এসেছি। সেটাও দু'জনের নামে রেজিস্ট্রি করা হয়েছে, না?"

"ঠিক তাই।"

"আমাদের কিছু টাকা এখনও উদ্বৃত্ত আছে। সেটা ডাঃ বসুর ইচ্ছে আপনারা ভাল কোন কোম্পানীর শেয়ারে ইন্‌ভেস্ট করেন।"

"তা করা যাবে। সরকারী সার্টিফিকেটও কিনতে পারেন। কত টাকা?"

"হাজার চল্লিশ হবে।"

"আপনি কি চান? সরকারী সার্টিফিকেট না কোম্পানীর শেয়ার?"

"ডাঃ বসুর ইচ্ছে ভাল কোম্পানীর শেয়ার।"

"উনি লিখেছেন আপনার ইচ্ছে মত কাজ করতে।"

"আমারও তাই ইচ্ছে," হেসে ফেলল দেববাণী। "আসলে, আমি এসব কিছু বুঝি নে। উনি তবু এক-আধটু বোঝেন।"

"তাই করা যাবে। টাকাটা আপনি দিয়ে যাবেন?"

"চেক নিয়ে এসেছি।"

হ্যাণ্ড-ব্যাগ থেকে দেববাণী চেক বার ক'রে তালুকদারের হাতে দিল।

তালুকদার গলা পরিষ্কার ক'রে বললেন, "আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে হচ্ছে।"

"করুন।"

"আপনারা এখনও বিয়ে করছেন না কেন?"

"অসুবিধা আছে।"

"এ ভাবে একসঙ্গে সম্পত্তি তৈরী করছেন, বিয়ে আপনাদের ত করতেই হবে। যত তাড়াতাড়ি করেন তত ভাল।"

"যদি না করি?"

"তাহলে সম্পত্তি নিয়ে ভবিষ্যতে ঝগড়া হ'তে পারে।"

দেববাণীর বুক কেঁপে উঠল।

"কেন, ঝগড়া হবে কেন?"

তালুকদার হেসে বললেন, "সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া না হ'লে আমাদের ব্যবসা একদিনও চলত না।"

"না না। তা বলছি না। আমি বলছি, আমরা ঝগড়া করব কেন?"

"মানুষ ঝগড়া করে। আপনারা মানুষ। আপনাদেরও ঝগড়া হ'তে পারে। আপনাদের এ্যাটর্নী হিসেবে এ বিষয়ে সতর্ক ক'রে দেওয়া আমার কর্তব্য।"

"বুঝতে পারছি।"

"বিবাহ হলে অন্যরকম। এভাবে চললে একদিন সামান্য কারণে মনের অমিল শুরু হতে পারে। তখন যদি দু'জনে মামলা-মকদ্দমা আরম্ভ করেন—"

"না, না।" আতঙ্কে প্রায় চীৎকার ক'রে উঠল দেববাণী। "সে কি কথা?"

"সব চেয়ে খারাপ সম্ভাবনাটা ভেবে রাখা দরকার," তালুকদার গম্ভীর হয়ে বললেন। "এখন আপনারা বন্ধু, আমার কিছু বলবার নেই। কিন্তু একসঙ্গে বাড়ী ক'রে, জমি কিনে, শেয়ার কিনে আপনারা দু'জন ব্যবহারিক-জীবনে একত্র আবদ্ধ হচ্ছেন। অথচ এ বন্ধনের কোন সামাজিক ও আইনগত রূপ নেই। এটা কেবল বিসদৃশ নয়, ভবিষ্যতের পক্ষে বিপজ্জনকও।"

"কেন? বিপদ্ কিসের?"

"দেখুন, সেক্সপীয়র বলেছেন, যেখানে প্রেম বেশী, সেখানে ভয় ও সন্দেহ বেশী। ভালবাসার মত বন্ধন নেই। যেমন শক্ত, তেমন হালকা। আপনাদের এত দিনের বন্ধুত্ব সামান্য কারণে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই ভালবাসাকে

সামাজিক ও আইনগত রূপ দিতে হয়। তার নাম বিবাহ। আপনারা স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করেও বিবাহ করছেন না কেন আমি বুঝতে পারছি না।"

দেববাণী আরক্ত হয়ে বলল, "আমরা স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করছি না। ওরকম সম্পর্ক আমাদের হয় নি।"

তালুকদারের বিরাট মুখ আরও থমথমে হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, "আপনি বলতে চান, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, অর্থাৎ দৈহিক সম্পর্ক, আপনাদের হয় নি ?

"না।"

"আমি বুঝতে পারছি না। তা হলে একসঙ্গে বাড়ী করলেন কেন ?"

"ইচ্ছে হ'ল তাই।"

"তার মানে, বিবাহের ইচ্ছে আপনাদের আছে।"

"সম্ভাবনা আছে বলতে পারেন।"

"দেখুন ডাঃ রায়, আপনাকে আমি অনেকদিন জানি। হাইকোর্টে আপনার বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলার সময় থেকে। আপনি মানুষ হিসাবে কোন জাতের আমার অজানা নেই। জীবনে আপনি নিজের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, তাতে আরও অনেকের মত আমিও আনন্দিত। আমি আপনার শুভকাঙ্ক্ষী। ডাঃ বসুকেও আমি জানি। আপনারা দু'জনে দু'জনের যোগ্য জীবনসঙ্গী। আপনার ভালর জন্যে বলছি, ইচ্ছে পোষণ করেও বিবাহ না করার কোনও মানে নেই। তা ছাড়া, সম্পত্তি নিয়ে ভবিষ্যতে যথেষ্ট গোলমালের সম্ভাবনা রয়ে যাচ্ছে।"

"আপনার কথা ভেবে দেখব। ডাঃ বসু সম্ভবতঃ এখানে আসছেন।"

"আরও একটা দিক আছে", তালুকদার নিভে-যাওয়া চুরুটে অগ্নিসংযোগ করে বললেন, "আপনার ছেলের দিক।"

চমকে উঠল দেববাণী।

"কেন ? তার জন্যেই ত—"

"বুঝেছি।" সামান্য হাসলেন তালুকদার। "ছেলের জন্যে আপনি বিবাহ করতে পারছেন না। ভাবছেন, সে অন্য একজন পুরুষকে তার মা'র স্বামী হিসেবে দেখতে পারবে না। তাই কি ?"

"অনেকটা তাই। সে তার বাবাকে ভোলে নি।"

"খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এ বিষয়ে আপনি তাকে কম সাহায্য করছেন না।"

"আমি সাহায্য করছি ? কেন ? কেমন করে ?"

"নিজে অবিবাহিত থেকে। আপনি তাকে সর্বদা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, তার বাবার স্থান আর কেউ পূর্ণ করতে পারে না।"

দেববাণী চুপ করে রইল।

"সে বিদেশে মানুষ হচ্ছে। স্টেপ্-ফাদার ব্যাপারটা তার নিশ্চয় অজানা নেই। আপনাকে একা একা দেখে সে নিশ্চয় ভাবছে তার বাবা এমন একজন ছিল, এমন কুলোক, যার স্মৃতি আপনি নিজেও ভুলতে পারছেন না, তাকেও ভুলতে দিচ্ছেন না। আপনি যদি স্বাভাবিক ভাবে ডাঃ বসুকে বিবাহ করতেন, সে নিশ্চয় আপনার জীবনের পরিপূর্ণতায় খুশি হ'ত। এ পরিপূর্ণতা তার জীবনকেও নানা ভাবে স্পর্শ করত।"

দেববাণী আস্তে আস্তে বলল, "এ কথা আমি ভেবে দেখিনি।"

তালুকদার বললেন, "এবার নতুন করে সব ভেবে দেখুন। ডাঃ বসু আসছেন, খুব ভাল কথা। আপনারা দু'জনে না হয় একদিন আসবেন আমার কাছে। প্র্যাক্টিক্যাল দৃষ্টিতে সব ব্যাপারটা আপনাদের দেখতে হবে। যে ভয় আপনি পাচ্ছেন, আমার ধারণা, তার কোন ভিত্তি নেই। দু'জনে আসবেন একদিন।"

"দু'জনকে নিয়ে সমস্যা নয়", মৃদু হেসে দেববাণী বলল। "সমস্যা একজনকে নিয়ে। যত সংশয়, যত ভয় সব তার।"

নিজামুদ্দিনে ফিরবার পথে দেববাণীর মন বলে চলল, যত সংশয় ভয়, সব আমার, কেননা আমি জননী ও নারী। শুধু তাই নয়, আমি প্রেমিকা। আমার মাতৃত্ব ও আমার প্রেম একপথে পরিপূর্ণতা পেল না কেন? কেন যাকে ভালবাসি, তার সন্তানের জন্ম দিয়ে জায়া ও জননী রূপে আমি একই পথে পূর্ণতা পেলাম না? এই বিরোধ আমার মধ্যে জননীকে জায়া হতে দিচ্ছে না।

তালুকদারের কথাগুলি বার বার দেববাণীর মনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সত্যিই কি আমি দেবকুমারকে নিয়ে অযথা ভয় পাচ্ছি? জীবন থেকে পূর্ণ-অপসৃত পিতাকে নিয়ে ভাববিলাসের সুযোগ সত্যি কি আমিই তাকে দিয়েছি? সে যে জন্মদাতা সম্বন্ধে একটা কথাও বলে না, তার মূলে কি কোন প্রচণ্ড অপরাধের নীরব উত্তরাধিকার? দেবকুমার কি মনে মনে নিজেকে অপরাধী করে রেখেছে তার পিতার হাতে মায়ের লাঞ্ছনা, অপমান, অত্যাচারের জন্যে? তাই কি সে কখনও প্রকাশ্যে বাবার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করে না? মায়ের

জীবনকে নিরানন্দ শূন্য দেখে দুর্বিষহ অপরাধের বোঝা সে কি অহরহ নিজের মধ্যে বহন করে বেড়াচ্ছে? একমাত্র আত্মজকে এতখানি না-চেনার দুঃখে দেববাণীর বুক টন্‌টন করে উঠল। মনে হ'ল, আমার কি সত্যিই বড় ভুল হয়ে গেছে? দেবকুমারের সঙ্গে কোনও দিন এ বিষয়ে পরিষ্কার কথাবার্তা না বলে তার মনে অপরাধের বোঝা চাপিয়ে রাখার সম্ভাবনায় দেববাণী অস্থির হয়ে উঠল। দেশদেশান্তরের দূরত্ব অপসৃত হয়ে গেল। চলমান গাড়ীতে বসেই দেববাণী মুহূর্তে বহু দেশ, সমুদ্র পেরিয়ে পুত্রের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তার সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে বলতে লাগল, বাছা, তোর কোন দোষ নেই, অপরাধ নেই; যে আমার জীবনে কেবলমাত্র অমঙ্গল এনেছিল, তার একটি মাত্র মঙ্গলদান তুই, তার কোন অপরাধ তোকে স্পর্শ করে নি। তুই তার উত্তরাধিকারী ন'স, তুই কেবল আমার উত্তরাধিকারী।

বাড়ী পৌঁছে বড় ক্লান্ত লাগল দেববাণীর। মা'কে নিয়ে বেড়াতে যাবে বলে গিয়েছিল তাই গাড়ী বাড়ীর বাইরে রাস্তার ধারে রেখে সে ধীরে ধীরে পা ফেলে ওপরে উঠে এল। ইচ্ছে হ'ল চেয়ারে গা ছেড়ে ব'সে পড়ে, কিন্তু মা কি ভাববেন মনে হওয়ায় সোজা শোবার ঘরে চলে এল। বাসন্তী দেবী বিছানায় শুয়ে বই পড়ছিলেন; নীরবে তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল দেববাণী।

উঠে বসলেন বাসন্তী দেবী। বললেন, "কি হয়েছে রে, বাণী?"

"কিছু নয় ত, মা।"

"তোকে এত ক্লান্ত লাগছে যে?"

"সারাদিন ঘোরাঘুরি—"

"না, আরও কিছু? মুখে তোর কালি পড়েছে। কোনও খারাপ কিছু ঘটে নি ত?"

"না, মা।"

"কাজ এগোল কিছু?"

"বিশেষ নয়।"

বিছানার পাশে আরাম-কেদারায় ব'সে পড়ল দেববাণী।

বলল, "আমি আর পারি নে। হিমাদ্রিকে লিখে দিয়েছি। এবার সে এসে নিজের কাজ নিজে ক'রে নিক।"

বাসন্তী দেবী মেয়ের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হলেন। শুধু বললেন, "বেশ করেছিস্।"

"চল, মা। তোমায় নিয়ে একটু বেড়াতে যাই।"

"আজ না হয় থাক। তোর মন ভাল নেই।"

"তোমাকে নিয়ে একেবারে বেড়াবার সময় পাচ্ছি না। এখানে এসে ঘরে বন্দী হয়ে আছ। আমার মন ঠিক আছে। চল, বেরিয়ে পড়ি।"

"কোথায় যাবি?"

"চল, এমনি একটু ঘুরে বেড়াই। তার পর ইচ্ছে হ'লে সাবিত্রী আম্মার ওখানে যাব।"

"তাঁকে বলে রেখেছিস্?"

"বলার দরকার নেই। যদি দেখি ব্যস্ত আছেন বা বেরিয়ে গেছেন, ভালই হবে, চলে আসব।"

"তোর মন আজ স্থির নেই। কেন শুধু শুধু বেরোবার কথা বলছিস?"

"ঘরে বসে আরও খারাপ লাগবে। এখানে লেবরেটরী নেই যে কাজে লেগে যাব। অলস সময় কাটাবার একেবারে অভ্যাস নেই, মা। মনটা কেমন ভারী হয়ে ওঠে।"

"চা খাবি নে?"

"খাব। আমি চটপট চা তৈরী করছি। তুমি কাপড় বদলে নাও।"

"আগে তুই স্নান-ঘরে যা। আয়নায় দেখ গে কেমন দেখাচ্ছে তোকে।"

"আগে এক কাপ গরম চা খেয়ে নি, মা।"

স্টোভে দেববাণী চটপট চা তৈরী ক'রে নিল। বাসন্তী দেবীকে দিয়ে নিজে চুমুক দিল চায়ের পেয়ালায়। বলে উঠল, "আঃ।"

টেলিফোন বেজে উঠল বারান্দায়। চায়ের পেয়ালা হাতে করেই দেববাণী গিয়ে রিসিভার তুলল।

অন্য প্রান্ত থেকে নারী-কণ্ঠ ভেসে এল, "ডাঃ রায়?"

"বলছি।"

"আমি সরোজা।"

"হ্যালো সরোজা, ভাল আছ ত? কি খবর?"

"আপনার সঙ্গে কাল দেখা করতে গিয়েছিলাম।"

"শুনেছি। তোমার সঙ্গে কাল দেখা না হওয়ায় দুঃখিত। কোনও জরুরী কাজ আছে?"

"কাজ কিছু নেই।"

"তবে ?"

"একটা খবর আছে আপনাকে দেবার।"

"বল।"

"আপনার গবেষণাগার হবে না।"

"হবে না ?"—দেববাণীর কণ্ঠে কৌতুক।

"না।"

"কেন ? তুমি কি ক'রে জানলে ?"

"যে জমি আপনি চেয়েছেন, সে জমি আপনি পাবেন না।"

"তাই নাকি ?"

"আমাদের কাগজের মালিক সে জমি কিনে নিচ্ছেন।"

দেববাণী এবার আর হালকা থাকতে পারল না।

"কিন্তু ও জমি ত বিদ্যায়তনের জন্যে নির্দিষ্ট।"

"নির্দিষ্টকে সব দেশে সব কালে অনির্দিষ্ট করা সম্ভব।"

"তোমার খবর পাকা ?"

"তাই ত মনে হচ্ছে। আমি কাল জানতে পেরে আপনার কাছে গিয়েছিলাম।"

"তোমার মা জানেন ?"

"না। জানলেও তাঁর কিছু করার নেই।"

"তোমার কাগজের মালিক কে ?"

"ওটা আর কাউকে জিজ্ঞেস করবেন।"

"তাঁর বুঝি খুব দাপট ?"

"তিনি ক্ষমতাবান লোক।"

"আর কিছু খবর আছে ?"

"আর কিছু খবর নেই।"

"ধন্যবাদ। তোমার নিজের খবর কি ?"

"ভাল। আচ্ছা চলি। গুড নাইট।"

"গুড নাইট, সরোজা। ধন্যবাদ।"

টেলিফোন নামিয়ে দেববাণী কয়েক মিনিট চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। সরোজা বিশ্বাসযোগ্য কিছু না জানলে খবর দেবার জন্যে এত ব্যস্ত হ'ত না। নানা দিক থেকে বাধা আসছে, দেববাণী ভাবল। আমার আর ভাল লাগছে

না। আসল কথা, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। নিজের দেশকে চিনি না, জানি না, বুঝি না, এখানে কাজ করব কি ক'রে? কি নিয়মে, কোন্ লিখিত-অলিখিত বিধানে ভারতবর্ষ চলছে আমি তার কতটুকু জানি? কিসে কাজ হয়, কিসে হয় না, কোন্ অদৃশ্য শক্তি গোপনে স্বার্থ গুছিয়ে নেয়, বিঘোষিত নীতি কর্মক্ষেত্রে কোথায় কতখানি অপচয়ের পথে নেমে আসে, এসব বোঝবার মত অভিজ্ঞতা আমার নেই। হিমাদ্রির আছে কি না জানি না। অন্তত আমার চেয়ে নিশ্চয় বেশী আছে। শুধু এজন্যে নয়, তার আসার আরও বড় প্রয়োজন হয়েছে। সে আসুক। ভারতবর্ষের প্রাচীন মাটিতে তার সামনে দাঁড়িয়ে আমি একবার তাকে দেখতে চাই। যে-দৃষ্টিতে বিদেশে তাকে দেখেছি, যে-মন নিয়ে বিদেশে তাকে চিনেছি, দেশের মাটিতে তার কতটুকু সত্যি, কতটুকু কল্পনা তার বিচার হয়ে যাক। সে আসুক। আমার চিঠি পেয়ে সে যদি না আসে? তাকে আজ কেব্‌ল পাঠাতে হবে। "তুমি যত শীঘ্র সম্ভব চলে এস। চিঠিতে সব লিখেছি। তার পরে যা ঘটেছে তাতে তোমার আসা আরও দরকার।"

চায়ের পেয়ালায় মুখ দিয়ে দেববাণী দেখল, ঠাণ্ডা জল। নামিয়ে রাখল। স্নানঘরে ঢুকে হিমাদ্রির আসন্ন আগমন কল্পনা ক'রে দেববাণী আরও অনেক কিছু ভাবল। যখন বেরিয়ে এল, দেববাণী রীতিমত উত্তেজিত। শাড়ী ভাল ক'রে পরে নি, শুধু গায়ে জড়ান। পেটিকোট ও ব্লাউজ ছাড়া আর কিছু নেই। অত শীতেও দেববাণীর দেহ গরম, মন অস্থির। চট ক'রে টেবিলে ব'সে কলম তুলে সে কেব্‌ল রচনা করতে লাগল। তিন বার খসড়া করবার পর রচনা মনোমত হ'ল দেববাণীর। চাকরকে ডেকে তার-ঘরে পাঠিয়ে দিল তক্ষুণি।

দেববাণী হিমাদ্রিকে আহ্বান জানাল: "তোমার এখানে উপস্থিতি অবশ্য প্রয়োজন। পত্রে যা লিখেছি তা ছাড়াও জরুরি কারণ আছে। পথে জেনিভায় নেমে দেবকুমারকে নিয়ে আসবে। আগামী সপ্তাহে তোমাদের দু'জনকে একসঙ্গে আশা করব। কবে আসছ 'তার' ক'রে জানাবে।"

দেববাণীর মনে বার বার গুঞ্জরিত হতে লাগল দু'টি শব্দ; ওরা আসুক। নিজেকে সে বার বার বুঝিয়ে বলল: ওরা দু'জনে একসঙ্গে আসুক। ওদের একসঙ্গে স্বদেশে না দেখলে আমি বুঝতে পারছি না ওরা আর আমি এক কি না, আমরা তিনজনে এক কি না। ওদের একত্র দেখলে আমার মনের সন্দেহ কাটবে, প্রশ্নের জবাব মিলবে।

চৌদ্দ

বাসন্তী দেবীকে নিয়ে দেববাণী যখন বেরিয়ে পড়ল তখন অন্তিম শীতের স্বল্পস্থায়ী বিকাল সন্ধ্যার আসন্ন আবছা অন্ধকারে মুখ লুকিয়েছে। নিজামুদ্দিন থেকে বেরিয়ে হুমায়ুনের সমাধি-সৌধে এসে পৌঁছল দেববাণী। দিল্লীর মুঘল স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হুমায়ুনের সমাধি। মাকে নিয়ে সমাধির অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে করতে দেববাণীর মনে আর একবার সরোজার কাছে সদ্যপ্রাপ্ত দুঃসংবাদ খচ্ ক'রে জেগে উঠল। সাবিত্রী আম্মার কাছে আজই একবার যেতে হয়, নিজেকে বলল দেববাণী; সরোজার খবরের প্রকৃত তাৎপর্য কি, তার মধ্যে কতখানি বিপদ লুক্কায়িত, সাবিত্রী আম্মা বলতে পারবেন। রিসার্চ সেণ্টারের জন্যে জমি অবশ্য অন্যত্র নেওয়া যায়, কিন্তু বাড়ীর প্ল্যান তাহলে আবার নতুন ক'রে বানাতে হয়। তার মানে আরও সময়, দীর্ঘতর বিলম্ব।

ইন্দ্রপ্রস্থ এস্টেটে বর্তমান জমিটি দেববাণীর খুব পছন্দ হয়েছিল; পুরাতন ও নতুন দিল্লীর সংযোগস্থলে রিসার্চ সেণ্টার সবচেয়ে ভাল হ'ত। সে শুনেছে এই নতুন-গড়ে ওঠা বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কালে একাধিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি কেন্দ্র স্থাপিত হবে; সেদিক থেকেও স্থানটি লোভনীয় লেগেছিল। এ জমি হাতছাড়া হয়ে গেলে পছন্দমত নতুন জমি পাওয়া-না-পাওয়ার সমস্যার অজুহাতেই ইচ্ছে হ'লে রিসার্চ সেণ্টারের সমস্ত পরিকল্পনাকে অনিশ্চিত ক'রে দেওয়া কারুর পক্ষে কঠিন হবে না। সব তথ্যের সন্ধান না পাওয়া গেলেও দেববাণী বুঝতে পেরেছিল, তাদের প্রস্তাব সর্ব-সমর্থিত নয়; নেপথ্যে, দৃষ্টি ও গোচরের বাইরে, তা শক্তিমান কোনও গোষ্ঠীর বিরুদ্ধতা অর্জন করেছে। এ গোষ্ঠী কাদের নিয়ে দেববাণী জানে না, কতখানি তাদের ক্ষমতা তাও তার অজানা; কেউ তাকে পরিষ্কার ক'রে কিছু বলতে চায় না। কিন্তু সেক্রেটারিয়েটের কর্মকর্তাদের হঠাৎ-শীতল ব্যবহারে, সাবিত্রী আম্মার নিরুপায় নিষ্ক্রিয়তায়, দেববাণী বুঝতে পেরেছিল সহজে তাদের উদ্যোগকে সার্থক ক'রে তোলা সম্ভব হবে না। অথচ, সমাধি-মন্দিরের প্রাচীন সিঁড়ি

ভেঙে ওপরে উঠতে উঠতে দেববাণী দেখল, এ জন্যে যে-পরিমাণ উৎসাহ নিয়ে লড়াই-এ নামা দরকার ততটা তার নেই।

বাসন্তী দেবীর মন বর্তমানের বেড়া ভেঙে তখন বহুদূরের অতীতে চ'লে গেছে। তিনি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন পূর্ণ-বৈভব মুঘল-রাজদরবার, দুর্গসংরক্ষিত অট্টালিকার ঘরে ঘরে বাদশাহী জীবনের বহুবর্ণ উচ্ছলতা। তাঁর কানে বেজে উঠছে সশস্ত্র সংঘাতের ভয়ানক কোলাহল; আহতের আর্ত চীৎকার; বিজেতার পাশব জয়োল্লাস, বিজিতের করুণ আর্তনাদ। কল্পনায় তিনি দেখতে পাচ্ছেন সপ্ত দিল্লীর ধূসর পাথুরে মাটিতে সাম্রাজ্যের গঠন, উত্থান পতন: অদূর-প্রবাহিণী ক্ষীণস্রোতা যমুনার বুকে সুদীর্ঘ নীরব ইতিহাসের মুখর নির্বাক্ স্বাক্ষরগুলি একে একে ভেসে উঠছে বাসন্তী দেবীর চোখে। হঠাৎ তিনি যেন দেখতে পেলেন, প্রায়, একশ' বছর আগে সিপাহী বিদ্রোহের শেষ-অধ্যায়ে মুঘলের সর্বশেষ স্বপ্নের চিরসমাধির মর্মন্তুদ দৃশ্য। বৃদ্ধ অন্ধ বাহাদুর শাহ্ এই হুমায়ুনের সমাধি-মন্দিরের সংলগ্ন কোন অধুনানিশ্চিহ্ন প্রাসাদে আশ্রয় নিয়েছিলেন; এখানেই, ঐ প্রাচীন দ্বারপথের অদূরে, ইংরেজের কাছে তাঁর দুই পুত্র আত্মসমর্পণ করেছিল। ইংরেজ তাদের নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েও লাল কিল্লায় নিয়ে যাবার পথেই হত্যা করেছিল। ভারতবর্ষের শেষ 'সম্রাট্' বাহাদুর শাহ্‌কে নির্বাসিত ক'রে ইংরেজ শতবর্ষব্যাপী যে সাম্রাজ্যের সৃষ্টি করেছিল আজ তাও অতীত ইতিহাস। ভারতবর্ষ আর এক অভিনব পরীক্ষার্ দীক্ষা নিয়েছে, যার তাৎপর্য বাসন্তী দেবী কেমন যেন বুঝে উঠতে পারেন না। হুমায়ুনের কবর বর্তমান ভারতবর্ষের কাছে প্রাচীন ইতিহাসের স্মারকচিহ্ন ছাড়া আর কিছু নয়; দেববাণীর মনে যে তার কোনও প্রভাব পড়ছে না, তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছেন। ভারতবর্ষের কোনও কিছুই কি বর্তমানের মানসকে প্রভাবিত করছে? বাসন্তী দেবী এ প্রশ্নের জবাব পান না। স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বপ্ন বৃদ্ধ কবি বাহাদুর শাহ্‌ও দেখেছিলেন, সে-স্বপ্ন বাস্তব হ'তে আরও একশ' বছর প্রায় কেটে গেল। স্বাধীন ভারতবর্ষের অস্পষ্ট স্বপ্ন বাসন্তী দেবীর যৌবনকালে আরও অনেকে দেখেছিল—তাদের মধ্যে একজনের গম্ভীর মুখচ্ছবি ইংরেজের হাতে বন্দী বাহাদুর শাহের পুত্রদের মুখের চেহারার সঙ্গে আজকার এই ম্লান সন্ধ্যায় যেন একাকার হয়ে গেছে। তারা সব পুরাতন। আজ ভারতবর্ষ আবার নতুন। তার নতুন-জীবনের অন্যতম প্রতীক বাসন্তী দেবীরই সন্তান দেববাণী। অথচ এই সামান্য কয়েকটা বছরের ব্যবধানে বর্তমান ভারত-

বর্ষের মানস এমন ক'রে বদলে গেল কিসের প্রভাবে? কেন তিনি নিজের সন্তানকে পর্যন্ত জানেন না, বোঝেন না, তার অন্তর্দ্বন্দ্বে সাহায্য করবার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত তাঁর নেই?

"মা!"

দেববাণীর ডাক শুনে বাসন্তী দেবী সচেতন হলেন।

"কি রে?"

"তোমার খুব ভাল লাগছে, না?"

ভাল লাগছে? কি জানি? একে কি ভাল লাগা বলে? অতীত ও বর্তমান একাকার হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে।

মেয়ের কথার জবাব দিলেন না বাসন্তী দেবী।

দেববাণী আবার প্রশ্ন করল, "কি ভাবছ তুমি, মা?"

"বুড়ো মনের এলোমেলো ভাবনা, তার আরম্ভ নেই, শেষ নেই।"

"তার মানে তুমি বলবে না।"

"সব কিছু বলা যায়, বাণী!" বাসন্তী দেবী মৃদু হাসলেন। "তুই কি তোর সব কথা আমায় বলিস?"

দেববাণীর নিঃশ্বাস মুহূর্তের জন্যে থেমে গেল।

"আমি তোমাকে যত কথা বলি মা, খুব কম মেয়েই মাকে ততটা বলে।"

"তা হলেও সব কিছু ত বলিস না!"

"কি বলিনি বল ত?"

"কি বলিস নি, বলতে চাস নে বা পারিস নে তা তুই-ই জানিস সবচেয়ে বেশী। হয়ত বলার মত অবস্থায় এসে পৌঁছস নি। হয়ত ভাবিস, আমি আর এক-কালের লোক, তোর সমস্যা বুঝতে পারি নে।"

"তা নয় মা। বুঝতে তুমি হয়ত পার। কিন্তু কতগুলি সমস্যা আছে যা আমাদের একান্ত নিজের, তারা কিছুতে অন্য কারুর কাছে ধরা দিতে চায় না।"

"তবু, সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলে মন হালকা হয়, সমাধান অনেক সময় সহজ হয়ে ওঠে। এমন অবস্থায় মানুষ পড়ে যখন নিজের সমস্যা নিজে মেটাতে না পেরে সে অন্যের শরণাপন্ন হয়।"

"সে অবস্থা আমার এখনও আসে নি, মা", হাল্‌কা সুরে দেববাণী বলল।

"তোকে একটা কথা বলি বাণী। মানুষ যখন বুড়ো হয়, তার দৃষ্টিতে

অনেক কিছু নতুন রহস্য ধরা পড়ে। অনেক কালের মন নিয়ে বর্তমান কালের সমস্যার পানে তাকালে তার ধার বেশ কম মনে হয়। কালে কালে আমাদের বাস্তব জীবনে অনেক পরিবর্তন হলেও মানুষের প্রধান সমস্যাগুলি মূলতঃ এক। তা না হ'লে মহাভারত-রামায়ণ পড়ে আমাদের এখনও ভাল লাগত না। কালিদাস এ যুগে কেউ পড়ত না, অতীতের মনীষা বর্তমানের দুয়ারে একেবারে পাত্তা পেত না। আমার কি মনে হয় জানিস, বাণী! আমার মনে হয়, তোর সঙ্গে প্রাচীন ভারতবর্ষের মেয়েদের বুঝি বিশেষ প্রভেদ নেই। তাই তোকে বলি, তুই আমাদের প্রাচীন সাহিত্য পড়ে দেখ।"

"কাদের কথা বলছ, মা? কোন মেয়েদের?"

"উপনিষদ্-মহাভারতে যে মেয়েদের কাহিনী বিবৃত রয়েছে। তাদের কয়েকজনের যে ধরনের সমস্যা জয় করতে হয়েছিল তার থেকে তুই বোধ করি অনেকখানি মনের বল পেতে পারিস।"

"আমার মনের বল নেই তুমি ভাবলে কি করে?"

"উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির উপাখ্যান প'ড়ে দেখিস। দুই স্ত্রী নিয়ে যাজ্ঞবল্ক্য গার্হস্থ্যধর্ম পালন করছিলেন; অর্থ-বিত্তে অভাব ছিল না তাঁর। বৃদ্ধ হলেও তিনি সঙ্কল্প করলেন, গৃহ-সংসার ত্যাগ ক'রে বনবাসী হয়ে ভগবানের ধ্যান করবেন। দুই স্ত্রীকে বললেন, এস, তোমাদের সম্পত্তি ভাগ ক'রে দি। স্ত্রীদের মধ্যে কাত্যায়নী কেবলমাত্র গার্হস্থ্য জীবনে নিরত ছিলেন; মৈত্রেয়ী সংসারধর্ম পালনের সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যা অনুশীলন করতেন। স্বামী সংসার ত্যাগ ক'রে অরণ্যে যাবেন, আর তাঁকে দিয়ে যাবেন কেবলমাত্র সম্পত্তির অর্ধাংশ, এই প্রস্তাব শুনে মৈত্রেয়ীর অন্তর বিদ্রোহ ক'রে উঠল। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে বললেন, পৃথিবীর সমস্ত ধন ও অর্থ যদি আমার হয়, তবে কি আমি অমৃতত্ব লাভ করতে পারব? স্বামী উত্তর দিলেন, না; বিত্ত দ্বারা কখনও অমৃতত্ব লাভ করা যায় না। মৈত্রেয়ী অনেক চিন্তা করলেন। তার পর স্বামী যেদিন সংসার ত্যাগ ক'রে চলে যাবেন, তিনি প্রশ্ন করলেন, যাতে আমি অমৃত হব না, তা দিয়ে আমি কি করব? তুমি আমাকে অমৃতের পথ ব'লে যাও। যাজ্ঞবল্ক্য বুঝলেন, মৈত্রেয়ী এমন স্ত্রী যে তাঁকে সংসারে বাঁধবে না, মুক্তি দেবে। তিনি আর সংসার ত্যাগ করলেন না; স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে অমৃতের সাধনা করতে লাগলেন।"

দেববাণী মন দিয়ে শুনছিল, কিন্তু হাল্কা ভাবে বলল, "আমি ত মৈত্রেয়ী নই, মা। আমি অমৃতের সন্ধান করছি না।"

"তাই যদি হ'ত বাণী, তাহলে তোর দ্বন্দ্ব-দ্বিধা কিছু থাকত না। চোখের ওপর অনেক মেয়েকে দেখছি, জীবনকে ভোগ করবার সুযোগ তারা দু'হাতে গ্রহণ করছে। আমাদের সাধারণ মানুষের জীবনে অমৃত কেবল ব্রহ্ম নন, বাণী, অমৃত হ'ল বড় কিছুর সন্ধান। তুই যে সমন্বয়ের খোঁজ করছিস, যা দৈনন্দিন জীবনভোগের চেয়ে বড়, তাতে নিশ্চয় অমৃতের স্পর্শ রয়েছে। যদি না থাকত তাহলে সে তোকে এমন ভাবে ব্যথা দিত না, এমন অস্থির ক'রে তুলত না। তাই বলছিলাম, মৈত্রেয়ীর মত মনের বল তোর নেই। মৈত্রেয়ী বিনা সংশয়ে কি চাই তা বুঝে নিয়েছিল, যা চাই তা পেতে সে ইতস্তত করে নি। স্বামীকে সে পরম নিশ্চিন্ত সাহসের সঙ্গে বলতে পেরেছিল, যাতে আমি অমৃত হব, তাই আমাকে দাও। তুই কি তেমনি ক'রে কাউকে বলতে পারিস ?"

বুকে কি যেন দুরু দুরু বেজে উঠল দেববাণীর। মুহূর্তে তা গলা পর্যন্ত উঠে এল। মুখে তার কথা সরল না। মনে শতস্বরে প্রশ্ন ঝঙ্কৃত হ'ল : আমি কি বলতে পারি হিমাদ্রিকে, যাতে আমি অমৃত হব, সে পথ আমাকে দেখিয়ে দাও ? হিমাদ্রি জানে সে পথ ? বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অমৃত হবার কি কোনও পথ আছে। জীবনকে পূর্ণ উপলব্ধি করার পথ কি আজও খোলা আছে ?

বাসন্তী দেবীকে নিয়ে দেববাণী যখন সাবিত্রী আম্মার বাড়ী পৌছল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। বাইরে থেকে ওরা দেখতে পেল সাবিত্রী আম্মার ঘরে আলো জ্বলছে। দেববাণী বেল্ টিপে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর রামস্বামী এসে দরজা খুলল। দেববাণী ও বাসন্তী দেবীকে পাশের ঘরে বসিয়ে সে গেল সাবিত্রী আম্মাকে খবর দিতে।

বাসন্তী দেবী নীচু গলায় বললেন, "খবর না দিয়ে এসে গেলি, যদি ওঁর অন্য কাজ থাকে ?"

"তাহলে চলে যাব," দেববাণী নিশ্চিন্তে জবাব দিল। "মনে হচ্ছে, কাজকর্ম বিশেষ নেই আজ। বাইরের লোকজন ত কাউকে দেখছি না।"

"আমি কিন্তু বেশী কিছু বলতে পারব না।"

"তোমাকে আগেও বলেছি, মা, আবার বলছি, ইংরেজী না জানা মানুষের কোনও অপরাধ নয়। পরাধীন ভারতবর্ষে যদি-বা ছিল, স্বাধীন ভারতবর্ষে নিশ্চয় নয়। তুমি বাংলায় বলবে যা তোমার বলার ইচ্ছে, আমি ইংরেজী ক'রে দেব। ওঁর কথা বুঝতে ত তোমার অসুবিধে হবে না !"

রামস্বামী এসে ওদের সাবিত্রী আম্মার ঘরে নিয়ে গেল। দেববাণী ঢুকল আগে, দেখল সাবিত্রী আম্মা কম্বল গায়ে জড়িয়ে বিছানায় ব'সে আছেন, মুখে হাসি, কিন্তু বড় বড় চোখ ছু'টিতে যেন ক্লান্তি জমে রয়েছে। অন্যান্য দিনের তুলনায় হাসিটিও যেন ম্লান মনে হ'ল দেববাণীর কাছে। কিন্তু কেবল মুহূর্তের জন্য। দেববাণীর পেছনে বাসন্তী দেবীকে দেখতে পেয়ে সাবিত্রী আম্মা ওঠবার চেষ্টা করলেন, মুখখানা আরও হাস্যমুখর হ'ল। ছু'হাত তুলে নমস্তে ক'রে হিন্দীতে বললেন, "আসুন, আসুন। দেববাণীকে কতবার বলেছি, মা'কে একদিন নিয়ে এস। এতদিনে সময় হ'ল।"

বাসন্তী দেবীকে চেয়ারে বসিয়ে দেববাণী বসল। সে বলল, "মা'র খুব আসবার ইচ্ছে ছিল। তবে সঙ্কোচ বোধ করছিলেন। বলছিলেন, ভাল ইংরেজী বলতে পারি নে।"

"তাহলে ত আপনার আরও বেশী ক'রে এখানে আসা উচিত," সাবিত্রী আম্মা বাসন্তী দেবীকে বললেন। "ইংরেজী আমিও বিশেষ জানি নে। তার চেয়ে বরং গান্ধীজীর কাছে বহুদিন কাটিয়ে হিন্দীটা ভাল জানি।"

"বাণীর কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি," ইতস্তত ক'রে বাসন্তী দেবী বললেন। "আপনাকে দেখবার বড় ইচ্ছে ছিল।"

"দেববাণী তার মা'র কথাও আমায় কম বলে নি।"

"মেয়েরা মা'দের কথা ত ব'লেই থাকে," বাসন্তী দেবী যোগ দিলেন।

"তাই ত উচিত," বলতে বলতে মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হলেন সাবিত্রী আম্মা।

"সরোজা কোথায় ?" প্রশ্ন করল দেববাণী।

"এখনও ফেরে নি," সংক্ষেপে বললেন সাবিত্রী আম্মা।

পরক্ষণে দেববাণীকে প্রশ্ন করলেন, "তোমার কাজ কতদূর এগোল ?"

"কোথায় আর এগোচ্ছে ?" দেববাণীর কথায় বিরক্তি ফুটে উঠল, কিছুটা নৈরাশ্যও। "কোথায় যে আটকে আছে তাও বুঝতে পারছি না।"

"খোঁজ-খবর করছ না ?"

"যতটা পারি করছি। কেউ কিছু বিশেষ বলতে চাইছেন না।"

"এবার তুমি মন্ত্রীমহাশয়ের সঙ্গে দেখা কর।"

"তাই ভাবছি।"

"ভেবে বেশী সময় নষ্ট ক'রো না।"

"কেন? আপনি কি কিছু শুনেছেন?"

"উড়ো কথা কানে আসে, দেববাণী।"

"আমি আজই খবর পেয়েছি, আমরা যে জমিটা চেয়েছি তা নেবার জন্যে আরও একটা পার্টি চেষ্টা করছে।"

"সরোজার খবর ত?" মৃদু ম্লান হাসি ফুটে উঠল সাবিত্রী আম্মার মুখে।

"হ্যাঁ!"

"তার মানে এই নয়, জমিটা তোমরা পাবে না।"

"শুনেছিলাম, ও জমিটা কোন বিদ্যায়তনের জন্য নির্দিষ্ট।"

"কালচারেল বা এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউট। তার মধ্যে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানকে চেষ্টা করলে আনা যায়।"

"সংবাদপত্র ত শিল্প। দস্তুর মত বড় ব্যবসা।"

"তা হলেও।"

"প্রতিপক্ষ মনে হচ্ছে প্রতিপত্তিশালী।" দেববাণী অনেকটা নিজের মনে বলল।

"সুতরাং, তোমাকে আরও জোরের সঙ্গে কাজে নামতে হবে," সাবিত্রী আম্মা বললেন।

"আপনাকে বলতে পারি তাই বলছি?" দেববাণী ক্লান্ত স্বরে যোগ দিল, "আমি নিজেই যেন তেমন উৎসাহ পাচ্ছি না। আসল কথা, আমার কেমন ভয় করছে।"

সাবিত্রী আম্মা হেসে বললেন, "ভয়? কিসের ভয়?"

"ঠিক জানি নে। মনে হচ্ছে, স্বদেশকেই যেন আমি ভয় করছি। দশ বছর আগে যেদিন কলকাতা ত্যাগ ক'রে বিদেশে গিয়েছিলাম, ভারতবর্ষের কিছুই আমার জানা ছিল না। আজ ফিরে এসে দেখছি, আমার অজ্ঞানতা অপরিসীম। বাইরের পৃথিবীকে যদি বা একটু চিনি, নিজের দেশকে আমি একেবারে জানি না। তাই মনে হচ্ছে, দেশকে না জেনে, না চিনে, এত বড় একটা কাজে হাত দিয়ে যদি শেষ পর্যন্ত সামলাতে না পারি?"

"তোমাদের মার্কিন মুলুক আর য়ুরোপ থেকে বিদেশীরা ভারতবর্ষকে ত দেখতে পাই এক-নজরে চিনে নেয়। এ দেশের সাতটা শহরে দশদিন কাটিয়ে তারা ভারত-বিশেষজ্ঞ হ'য়ে ফিরে যায়। আর তাদের সারগর্ভ রচনা আমাদের সংবাদপত্রে ফলাও ক'রে ছাপান হ'য়ে থাকে।"

"যারা তা পারে তার অন্য জাতের লোক।"

"তোমার পার্টনার কি বলছেন?"

দেববাণী হঠাৎ লজ্জা পেল। মৃদু স্বরে বলল, "তাঁকে সব খুলে লিখেছি।" একটু থেমে যোগ দিল, "তাকে আসতে লিখেছি।"

সাবিত্রী আম্মা বললেন, "ভালো করেছ।"

"রিসার্চ সেণ্টার তৈরী করবার প্ল্যান তারই," দেববাণী যেন কৈফিয়ৎ দিল, "উৎসাহ তাঁরই বেশী। তিনি স্বদেশকে জানেন, বোঝেন। তাঁর নিজেরই উপস্থিত থেকে সব কিছু বিবেচনার পর কর্তব্য নির্দেশ করা উচিত।"

"আমি তাই মনে করি," সাবিত্রী আম্মা বললেন।

বাসন্তী দেবী এতক্ষণ নীরবে শুনছিলেন। তাঁকে লক্ষ্য ক'রে সাবিত্রী আম্মা বললেন, "আপনি হয়ত ভাবছেন, আমি কেন দেববাণীকে আর সাহায্য করতে পারছি না।"

বাসন্তী দেবী ব'লে উঠলেন, "না, না। আপনি ওকে যে অনেক সাহায্য করেছেন, তা আমি জানি।"

দেববাণী বলল, "আপনার কাছ থেকে উৎসাহ ও সাহায্য না পেলে আমি কিছুই হয়ত করতে পারতাম না।"

ম্লান হাসির সঙ্গে সাবিত্রী আম্মা বললেন, "পারতে। আমি না হ'লে অন্য কেউ তোমায় উৎসাহ দিত, এগিয়ে দিত। সংসারে, দেববাণী, ভাল লোকের অভাব নেই। যারা নিজের পায়ে দাড়াতে চেয়েছে তারা সবাই একথা বলবে। পথের প্রতি মোড়ে তোমাকে সাহায্য করতে, এগিয়ে দিতে একজন কোন বন্ধুকে ভগবান দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। তারা তোমার কেউ নয়, অথচ তাদের কাছে তুমি যা পেয়েছ, নিজের আত্মীয়-স্বজনের কাছেও তা পাও নি। আমার জীবনে বার বার আমি বিধাতার এ আশীর্বাদ পেয়ে এসেছি।"

"আমিও," আস্তে সায় দিল দেববাণী।

"তোমাকে আমার প্রথম দিনেই কেন ভাল লেগেছিল, বলি। বুঝতে পেরেছিলাম, আমি ও তুমি এক পথের যাত্রী। সে পথের বাইরেকার চেহারা বদলেছে, কিন্তু আসলে তা এক। আমি এ শতাব্দীর প্রথমকার, তুমি মধ্যেকার। কিন্তু আমিও এগিয়ে যাবার যে দুর্দম্য জ্বালা নিয়ে জীবনের পথে একেবারে নিঃসহায় নির্বান্ধব যাত্রা শুরু করেছিলাম, সে জ্বালাই অন্য রূপে তোমাকে হারতে দেয় নি। আমি ভারতবর্ষের আধুনিক যুগের পুরাতন, তুমি পরিণত নূতন।"

"আপনি যে অবস্থায়, যে বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, আমাদের তুলনায় তা আরও ভীষণ। আপনার মত শক্তি আমাদের কোথায়?" দেববাণী বিনীত স্বরে বলল।

"সমাজের অবস্থা নিশ্চয় আরও প্রতিকূল ছিল," সাবিত্রী আম্মা বললেন। "তোমার মা তা খুব ভাল জানেন। দক্ষিণ ভারতে, বিশেষ ক'রে তামিলনাদে, সমাজ অত্যন্ত গোঁড়া ও নিষ্ঠুর ছিল। সেদিক থেকে আমি যা করেছিলাম তা দুঃসাহস বৈকি—তোমাকে ত একদিন সে গল্প করেছি। কিছু একটা মস্ত বড় জিনিস আমাদের ছিল, যা তোমাদের নেই। আমরা এক বড় অগ্নিসম্ভব যুগে বেড়ে উঠেছিলাম। সে ছিল ভাব-বিপ্লবের যুগ, চিত্তশুদ্ধি ও আত্মত্যাগের যুগ। আমি যদি অ্যানি বেসান্তের সংস্পর্শে না আসতাম, তাহ'লে আমার কি পরিণতি হ'ত ভাবতে পারি না। তোমরা বুঝবে না, গান্ধীজির শিষ্যত্ব পাওয়ার মানে কি ছিল সেদিন। আমাদের ক্ষুদ্রত্ব, আমাদের দুর্বলতা, অনেকখানি তিনি দূর ক'রে দিয়েছিলেন। বাংলায় যেমন স্বামীজির সংস্পর্শে এসে একদল সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী গ'ড়ে উঠল, দেশবন্ধুর নেতৃত্বে একদল অসমসাহসী দেশকর্মী, তেমনি গান্ধীজি আমাদের মধ্যে বড় কিছুর আলো এনে দিলেন। তা ছাড়া, স্বদেশীর একটা উদাত্ত মাদকতা ছিল। দেশকে মা বলে জানতে পারা, বিদেশী প্রভুদের আয়ত্ত থেকে তাকে মুক্ত করার স্বপ্ন দেখা, দ্রুত-বেড়ে-যাওয়া প্রত্যক্ষ সংগ্রামে বার বার ঝাঁপিয়ে পড়া, এসবের মধ্যে এমন কিছু ছিল যা আমাদের টেনে নিয়ে গেছে লক্ষ্যের দিকে। তোমরা বেড়ে উঠেছ অন্য যুগে। এ হ'ল প্রভাতের পর নিদাঘ দিনের তপ্ত পূর্বাহ্ণ। ভারতবর্ষে আজ আর কোন জীবন্ত আদর্শ নেই। গণতন্ত্রের এমন কোনও উত্তাপ নেই যা মানুষের মনকে জ্বালিয়ে দিতে পারে, যতক্ষণ-না আমরা গণতন্ত্র থেকে বঞ্চিত হই। তোমরা বেড়ে উঠেছ আত্মত্যাগের যুগে নয়, আত্ম-সম্ভোগের যুগে। গান্ধীজির সব ছিল, তবু তিনি ভিখিরির সাজ গ্রহণ করেছিলেন; আজ আমরা কাউকে ভিখিরি রাখতে রাজী নই। ভেব না, আমি একালের নিন্দে করছি। যা হচ্ছে তা ভালই হচ্ছে, তা হবেই। শুধু বলছি, এ যুগে নীতিবোধ বাঁচিয়ে চলা অনেক বেশী কঠিন।"

বাসন্তী দেবী বললেন, "আপনি ঠিক বলেছেন।"

সাবিত্রী আম্মা ব'লে চললেন, "আমরা আদর্শের তাপে বেড়ে উঠেছিলাম ব'লে এ যুগে যেন একেবারে হারিয়ে গেছি। অনেক সমস্যা, দ্বন্দ্ব আমাদের জীবনেও ছিল, তার বোঝা আমাদের বয়ে বেড়াতে হয়েছে। কিন্তু সংগ্রামের

বন্যা এসে আমাদের জীবনের অনেক জঞ্জাল ধুয়ে দিয়ে গেছে। তবু, দেববাণী, আমরা ব্যক্তিগত ভাবে অনেকেই তীরে এসে পৌছতে পারিনি। তোমাকে বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে, তবুও বলছি, বর্তমান ব্যবস্থায় আমার কিছু করবার ক্ষমতা নিতান্ত সীমাবদ্ধ। রাজনীতি মানেই দলাদলি, ক্ষমতার লড়াই, শক্তি অর্জন করা ও রক্ষা করার জন্যে কুটিল, জটিল সংঘাত। এর মধ্যে যে নিজের স্থান ক'রে নিতে পারে নি, তার ক্ষমতা নেই, সে নিঃসার। দেশ স্বাধীন হবার পর, অনেক যুগ বাদে, আমি প্রথম অনুভব করেছিলাম, আমার আর কিছু করবার নেই। গত ক'বছর ধ'রে এ অনুভূতি আরও বেশী ক'রে আমায় পেয়ে বসেছে।"

"সে কথা কেন বলছেন?" দেববাণী প্রতিবাদ করল। "আপনি আপনার কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে ক'রে যাচ্ছেন। বহু লোক আপনার দ্বারা উপকৃত হয়েছে, এখনও হচ্ছে।"

"নদীকে, দেববাণী, যদি ছোট্ট চৌবাচ্চায় পরিণত ক'র, দু'চার জনের তৃষ্ণা সে মেটাবে, কিন্তু নিজের কাছে সে তার নিঃশেষিত জীবনের ফাঁকি লুকাতে পারবে না।"

বাসন্তী দেবী বললেন, "ফুরিয়ে যেতে সবারই কষ্ট হয়। তবু তা অনিবার্য। আমাদের শাস্ত্রে শেষ হয়ে যাওয়াকে শান্ত হৃদয়ে, উদারতার সঙ্গে গ্রহণ করবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।"

সাবিত্রী আম্মা বললেন, "সে কথাই আমি নিজেকে বলি। চারদিকে জীবনের বিচিত্র বহুবর্ণ ছবি দেখতে পাই। সবচেয়ে যেটা আমার মনকে বিহ্বল করে তা হচ্ছে ভারতবাসীর আত্ম-প্রতিষ্ঠার দুর্দম প্রয়াস। দেখতে পাই সারা দেশে মানুষ জেগে উঠেছে, জীবনের দাবী বেজে উঠেছে বিরাট কলতানে। এর সবটাই সুস্থ, সুশ্রী নয়। অনেক কুৎসিত ক্ষুধা সমাজের গোপন অন্দর থেকে সোজাসুজি চোখের সামনে উঠে এসেছে। আবার এমনও কেউ কেউ আছে, জীবন যাদের কাছে অর্থহীন, যারা কোনও পথের সন্ধান পায় নি। কিন্তু গ্রামে, শহরে, হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত, ভারতবর্ষ যে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। দেখতে পাই আজকালকার মেয়েরা কত নীরব সাহসের সঙ্গে জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করছে। বড় আনন্দ হয়। ভাবি, আজকার এই দেশব্যাপী উন্মেষের জন্যে আমিও হয়ত একবিন্দু কিছু করতে পেরেছি। দুঃখ, ব্যথা, ব্যর্থতা আমাদের ছিল, তোমাদেরও আছে, মানুষের চিরদিন থাকবে; পূর্ণতার প্রয়াস চিরদিন অপূর্ণতায় নিজের অন্তিম দীনতা

আবিষ্কার করবে। কিন্তু তবু পথ চলারই নাম বেঁচে থাকা, অচল হওয়া মানে মরে যাওয়া। (বাসন্তী দেবীর দিকে তাকিয়ে বললেন) উপনিষদে সেই 'চরৈবেতি' শ্লোকগুলির কথা ভাবুন—আদিকাল থেকে মানুষের মূলমন্ত্র, চল, এগিয়ে যাও, লক্ষ্য হ'তে লক্ষ্যান্তরে, এক অপলক সন্ধ্যাতারার আহ্বানে অন্য অনিমেষ নক্ষত্রের পানে।"

বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন সাবিত্রী আম্মা। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিলেন। দেববাণী দেখতে পেল তাঁর ওষ্ঠাধর পাংশু, শুকনো, চোখের নীচে ক্লান্তির কালিমা।

"আপনার শরীরটা ভাল নেই মনে হচ্ছে," সে বলল। "আজ বরং আমরা উঠি।"

"বস, বস," হেসে উঠলেন সাবিত্রী আম্মা। "এ বয়সে শরীর নিয়ে অত মাথা ঘামালে চলে না। বরং একা একা থাকতে হলে আরও খারাপ লাগে।"

বাসন্তী দেবীকে উদ্দেশ ক'রে বললেন, "একদিন একপথে আমরা ভারতবর্ষের জন্যে সংগ্রামে নেমেছিলাম। আজ অন্য পথে, অন্য দিনে দেববাণীরা নেমেছে। ওকে দেখে আমার মনে হয় এ যেন একই নদীর বিচিত্র প্রবাহ। (দেববাণীকে) মনে ক'রো না, আমরা পরাধীন ভারতে রাজনীতি করেছি। দেশকে স্বাধীন করার যে সংগ্রাম তার নাম রাজনীতি নয়। রাজনীতি শুরু হয়েছে দেশ স্বাধীন হবার পর। আজ তাতে সংগ্রাম নেই, আছে কলহ, ঝগড়া, কোলাহল। আজকের আসল কর্তব্য ভারতবর্ষকে গ'ড়ে তোলবার; তোমাদের জীবনকে নানাভাবে পল্লবিত, প্রস্ফুটিত ক'রে তোলবার। নবাগত, অনাগত নাগরিকদের জন্যে সমৃদ্ধতর জীবন-সম্ভার গ'ড়ে তোলবার। ভারতবর্ষে এক মহান নাটকের ওপর যবনিকা উঠেছে, দেববাণী। তাই আজ তোমার মা'র উপস্থিতিতে তোমাকে একটি উপদেশ দিই। যদি দেশের সঙ্গে নাড়ীর যোগ বোধ কর তা হলে এ নাটকের বিরাট মঞ্চে নেমে যাও, এর থেকে দূর থেক না।"

"আপনি আমাকে দেশে ফিরে আসতে বলছেন?"

"ফিরে আসতে শুধু নয়, কাজে লেগে যেতে।"

"আসতে ত চাইছি। কিন্তু দেখুন না, রিসার্চ সেণ্টারের ব্যাপারটা এগোচ্ছে না।"

"ওটা বন্ধ হলেই তোমার সব রাস্তা ফুরিয়ে যাবে না। তবু তুমি ফিরে আসতে পারবে, কাজ করবার সুযোগ পাবে।"

"বাইরে থেকে অনেক বৈজ্ঞানিক দেশে এসে হতাশ হয়ে আবার ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন।"

"তাঁরা পালিয়েছেন। এসে দেখতে পেয়েছেন দেশে মাইনে কম, আরামের অভাব, সম্মানের আরও গুরুতর অভাব। তুমিই একদিন বলেছিলে, দেশে এখন কেবল প্রশাসকদের প্রভুত্ব। কেবল রাজনীতির দাপট। সব মানি। এখনও বহু বৈজ্ঞানিক কাজ পাচ্ছে না, যারা পাচ্ছে তাদের অন্তরে অতৃপ্তি, অসন্তোষ। এ সব মেনে নিলেও আসল কথাটা অনুক্ত থেকে যায়। ভারতবর্ষ গণতন্ত্রের দেশ। তাকে আমরা সবাই যেমনি গড়ব, সে তেমনি তৈরী হবে। সুতরাং পালিয়ে যাবার কোনও মানে হয় না। যারা পালায় তারা হয় ভীরু, নয় স্বার্থপর। তোমরা সবাই দেশে এসে যদি নিজেদের মর্যাদা আদায় ক'রে না নাও, তা হলে কেউ তা তোমাদের দেবে না।"

"তা হলে ত রাজনীতি করতে হয়," দেববাণী বলল।

"করতে যদি হয় ত করবে," জোর দিয়ে বললেন সাবিত্রী আম্মা। "বিজ্ঞানের, বিদ্যার মর্যাদা স্থাপনের জন্যে যে-রাজনীতি তাতে কোনও দোষ নেই, দেববাণী।"

"সত্যি কথা বলতে কি, ফিরে আসতে কেমন যেন ভয় করে।"

"অর্থাৎ যে মর্যাদা, অর্থ, কাজের সুযোগ বিদেশে পাচ্ছ, তা যদি দেশে না পাও! তা ত পাবেই না। ওরা অনেক এগিয়ে গেছে। আমরা মাত্র আরম্ভ করেছি। কিন্তু তৈরী সুযোগ পাওয়ার চেয়ে সুযোগ তৈরী ক'রে নেওয়াতে কি বেশী আনন্দ নেই?"

"আছে, যদি তৈরী ক'রে নেওয়া যায়। সে সুযোগেরও যে অভাব। শুনতে পাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি রাজনীতির অন্ধকারে জ্ঞানের আলো হারাতে বসেছে। একদিকে শিক্ষকরা ক্লান্ত, সমাজে উপেক্ষিত, অন্যদিকে ছাত্ররা অশান্ত, বিক্ষুব্ধ। রাজনৈতিক নেতারা বিদ্যায়তনেও নিজেদের প্রভাব বিস্তার করেছেন। দলাদলির মধ্যে ভিড়তে না পারলে ভাল ক'রে পড়াবার সুযোগ পর্যন্ত পাওয়া যায় না।"

"হয়ত তাই। সৌভাগ্যক্রমে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। তবু দেখতে পাই, মন্ত্রীদের ডক্টরেট দেবার জন্যে তাদের মধ্যে যেন প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা লেগে গেছে। গলদ অনেক আছে, কিন্তু, দেববাণী, সদিচ্ছা, সম্ভাবনারও অভাব নেই। এ আমি জোর দিয়ে বলতে পারি।

আবিষ্কার করবে। কিন্তু তবু পথ চলারই নাম বেঁচে থাকা, অচল হওয়া মানে মরে যাওয়া। (বাসন্তী দেবীর দিকে তাকিয়ে বললেন) উপনিষদে সেই 'চরৈবেতি' শ্লোকগুলির কথা ভাবুন—আদিকাল থেকে মানুষের মূলমন্ত্র, চল, এগিয়ে যাও, লক্ষ্য হ'তে লক্ষ্যান্তরে, এক অপলক সন্ধ্যাতারার আহ্বানে অন্য অনিমেষ নক্ষত্রের পানে।"

বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন সাবিত্রী আম্মা। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিলেন। দেববাণী দেখতে পেল তাঁর ওষ্ঠাধর পাংশু, শুকনো, চোখের নীচে ক্লান্তির কালিমা।

"আপনার শরীরটা ভাল নেই মনে হচ্ছে," সে বলল। "আজ বরং আমরা উঠি।"

"বস, বস," হেসে উঠলেন সাবিত্রী আম্মা। "এ বয়সে শরীর নিয়ে অত মাথা ঘামালে চলে না। বরং একা একা থাকতে হলে আরও খারাপ লাগে।"

বাসন্তী দেবীকে উদ্দেশ ক'রে বললেন, "একদিন একপথে আমরা ভারতবর্ষের জন্যে সংগ্রামে নেমেছিলাম। আজ অন্য পথে, অন্য দিনে দেববাণীরা নেমেছে। ওকে দেখে আমার মনে হয় এ যেন একই নদীর বিচিত্র প্রবাহ। (দেববাণীকে) মনে ক'রো না, আমরা পরাধীন ভারতে রাজনীতি করেছি। দেশকে স্বাধীন করার যে সংগ্রাম তার নাম রাজনীতি নয়। রাজনীতি শুরু হয়েছে দেশ স্বাধীন হবার পর। আজ তাতে সংগ্রাম নেই, আছে কলহ, ঝগড়া, কোলাহল। আজকের আসল কর্তব্য ভারতবর্ষকে গ'ড়ে তোলবার; তোমাদের জীবনকে নানাভাবে পল্লবিত, প্রস্ফুটিত ক'রে তোলবার। নবাগত, অনাগত নাগরিকদের জন্যে সমৃদ্ধতর জীবন-সম্ভার গ'ড়ে তোলবার। ভারতবর্ষে এক মহান নাটকের ওপর যবনিকা উঠেছে, দেববাণী। তাই আজ তোমার মা'র উপস্থিতিতে তোমাকে একটি উপদেশ দিই। যদি দেশের সঙ্গে নাড়ীর যোগ বোধ কর তা হলে এ নাটকের বিরাট মঞ্চে নেমে যাও, এর থেকে দূর থেক না।"

"আপনি আমাকে দেশে ফিরে আসতে বলছেন?"

"ফিরে আসতে শুধু নয়, কাজে লেগে যেতে।"

"আসতে ত চাইছি। কিন্তু দেখুন না, রিসার্চ সেণ্টারের ব্যাপারটা এগোচ্ছে না।"

"ওটা বন্ধ হলেই তোমার সব রাস্তা ফুরিয়ে যাবে না। তবু তুমি ফিরে আসতে পারবে, কাজ করবার সুযোগ পাবে।"

"বাইরে থেকে অনেক বৈজ্ঞানিক দেশে এসে হতাশ হয়ে আবার ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন।"

"তাঁরা পালিয়েছেন। এসে দেখতে পেয়েছেন দেশে মাইনে কম, আরামের অভাব, সম্মানের আরও গুরুতর অভাব। তুমিই একদিন বলেছিলে, দেশে এখন কেবল প্রশাসকদের প্রভুত্ব। কেবল রাজনীতির দাপট। সব মানি। এখনও বহু বৈজ্ঞানিক কাজ পাচ্ছে না, যারা পাচ্ছে তাদের অন্তরে অতৃপ্তি, অসন্তোষ। এ সব মেনে নিলেও আসল কথাটা অনুক্ত থেকে যায়। ভারতবর্ষ গণতন্ত্রের দেশ। তাকে আমরা সবাই যেমনি গড়ব, সে তেমনি তৈরী হবে। সুতরাং পালিয়ে যাবার কোনও মানে হয় না। যারা পালায় তারা হয় ভীরু, নয় স্বার্থপর। তোমরা সবাই দেশে এসে যদি নিজেদের মর্যাদা আদায় ক'রে না নাও, তা হলে কেউ তা তোমাদের দেবে না।"

"তা হলে ত রাজনীতি করতে হয়," দেববাণী বলল।

"করতে যদি হয় ত করবে," জোর দিয়ে বললেন সাবিত্রী আম্মা। "বিজ্ঞানের, বিদ্যার মর্যাদা স্থাপনের জন্যে যে-রাজনীতি তাতে কোনও দোষ নেই, দেববাণী।"

"সত্যি কথা বলতে কি, ফিরে আসতে কেমন যেন ভয় করে।"

"অর্থাৎ যে মর্যাদা, অর্থ, কাজের সুযোগ বিদেশে পাচ্ছ, তা যদি দেশে না পাও! তা ত পাবেই না। ওরা অনেক এগিয়ে গেছে। আমরা মাত্র আরম্ভ করেছি। কিন্তু তৈরী সুযোগ পাওয়ার চেয়ে সুযোগ তৈরী ক'রে নেওয়াতে কি বেশী আনন্দ নেই?"

"আছে, যদি তৈরী ক'রে নেওয়া যায়। সে সুযোগেরও যে অভাব। শুনতে পাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি রাজনীতির অন্ধকারে জ্ঞানের আলো হারাতে বসেছে। একদিকে শিক্ষকরা ক্লান্ত, সমাজে উপেক্ষিত, অন্যদিকে ছাত্ররা অশান্ত, বিক্ষুব্ধ। রাজনৈতিক নেতারা বিদ্যায়তনেও নিজেদের প্রভাব বিস্তার করেছেন। দলাদলির মধ্যে ভিড়তে না পারলে ভাল ক'রে পড়াবার সুযোগ পর্যন্ত পাওয়া যায় না।"

"হয়ত তাই। সৌভাগ্যক্রমে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। তবু দেখতে পাই, মন্ত্রীদের ডক্টরেট দেবার জন্যে তাদের মধ্যে যেন প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা লেগে গেছে। গলদ অনেক আছে, কিন্তু, দেববাণী, সদিচ্ছা, সম্ভাবনারও অভাব নেই। এ আমি জোর দিয়ে বলতে পারি।

শিক্ষার সুযোগ ও আয়োজন বৃদ্ধি পেয়েছে। উপযুক্ত মানুষের পক্ষে ভারতবর্ষ এখন বিরাট কর্মভূমি। চল্লিশ কোটি মানুষ জেগে উঠেছে, তাদের মনের চাহিদা একবার ভেবে দেখেছ? যেদিকে তাকাও সেদিকে দেখবে করবার কত কিছু আছে, শুধু লোক নেই, সংকল্প নেই, আদর্শের দৃঢ়তা নেই।"

সাবিত্রী আম্মা হঠাৎ অন্যমনস্ক হলেন। কি যেন গভীরভাবে ভেবে দেখলেন। মুখে এমন একটা ব্যথার কালো ছায়া পড়ল যা দেববাণী আগে কখনও দেখে নি।

একটু পরে মৃদু, ক্লান্ত স্বরে তিনি বললেন, "আমরা পুরাতন লোক, ভারতবর্ষের যে প্রভাব আমাদের মনে, সে প্রভাব এ যুগে না থাকাই স্বাভাবিক। আমি তো বলেছি, এ যুগের অনেক কিছু বুঝতে পারি নে। তবে মাঝে মাঝে মনে হয়, আজকের এই জগাখিচুড়ি বেশী দিন থাকবে না। সংগ্রাম আজ থেমে গেছে; আবার শুরু হবে। কারা করবে জানি নে, তবে কিসের সংগ্রাম আগামী কালের জন্যে তৈরী হচ্ছে, তা যেন বুঝতে পারি। আমি চিরদিন লড়েছি বলেই জানি, তোমরাও লড়বে, তোমরা যদি না লড়, তোমাদের পরের যুগ লড়বে। দেশ গঠনের সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন আসবে, গঠন কাদের জন্যে, এর মধ্যে জনসাধারণের স্থান কোথায়? আজ আমরা তাদের দিচ্ছি; কাল তারা বলবে, আমাদের ভাল আমরা করব, তোমাদের কাছে হাত পেতে নেব না। আজ আমাদের উচ্চারিত আদর্শে ও দ্বিধাদুর্বল কর্মে বড় তফাৎ থেকে যাচ্ছে। কিন্তু দেশ যে জেগে উঠেছে তাতে ত সন্দেহ নেই! আমরা থেমে গেলে, অন্যেরা চলবে। একসঙ্গে যদি না চলা যায়, ভিন্নপথে চলবে দেশের ভিন্ন ভিন্ন মানুষের দল: সংঘাত হবে, আবার সমন্বয়। এ সময় যার মনে আদর্শের আলো পড়েছে তার কর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ। বিশেষ ক'রে যারা গড়তে চায়, পথ তৈরী করতে চায়, জীবনকে পূর্ণতর করা যাদের স্বপ্ন। যারা ক্ষমতা-প্রাপ্ত, আত্মতুষ্টদের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে সামান্য প্রসাদে তৃপ্ত হ'তে চায় না, তাদের। যারা অনেকের জন্যে, নতুন মানুষের জন্যে, জীবনের দরজা খুলে দিতে চায়, তাদের কাজ আজ ভারতবর্ষে, দেববাণী।"

"করবার যে অনেক কিছু আছে তা আমারও মনে হয়েছে।"

"তা হলে লেগে যাও। তোমার গোকুলভাইকে মনে আছে? একদিন এখানেই তাঁকে দেখেছিলে?"

"আছে।"

"তুমি একদিন তাঁর কাছে যেয়ো। এক অন্যরকম মানুষ দেখবে।" কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন সাবিত্রী আম্মা। পরে, বড় নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন, "আরও একটা কথা তোমায় বলি। তোমার জীবনের সমস্যা আমি যা একটু বুঝতে পেরেছি তার সমাধানও ভারতবর্ষেই সম্ভব।"

দেববাণী নিঃশব্দে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল।

সাবিত্রী আম্মা বললেন, "সংসারটা সবার জন্যে শান্তির নীড় নয়, দেববাণী। কেমন যেন ওলট-পালট হয়ে যায় আমাদের গোছাল জীবন, কোথা থেকে দম্‌কা হাওয়া এসে সব তচ্‌নচ্‌ ক'রে দেয়। যাদের হয় না, যারা রুটিন-বাঁধা বেঁচে থেকে জীবনের আস্বাদ না পেয়েই মরে যায়, তারা ভাবে সব জীবনই বুঝি তাদের মত রুটিন মেনে চলবে। তারা জানে না, বেঁচে থাকা যেমন দীর্ঘ, জীবনের মাদক আস্বাদ তেমনি ক্ষণিক। আমার এই দীর্ঘ বেঁচে-থাকায় জীবনের আস্বাদ যে ক'বার পেয়েছি আজও পরিষ্কার মনে আছে। সেই যেদিন অ্যানি বেসান্তের কাছে দাঁড়িয়ে তাঁর আশীর্বাদে নতুন ক'রে বাঁচবার সুযোগ পেলাম, সেদিন জীবনের প্রথম উন্মাদনা টের পেলাম। আর এক দিন মাদুরাই শহরে গান্ধীজির পায়ে প্রণাম করবার সময় জীবনকে নতুন ক'রে পেয়েছিলাম। স্বদেশী ক'রে প্রথম জেলে যাবার দিন জীবন বড় আলোক-উজ্জ্বল মনে হয়েছিল। তাই ভাবি, তিলে তিলে বেঁচে থাকা যায়, কিন্তু জীবন উপলব্ধি করা যায় না। সে সুযোগ কদাচ কখনও আসে। এলে তাকে ফেরান উচিত নয়। কি বল তুমি?"

"আপনি বলুন, আমি শুনছি।"

"অনেক ত বললাম; আর কি বলব। ভারতবর্ষের একটা মহান গুণ হ'ল সে সব কিছুকে গ্রহণ করে, বিভিন্ন বিরোধে সমন্বয় আনবার চেষ্টা করে। তাই বলছিলাম, দ্বন্দ্ব মেটাবার মত পরিবেশ এদেশে যেমন, অন্যত্র বোধ করি কোথাও তেমন নেই। তবে একটা কথা মনে রেখ। জীবন আমাদের সঙ্গে সর্বদাই একটু ছলনা করে। আমরা যা হতে চাই কেউ তা হতে পারি নে। তার চেয়ে অন্য রকম, ছোট বা বড় হয়ে যাই। তুমি আদর্শের পেছনে সারা জীবন ঘুরে ঘুরে অন্তিম সায়াহ্নে দেখতে পাবে, যা পেলে তার জন্যে এত ঘোরাঘুরির দরকার ছিল না। যে প্রেম না পেয়ে তুমি অস্থির, তা পেয়ে মনে হবে কোথাও বুঝি একটু ঠকে গেলে। যে ব্যথা এড়াবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা কর, সে ব্যথা যদি পেতেই হয় ত দেখবে, এমন অসহ্য তা নয়। বাস্তবকে কল্পনার রসে

মজিয়ে আমরা অনেক বড় ক'রে ভাবনার রাজ্য গ'ড়ে তুলি। তুমিও যে সমস্যার কথা ভাবছ তার অনেকখানি হয়ত তোমার ভাব-বিলাস। বাস্তবে যদি তাকে পরিপূর্ণ উপস্থিত না দেখ, বোধ করি তুমি দুঃখই পাবে, কেননা তোমার ভাবনা-বিলাসে বাধা পড়বে।"

হঠাৎ সাবিত্রী আম্মা সতর্ক হয়ে কান পাতলেন। দরজা খুলে হাই হিলের শব্দ তুলে সরোজা নিজের আগমন ঘোষণা করল। একটু পরে দ্বারপথে এসে সে দাঁড়াল।

সাবিত্রী আম্মা বললেন, "সরোজা, ইনি দেববাণীর মা।"

সরোজা কোনও মতে হাত তুলে নমস্কার করল।

দেববাণীকে লক্ষ্য ক'রে বলল, "খবরটা ঠিক কি না যাচাই করেছেন?"

"দরকার আছে কি?" দেববাণী হেসে প্রশ্ন করল।

"তা আপনি বুঝবেন।"

"ও জমি না পেলে রিসার্চ সেণ্টার হবে না, একথা তুমি ভাবলে কি ক'রে?"

"এমনি ভাবলাম।"

"অন্য জমি নেই?"

"সে জন্যে আপনাকে বছরখানেক দিল্লী শহরে অবস্থান করতে হবে।"

"তাই না হয় করব। আমি ত ভাবছি চাকরি নিয়ে দিল্লী চলে আসব। যতদিন না ইনস্টিটিউট গ'ড়ে ওঠে ততদিন নড়ব না।"

"বিদেশে বড় চাকরি করছেন তাই দেশে এসে খাতির পাচ্ছেন। দেশে ফিরে আসুন, দেখবেন মানুষের দাম কি সস্তা। শ্রীবাস্তব সাহেব পাঁচ ঘণ্টা বাইরে দাঁড় করিয়ে পিয়ন দিয়ে বলে পাঠাবেন, আজ দেখা হবে না।"

তার কথা বলার ধরনে দেববাণী হেসে উঠল।

বলল, "পাঁচ ঘণ্টা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবার লোক আমি নই।"

সরোজা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। মাকে বলল, "তোমাকে না ডাক্তার চুপচাপ শুয়ে থাকতে বলেছেন? খুব বুঝি কথা বলছ?"

সাবিত্রী আম্মা জবাব দিলেন না।

সরোজা বলে উঠল, "যাদের আর কিছু করবার নেই তারাই নিজের কথা বলবার লোভ সামলাতে পারে না। শূন্য কলস বড় বেশী বাজে। তোমার কাছে কাল থেকে ভিজিটর্স বারণ।"

কারুর পানে না তাকিয়ে সে দ্রুতপদে অন্য ঘরে চলে গেল।

সাবিত্রী আম্মাকে বিবর্ণ বিব্রত দেখে দেববাণী বলল, "আপনাকে বড় ভালবাসে সরোজা।"

"ওকে নিয়ে—"

তাঁকে থামিয়ে দেববাণী বলল, "ওর মনে গলদ নেই। কিন্তু সত্যি আমাদের অন্যায় হয়ে গেছে। আপনি যে অসুস্থ তা ত বলেন নি।"

"ও কিছু নয়। প্রেশারটা কিছুদিন থেকেই বেশী যাচ্ছে।"

"তা হলে আপনার পূর্ণ বিশ্রাম দরকার।"

"বিশ্রামেই ত আছি।"

"আজ আমরা আসি।"

বাসন্তী দেবী উঠে দাঁড়ালেন, সাবিত্রী আম্মা দাঁড়িয়ে তাঁর হাত নিজের হাতে নিলেন। হেসে বললেন, "আর একদিন আসবেন। আজ ত আমিই কেবল বললাম। আর একদিন আপনার কথা শুনব।"

যাবার সময় দেববাণীকে বললেন, "ডাঃ বসু এলে একদিন নিয়ে এস।"

"আসব", কথা দিল দেববাণী। "নিশ্চয় আসব।"

পরের দিন সকালে সংবাদপত্র খুলে প্রথম পৃষ্ঠার দক্ষিণ প্রান্তে দেববাণী দেখতে পেল পার্লামেন্টের সদস্য সাবিত্রী আম্মা মধ্যরাত্রে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে সরকারী নার্সিং হোমে স্থানান্তরিত হয়েছেন। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

সেদিন ছিল বুধবার। শুক্রবার অপরাহ্ণে সাবিত্রী আম্মার মৃত্যু হ'ল।

পনর

দুটো দিন বড় ব্যস্ত ছিল দেববাণী। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করছেন, তার প্রুফ দেখতে হ'ল; মাদ্রাজে আসন্ন বক্তৃতার খসড়া তৈরীর কাজও সে আরম্ভ ক'রে দিল। হিমাদ্রির কেব্‌ল্ এসে গেল, সে আসছে, জেনিভায় নেমে খোকনকে নিয়ে আসবার চেষ্টা করবে। ওরা এলে বাসস্থানের পরিবর্তন দরকার, তাই দেববাণী কাছাকাছি একটা ছোট ফ্ল্যাটের খোঁজ শুরু করল। হিমাদ্রির জন্য ভাবনা নেই, দিল্লীতে তার জানা-চেনা অনেক আছে, তা ছাড়া হোটেল ত আছেই। মা, দেবকুমার ও দেববাণী তিনজনের জন্যে দু'খানা ঘর অবশ্য দরকার; তা ছাড়া, শিহরিত দেববাণী ভাবল, হিমাদ্রিও অনেকটা সময় নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে কাটাবে; একটু নির্জনতা চাই।

সংবাদপত্রে সাবিত্রী আম্মার হৃদ্‌রোগের খবর প'ড়ে দেববাণী ফোন করে-ছিল, জবাব পায় নি। বিকেলে সে নার্সিং হোমে গিয়ে খবর করল। সাবিত্রী আম্মার ঘরের বাইরে অনুচিত ভিড় জমে আছে, দেখে দেববাণী রীতিমত বিস্মিত হ'ল। হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত রোগীকে একেবারে নিঃশব্দ শান্ত পরিবেশে রাখা দরকার। সে দেখল, জনকুড়ি লোক বারান্দায় জড়ো হ'য়ে নানা বিষয়ে সরব আলোচনার পীড়াদায়ক ঐকতান তুলেছে। ভিড় বাড়াবার ইচ্ছে হ'ল না দেববাণীর। সাবিত্রী আম্মার ঘরের দরজার কাছে দু'চার মিনিট সে দাঁড়াল, কি করবে ভেবে না পেয়ে, তিনি কেমন আছেন জানবার আশায়। দেখল, ঘরের মধ্যেও প্রয়োজনের চেয়ে বেশী লোক। তাকে দরজায় দেখে একজন নার্স এগিয়ে এসে বলল, ভেতরে আসার চেষ্টা যেন সে না করে, তাতে রোগীর অসুবিধা হবে।

দেববাণী আস্তে বলল, "ভেতরে আমি যাচ্ছি না। উনি কেমন আছেন?"

"কিছু বলা যায় না এখনও।"

"ওঁর মেয়ে সরোজা আছে এখানে।"

"আছে।"

"তাকে একটু ডেকে দিন। বলুন, দেববাণী ডাকছে।"

একটু পরে সরোজা বাইরে এল। তাকে দেখে বিস্মিত হল দেববাণী। অনিদ্রায় তার মুখ ম্লান, চোখ ক্লান্ত ; গৌরবর্ণ দিনের শেষ আলোর মত মলিন।

সরোজার মুখচোখের উগ্রতা আজ যেন তাকে না বলেই ছুটি নিয়েছে।

তাকে মনে হচ্ছে শান্ত ক্লান্ত চিন্তিত একটি দক্ষিণী তরুণী।

দেববাণীকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল সরোজা।

সরোজা কাছে আসতে দেববাণী তার হাত ধরল। হাত ছাড়িয়ে নিল না সরোজা।

"আমি আজ কাগজে দেখলাম। কখন অসুস্থ হলেন ?"

"রাত্রি একটার পর।"

"কাল সন্ধ্যায় অত কথা বলা ঠিক হয় নি। আমি একেবারে বুঝতে পারি নি।"

সরোজা কিছু বলল না।

"এখন কেমন ?"

"ভাল নয়।"

"ডাক্তাররা কি বলেন ?"

"একটা বড় ও একটা ছোট এ্যাটাক হয়ে গেছে। আবার যদি বড় এ্যাটাক হয় তাহ'লে বিপদ্।"

"তোমার বাবা এসেছেন ?"

"আজ রাত্রে আসছেন বোধ হয়।"

"এত ভিড় কেন ?"

"আমার মা একজন বিখ্যাত মহিলা।"

"ভিড় জমতে দেওয়া উচিত নয়। এরা ত আলাপ-আলোচনার আসর খুলে বসেছে।"

"এঁরা বেশির ভাগ মার এককালের ও বর্তমানের রাজনৈতিক সহকর্মী।"

"ওঁদের চলে যেতে বলা যায় না ?"

"মাকে ডাক্তাররা ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। জেগে থাকলে তিনিও চাইতেন, এঁরা থাকুন। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত থাকুন।" তীক্ষ্ণ ধারাল হাসি ফুটে উঠল সরোজার ওষ্ঠাধরে।

একটু ইতস্তত করে দেববাণী বলল, "তুমি ছুটি নিয়েছ ?"

সরোজা বড় বড় চোখে সোজা তাকাল দেববাণীর দিকে।

বলল, "ছুটি না নিয়েই কামাই করছি।"

পরের দিন দেববাণী মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। যথেষ্ট সৌজন্যের সঙ্গে তিনি তাকে গ্রহণ করলেন। কথাবার্তায় কিন্তু দেববাণী খুব খুশি হ'ল না। পরিষ্কার ভাষায় মন্ত্রী কিছু বললেন না, তথাপি দেববাণী বুঝল বিদেশী সাহায্যের প্রস্তাবে সরকারী সম্মতি অনিশ্চিত। মন্ত্রীমহাশয় দেববাণীকে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও গবেষণা সম্প্রসারণের জন্যে সরকারী উদ্যোগ যে ব্যাপক হয়ে উঠেছে সে কথাটা বার বার বললেন। দশ-বারটি জাতীয় গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে। উচ্চতর টেকনিক্যাল শিক্ষার জন্যে কেন্দ্রীয় ইনস্টিটিউট দু'টি ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, দু'টি আরও হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক শিক্ষা বিস্তারে বিদেশী সহযোগিতার দরকার, তা গ্রহণে সরকারের আপত্তি ত নেইই, বরং আগ্রহ আছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে, বিদেশী সাহায্য সরকারের পক্ষেই গ্রহণ করা সুবিবেচনার কাজ। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বিদেশী সাহায্য নিয়ে গঠনে নীতিমূলক আপত্তি নেই; কিন্তু প্রত্যেকটি প্রস্তাবকে যাচাই ক'রে দেখতে হবে সত্যিই তার প্রয়োজন আছে কি না। দেশের বিত্ত অপ্রচুর, তার অপচয় যেমন অবাঞ্ছনীয়, একই উদ্যোগের প্রতিলিপি তেমনি পরিহার্য। তাছাড়া, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাইরে কোনও বড় কিছু হঠাৎ করতে যাওয়া সব সময় সহজ হয়ে ওঠে না।

দেববাণী বুঝল রিসার্চ সেণ্টারের ব্যাপারটি বেশ শক্ত ক'রে আটকা প'ড়ে গেছে। দু'চারটে প্রশ্ন ক'রে ঠিক কোথায় বাধা দেখা দিয়েছে জানবার চেষ্টা করল। সুবিধে করতে পারল না।

মন্ত্রীমহাশয় সাগ্রহে দেববাণীর নিজস্ব কাজকর্মের খবর নিলেন। দেববাণী দেখল, বিজ্ঞানের ছাত্র না হয়েও বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহ প্রচুর, সাধারণ জ্ঞান প্রশংসার যোগ্য। পৃথিবীর অগ্রসর দেশগুলিতে বড় বড় কাজকর্মের খোঁজখবরও তিনি বেশ রাখেন।

দেববাণীর কর্মজীবনের কিছুটা পরিচয় পেয়ে তিনি বললেন, "আপনি কি দেশে ফিরে আসতে চান?"

দেববাণী সবিনয়ে উত্তর দিল, "আমাদের ইনস্টিটিউট তৈরী হ'লে আসতেই হবে।"

"না হ'লে আসবার ইচ্ছে নেই?"

"ঠিক বলতে পারি নে।"

"যদি আসতে তৈরী থাকেন, দেশে ভাল কাজকর্মের সুযোগ সম্ভবতঃ আপনাকে ক'রে দেওয়া যায়।"

ধন্যবাদ জানিয়ে দেববাণী জানতে চাইল, কি ধরনের সুযোগ পাওয়া সম্ভব।

মন্ত্রীমহাশয় সাধারণ ভাবে ভারতবর্ষে নতুন-তৈরী বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের সুযোগ উল্লেখ করলেন।

"যদি কিছু না মনে করেন, আমি দু'একটা স্পষ্ট খবর পেতে চাই।"

"কি রকম খবর?"

"আমি দেশে এলে সন্তোষজনক কাজের ব্যবস্থা আপনি ক'রে দিতে পারবেন?"

"তা নির্ভর করবে, প্রথমত, সন্তোষজনক বলতে আপনি কি বোঝেন, ও, দ্বিতীয়ত, যখন আপনি আসবেন তখন আমাদের হাতে কি থাকে না থাকে, তার ওপর।"

দেববাণী চুপ ক'রে গেল।

তিনি বললেন, "এমনি ক'রে ত কাজ হয় না! আপনি যদি দেশে কাজ করতে চান, আমাদের লিখুন, কি ধরনের কাজ আপনি চান, আমরা ক্ষেত্র-বিশেষে আপনার জন্যে কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারব।"

একটু থেমে প্রশ্ন করলেন, "কত টাকা মাইনে হলে আপনার চলবে?"

"এখনও ভেবে দেখিনি," উত্তর দিল দেববাণী। "পরে জানাতে পারি।"

"তাই করবেন।"

"আপাততঃ, রিসার্চ সেণ্টার প্রস্তাবটা আপনি অনুমোদন করছেন না, মনে হচ্ছে।" দেববাণী মরীয়া হ'য়ে বলল।

"তা ত বলিনি," তিনি শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন। "শুধু বলেছি এ ব্যাপারটা চট্ ক'রে হবার নয়। আপনি চাইছেন দু'তিন সপ্তাহে আমরা 'হ্যাঁ' বলি। সেটা বড় শক্ত কাজ হবে মনে হচ্ছে। সব দিক ভেবেচিন্তে আমরা হয়ত অনুমোদন করতেও পারি। কিন্তু একটু সময় নেবে।"

অসন্তুষ্ট মন নিয়ে দেববাণী ফিরে এল বাসায় বিকেল বেলা। যা হবার নয় তার পেছনে পণ্ডশ্রমের কোনও মানে নেই। আমার ছুটি শেষ হয়ে আসছে। হিমাদ্রিও এ নিয়ে তদ্বিরের জন্যে অনিশ্চিত কাল দেশে ব'সে থাকতে পারবে না। সুতরাং এ যাত্রা রিসার্চ ইনষ্টিটিউট তৈরী করার সঙ্কল্প এখানে সমাপ্ত মনে হচ্ছে। ভবিষ্যতে নতুন সুযোগ হয়ত আসবে, হয়ত আসবে না। দেববাণী

ভেবে যুগপৎ বিরক্ত ও বিস্মিত হ'ল যে, দেশে সবাই তাকে 'চাকরি' করবার জন্যে ডাকছে, নিজের উদ্যোগে বড় কিছু করার উৎসাহ দিচ্ছে না। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন সাবিত্রী আম্মা; তাঁর কাছে দেববাণী সত্যিকারের উৎসাহ পেয়েছিল। তিনি বৈজ্ঞানিক নন। বিধিনিষেধ বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য ক'রে জীবনপথে নিজে এগিয়েছিলেন ব'লে তাঁর বার্ধক্য-শান্ত রক্ত এখনও অ্যাডভেঞ্চারের নামে মেতে উঠত।

সাবিত্রী আম্মার কথা মনে পড়তে দেববাণীর মন বিষণ্ণ হয় গেল। মাত্র একদিন আগে দেখা তাঁর শ্রান্ত-স্মিত মুখখানা, তাঁর আন্তরিকতায় আবেদন-মুখর কথাগুলি বার বার মনে পড়তে লাগল। সত্যিই কি সাবিত্রী আম্মা ও দেববাণী একই নদীর বিভিন্ন ধারা? যে জীবন-সংগ্রাম ওরা আরম্ভ করেছিলেন, সত্যিই কি আমরা তাকে পূর্ণতর বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। দেশে এসে কাজে লেগে যাবার উপদেশ দেববাণীর কানে বার বার বেজে উঠল। সত্যিই কি আমার, আমাদের সবাকার, আসল কর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ? "বিদেশে তুমি টাকা পাবে, কাজ পাবে, স্বীকৃতিও হয়ত জোর ক'রে আদায় করতে পারবে, কিন্তু নিজের ব'লে কিছু খুঁজে পাবে না। ওরা আমাদের শ্রদ্ধা করে না দেববাণী, এমন কি গালিও দেয় না। ওরা চায় আমাদের উপেক্ষা করতে, দয়া করতে।" কথাগুলি দেববাণী সত্যি ব'লে মানতে পারল না, আবার একেবারে মিথ্যে ব'লে উড়িয়েও দিতে পারল না।

মনে পড়ল সাবিত্রী আম্মার দৃঢ়বিশ্বাস কথা, "ভারতবর্ষে তোমার জীবনের দ্বন্দ্ব কেটে যাবে।" আমার জীবনের অমিল কি দেশে এলে মিলবে? সাবিত্রী আম্মার জীবনের অমিল কি কোনও দিন মিলেছিল? সে অমিলের মূর্তিমতী অবদান সরোজা। সে কি কোনও দিন কোনও কিছুর সঙ্গে মিলে যাবে?

দেববাণী বাড়ী ফিরে দেখল, বাসন্তী দেবী চিঠি লিখছেন। দু'চারটে কথা হ'ল। বাসন্তী দেবী জানতে চাইলেন মন্ত্রীমশাই কি বললেন। দেববাণী বলল, আশাপ্রদ কিছু নয়। মা জানতে চাইলেন, আর কি কি ক'রে এল সে সারাদিন। দেববাণী সংক্ষেপে উত্তর দিল। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে সে কলঘরে ঢুকল। বাসন্তী দেবী বললেন, "চটপট হাতমুখ ধুয়ে আয়। চা করছি।"

চা খাবার পর দেববাণী মাদ্রাজে বক্তৃতার খসড়া নিয়ে বসল।

ঘণ্টাখানেক পর এসে উপস্থিত হ'ল লিওনার্ড হোপ।

আজ হোপকে পেয়ে দেববাণীর ভালই লাগল। মনটা হালকা কথা বলার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। দেববাণী দেখল, আরও একটা ইচ্ছে মনের মধ্যে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। দিগন্ত-বিস্তৃত রাজপথ দিয়ে ষাট মাইল বা আশি মাইল গতিতে গাড়ী চলবে, আর দেববাণীর মন থেকে জটিল-গ্রন্থি চিন্তা সব যাবে হাওয়ার সঙ্গে শূন্যে মিলিয়ে।

"আপনি বড্ড ব্যস্ত আছেন।" লিওনার্ড বলল, "দু'বার খোঁজ ক'রে দেখা পাই নি।"

"সেজন্যে বড় দুঃখিত। আপনি খোঁজ করেছিলেন, খবর পেয়েছি। ব্যস্ত আর কৈ ? অকাজে ঘোরাঘুরি।"

"শুনলাম, রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্ল্যানটা অনেকখানি এগিয়েছে।"

"কোন্ আশাবাদী আপনাকে খবর দিল ? প্ল্যান ত সমাপ্ত। কিন্তু কাগজে-কলমে। বাস্তবে রূপায়িত হবার আশা কম।"

"আমি এরকম কিছু আগেই আন্দাজ করেছিলাম। আপনি দুঃখ পাবেন ভেবে বলিনি।"

"যাক গে ওসব কথা। এ নিয়ে আর কথাবার্তা ভাল লাগে না। শুনে-ছিলাম, আপনি দেশে যাচ্ছেন। তার কি হ'ল ?"

"শীতটা কাটুক। শীতের দিল্লী পৃথিবীর সবচেয়ে মনোরম শহর।"

দেববাণীর মন হাল্কা কিছুর জন্যে হঠাৎ যেন মরীয়া হ'য়ে উঠল। নিজের চপলতায় আশ্চর্য হল, নিজেকে বিস্মিত ক'রে, প্রশ্ন হেনে বসল :

"আইরীণ বলছিল ভারতীয় মেয়েদের আপনার ভাল লাগে। যদি ধৃষ্টতা মাপ করেন, এদেশের কোন্ মেয়েদের আপনার ভাল লাগে, মিঃ হোপ ?"

"তার মানে ?"

"কেবল ভারতীয় মেয়ে বললে ত কিছু বোঝায় না! ভারতবর্ষে অনেক ধরনের মেয়ে আছে। পাঞ্জাবী মেয়ে আর বাঙালী মেয়ে কি এক ? আবার দক্ষিণ ভারতের মেয়েরা আলাদা। মারাঠী মেয়ে ও গুজরাটী মেয়েতে প্রভেদ অনেক। রাজস্থানী মেয়ে আর আসামের খাসিয়া মেয়ে যেন দু' দেশের কন্যা। তা ছাড়া, ভারতে সাবেকী মেয়ে আছে, অল্প-আধুনিক, অতি-আধুনিক মেয়েও আছে। স্ল্যাক্‌স্ প'রে পুরুষের মত চুল ছেঁটে বয়-ফ্রেণ্ডদের সঙ্গে হল্লা-করা মেয়েও আছে, আবার শান্ত, নরম, লাজুক, শ্যামলা মেয়েরও অভাব নেই। এদের কাকে আপনার ভাল লাগে ?"

লিওনার্ড হোপ অত ভেবে দেখে নি। গম্ভীর হয়ে ভেবে বলল, "আপনি যে প্রাদেশিক প্রভেদের তালিকা দিলেন, আমাদের মত সাময়িক অতিথির পক্ষে তার বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। সাধারণতঃ আমরা আধুনিক ভারতীয় মেয়েদের সংস্পর্শে আসি।"

"এবং নিশ্চয় দেখে আশ্চর্য হন যে, তারা সবদিক থেকে সম্পূর্ণ আধুনিক।"

"কেউ কেউ খুব মডার্ণ আউটলুক দেখিয়ে থাকেন। আমার নিজের অবশ্য অতটা ভাল লাগে না। আমি লোকটা সীরিয়স ব'লে জীবনকে গাম্ভীর্য ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে গ্রহণ করে এমন মেয়ে পছন্দ করি।"

"সে রকম মেয়ে আপনার দেশে তো অনেক আছে!"

"নেই তা ত বলিনি। তবু ওরিয়েণ্টাল মেয়েদের মধ্যে কেমন একটা শান্ত স্থিরতা আছে যা আমাদের সমাজ থেকে বড় তাড়াতাড়ি চ'লে যাচ্ছে। সেজন্যই বোধ করি হাজার হাজার আমেরিকান জাপানী মেয়ে বিয়ে ক'রে নিয়ে গেছে।"

"আমাদের সৌভাগ্য, মিস্টার হোপ, আপনারা দলে দলে এখনও ভারতীয় মেয়ে বিয়ে করতে শুরু করেন নি।"

দেববাণী লঘু হাসির সঙ্গে কথাটা বলল। কিন্তু লিওনার্ড একটু আঘাত পেল।

"সৌভাগ্য কেন বলছেন?"

"মার্কিন জামাই পেয়ে আমাদের বাপ-মা'রা বিপদে পড়তেন। এদেশে জামাই-আদর ব'লে একটা সাবেকী ব্যাপার আছে।"

"অনেক ভারতীয় মেয়ে কিন্তু আজকাল বিদেশী বিবাহ করছে।"

"অনেক নয়, কেউ কেউ।"

"আপনি ত বহুদিন আমাদের দেশে ছিলেন। মার্কিন পুরুষদের আপনার ভাল লাগে নি?"

"কেন লাগবে না?"

"কারুর সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব হয় নি?"

"নিশ্চয় হয়েছে।"

"না না। সাধারণ বন্ধুত্বের কথা বলছি না।"

"আপনি কি জানতে চাইছেন কোনও আমেরিকার পুরুষের সঙ্গে আমার প্রেম হয়েছে কি না?"

"হয়েছে?"

"স্পষ্ট ক'রে বলছেন না কেন? না, মিঃ হোপ, সে সৌভাগ্য হয় নি।"

"আশ্চর্য!"

"কেন? আশ্চর্য হবার কি আছে?"

"আপনার মত মেয়ের আমেরিকান যুবকদের কাছে সহজে শ্রদ্ধা পাওয়া উচিত।"

"কিন্তু আপনি ত জানেন, শ্রদ্ধা ও আধুনিক প্রেম এক নয়।"

"শ্রদ্ধা না হলে প্রেম গভীর হয় না।"

"বড্ড সেকেলে কথা বলছেন আপনি।"

"একটু প্রভিন্সিয়াল শোনাচ্ছে বোধ হয়। কিন্তু আমি এ বিশ্বাস নিয়েই বড় হয়েছি। আমার বাবা পাদ্রী ছিলেন। শুধু তাই নয়, খুব গোঁড়া নীতি-বোধ ছিল তাঁর। আমার মা স্যালভেশন আর্মিতে কাজ ক'রে 'মেজর' হয়েছিলেন। আমার একটি বড় বোন আছে। সে চীনে বহু বছর কাটিয়েছে মিশনারী কাজে। এখন আছে থাইল্যাণ্ডের এক গ্রামে, কুষ্ঠরোগীদের জন্যে হাসপাতাল চালাচ্ছে।"

"শুধু আপনিই অধার্মিক কাজ করছেন দেখতে পাচ্ছি।"

"আমি যে পাদ্রী হলাম না তার জন্যে দায়ী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ছাত্রজীবন শেষ না হতে আমাকে যুদ্ধে নামতে হ'ল। আমার প্রথম পোষ্টিং হ'ল ইংলণ্ডে। বছরখানেকের মধ্যে আমাকে এমন কাজে লাগান হ'ল যার সঙ্গে রাজনীতি ও কূটনীতির সম্বন্ধ খুব বেশী। গোপনে আমি ফ্রান্সে চ'লে এলাম। আমার কাজ হ'ল ফরাসী পার্টিজানদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। যুদ্ধ শেষ হলে আমাকে স্টেট ডিপার্টমেণ্ট চাকরি দিতে চাইল, আমি রাজী হয়ে গেলাম।"

"ভারতবর্ষে ক'দিন আছেন?"

"আড়াই বছর।"

"কেমন লাগছে?"

"ভাল এবং মন্দ।"

"আপনাদের দেশেও আমার তাই লাগে।"

"প্রথম প্রথম আমার বেশ খারাপ লাগত। আজকাল বেশ ভালই লাগে।"

"আমার ঠিক উল্টো। প্রথম প্রথম বরং ভাল লাগত। এখন আর তেমন ভাল লাগে না।"

"কেন বলুন ত!"

"আমি গিয়েছিলাম পড়তে, শিখতে। প্রথম বছরগুলি পড়াশোনায় কাজ-কর্মে বেশ কেটেছিল। অন্য কিছু ভাববার, বুঝবার, দেখবার, শোনবার সময় ছিল না আমার। য়ুনিভারসিটিতে লেবরেটরীতে বেশির ভাগ লোকের সহৃদয় সাহায্য আমি পেয়েছি, মন সর্বদা কৃতজ্ঞতায় ভরা থাকত। কাজের স্বীকৃতি যা পেয়েছি তাই মনে হ'ত অনেক। এমনি ক'রে বহুদিন কেটে গেল! আপনাদের দেশের সঙ্গে বিজ্ঞান-চর্চার বাইরে আমার বিশেষ পরিচয় পর্যন্ত হ'ল না। এ পরিচয় শুরু হ'ল যখন চাকরিতে ঢুকলাম। সব কথা ব'লে কাজ নেই, কিন্তু এটুকু বুঝতে বাকী রইল না যে, আপনারা আমাদের সাহায্য করতে, অনুগ্রহ করতে যতটা আগ্রহী, সমান ভাবে গ্রহণ করতে ততটা নন। চাকরিতে ঢুকে আপনাদের দেশ, সমাজ, জীবনযাত্রার দিকে ভাল ক'রে তাকাবার সুযোগ ও সময় আমি যেন প্রথম পেলাম। যা দেখলাম, তাতে আমার মন খুশি হ'তে পারল না।"

লিওনার্ড হোপের মুখে কালো ছায়া নেমে আসতে দেখে দেববাণী বলল, "হয়ত এই নিয়ম। আমাদের দেশেই ধরুন না কেন। 'ছোট' জাতের লোকেদের মঙ্গল, উপকার, উন্নতি আমরা অবশ্য চাই; সে জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করি নে। কিন্তু ওরা আমাদের সমান হয়ে দাঁড়ালে, আমাদের চেয়েও বড় হ'তে চাইলে আমরা আর উদার থাকতে পারি নে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তাই। পশ্চিমের মানুষরা অন্য মানুষের চেয়ে এত আগে, এত বেশী এগিয়ে গেছে, নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তারা এত দৃঢ়-সচেতন যে, উদার ভাবে পৃথিবীর বাকী লোকেদের উন্নতির পথে এগিয়ে নিতে তারা অনেকটা প্রস্তুত, কিন্তু তাদের সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে গ্রহণ করতে সহজে মন ওঠে না। আপনারা নিজেদের বড় বেশী নির্ভুল মনে করেন; অন্য দেশের স্বার্থ ও চিন্তাধারা যে আলাদা হতে পারে, মানতে চান না। এক কথায়—কিছু মনে করবেন না—আপনারা শুধু একটা দেশকে শ্রদ্ধা করেন। তার নাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।"

লিওনার্ড বলল, "যা বললেন তার কিছুটা নিশ্চয় ঠিক। এ কথা অনেক দেশে, অনেকের মুখে আমরা শুনে থাকি।"

"তবু যে আপনারা এর পুরো সত্য মানতে চান না, তাতে প্রমাণ হয় কত গভীর আপনাদের আত্মপ্রেম।"

"আত্ম-সন্দেহ থেকে এক-একটা জাতির আত্ম-বিনাশ ঘটে থাকে। য়ুরোপে

যা হচ্ছে। আমার মনে হয় আত্ম-সন্দেহের চেয়ে আত্ম-প্রেম অনেক ভাল।"

"কিন্তু, মিঃ হোপ, আত্মপ্রেমী লোকেরা নাকি অন্য কাউকে ভালবাসতে পারে না।"

"ভুল।"

"ভুল কেন?"

"আমাকে আপনি আত্মপ্রেমী মনে করেন। কিন্তু আমি নিশ্চয় মনের মত কাউকে পেলে ভালবাসতে পারি।"

লিওনার্ড হোপের মুখখানা রঙিন হয়ে উঠতে দেখে দেববাণী প্রশ্ন করল, "মনের মত কাউকে নিশ্চয় খুঁজে পেয়েছেন?"

"তেমন কাউকে পাই নি। আমি বড় সহজে খুশি হই নে। খুঁতখুঁতে নই, কিন্তু স্বল্পে সন্তুষ্ট নই।"

"আপনাকে একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। খুব অ-সাধারণ মেয়ে।"

"ভারতীয় না বিদেশী?"

"শুধু ভারতীয় নয়, দক্ষিণ-ভারতীয়।"

"শুনেছি ওরা অত্যন্ত রক্ষণশীল।"

"যার কথা বলছি সে নয়।"

"খুব আধুনিক?"

"যে-অর্থে এ শব্দটি প্রচলিত, সে-অর্থে নয়।"

"সুন্দরী?"

"দেখে বিচার করবেন।"

হঠাৎ লিওনার্ড উঠে দাঁড়াল। বলল, "চলুন, একটু বেড়িয়ে আসি।"

দেববাণী সহজে রাজী হ'ল। মা'কে ব'লে চটপট তৈরী হয়ে নিল। যাবার সময় বাসন্তী দেবী মনে করিয়ে দিলেন, "সাবিত্রী আম্মার খোঁজ নিয়ে আসিস।"

দেববাণী বলল, "আসব।"

গাড়ীতে ব'সে দেববাণী বলল, "পালামের রাস্তায় চলুন। আমার ইচ্ছে করছে খুব বেগে গাড়ী চালাতে।"

"আপনি চালাবেন?" সীট থেকে উঠবার ভঙ্গিতে লিওনার্ড প্রশ্ন করল।

"না। আপনিই চালান।"

নিজামুদ্দিন থেকে মথুরা রোড দিয়ে গাড়ী বেরিয়ে রিং রোডে পড়ল। স্পীডোমিটারে তখন পঞ্চাশ উঠেছে। রিং রোড দিয়ে উধাও হ'য়ে মতিবাগ পেরিয়ে গাড়ী ধওলা-কুঁয়ায় পাক খেয়ে পালামের রাস্তা ধরল। লিওনার্ড এবার সত্তর মাইলে উঠল।

দু'দিকে সবুজ মাঠ, লোকালয়, গাছ-পালা, উন্মত্ত হাওয়ার বেহিসাবী বেগের সঙ্গে মিলেমিশে খিচুড়ি হয়ে গেছে। চোখের নিমেষে উধাও রাস্তার সঙ্গে বার বার নেমে আসা আকাশ কেমন এক চক্রাকারে ঘুরতে লেগেছে। গাড়ীর গতি এখন আশি মাইল। শীতের প্রকোপ আর নেই, তবু হাওয়া ঠাণ্ডা। দেববাণী দরজার কাচ খুলে দিয়ে সে দুরন্ত ঠাণ্ডা হাওয়ায় মনের গ্লানি উড়িয়ে দিতে চাইল।

পালাম ছাড়িয়ে রাস্তা সোজা চলে গেছে পাঞ্জাবের গুরগাঁও শহরে। লিওনার্ড এক সময় বলল, "আরও স্পীড বাড়াব ?"

"দেখবেন যেন অ্যাক্সিডেন্ট করবেন না।"

"তা হলে এই থাক।"

ফিরবার পথে লিওনার্ড গাড়ী আস্তে চালিয়ে আনল। পালাম ছাড়িয়ে ক্যান্টনমেন্টের দিকে আসবার সময় সে দেববাণীকে প্রশ্ন করল :

"ডক্টর রায়, আপনাকে আমি নাম ধরে ডাকতে পারি ?"

"নিশ্চয়।"

"তা হ'লে আপনিও আমায় লিওনার্ড বলবেন।"

"বেশ ত।"

একটু পরে লিওনার্ড আবার জিজ্ঞেস করল, "বাণী তুমি কাউকে ভালবাস, না ?"

দেববাণী হেসে বলল, "এ কথা কেন ?"

লিওনার্ড বলল, "তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি বড্ড সুস্থির, সুশান্ত। নোঙর-করা জাহাজের মত।"

দেববাণী বলল, "তাই বুঝি ?"

লিওনার্ড বলল, "আমার প্রশ্নের জবাব দিলে না যে ?"

দেববাণী বলল, "সব প্রশ্নের জবাব নেই।"

ওয়েলিংডন ক্রিসেন্ট দিয়ে গাড়ী তালকাতোরা বাগানের পাশ কাটাবার সময় দেববাণী অনুভব করল লিওনার্ড ডান হাতে তার বাঁ হাত তুলে নিয়েছে।

বাধা দিল না দেববাণী।

বলল, "নার্সিং হোমে নামতে হবে। তুমি সঙ্গে এসো।"

নার্সিং হোমে নেমে সাবিত্রী আম্মার ঘরের কাছে এসে দাঁড়াল দুজনে। তখনও বেশ কিছু লোকের ভিড়।

নার্সের কাছে খবর পেয়ে সরোজা বেরিয়ে এল। দ্বিতীয় রাত্রির অনিদ্রায় তার মুখখানা আশ্চর্য করুণ দেখাচ্ছে। উগ্র স্বভাব হঠাৎ মোলায়েম হয়ে গেছে।

"কেমন আছেন?" দেববাণী প্রশ্ন করল।

"ভাল নয়।"

"আবার এ্যাটাক্ হয় নি ত?"

"একবার হয়েছিল। খুব বড় নয়।"

"কথা বলছেন?"

"আজ আর বলছেন না।"

গলা কেঁপে উঠল সরোজার।

"ডাক্তাররা কি বলছেন?"

"আশা দিচ্ছেন না।"

"তোমার বাবা এসেছেন?"

"হ্যাঁ।"

লিওনার্ড হোপ এক দৃষ্টিতে সরোজাকে দেখছিল। সরোজাও দু'তিনবার তাকিয়ে দেখল।

দেববাণী বলল, "ইনি লিওনার্ড হোপ। আমার এক আমেরিকান বন্ধু।" লিওনার্ডের দিকে তাকিয়ে, "ইনি সরোজা। এঁর কথাই তোমাকে বলছিলাম।"

লিওনার্ড সুন্দর ভাবে 'বাউ' করল। তারপর সংক্ষিপ্ত করমর্দন। বলল, "আপনার মা'র অসুখে বড় দুঃখিত।"

"হার্ট এ্যাটাক্," বলল সরোজা।

"বুঝেছি।"

একটু পরে লিওনার্ড বলল, "আমি কিছু করতে পারি কি?"

সরোজা বলল, "ধন্যবাদ।"

পথে দেববাণী লিওনার্ডকে সরোজার কথা বলল, আর বলল সাবিত্রী আম্মার কথা।

বাসার কাছাকাছি এসে লিওনার্ড বলল, "আমাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ

করতে তোমার আপত্তি নেই ত, বাণী ?”

“মোস্ট ওয়েলকাম।”

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠবার মুখে আইরীণ এসে ধরল।

“কি হ’ল আজ ? মিঃ হোপকে বড় বেশী গম্ভীর দেখলাম।”

দেববাণী হাই চেপে বলল, “লোকটা মন্দ নয়।”

“নট এ্যাট্ অল্।”

“গাড়ী বেশ ভাল চালায়।”

“খুব ভাল।”

“কথা একটু বেশী বলে।”

“এবং বড় বড়।”

“বেশ সভ্য।”

“অতিশয়।”

“ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছুটা শ্রদ্ধা আছে।”

“এবং ভারতীয় মেয়েদের সম্বন্ধে কৌতূহল ও উৎসাহ।”

“এসব দেখে-শুনে সরোজার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম।”

আইরীণ বিস্মিত হল।

“বেচারীর মা মৃত্যুমুখে। বড় একা প’ড়ে যাবে। যা মনমেজাজ, দেশী ছেলে-ছোকরারা কাছে ঘেঁষতে সাহস করে ব’লে মনে হয় না। লিওনার্ড হোপের প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না।”

“কিন্তু বাণী,” আইরীণ বলে গেল, “ওর যে অন্যদিকে নজর ছিল !”

“তাই বলছিল, বেচারা,” দেববাণী ব্যথার স্বরে বলল, “কিন্তু কি করা যায় ? বলল, প্রথম দর্শনেই আমি তার প্রেমে পড়েছি। কিন্তু স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সে এত সুখী, তাকে বলবার মত সাহস পর্যন্ত আমার নেই।”

কয়েক মুহূর্ত আইরীণ বুঝতে পারল না। তার পর বুঝতে পেরে দেববাণীকে মারতে উঠল।

“পাজি মেয়ে, দুষ্ট মেয়ে, মিথ্যুক মেয়ে !”

হাসতে হাসতে দেববাণী ওপরে উঠে গেল।

বাসন্তী দেবী এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, “সাবিত্রী আম্মা ভালর দিকে বুঝি ?”

হাসির রেশ তখনও ফুরোয় নি। দেববাণী বলল, “না মা। অবস্থা বেশ

খারাপ।"

বাসন্তী দেবী অবাক হয়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

একটু পরে দেববাণী স্নানঘরে গেল। শুনতে পেলেন সে মৃদু স্বরে গান গাইছে।

গানের আড়ালে দেববাণীর মনে একটি সুন্দর সুরমুখর উপলব্ধি গুঞ্জরিত হচ্ছিল। সে সত্যি একজনকে ভালবাসে। আমি নিরাপদ, নির্ভীক, কারণ আমি ভালবাসি। আমি সুশান্ত, সুস্থির। আমি নোঙর-করা জাহাজ। বন্দরে উপনীত। লিওনার্ড হোপকে মনে মনে ধন্যবাদ দিল দেববাণী। তার কাছ থেকে এ মন্তব্যের পর আমার আর আত্ম-সন্দেহ থাকা উচিত নয়। আমি কি চাই না চাই সে কথা অবান্তর। যা একমাত্র আসল তা হচ্ছে, আমি বন্দরে উপনীত।

ষোল

সাবিত্রী আম্মার মৃত্যু-খবর দেববাণী পেল প্রভাতী সংবাদপত্রে।

নার্সিং হোমে টেলিফোন ক'রে জানল, মৃতদেহ সাবিত্রী আম্মার বাসগৃহে স্থানান্তরিত হয়েছে।

বাসন্তী দেবীকে নিয়ে ফিরোজ শা' রোডের বাড়ীতে যখন দেববাণী পৌঁছল তখন সেখানে বেশ কিছু গণ্যমান্য লোকের সমাগম। পার্লামেণ্টের সদস্য, যাঁরা দিল্লীতে আছে, প্রায় সবাই এসে গেছেন, আসছেন। একে একে মন্ত্রীরাও উপস্থিত হচ্ছেন। সাবিত্রী আম্মার প্রাণহীন দেহকে সোনালি সিল্কের লাল-পেড়ে শাড়ী, চন্দন, কুঙ্কুম, সিঁদুর ও ফুলে সুন্দর ক'রে সাজিয়ে শোবার ঘরে রাখা হয়েছে। সবাই এসে মৃতদেহ প্রদক্ষিণ করছেন, ফুল বা ফুলের মালায় শেষ-সম্মান জানাচ্ছেন। দেববাণী মাকে নিয়ে সাবিত্রী আম্মার সামনে শেষ-বারের মত কয়েক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়াল। গভীর প্রশান্তিতে চিরনিদ্রিত সাবিত্রী আম্মা। ম্লান কাঞ্চনবর্ণ সে প্রশান্তিকে বিষণ্ণ করেছে। বিদায় নেবার সময় সাবিত্রী আম্মা বুঝি ব'লে গেছেন, ক্ষোভ নেই, নালিশ নেই, কিন্তু হ'ল না, হ'ল না, যেমন ভেবেছিলাম, জীবন তেমনটি হ'ল না।

দেববাণীর ইচ্ছে ছিল, কিছু ফুল নিয়ে যায়, টাটকা, তাজা ফুল। নিউ দিল্লীতে ফুলের দোকান নেই, যেমন আছে কলকাতায় অজস্র ; এখানে পাওয়া যায় কেবল গাঁদা ফুলের মালা, বাসি ফুলের তোড়া, গোলাপের পাপড়ি। সুতরাং খালি হাতেই যেতে হয়েছিল। সাবিত্রী আম্মাকে শেষ-দর্শন ক'রে বাসন্তী দেবীকে নিয়ে বাইরে এসে দেববাণী পুনরায় বিস্ময় ও বিরক্তির সঙ্গে দেখল, সমাগত স্ত্রী-পুরুষ সবাই মৃদুস্বরে বেশ জটলা শুরু ক'রে দিয়েছে ; মৃত্যুকে অভিবাদন করবার উপযুক্ত নীরব গাম্ভীর্য প্রায় কারুর মধ্যে নেই। কান পেতে শুনলে দেখা যায়, এমন কোনও বিষয় নেই যা আলোচিত হচ্ছে না ; কেবল বোধ করি সাবিত্রী আম্মা ছাড়া। মৃত্যু এসে তার স্বাভাবিক দাবীতে একটি পরিণত-বয়সের মহিলাকে তুলে নিয়ে গেছে ; এ রকম ঘটনার আনুষ্ঠানিক রীতি পালন করবার জন্যে এদের আসতে হয়েছে, তাই এরা এসেছে।

এর মধ্যে দেববাণী সরোজার খোঁজ করল। দ্বিতীয় ঘরে, সে দেখল,

একজন শুভ্রকেশ, স্বাস্থ্যবান বৃদ্ধ কিছু লোকের সঙ্গে তামিল ভাষায় কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করছেন। নামজাদা কেউ এসেছেন খবর পেলে উঠে এসে বাইরে দাঁড়াচ্ছেন, এবং তাকে নিয়ে সাবিত্রী আম্মার ঘরে যাচ্ছেন। দেববাণী অনুমান করল, ইনি সাবিত্রী আম্মার স্বামী, সরোজার বাবা। অত্যন্ত গম্ভীর রাশভারী চেহারা, বড় বড় চোখ ঈষৎ রক্তবর্ণ। দীর্ঘ, মজবুত নাকে কঠিন ব্যক্তিত্ব সুপ্রকাশ। ভদ্রলোককে দেখে মনে হ'ল, পৃথিবীকে তিনি সন্দেহে, ভয়ে, তুচ্ছতায় ও সচেষ্ট প্রতিরোধে সর্বদা খানিকটা দূরে সরিয়ে রাখছেন।

সরোজাকে দেববাণী কোথাও দেখতে পেল না।

আর একটু খোঁজার পর রামস্বামীকে দেখতে পেল দেববাণী। তাকে প্রশ্ন করল, "সরোজা কোথায় ?"

জিভ দিয়ে অদ্ভুত শব্দ ক'রে রামস্বামী জানাল, সে জানে না।

বাসন্তী দেবী লনের এক প্রান্তে দাঁড়িয়েছিলেন। দেববাণী এসে বলল, "মা, এবার চল।"

"সরোজাকে পেলি ?"

"না।"

"তা হলে ?"

"চল, মা।"

গাড়ীতে ব'সে দেববাণীর সেই দিনের কথা মনে পড়ল যেদিন সে প্রথম সাবিত্রী আম্মার কাছে এসেছিল। কেন এসেছিল ভাবতে বিস্ময় লাগল। দিল্লী এসে প্রথম প্রথম বন্ধুবান্ধবহীন দেববাণী কার কাছে যাবে, কোথায় সাহায্য পাবে কিছুই বুঝতে পারে নি। শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ে দু'তিনবার যাতায়াতের পর সে বুঝেছিল সরকার নামক স্থবির যন্ত্রকে সচল করতে হলে তদ্বির নামক তেলের বড় প্রয়োজন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম যেদিন সে দেখা করতে গেল, বক্তৃতা দেবার কয়েক দিন আগে, অধ্যাপকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় এ কথাটা আরও পরিষ্কার ক'রে সে বুঝতে পারল। রসায়ন-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সাবিত্রী আম্মার নাম ক'রে দেববাণীকে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর কথাগুলি আজ দেববাণীর মনে পড়ল। ওঁর খুব কিছু ক্ষমতা নেই, তিনি বলেছিলেন, কিন্তু ভাল কোনও

উদ্যোগ দেখলে উনি যেমন উৎসাহের সঙ্গে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন, এম. পি.-দের মধ্যে তেমন বোধ হয় খুব কম আছেন।

সামান্য কয়েক সপ্তাহে দেববাণীকে স্নেহ ও প্রীতির বন্ধনে বেঁধে ফেলেছিলেন সাবিত্রী আম্মা। শুধু যে সাধ্যের ও শক্তির অতিরিক্ত সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন তা নয়, তাঁর সঙ্গে স্নেহ-শ্রদ্ধাস্নিগ্ধ সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে কতবার দেববাণী তাঁর কাছে এসেছে, প্রত্যেকবার তিনি সাদরে তাকে গ্রহণ করেছেন। শুধু তাই নয়, নিজের জীবনের কত-না গল্প করেছেন, দেববাণীর জীবনের কথা সাগ্রহে শুনেছেন, এমন কি তাঁর একমাত্র সমস্যা—কন্যা সরোজাকে নিয়ে পর্যন্ত তাদের অনেক কথাবার্তা হয়েছে।

সাবিত্রী আম্মার চরিত্রের নির্মল ঔদার্য দেববাণীকে গভীর ভাবে স্পর্শ করেছিল। যখন সে বুঝতে পেরেছিল, রিসার্চ ইনৃষ্টিটিউট ব্যাপারে সত্যিকারের সাহায্য করবার ক্ষমতা সাবিত্রী আম্মার নেই, যে সব সূক্ষ্ম, জটিল, অনুচ্চারিত কারণে ব্যক্তিবিশেষের আয়ত্তে রাজনৈতিক ক্ষমতা এসে থাকে তার বাইরে বাস ক'রে তিনি কেবল প্রারম্ভিক ব্যর্থ চেষ্টা করতে পেরেছেন, তখনও দেববাণী ক্ষুণ্ণ হয় নি, বরং তাঁর নির্ভেজাল, অসহায় শুভানুধ্যায়ে আরও বেশী আকৃষ্ট হয়েছিল। অসাধারণ জীবন-তৃষ্ণা আশ্চর্য সাহসে, বিচিত্র পথে তাঁর জীবনকে বিকশিত করেছিল। দৃপ্ত মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হয়ে সে যখন ম্লান গোধূলিতে উপনীত হ'ল, শীতের বিশীর্ণা নদীর মত স্তিমিত হয়ে গেল তার তেজ, তখন অপরিহার্য নিষ্ঠুর হিসাব-নিকাশে সাবিত্রী আম্মা দেখতে পেলেন, তাঁর অগোচরেই অনেকখানি ফাঁক ও ফাঁকি জমা হয়ে গেছে। একদিন এ কথা নিজেই তিনি দেববাণীকে বলেছিলেন। "ফুরিয়ে যাওয়া যে কত দুঃখের তা ফুরাবার মুখে না এলে আমরা বুঝতে পারি নে," বলেছিলেন সাবিত্রী আম্মা। "বৃদ্ধকালে কেবল মনে হয়, জীবনে ভুলগুলি যদি না হ'ত। ইচ্ছে হয়, আর একবার নতুন জীবন শুরু করি। অথচ এ-ও জানি যে, নতুন ক'রে শুরু মানে আবার নতুন ভুল।"

আশ্চর্য লাগে দেববাণীর ভাবতে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের জীবনে কি ভয়ানক তফাৎ। পশ্চিমে মানুষ জীবনকে ভোগ করতে চায়, তার চেয়ে বড় পাওনা তাদের নেই। ভোগ করবার বাধাও তারা কাটিয়ে উঠেছে। যে দারিদ্র্য জীবনকে উপবাসী রাখে, বঞ্চিত করে, সে দারিদ্র্য পশ্চিমে আর নেই। মানুষে মানুষে ব্যবধান ঘুচে গেছে অনেকখানি। পর পর দুটি মহাযুদ্ধে সামাজিক

বিধি-নিষেধ গেছে ভেঙে। বিজ্ঞান ও যন্ত্র মানুষের জীবনকে ত্বরিৎগতি করেছে, ধীর-স্থিরতা আর নেই। এখনকার জীবনদর্শনের সবচেয়ে বড় কথা, ভোগ কর। নরনারীর দৈহিক আনন্দ সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমে তাই যৌবনের এত সম্মান, কদর। যৌবন আছে ত সব আছে; যেহেতু যৌবন চিরদিন থাকবে না, তাই যতদিন আছে, আনন্দ কর, স্ফূর্তি কর, ভোগ কর।

অথচ ভারতবর্ষে মানুষের জীবন এখনও ভিন্ন তালে চলছে। দারিদ্র্য মানুষকে উপবাসী ক'রে রাখছে। ভোগ-বিলাস-কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় পয়সা-ওয়ালা মানুষের প্রাপ্য। তারা নাইট-ক্লাবে যায়, ক্যাবারে দেখে, মদ খায়, মেয়েমানুষ নিয়ে স্ফূর্তি করে। তারা দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। তাদের কেউ কেউ অক্সফোর্ড স্ট্রীটে স্যুট তৈরী করে, ভিয়েনার অপেরা, মস্কোর ব্যালে ও প্যারিসের লিডো নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু মূলতঃ ভোগ এদের জীবনেও খিড়কির দরজা দিয়ে ঢোকে। ভারতবর্ষের জীবন-দর্শনে এখনও ভোগ-বিমুখতাকে, না-পাওয়াকে উচ্চ স্থান দেওয়া হচ্ছে। সেজন্য হয়ত ভারতীয় জীবন ক্ষুদ্র, ভীরু, স্বল্প-তৃপ্ত, দুঃসাহস-বিমুখ। তবু সে শান্ত, স্থির, মন্থর। হয়ত এ সবই বাধ্যতামূলক; বঞ্চিত মানুষের একমাত্র সম্বল পরলোক নির্ভর, বাস্তব উদাসীন জীবন-দর্শন। কিন্তু ভারতবর্ষ যে এখনও ভোগী হয়ে ওঠে নি, উঠতে পারে নি, উঠতে আরও বেশ কিছুদিন সময় লাগবে, এরই মধ্যে বর্তমান ভারতীয় বাস্তবের অনেকখানি নিহিত রয়েছে। সাবিত্রী আম্মা স্বামীকে ভাল না বেসেও গভীর অনিচ্ছায় তাঁর সন্তান গর্ভে ধারণ করেছিলেন; জীবনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার উদ্গত পরিতৃপ্তি খুঁজেছিলেন দেশপ্রেম ও দেশ-সেবার মধ্যে; উত্তেজনার বছরগুলি কেটে যাবার পর বুঝতে পারলেন ফাঁক ও ফাঁকি। সরোজা তাঁর কন্যা, সে ফাঁক ও ফাঁকির দুঃসহ বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে। পশ্চিমে হ'লে, দেববাণী ভাবল, সরোজা আধুনিক গল্প-উপন্যাসের নারীচরিত্র অনুকরণ করত; মনোবিকলন-পারদর্শীরা ওকে নানা রকম পরামর্শ দিতেন। কিন্তু ভারতবর্ষে সরোজা মা বাবা, দু'হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতা, এবং বর্তমান যুগের অগভীর অবিশ্বাস—সব কিছুর বোঝা অজ্ঞানে অবচেতনে সজ্ঞানে ব'য়ে বেড়াচ্ছে; পশ্চিমের যে আধুনিকতায় সে খানিকটা অন্তত মুক্তি পেতে পারত তা থেকে বঞ্চিত হয়ে নিঃসার আক্রোশে কেবল আঘাত করছে।

বাসন্তী দেবীকে নীরব দেখে সারা রাস্তা দেববাণীও কোনও কথা বলল না।

মৃত্যু মনকে বিষণ্ণ ক'রে দেয়। সাবিত্রী আম্মার কথা ভাবতে ভাবতে বার বার সরোজার কথা মনে হতে লাগল। মা'র মৃত্যুর পর তার সঙ্গে যে দেখা হ'ল না একথা সে ভুলতে পারল না।

সারা দিনে দেববাণীর অনেকগুলি কাজ করবার ছিল। সাবিত্রী আম্মার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখবার জন্যে যমুনাতীরে নিগম্বোধ ঘাটে যাবার ইচ্ছে দেববাণীর হল না; বরং মনে পড়ল, সন্ধ্যের দিকে দরকারী একটা সাক্ষাৎকার আছে। বাসন্তী দেবী দু'দিনের জন্যে হরিদ্বার, হৃষিকেশ, লছমনঝোলা বেড়িয়ে আসতে চাইছেন; রামকৃষ্ণ মিশনে চিঠি লিখে অতিথিশালায় থাকবার ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছেন। কাল তিনি যাবেন, তাঁর টিকেট কেনবার ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যান্য কাজের মধ্যে, হিমাদ্রি ও খোকনের আসন্ন আগমনের আশায়, ছোট একটা ফ্ল্যাটের সন্ধান পাওয়া গেছে, একবার দেখে আসতে হবে।

নিজামুদ্দিনের বাসায় ফিরে চটপট তৈরী হল দেববাণী। স্নান সেরে, সাজ-পোশাক সমাপ্ত ক'রে দেখল, বাসন্তী দেবী তার জন্যে লুচি ভেজেছেন, সঙ্গে আলুর তরকারি। ব্রেকফাস্ট সেরে দেববাণী তাড়াতাড়ি তিনখানা জরুরী চিঠি লিখে ফেলল। তার পর বেরিয়ে পড়ল।

প্রথমে যাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল দেববাণী, তিনি মার্কিন দূতাবাসের সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চপদস্থ অফিসার, নাম আর্থার অসগুড্স্ সারকি-সিয়ান। ছ' ফুট দু-ইঞ্চি লম্বা, তেমনি চওড়া, মাথায় একটি চুলও নেই, মাংসল মুখখানায়, মার্কিন চেহারায় সচরাচর যেমন হয়ে থাকে, কোথায় একটু অপক্ব ছেলেমানুষি লুকায়িত। চোখ গভীর নীল, সুপুষ্ট দীর্ঘ নাক। আর্থার সারকিসিয়ানের সামনে ব'সে দেববাণীর আর একবার মনে হল, মার্কিন জাতটার জীবনে পদে পদে খামখেয়ালি বিপরীতের দৌরাত্ম্য। এরকম দশাসই মানুষকে সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান বিভাগের অধিকর্তা ব'লে গ্রহণ করতে গেলে সংস্কৃতির যে বাস্তব ব্যাখ্যা প্রয়োজন, একমাত্র আমেরিকায় তা বিনা দ্বিধায় গৃহীত হ'তে পারে।

আর্থার সারকিসিয়ান দেববাণীর সঙ্গে সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করল। কিন্তু যে প্রয়োজনে দেববাণী এসেছিল সে বিষয়ে কথাবার্তায় সে খুব প্রীত হ'ল না।

দেববাণী বলল, "আপনি হয়ত জানেন আমি এবং আমার বন্ধু ডাঃ এইচ্ বসু, দিল্লীতে উচ্চতর বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটি কেন্দ্র স্থাপন করতে চাই।

আমাদের উদ্যোগে কয়েকটি মার্কিন বন্ধু এবং একটি ফাউণ্ডেসন সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।"

আর্থার সারকিসিয়ান গম্ভীর মুখে বিস্ময় আমদানী ক'রে বলল, এ বিষয়ে সে কিছু জানে না।

দেববাণী আশ্চর্য না হয়ে একটু হাসল। সে জানে, আর্থার সারকিসিয়ানের সব ব্যাপারটা খুব ভাল জানা আছে। মৃদু হাস্যে সে জানিয়ে দিল, তুমি যে জান তা আমি জানি। এবং অল্প কথায় সে সারকিসিয়ানকে বিষয়টা বুঝিয়ে দিল।

সারকিসিয়ান প্রশ্ন করল, "আমেরিকায় কারা আপনাদের সাহায্য করছেন?"

দেববাণী জানত, সারকিসিয়ানের এসব খবর জানা আছে। তাই নিঃসঙ্কোচে সে বলল।

সারকিসিয়ান আবার প্রশ্ন করল, "আপনি ত অনেক বছর আমেরিকায় আছেন?"

"আট বছর কাটিয়েছি আপনাদের অতিথি-বৎসল দেশে," দেববাণী জবাব দিল।

"আপনার যে গবেষণায় নাম হয়েছে তা আমরা জানি। এমনকি আপনার গবেষণার কথা একাধিকবার আমরা এদেশে প্রচারও করেছি।"

"ধন্যবাদ। আপনাদের দেশে অকুণ্ঠ সাহায্য না পেলে আমি কিছুই করতে পারতাম না," দেববাণী কৃতজ্ঞতার স্বরে বলল।

"আপনার গবেষণা কি শেষ হয়েছে?"

"গবেষণা কি কখনও শেষ হবার, ডাঃ সারকিসিয়ান?

"তা হ'লে এক্ষুণি দেশে আসতে চাইছেন কেন?"

"চেষ্টা করলে গবেষণা দেশে এসেও চলতে পারবে।"

"কিন্তু, একটা ইনস্টিটিউট গ'ড়ে তোলা ত সহজ কাজ নয়। তার ঝক্কি সামলাতে গিয়ে ইঁট-সুরকির ব্যবসাদার, সরকারী দপ্তরে হানা দিতে দিতে আপনাকে বিজ্ঞান ছাড়তে হবে।"

"একবার ইনস্টিটিউট চালু হয়ে গেলে তখন এসব সমস্যা আর থাকবে না।"

"তার চেয়ে আমেরিকায় আরও কিছুদিন কাজ করলে আপনার সুবিধে হ'ত না? ওখানে কি আপনার কোনও অসুবিধা হচ্ছে? যদি তাই হয়—"

"না, না। আমার কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। কি জানেন, ভারতবর্ষের

এখন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন বিজ্ঞানের। আমরা বাইরে গিয়ে যেটুকু শিখেছি দেশে এসে তার ব্যবহারিক বিনিয়োগের চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য নয় কি?"

সারকিসিয়ান বলল, "তা ত বটেই। আমার অবশ্য মনে হয়—এটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত ধারণা—এদেশে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন কৃষি-উন্নয়ন। আপনার পরিকল্পিত গবেষণাগারের চেয়ে ছোট ছোট লেবরেটরী তৈরী ক'রে মাটি, সার, শস্যের দুশমন কীট-পতঙ্গ ধ্বংস, এসব নিয়ে কাজকর্মের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী।"

"আপনি যা বলছেন তা নিশ্চয় কতকটা সত্যি। কিন্তু ছোট্ট ছোট্ট ব্যাপার নিয়ে ব'সে থাকার সময় আমাদের নেই। আমরা বড় দেরিতে শুরু করেছি। আমরা এখনও গরুর গাড়ীর যুগে আটকে রয়েছি, আপনারা মহাব্যোমে অভিযান চালাচ্ছেন। আমাদের ঘরে এখনও কেরোসিনের বাতি জ্বলে; আপনারা আণবিক শক্তিতে শিল্প চালনার চেষ্টায় লেগে গেছেন। আমাদের হাতিয়ার এখনও কৃপাণ, বড় জোর রাইফেল; আপনারা হাইড্রোজেন বোমায় পৃথিবী ধ্বংসের ক্ষমতা অর্জন করেছেন। যারা এগিয়ে গেছে আর যারা এগোতে পারে নি, তাদের মধ্যে প্রভেদ আজ যত বেশী, ইতিহাসের অন্য কোনও যুগে এতটা ছিল না। সুতরাং আমাদের একসঙ্গে অনেক কিছু করতে হবে, এবং তাড়াতাড়ি করতে হবে।"

"আপনি যা বললেন একথা এদেশে সর্বদা শুনতে পাই," আর্থার সারকিসিয়ান বলল, "অথচ এর অর্থ বুঝতে পারলেও যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমি নিজে নিঃসন্দেহ নই। উচ্চাশা খুব বড় জিনিস, কিন্তু আশার বীজ ছড়িয়ে যদি ফসল কাটা না যায় তা হ'লে ফল খারাপ হ'তে পারে। আণবিক বোমা। এ কথা আজ সবাই জানে যে, আণবিক বোমা প্রায় প্রত্যেক মধ্যম অগ্রসর দেশে তৈরী হ'তে পারে। কিন্তু কথা হচ্ছে, তৈরী হওয়ার দরকার কি না। একটা আণবিক বোমা তৈরী করতে যে অর্থ খরচ হয় তা দিয়ে অনেক অন্য ভাল কাজ করা সম্ভব। এবং ভারতবর্ষের মত দু'চারটে দেশ দু-দশটা আণবিক বোমা তৈরী করলে পৃথিবীর বর্তমান বিভীষিকার ভারসাম্য কোনও মতে বদলাবার সম্ভাবনা নেই।"

দেববাণী বলল, "আপনার তুলনাটা একটু বেখাপ্পা হল, কিছু মনে করবেন না। যতদূর জানি আমাদের দেশে আণবিক বোমা তৈরীর কোনও প্ল্যান নেই। কিন্তু আমাদের আণবিক শক্তির প্রয়োজন আছে। শিল্প সংগঠনে বা

বিদ্যুৎ নির্মাণে আণবিক শক্তি অবশ্য এখনও আপনাদের দেশেও খুব একটা সাহায্য করে নি, বা তাকে করতে দেওয়া হয় নি, কিন্তু এমন এক দিন নিশ্চয় আসবে যখন আণবিক শক্তির বিনিয়োগে আমাদের অগ্রগতি সহজতর হবে।"

আর্থার সারকিসিয়ান যে খুশি হল না, দেববাণী তা বুঝল।

সারকিসিয়ান কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে গলায় স্বর মোলায়েম ক'রে প্রশ্ন করল, "আপনার গবেষণার বিষয় আমরা কি করতে পারি?"

দেববাণী বলল, "আমি খোলাখুলি কথা বললে অপরাধ নেবেন না ত?"

"নিশ্চয় না।"

"আমি শুনেছি, এ বিষয়ে আমাদের সরকার আপনাদের মতামত জানতে চেয়েছেন।"

"আর কি শুনেছেন?"

"আপনারা খুব একটা উৎসাহ দেখাচ্ছেন না।"

সারকিসিয়ান গভীর নীরবে তাকিয়ে রইল।

দেববাণী বলল, "উৎসাহ দেখান, না-দেখান আপনাদের ব্যাপার, আপনারা বুঝবেন। আমি আপনাদের দেশ থেকে কোন সরকারী সাহায্য চাই নি। এদেশের গভর্ণমেণ্টের কাছে আমরা কেবল জমি চেয়েছি। আমাদের গবেষণাগারকে সরকারী প্রভাবের বাইরে রাখার চেষ্টা করছি আমরা। আপনার কাছে অনুরোধ, এমন কিছু করবেন না যাতে আমাদের উদ্যোগ ব্যর্থ হয়।"

আর্থার সারকিসিয়ান নীরবে চিন্তা করল।

তার পর বলল, "আপনি কবে আমেরিকা ফিরে যাচ্ছেন?"

"আরও কিছুদিন আছি। ছুটি একটু বাড়াতেও পারি।"

"একদিন আমাদের সঙ্গে ডিনার খেতে আসুন; খুব খুশি হবেন মিসেস সারকিসিয়ান।"

"ধন্যবাদ।"

"কবে আপনি ফ্রী আছেন?"

"সপ্তাহখানেক পরে।"

"কেন? এক সপ্তাহ পরে কেন?"

"ডাঃ বসুর আসার কথা দু'চার দিনের মধ্যে।"

"আমি আপনাকে ফোন করব'খন।"

আর্থার সারকিসিয়ান সাক্ষাৎকারের সমাপ্তি সূচনা করল।

দেববাণী তবুও ব'লে উঠল, "আমার অনুরোধ সম্পর্কে আপনি কিন্তু কিছু বললেন না।"

আর্থার সারকিসিয়ান তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। দেববাণীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে করমর্দন করতে করতে বলল, "এ বিষয়ে আমাদের বিশেষ কিছু বলার নেই। কিন্তু আপনার সঙ্গে পরিচয় পাকা করবার ইচ্ছে রইল। ডাঃ বসু ও আপনি একদিন ডিনারে এলে খুব খুশি হব।"

সারকিসিয়ানের কাছে বিদায় নিয়ে গাড়ীতে ব'সে দেববাণী হাত ঘড়িতে সময় দেখল।

এবার যার সঙ্গে দেখা করতে যাবে তাঁর নাম গোকুলভাই বিপিনভাই দেশাই। সাবিত্রী আম্মা শেষ সাক্ষাৎকারের দিন এঁর সঙ্গে দেখা করবার উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি বেঁচে নেই, তাই গোকুলভাইকে দেববাণীর সাবিত্রী আম্মার সঙ্গে জীবন্ত সংযোগ ব'লে মনে হয়েছিল। টেলিফোন করতে তিনি সাগ্রহে তাকে কাছে ডেকেছেন। সাবিত্রী আম্মার গৃহে একদিন সামান্য আলাপ হয়েছিল, কিন্তু গোকুলভাই দেববাণীকে মনে রেখেছেন, টেলিফোন করতেই চিনতে পেরেছেন। দেববাণীর মনে হ'ল তার কাছে গিয়ে অন্তত এই বিস্বাদ সরকারী ঔদাসীন্য থেকে খানিকটা মুক্তি পাওয়া যাবে।

গোকুলভাই বিপিনভাই দেশাই কনট সার্কাসে ফ্ল্যাটে বাস করেন। আজীবন গান্ধীর সহচর-শিষ্য। উনিশ শ' একুশ সালে গান্ধীজি যখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন, গোকুলভাই তখন পুণায় কোনও প্রতিষ্ঠাবান কলেজে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। অধ্যাপনা ছেড়ে গান্ধীর শিষ্য হলেন। পরে মহারাষ্ট্র অঞ্চলে অন্যতম ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তিন দশকে বিপিনভাই গান্ধীর আশ্রমে চ'লে যান। তারপর থেকে এখন পর্যন্ত শিক্ষাবিষয়ে নানা জাতীয় কাজকর্মে তিনি লিপ্ত। তিনচারটে সরকারী কমিশন কমিটিতে সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন; কয়েক বছর বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারও ছিলেন। গোকুলভাই দেশাই-এর বয়স এখন পঁয়ষট্টি। শুভ্র-কেশ খুব ছোট্ট ক'রে ছাঁটা; ফর্সা গোলগাল মুখখানায় বুদ্ধির দীপ্তি, দার্শনিক প্রশান্তি। বড় বড় সাদা চোখের মাঝখানে কালো মণি এখনও আশ্চর্য উজ্জ্বল। বেঁটে-খাট দেহ, হালকা, গতিশীল।

সিঁড়ির নীচে এক শিখ-দরজি ছোট্ট দোকান খুলে বসেছে। পাশে

পেভমেণ্টে মুচি বসেছে যাবতীয় সরঞ্জাম নিয়ে। সিঁড়ি উঠে গেছে বক্র গতিতে দৃষ্টির আড়ালে। পেভমেণ্টে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্ত হবার জন্যে দেববাণী দরজিকে জিজ্ঞেস করল, দেশাই-সাব কি ওপরে থাকেন ? দরজির মাথা নাড়া শেষ না হতেই সে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল।

দোতলায় দরজার গায়ে গোকুলভাই দেশাই-এর নাম দেখতে পেল ; বেল টিপতে একটি তরুণ এসে দরজা খুলল।

"মিঃ দেশাই আছেন ?"

"আছেন। আপনি ভেতরে আসুন।"

ভেতরে গিয়ে সে দেববাণীকে যে ঘরে বসাল তাতে আলোর অভাব। পুরনো সোফা-সেটের স্থানে স্থানে রেক্সিন উঠে গেছে। বাঁ কোণে গোল টেবিলে এক রাশি সংবাগপত্র ও ম্যাগাজিন জড়ো হয়ে আছে। ঘরটায় যথেষ্ট আলো ঢুকতে পারে না। দেয়ালে রং-এর প্রলেপ, কিন্তু মাঝে মাঝে প্রলেপ উঠে গিয়ে সাদা বেরিয়ে পড়েছে। দেববাণী দেখল, দেয়ালে মাত্র দুখানা অলংকার। একখানা মহাত্মা গান্ধীর ছবি—মৃতদেহের আলোক চিত্র ; অন্যখানা ইংরেজী ক্যালেণ্ডার।

একটু পরে বিপিনভাই ঘরে এলেন। মোটা খদ্দরের কুর্তা ও পায়জামা। তাঁতে-বোনা মোটা পশমী চাদরে দেহ আবৃত।

দেববাণী দাঁড়িয়ে নমস্কার করতে বিপিনভাই তার দুখানি হাত ধ'রে ফেললেন। মুখখানা তাঁর বিষণ্ণ গম্ভীর।

"এই একটু আগে আমি ফিরেছি," বিপিনভাই বললেন। "আপনাকেও ত দেখলাম ওখানে।"

"আমি খবরের কাগজ খুলে জানলাম তিনি মারা গেছেন।"

"সাবিত্রীকে আমি অনেক বছর ধ'রে জানি ! সে আমার অত্যন্ত আপনার লোক ছিল।"

দেববাণী চকিত দৃষ্টিতে বিপিনভাই-এর চোখে তাকাল। দেখল, নিস্তরঙ্গ বিষাদের মধ্যেও মৃদু আলোর ঝলকানি। গভীর অন্ধকার রজনীতে নক্ষত্রের আলো।

"সাবিত্রীর মত সাহসী স্ত্রীলোক সচরাচর দেখা যায় না। জীবনে কোনও প্রতিকূল অবস্থা তাকে আটকাতে পারে নি। অমন সৎসাহস আমি খুব বেশী দেখিনি।"

"আমি ওর জীবন-কাহিনী কিছু কিছু শুনেছি," দেববাণী মৃদু স্বরে বলল।

"কার কাছে?"

"উনিই বলেছেন।"

"আরও অনেক গুণ ছিল সাবিত্রীর। সে ছিল যাকে বলতে পার পরমা-সুন্দরী। যেদিন সে প্রথম গান্ধীজির আশ্রমে এল—সে আজ অনেক দিনের কথা, তখন তার বয়স কম হয় নি—তাকে দেখে আমরা সবাই মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমার চেয়ে দু'তিন বছরের ছোট ছিল সাবিত্রী। অল্পদিনেই আশ্রমে সে নিজের প্রতিষ্ঠা বিস্তার ক'রে নিয়েছিল।"

"খুব স্নেহশীল ছিল তাঁর মন," দেববাণী যোগ দিল।

"আশ্চর্য উদার," সোৎসাহে বললেন বিপিনভাই। "কোনও রকমের সঙ্কীর্ণতা সাবিত্রীর মনে স্থান পায় নি। আরও একটা বিশেষ গুণ ছিল তার—সংগ্রামে উৎসাহ। লড়তে না পারলে সে শান্তি পেত না। ছোটবড় আন্দোলন যাই যখন হোক না কেন, জেলে যাবার জন্যে সাবিত্রী সবার আগে তৈরী।"

"অমন উদার ছিলেন বলেই অত সহজে আমাকে তিনি এত স্নেহের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন," দেববাণী বলল, "সংগ্রামী ছিলেন, তাই আমার জন্যও কম চেষ্টা করেন নি।"

"আপনার মধ্যে যে 'ফাইট' আছে তা-ই সাবিত্রীকে আকর্ষণ করেছিল। কাউকে ভাল কাজের জন্যে লড়তে দেখলে সে আনন্দ পেত, তার পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা করত। আর এ জন্যেই স্বাধীনতার পর তার প্রতিষ্ঠা কমে গেল। তখনও সব কিছু নিয়ে তাকে লড়তে দেখে নেতারা অসন্তুষ্ট হলেন।"

"ও কথা আমাকেও তিনি বলেছিলেন।"

"আমাদের বেশির ভাগ নেতারা, বোধকরি সমস্ত দেশটাই, স্বাধীনতার পর সংগ্রাম-ক্লান্ত। ইংরেজ বিদায় নিয়ে যেন আমাদের সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটিয়ে দিয়ে গেছে। দেশ গড়ে তোলাও যে বিরাট সংগ্রাম, হয়ত স্বাধীনতা পাবার চেয়েও বড়, সেকথা আমরা মানতে রাজী নই। সাবিত্রী ছিল সেই মুষ্টিমেয়দের দলে যারা কিছুতে লড়াই ছাড়তে রাজী নয়। আমি একবার তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'ইংরেজ গেল, এবার লড়বে কার সঙ্গে?" মুহূর্তের দ্বিধা না করে সে বলেছিল, 'ইংরেজের চেয়েও বড় শত্রু আছে, তার সঙ্গে।' আমি প্রশ্ন করলাম, 'কে সে?' উত্তর হ'ল, 'আমরা নিজেরা'।"

সাবিত্রী আম্মা সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বললেন বিপিনভাই দেশাই।

দেববাণী বুঝল, এ সব কথা বলতে পেরে এই পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধের মন হাল্‌কা হতে পারছে। হয়ত সে বাইরের অল্পপরিচিত মেয়ে বলে বিপিনভাই প্রাণ খুলে এত কথা বলতে পারছেন, ফিরে যেতে পারছেন সেই সুদূর অতীতে যেখানে অন্য কোনও যুগে, অন্যতর পরিস্থিতিতে, অন্য চরিত্রের ভূমিকায় তিনি, সাবিত্রী আম্মা এবং আরও অনেকে একদিন এক ভিন্ন রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

বিপিনভাই-এর কথা শুথা শুনতে শুনতে দেববাণীর মনে হ'ল, জীবন কি বিরাট আশ্চর্য, আর তারও চেয়ে বড় বিস্ময় মানুষের ভালবাসা।

সাবিত্রী আম্মার সঙ্গে বিপিনভাই দেশাই-এর জীবন অনুক্ত সূত্রে অতীতের কোনও এক অসতর্ক মুহূর্তে বাঁধা পড়েছিল, দেববাণী কেবলমাত্র আন্দাজ করতে পারল। এ বন্ধনের গভীরতা ছিল কতখানি, কিংবা তার ব্যাপকতা, বিপিন-ভাই-এর কথা শুনতে শুনতে মন তার তাই নিয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠল। বিপিন-ভাই ব'লে গেলেন সেই অতীতকালের রোমাঞ্চকর সব কাহিনী, যখন দেশের মুক্তির মধ্যে কত-না নরনারী নিজেদের জীবনের নানাবিধ সমস্যার মুক্তি-সন্ধান পেয়েছিল। আশ্রমিক জীবনের শান্তশ্রী বাতাবরণে হৃদয়ের উত্তাপ নিয়ে এঁরা সেদিন কি করতেন, দেববাণীর মন প্রশ্ন করল, কিন্তু বিপিনভাই-এর সদ্য-শোকতপ্ত স্বতঃস্ফূর্ত জবানবন্দীতে তার সম্যক্ জবাব পেল না। তার মনে পড়ল, মা বাসন্তী দেবীর কথা। "নবীন বাংলা"র যুগে বিবেকানন্দ-অরবিন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হৃদয় যে পাষাণ কঠিন নীরব সংযমে ত্যাগকে সবচেয়ে বড় ব'লে মেনে নিত, বিংশশতাব্দীর উত্তর-তিরিশের অনেক-তরল পরিস্থিতিতেও কি সে-রকম সংযমে প্রেমকে এঁরা কামনার আগুন থেকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন? বিপিনভাই দেশাই অকৃতদার; তাঁর এই আজীবন কৌমার্যের পেছনে সাবিত্রী আম্মার প্রভাব কতটুকু? দেববাণী সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল, বিপিনভাই একবারও সাবিত্রী আম্মার স্বামীর নাম উল্লেখ করলেন না। সরোজার কথাও একবার তাঁর মুখে উচ্চারিত হ'ল না। যে সাবিত্রীর কাহিনী বলতে বলতে বার বার তিনি উদ্বেলিত হলেন, সে স্ত্রী নয়, মা নয়, শুধু নারী।

এমনি ক'রে প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেল। এক সময় হঠাৎ বিপিনভাই-এর খেয়াল হ'ল, দেববাণীকে তিনি কেবল নিজের কথা ও সাবিত্রী আম্মার কথাই ব'লে গেছেন, তার কথা একবারও জিজ্ঞেস করেন নি।

কথাবার্তার রাশ টেনে, সলজ্জ হাসির সঙ্গে বললেন, "এতক্ষণ আমি কেবল

আমাদের কথাই ব'লে গেলাম; আপনার নিশ্চয় ভাল লাগছে না। আসলে মৃত্যু মানুষের মনকে বড় নরম ক'রে দেয়। স্মরণ করিয়ে দেয়, তোমারও সময় হয়ে এসেছে, তৈরী হয়ে নাও।"

"আপনার কথা শুনতে আমার খুব ভাল লাগছে," দেববাণী আন্তরিকতার সঙ্গে বলল।

"আমরা কেউ একবারে মরি না, আস্তে আস্তে মরি। বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু শুরু হয়। জীবনের এক-একটা দিক্ মরতে থাকে। এক একজন আত্মীয়-বন্ধু-স্বজনের মৃত্যুর সঙ্গে আমাদেরও খানিকটা ম'রে যায়।"

দেববাণীকে এবার তিনি বললেন, "এসব কথা থাক। আপনার বয়সে মৃত্যুর কথা শুনতে ভাল লাগে না। এবার আপনার কথা বলুন। সাবিত্রীর কাছে আপনার গবেষণাগারের কথা আমি শুনেছিলাম। কতদূর কি হ'ল বলুন।"

দেববাণী সব কিছু গুছিয়ে বলল। মার্কিন দূতাবাসে একটু আগের কথাবার্তা পর্যন্ত।

বিপিনভাই গম্ভীর মনোযোগে শুনছিলেন। দেববাণী থামলেও তিনি কিছুক্ষণ ভাবলেন।

তার পর বললেন, "ব্যাপারটা কোথায় আটকেছে আন্দাজ করতে পারছি। আপনাদের গোড়ায় ভুল হয়েছে, আপনারা নির্দিষ্ট পথে এগোন নি।"

"নির্দিষ্ট পথ মানে?"

"গবেষণাগার স্থাপনের পরিকল্পনা প্রথমে আপনাদের ভারত সরকারের কাছে পাঠান উচিত ছিল। বিদেশী সাহায্য সংগ্রহের ব্যবস্থা ওঁরাই করতেন।"

"তা হ'লে উদ্যোগটাও ওঁদেরই হ'ত।"

"কিন্তু আপনাদেরও তাতে স্থান থাকত।"

"সে রকম স্থান আমরা চাই নি। আমরা চেয়েছিলাম বেসরকারী ভাবে নিজেরা কিছু তৈরী করতে।"

"বর্তমান অবস্থায় তা সম্ভব নয়। ভবিষ্যতেও এদেশে হবে কি না সন্দেহ।"

"কেন?"

"সম্ভব যে নয় তা ত দেখতেই পাচ্ছেন। ভারত সরকার জানেন না, যাঁরা আপনাদের অর্থ ও যন্ত্রপাতি দেবার আশ্বাস দিয়েছেন তাঁরা কেমন লোক, তাঁদের উদ্দেশ্য কি? মার্কিন গভর্ণমেণ্টও তাঁদের সরাসরি সাহায্য দিতে অনুমতি দেবেন, মনে হচ্ছে না। এদেশে যে কয়টি মার্কিন ফাউণ্ডেশন কাজ করছে,

সবার সঙ্গে হু'দেশের গভর্ণমেণ্টের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে।"

"কিন্তু আমি নিজেই দেখেছি জার্মানিতে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক নিজেদের প্রচেষ্টায় মার্কিন সাহায্য নিয়ে মস্ত এক গবেষণাগার স্থাপন করেছেন। জার্মান সরকার তাঁদের বাধা দেন নি।"

"জার্মানীতে যা সম্ভব ভারতবর্ষে তা সম্ভব নয়। প্রথম কথা, ওরা অনেক এগিয়ে গেছে, ওদের প্রত্যেক পদক্ষেপের আগে সতর্ক হয়ে চারদিকে তাকাতে হয় না। দ্বিতীয়তঃ, ওরা ধনতন্ত্রের পথে চলছে, আমরা মোটামুটি সমাজতন্ত্র গঠন করতে চেষ্টা করছি। এদেশে দেশ গঠনে সরকারের যতখানি দায়িত্ব ও অভিভাবকত্ব, জার্মানীতে তা নয়। তা ছাড়া, আমার মনে হচ্ছে, মার্কিন সরকারও হঠাৎ একটা উচ্চতর বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের জন্যে অর্থ সাহায্য দিতে চট্‌ ক'রে রাজী হবেন না।"

"তাই ত মনে হচ্ছে।"

"ওরা আমাদের অনেক সাহায্য করছে, কিন্তু মার্কিন জাতটা এমন দুর্ভাগা, সুনাম একেবারে পাচ্ছে না। তার কারণ ওরা আমাদের নতুন ক'রে ঢেলে সাজবার প্রয়াসে সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে না। ওরা বলছে, তুমি রুগ্ন, দুর্বল, তোমার উপসর্গগুলি যাতে কমে আসে তার ব্যবস্থা করছি। আমরা বলছি, উপসর্গ নয়, আসল রোগটার চিকিৎসা প্রয়োজন। ওরা মানছে না।"

"ওদের বোঝাবার চেষ্টা করছি আমরা ?"

"সরকারের তরফ থেকে চেষ্টার ত্রুটি হয়েছে ব'লে ত মনে হয় না। একটা কথা সচরাচর আমাদের দেশের লোকে জানেন না। মার্কিন দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের ভাবগত আদান-প্রদান আজকের নয়, বহু দিনের। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা যাবার বেশ আগে আমাদের বেদান্তদর্শন ওদেশে কিছু প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইংরেজের সঙ্গে আমাদের লড়াই-এ প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই আমেরিকার সমর্থন চেয়ে আবেদন-নিবেদন, প্রচার-প্রভাব শুরু করেছিলাম। গান্ধীজি নিজেও মার্কিন জনমত সংগঠনের জন্যে কম চেষ্টা করেন নি। লালা লাজপৎ রায় ও সরোজিনী নাইডুকে তিনি আমেরিকায় ভারতের স্বাধীনতা-দাবীর সমর্থন সংগঠনের জন্যে বার বার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝখান পর্যন্ত আমরা মার্কিন জাতটাকে ভারতবর্ষের সঙ্গে পরিচিত করাবার চেষ্টা ক'রে এসেছি। স্বাধীনতা পাবারপরে, ইংরেজের কথা বাদ দিলে, আমেরিকার সঙ্গেই আমাদের আদান-প্রদান সবচেয়ে

বেশী। আজ ভারতবর্ষে বোধকরি কয়েক হাজার আমেরিকান 'বিশেষজ্ঞ', 'পারদর্শী', 'পরামর্শদাতা' অবস্থান করেছেন। তাঁরা সমস্ত দেশে ছড়িয়ে রয়েছেন। অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করছেন, অনেকে গ্রামাঞ্চলে কাজ করছেন, আবার অনেকে শিল্প, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান, এসব বিবিধ বিষয়ে লিপ্ত আছেন। মার্কিন সংবাদপত্রগুলি একে একে এদেশে প্রতিনিধি পাঠাচ্ছে। সুতরাং ভারতবর্ষকে জানবার ও বুঝবার সুযোগ-সুবিধে আমেরিকার যতখানি ছিল বা আছে ততটা, ইংরেজ ছাড়া, বাইরের আর কোন দেশের নেই।"

"তবু, আপনি বলছেন, ওরা বুঝতে পারে নি?"

"আমাদের ত তাই মনে হয়। ওরা হয়ত নিজের দিক থেকে বেশ ভালই বুঝে নিয়েছে। আমাদের মনে হয়, অন্য কোন জাতকে বুঝতে ও জানতে হ'লে যে অন্তর্দৃষ্টি, যে নিস্পৃহ আত্ম-নিবর্তনের প্রয়োজন তা ওদের কমই আছে। ওরা কেবল ওদের দৃষ্টিতে, মাপকাঠিতে সবকিছু বিচার ক'রে দেখতে চায়।"

"আমি অনেক দিন ওদের দেশে কাটিয়েছি," দেববাণী বলল। "ওদের চরিত্রের ভাল-মন্দ অনেক কিছু নিজের চোখে দেখেছি, মনে বুঝেছি। কিন্তু ভারতবর্ষে ব'সে ওদের কেমন দেখায় তা জানতে পারিনি।"

"তা হ'লে আপনি এবার কি করবেন ভাবছেন?"

"আপাততঃ আমার আর কিছু করার নেই। আমার বন্ধু ডাঃ বসু হয়ত কয়েকদিনের মধ্যে এসে পড়বেন। গবেষণাগারের প্ল্যান আসলে তাঁরই।"

"সাবিত্রী আপনাদের কথা একদিন আমাকে বলছিল।"

দেববাণী একটু আড়ষ্ট হ'ল।

বিপিনভাই বললেন, "তিনি ত ভিয়েনা থেকে আসছেন?"

"হ্যাঁ।"

"কবে আসবেন?"

"ঠিক জানি নে। আজ-কালের মধ্যে জানতে পারব।"

"তিনি এসে কি কিছু করতে পারবেন?"

"আমি বিশেষ ভরসা পাচ্ছি নে। না পারলে, আমরা ফিরে যাব। দু'জনেরই চাকরি আছে।"

তার সঙ্গে বিপিনভাইও হাসলেন।

"দেশে কিছুদিন কাজ করুন না কেন?"

"কাজ কোথায়?"

“কাজ হয়ত জুটে যাবে। আগে মনস্থির করুন।”

“আপনি কি আমাকে বিশেষ কোনও চাকরিতে ডাকছেন ?”

“শুধু আপনাকে নয়। আপানাদের দু'জনকেই।”

হঠাৎ দেববাণীর মুখে কথা জোগাল না। সে নীরবে বিপিনভাইএর মুখে তাকিয়ে রইল।

“আমি বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলাম। এ বছর বোধ করি আবার আমাকে এ দায়িত্ব নিতে হবে। যদি আপনারা দেশে কাজ করতে চান, খুব সম্ভব দু'জনকেই আমরা নিতে পারব।”

“আপনাকে ধন্যবাদের ভাষা নেই আমার। অবশ্যি আমরা দেশেই কাজ নেব কি না তার কিছুই ঠিক নেই।”

“জানি। যদি নিতে চান, আমাকে লিখবেন।”

“আপনি আমাদের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিয়েছেন ?”

“এক-আধটু নিয়েছি। বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগকে অনেকখানি বাড়াবার প্ল্যান তৈরি হয়েছে। গভর্ণমেণ্ট সে জন্যে টাকা দিচ্ছেন। পদার্থ ও রসায়ন দুটো বিভাগকেই আমরা বাড়াব। পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে আণবিক শক্তি নিয়ে রিসার্চ করবার ব্যবস্থা হবে। কথা হচ্ছিল দু'চার জন বিদেশী বিশেষজ্ঞ আনবার। আপনারা যদি আসেন তা হ'লে বেশ ভালই হবে। আপনার কাজকর্মের কিছুটা পরিচয় আমার জানা আছে; আমার বন্ধু ডাঃ ভগবানদাসের কাছে ডাঃ বসুর কথা তুলেছিলাম।”

“কিন্তু আপনি কি ক'রে জানলেন আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব, বা আমাদের দেশেই চাকরি নেবার ইচ্ছে আছে ?

বিপিনভাই হেসে বললেন, “আপনারা আমাদের যত অলস ও অকেজো ভাবেন ততটা আমরা নই। আমরাও সর্বদা উপযুক্ত লোক খুঁজে বেড়াচ্ছি। দুঃখের কথা, শিক্ষাবিভাগে উপযুক্ত লোক পাওয়া যায় না, গেলেও ধ'রে রাখা যায় না। কিছুদিন পরে হয় তারা বিদেশে চ'লে যায় নয়ত সরকারী চাকরি নিয়ে বসে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তেমন মাইনে দিতে পারে না, তাই তাদের জোর কম। সাবিত্রীর কাছে আপনার কথা শুনে তখনই আমি ভেবেছিলাম বরোদায় আপনাকে আনা যায় কি না। সাবিত্রীকে বলেওছিলাম। কিন্তু আপনার গবেষণাগারের ব্যাপারটা ঠিকমত ফেঁসে যাওয়ার আগে আপনাকে কিছু বলা উচিত মনে করিনি।” হাসতে হাসতে বললেন, “ফেঁসে যে যাবে আমি

জানতাম। আপনার ঠিকানা আমার কাছে ছিল, আপনি আমেরিকায় ব'সেই আমার চিঠি পেতেন। কিছুদিন আগে ডাঃ ভগবানদাসের সঙ্গে বরোদা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল। জিজ্ঞেস করেছিলাম, বাইরে ভাল ভারতীয় বৈজ্ঞানিক তাঁর জানা কারা আছেন। অন্য দু'চারজনের সঙ্গে ভিয়েনায় ডাঃ বসুর কথাও তিনি বললেন। তক্ষুণি আমার মনে পড়ে গেল, ইনি সাবিত্রীর বাড়ীতে দেখা বাঙালী মেয়েটির বন্ধু। বুঝতে পারলেন"—

বিপিনভাই এবার উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন—"আমরা অনেক বড় জাল ফেলে মাছ ধরবার চেষ্টা করি! কিন্তু পাই নে। গভর্ণমেণ্ট সব ভাগিয়ে নিয়ে যায়।"

দেববাণী বলল, "শিক্ষাক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব একথা আমি অনেকের কাছে শুনছি। বিদেশে কিন্তু এতটা নেই। আমেরিকায় পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ব্যবসা-বাণিজ্য বা গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাইনে দিতে পারে না। যাঁরা শিক্ষা ও গবেষণা নিয়ে জীবন কাটাতে চান, তাঁরা অপেক্ষাকৃত দারিদ্র্য স্বীকার ক'রে নেন। তাঁদের পুরস্কার অনেকখানি পারমার্থিক। আমাদের দেশে আমরা খুব বড় গলায় স্পিরিচুয়ালিজমের কথা বলি, কিন্তু কাজের বেলায় আমরা বোধ হয় কারুর চেয়ে কম ভোগবিলাসী নই।"

"বরং অনেকের চেয়ে বেশী," জোর দিয়ে বললেন, বিপিনভাই দেশাই। "অবশ্য তার কারণও আছে। বহুদিন না পেয়ে পেয়ে আমাদের ক্ষুধা আজ অনেক বেশী; সবকিছু আমরা একসঙ্গে, অন্তত খুব তাড়াতাড়ি, পেতে চাইছি।" একটু থেমে আবার বললেন, "আপনি যখন কথাটা তুললেন, তখন আমার পক্ষে প্রশ্ন করা কি অন্যায় হবে যে, আপনারা দু'জনে কত টাকার চাকরি হলে দেশে ফিরতে পারবেন?"

আরক্ত হয়ে দেববাণী বলল, "দু'জনের কথা ত আমি বলতে পারব না।"

"তা হ'লে আপনার কথাই বলুন।"

"ভেবে দেখিনি। দেশে আসব চাকরি নিয়ে একথাটাই এখনও পরিষ্কার ক'রে ভাবিনি।"

"কিছু একটা আভাস দেওয়াও আপনার পক্ষে সম্ভব নয়?"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে দেববাণী বলল, "কাজ পছন্দ হলে টাকার ব্যাপারে আটকাবে না শুধু এটুকু আপনাকে বলতে পারি।"

"আপনার একার কথা, না দু'জনার?"

লজ্জা পেয়ে দেববাণী বলল, "আমার একার। ডাঃ বসু খেয়াল হলে বিনে মাইনেতেও কাজ করতে পারেন।"

বিপিনভাই বললেন, "আমরা কি দিতে পারব জেনে রাখতে পারেন। সঠিক বলতে পারছি না, তবে দু'জনকেই আমরা অধ্যাপকের পদে নিতে পারব। এক-একটা বিভাগের সম্পূর্ণ পরিচালনার ভার থাকবে আপনাদের ওপর। হাজার থেকে পনেরশ' গ্রেডের যে-কোন স্থানে আপনারা শুরু করতে পারবেন।"

দেববাণী বলল, "আপনার প্রস্তাব লোভনীয় সন্দেহ নেই। ভেবে দেখব। যদি দেশে ফিরে আসতে চাই তা হ'লে এর চেয়ে ভাল কিছু ভাবতে পারি নে।"

বিপিনভাই প্রশ্ন করলেন, "বাধা কিসের?"

"বাধা একটু আছে," দেববাণী আস্তে বলল।

উঠল দেববাণী। এ প্রসঙ্গ সে বাড়তে দিতে চায় না। বিপিনভাইকে মাথা নীচু ক'রে নমস্তে জানাল। তিনি দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

সিঁড়ি বেয়ে নামবার মুখে হঠাৎ দাঁড়িয়ে দেববাণী ব'লে উঠল: "আপনি সরোজা কোথায় জানেন? সকালে ও-বাড়ীতে সরোজাকে ত দেখতে পেলাম না!"

বিপিনভাই-এর নরম শান্ত মুখে কাঠিন্য দেখতে পেল দেববাণী।

তিনি বললেন, "না"।

সতের

সন্ধ্যার পরে হিমাদ্রির কেব্‌ল পেল দেববাণী।

"তোমার জরুরী আহ্বানের অর্থ বুঝতে পারছি না, তবুও আসছি। আজ ছুটি মঞ্জুর হ'ল! দেবকুমারকে 'তার' করেছি। কাল জেনিভায় পৌছব। ওখান থেকে কবে দিল্লী পৌছব জানাব।"

কিছুক্ষণ আগে কাছাকাছি বাড়ীতে বড় গোছের একখানা ফ্ল্যাট একমাসের জন্যে দেববাণী পেয়ে গেছে। আইরীণই ঠিক ক'রে দিয়েছে। সুইডিস ভদ্রলোকের ফ্ল্যাট, স্ত্রী দেশে চ'লে গেছেন, তিনি মাস দু-একের জন্যে হায়দ্রাবাদে যাচ্ছেন কাজে! দেববাণীকে 'কেয়ার টেকার' হয়ে থাকতে হবে; ভাড়ার অর্ধেক দিলেই চলবে। অত বড় ফ্ল্যাটের কোনও প্রয়োজন ছিল না দেববাণীর; তবু সুবিধে অনেক, ভাড়া খুব বেশী নয়। আইরীণের গাড়ী দরকার হ'লে ব্যবহার করা যাবে। ফ্ল্যাটে টেলিফোন আছে, শয়নঘর থেকে রান্নাঘর পর্যন্ত বিলিতী কায়দায় সাজান-গোছান। মা ত কাল হরিদ্বার যাচ্ছেন; দেববাণী বুঝতে পারছে, হিমাদ্রি আসবার সময় ইচ্ছে ক'রেই তিনি স'রে পড়ছেন। যদিও বলছেন, দু'চার দিন পরেই ফিরে আসবেন, দেববাণীর ধারণা তিনি সপ্তাহ খানেক থাকবেন। খোকনকে নিয়ে তাকে একাই নতুন ফ্ল্যাটে থাকতে হবে।

হিমাদ্রির জন্যে দেববাণী হোটেলে ঘর বুক করতে যাচ্ছিল, এমন সময় আইরীণ এসে হাজির হল।

"তোমার একটা কেব্‌ল এসেছে, না? হিমাদ্রির ত?"

"হ্যাঁ।"

"কবে আসছে?"

"তা জানি নে। তবে আসছে।"

দেববাণী কেব্‌লটা আইরীণের হাতে দিল।

পড়ে দুষ্টু হাসিতে আইরীণের মুখ-চোখ ভ'রে গেল।

"কোন্ বাঁধনে এমন শক্ত ক'রে বেঁধেছ জানতে পারি কি?"

"আমাদের কবির ভাষায়, বন্ধনহীন গ্রন্থি।"

"আর গদ্যে?"

"বন্ধুত্ব।"

"না, না। প্রেম।"

"মস্করা রাখ। তুমি একটু বস। আমি ইম্পিরীয়েলে একবার ফোন করি।"

"কেউ এসেছে বুঝি?"

"না। হিমাদ্রির জন্যে একটা ঘর বুক ক'রে রাখি।"

"বাঃ। একটা পুরো ফ্ল্যাটে তোমাদের ছ'জনের জায়গা হবে না?"

"মার খাবে।"

"আর কতদিন এই ছেলেখেলা চলবে তোমাদের?"

"দেখি কত দিন চলে।"

"অর্থাৎ চালিয়ে যাবেই?"

"না চললে আর চালাব কি করে?"

"বাণী, তুমি এবার সীরিয়স হও।"

"সীরিয়স হয়েই ত আমার সব মুশকিল হয়েছে।"

"তা হ'লে হালকা হও।"

"দেখি হ'তে পারি কি না।"

"হিমাদ্রির জন্যে হোটেলে ঘর খুঁজছ কেন?"

"তবে সে থাকবে কোথায়?"

"কেন? তোমার কাছে?"

"তুমি বড্ড বেড়েছ।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, হিমাদ্রির থাকার ঘর ঠিক হয়ে আছে।"

বিস্মিত দেববাণী প্রশ্ন করল, "কি বললে?"

"হিমাদ্রির থাকার ঘর ঠিক হয়ে গেছে।"

"কোথায়?"

"তা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।"

"অন্য কেউ ভাবলে আমার পক্ষে খুব খুশি হবার কথা নয়।"

"আ-হা! এই ত তোমার মুখ খুলেছে। মানুষ হয়েছ দেখতে পাচ্ছি।"

নিজের অসতর্ক প্রগল্‌ভতায় লজ্জিত হ'ল দেববাণী।

সে বলল, "সঙ্গদোষ।"

"সঙ্গগুণ বল। মোট কথা, হিমাদ্রির বাসস্থান ঠিক আছে।"

"কোথায় ঠিক হ'ল?"

"এখানে।"

"তার মানে?

"খুব সহজ। হিমাদ্রি এখানে থাকবে। এই তুমি এখন যেখানে আছ।"

"আইরীণ!"

"বাণী!"

"তুমি কি ঠিক বলছ?"

খুশিতে উচ্ছল দেববাণী।

"বেচারী হিমাদ্রি। তোমার সঙ্গে থাকতে না পারলে, অন্তত তোমার কাছাকাছি ত থাক!"

"তুমি একটি এঞ্জেল, আইরীণ।"

"ধন্যবাদ। তা হ'লে তাই ঠিক রইল।"

"বব্‌কে জিজ্ঞেস করেছ ত?"

"না।"

একটু দমে গিয়ে দেববাণী বলল, "তা হ'লে কি ক'রে হবে?"

"বব্‌ নিজেই এ ব্যবস্থা দিয়েছে।"

"তাই নাকি?" আবার খুশিতে উছলে উঠল দেববাণী।

"এবার বল, বব্‌ একটি কিউপিড্‌?"

এতদিন দেববাণী গুছিয়ে যে-সমস্যার কথা ভাবে নি, ভাবতে চায় নি, তাকে না জানিয়েই তার মন সে-সমস্যার ওপর অনেকখানি প্রলেপ লাগিয়ে রেখেছে। দেশের মাটি, বায়ু, জল আর মানুষের স্পর্শে দেববাণীর অন্তর্দ্বন্দ্ব যেন অনেকখানি কোমল ও নরম হ'য়ে এসেছে। সলিসিটর তালুকদার বৈষয়িক বাস্তব যুক্তিতে তাকে কিছুটা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু ভয় তার সমস্যাকে মেটাতে পারবে না, দেববাণী তা ভালই বুঝতে পেরেছিল। তার মায়ের নীরব আকাঙ্ক্ষা ও অনুরোধ, সাবিত্রী আম্মার অভিজ্ঞতা-নিকষিত উপদেশ এবং বিপিনভাই দেশাই-এর অপ্রত্যাশিত কর্ম-প্রস্তাবনা: সবকিছু মিলে দেববাণীর অন্তরে একটা অনুক্ত, অস্পষ্ট অনুভূতি সৃষ্টি করেছে, যাকে ভাষায় রূপ দিতে গেলে হয়ত বলতে হবে, সব কিছু আমাকে তোমার কাছে টেনে আনছে, আমি নিজে আর নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারছি না। দেবকুমার হিমাদ্রিকে মায়ের স্বামীর ভূমিকায় গ্রহণ করবে কি না এ প্রশ্নের জবাব দেববাণী এখনও পায় নি;

কিন্তু মন তার বার বার বলছে, এ প্রশ্নের সমাধান আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না ; এবার তার একটা বিহিত করতে হবে। দেশের সঙ্গে সামান্য নতুন পরিচয়েই দেববাণী বুঝতে পেরেছে, বিদেশে তারা যেভাবেই বছরের পর বছর কাটাক না কেন, ভারতবর্ষে তাদের সম্পর্ককে সামাজিক অনুমোদনে সুপক্ক না করতে পারলে সসম্মানে কাজ করা যাবে না। বিপিনভাই দেশাই তাদের দু'জনকে বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ে আহ্বান করেছেন ; কিন্তু তাদের সম্পর্কে সামাজিক ছাপ না থাকলে এ চাকরি যে করা যাবে না, এটুকু দেববাণী ভালই বুঝতে পেরেছে।

স্বাধীন ভারতবর্ষের নীতি-মান দেববাণী যেটুকু দেখেছে এবং যা-সব কয়েক সপ্তাহে শুনেছে তাতে বুঝতে পেরেছে জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, এখানেও তেমনি, নানা বিরুদ্ধ প্রভাবের সংগ্রাম চলছে। শহুরে সমাজের উঁচু স্তরে নীতি-মান অনেকখানি নেমে এসেছে। নতুন ধনীদের মধ্যে বোধকরি সবচেয়ে বেশী। অন্যান্য ভোগের সঙ্গে নারী ও সুরা ভোগও ভারতবর্ষে অনেক বেড়েছে স্বাধীনতার পরে। এককালের ভোগবিমুখ নেতাদের বর্তমান সম্ভোগ বিলাসের যে-সব কাহিনী এরই মধ্যে সে শুনেছে তার যদি কিছুটাও সত্যি হয় তা হ'লে বুঝতে হবে, নীতিবাগীশতা দেশে আর নেই। পরস্ত্রীকে বিবাহ করার কয়েকটি কাহিনী দেববাণী শুনেছে ; ডিভোর্সের পর মেয়েরা স্বচ্ছন্দে আবার বিয়ে করছে। সাবিত্রী আম্মা একদিন হেসে বলেছিলেন, ডিভোর্স-করা মেয়েদের যত সহজে বিয়ে হয় কুমারী মেয়েদেরও তা হয় না। চলতি ভাষায় যাকে সোসাইটি বলা হয় তার মধ্যে সম্ভোগপ্রবাহ যে অনেকখানি ছড়িয়ে পড়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

সামাজিক নীতি-মান ভদ্র জীবনের পক্ষে অবশ্যই অনেকখানি উদার হয়েছে। কে কাকে বিয়ে করল তা নিয়ে দেববাণীর ছাত্রকালেও যে আলোড়ন হ'ত আজ আর তা নেই। কাজিন ম্যারেজ পর্যন্ত সমাজ উদারতার সঙ্গে গ্রহণ করছে। একজনের স্ত্রীকে ভাগিয়ে নিয়ে বিবাহ করলেও সমাজে সে গৃহীত হচ্ছে : কিছু দিন আগে দেববাণীর সঙ্গে এমন এক দম্পতির পরিচয় হয়েছিল। দিল্লীর কোনও কলেজে তাঁরা দু'জনেই পড়ান। মেয়েটি আগের স্বামীকে ছেড়ে বর্তমান স্বামীকে বিয়ে করেছে ; ডিভোর্স পর্যন্ত নেয় নি। ভারতবর্ষের আইন বোধ হয় এ বিষয়ে যথেষ্ট কড়া নয়। আনুষ্ঠানিক বিবাহ আইনত স্বীকৃত ; উত্তরাধিকারে উইল সবচেয়ে বেশী জোরাল। বিবাহ সম্পর্কে সমাজ ও দেশ যে অত্যন্ত উদার হয়েছে তাতে, অতএব, সন্দেহ নেই। কিন্তু

অবিবাহিত নরনারীর একত্র জীবনকে সমাজ এখনও গ্রহণ করে নি। সহজে করবেও না। বিদেশে এ ধরনের সম্পর্ককে সমাজ গ্রহণ না করলেও বর্জন করে না; সহ্য ক'রে নেয়। ভারতবর্ষে তা হবার নয়। এমন কি বিবাহের বাইরে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বও এদেশে কুৎসা ও ব্যঙ্গের বিষয়। অর্থাৎ, দেববাণী বুঝতে পেরেছে, ভারতবর্ষ কোনও রকমে মিলিয়ে দেবার জন্য ব্যগ্র; না মেলান পর্যন্ত তার মনে যেন শান্তি নেই। হিমাদ্রি ও আমি যদি দেশে এসে কাজ করতে চাই, বাস করতে চাই, দেববাণী মনে মনে গত কয়েকদিন বার বার বলেছে, তা হ'লে, তা হ'লে আমাদের বিয়ে করতে হবে, স্বামী-স্ত্রী হতে হবে।

অথচ, কি আশ্চর্য, দুজনের টাকায় লেকের ধারে বাড়ী করবার সিদ্ধান্তের সময়ও এমন স্পষ্ট ক'রে একথা দেববাণীর মনে হয় নি।

সেদিন উত্তীর্ণ সন্ধ্যায় ম্যাসাচ্যুসেট্স্ থেকে হিমাদ্রি অমন ক'রে বিদায় নেবার পর দেববাণী পরম নিশ্চিন্তে সারারাত ঘুমিয়েছিল। হিমাদ্রিকে সাধারণ পুরুষের নগ্ন ভূমিকায় দেখতে পেয়ে তার রমণী হৃদয় প্রগল্‌ভ পরিতৃপ্তিতে ভ'রে গিয়েছিল। সে যে নিজেকে দিতে পারে নি, এজন্য কোনও বেদনা সেদিন রাত্রে তার মনকে আঘাত করে নি। তার না-দেবার মধ্যে যে পরিপূর্ণ দান লুকিয়ে ছিল হিমাদ্রির মত অন্ধ মানুষের পক্ষেই তা দেখতে না পাওয়া সম্ভব; কিন্তু হিমাদ্রির কামনার চিহ্ন দেববাণীর সর্বাঙ্গে নিবিড় সুখস্পর্শের মত সারারাত লেগে রইল।

পরের দিন সে হিমাদ্রিকে চিঠি লিখল, সপ্তাহ-শেষে আমি তোমার অতিথি হ'ব। এয়ারপোর্টে এস।

বেশ সেজেগুজে দেববাণী স্টেশনে এসে উপস্থিত হ'ল। হিমাদ্রি কোনও দিন তাকে এমন সযত্নে সুবেশিত দেখে নি। এয়ারপোর্টেই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

"কি দেখছ?"

দেববাণী চিঠিতেই 'তুমি' লিখেছিল। মুখে এবার সম্বোধনটা একটুও আটকাল না।

"খুব সেজেছ, তাই দেখছি।"

"হঠাৎ একটু সাজতে ইচ্ছে হ'ল।"

হিমাদ্রি হাসল।

"চিঠিতে কিছু লেখ নি। হঠাৎ চ'লে এলে যে?"

"হঠাৎ চ'লে আসার ইচ্ছে হ'ল।"

"খুব ছেলেমানুষি করছ দেখছি," হিমাদ্রি খানিক হতবুদ্ধির মত বলল।

"কেন? আমি কি বুড়ী হয়ে গেছি?"

হিমাদ্রির হোটেলেই দেববাণীর জন্যে ঘর নেওয়া হয়েছিল। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। হোটেলে পৌঁছে দু'জনে যে যার ঘরে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে একত্র বেরিয়ে পড়ল।

দেববাণী বলল, "চল কোথাও গিয়ে বসি।"

"পার্কে যাবে?"

"বড় ভিড়।"

"তা হ'লে?"

"ইউনিভারসিটির পার্কে চল। সেখানটা নির্জন।"

হিমাদ্রি একটু ইতস্তত করল।

"চল।" দেববাণী বলল, তোমার ছাত্র ও সহকর্মীদের কাছে লজ্জা পাবার কিছু নেই।"

দু'জনে এসে ফুলে ভরা রং বাহার পার্কের ঘন সবুজ লনের একধারে বসল। হিমাদ্রির মুখে কথা নেই।

কথা বলল দেববাণী।

"অমন হন্ হন্ ক'রে চ'লে এলে কেন সেদিন?"

"তা ছাড়া আর কি করবার ছিল, বল?"

দেববাণীর মুখে হঠাৎ কথা এল না। নিজেকে সে গুছিয়ে নিল। খোলাখুলি কথা বলা তার স্বভাব, আজ আরও মনস্থির ক'রে এসেছে পরিষ্কার কথা বলবে।

একটু পরে বলল, "তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাও?"

হিমাদ্রি চমকিত হয়ে তাকাল। ব্যথা-আনন্দে অস্থির তার বড় বড় গম্ভীর চোখ দু'টি।

"হ্যাঁ।"

"তুমি সুখী হবে?"

"তাই ত মনে হচ্ছে।"

"আমার সবই ত তুমি জান।"

"সে কথা আবার তুলছ কেন?"

"আগে তোমাকে একটা কথা বলে নি। এ কথা শোনবার জন্যে তুমি অস্থির, শোনার অধিকারও তোমার পুরো। কথাটা আর কিছু নয়। আমি তোমাকে ভালবাসি।"

হিমাদ্রির মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"আমি তোমাকে ভালবাসি," দ্বিতীয়বার বলল দেববাণী। "আমাকে চেয়ে যে সম্মান তুমি দিয়েছ তাতে আমার জীবন যে কতখানি মূল্যবান হয়েছে তা তুমি বুঝবে না।"

"তা হ'লে তোমার মত আছে ?"

"কিন্তু পুরুষ ব'লে তুমি আমার কতগুলো সমস্যা বুঝতে পারছ না। এ সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আমি মত দিতে পারছি না।"

"কি সমস্যা ?"—হিমাদ্রির কণ্ঠে ব্যথার ধ্বনি দেববাণীর অন্তরে প্রতিধ্বনি তুলল।

"আমি মা।"

"তা কি আমি জানি না ?"

"তুমি জান। কিন্তু খোকন আমাকে ছাড়া আর কাউকে জানে না। সে আমাকে তোমার স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ না-ও করতে পারে।"

"কেন করবে না ? আমি তাকে যথেষ্ট স্নেহ করি।"

"খোকন তার বাবাকে ভোলে নি।"

একটু চুপ থেকে হিমাদ্রি প্রশ্ন করল, "তা হ'লে খোকনের জন্যে আমাদের বিয়ে হবে না ?"

করুণ হাসল দেববাণী। "তুমি এ বাধার অর্থ সবটা বুঝবে না। খোকন তোমাকে গ্রহণ করতে না পারলে আমাকেও সে পাবে না।"

"খোকনকে বুঝিয়ে বল।"

"সে সময় আজ নয়। খোকন এখানে নেই। সে বড় ছোট, এসব এখনও বুঝবে না।"

"তা হ'লে ভাবছ কেন ?"

"সে আমাদের কথা বুঝবে না। কিন্তু নিজের মনে ঠিক ভাববে, মা তাকে ছেড়ে চ'লে গেল।"

"তা হ'লে ?"

"খোকন ছাড়া আরও একটা কথা আছে।"

"বল।"

"যদি সে রাজী হয়, যদি আমরা কোনও দিন এক হ'তে পারি, তবু আমি আবার নতুন ক'রে মা হতে পারব না।"

"কেন?"

"খোকনের জন্যে। তা ছাড়া, সে-বয়সও আমার নেই।"

হিমাদ্রি ভাবল। বলল, "বয়স তোমার আছে। কিন্তু তুমি যদি না চাও, তা হ'লে আমার সন্তানের জননী তোমাকে হতে হবে না।"

"তুমি দুঃখ পাবে না?"

"হয়ত পাব। কিন্তু সে দুঃখ সইবে।"

দেববাণীর চোখে জল এসে গেল।

"তুমি অনেক বড়, তোমাকে যত দেখছি, তত তোমার মাহাত্ম্যের কাছে আমি ছোট হয়ে যাচ্ছি। আজ আমার সকল সমস্যা, দ্বন্দ্ব, চিন্তা, ভাবনা আমি তোমাকে দিলাম। তার সঙ্গে আমাকেও দিলাম তোমার হাতে তুলে। তুমি সব শুনলে, সব বুঝলে। এবার যা বলবে আমি তাই করব।"

হিমাদ্রি দেববাণীর হাত দু'টি দু' হাতে ধরল।

বলল, "তা হ'লে আমার প্রথম হুকুম তামিল কর।"

"হুকুম কর।"

"বড় ক্ষিধে পেয়েছে। চল খেতে যাই।"

হোটেলের ডাইনিং ঘরে দু'জনে খেল। অনেক রাত্রি পর্যন্ত দু'জনের কত কথা হ'ল। এক সময় দেববাণী বলল, "রাত অনেক হ'ল। এবার শুতে যাই।"

হিমাদ্রি উঠে দাঁড়াল।

দেববাণীকে বুকে টেনে নিয়ে হিমাদ্রি দেখল তার দেহ জ্বলল না। গভীর প্রেম তাকে শান্ত করেছে।

দু'দিন আনন্দে কেটে গেল, দুঃখেও। নিজেদের সমস্যা নিয়ে অনেক আলোচনা হ'ল। হিমাদ্রি বুঝল, দেববাণীর অন্তর্দ্বন্দ্ব বাস্তব, কঠিন; না মিটলে দেববাণী পুনরায় স্ত্রী হতে রাজী হবে না। হিমাদ্রি আরও দেখল, পুত্রকে দেববাণী যেমন ভালবাসে, তেমনই ভয় করে। তাকে নিজের আকাঙ্ক্ষার অনুকূলে আনবার কোনও পথ বা উপায় তার জানা নেই, তাকে নিজের সমস্যা বুঝিয়ে বলতে সে ভয় পায়। দেববাণীর একমাত্র ভরসা খোকন নিজেই একদিন মা'র অবস্থা বুঝবে। দেববাণীর মত বুদ্ধিমতী বৈজ্ঞানিক যে অসহায়

ভাবে এমন একটা ভুলকে আঁকড়ে থাকতে পারে হিমাদ্রি ভাবতে পারে নি। তাকে গভীর ভাবে ভাল না বাসলে সে নিশ্চয় অত্যন্ত বিরক্ত হ'ত। বর্তমানে তার প্রধান চিন্তা হ'ল কি ক'রে দেববাণীর মন থেকে এ সংশয় দূর করা যায়। জোর ক'রে দেববাণীকে বাঁধা যাবে না। তাকে ধীরে আস্তে বন্ধনের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।

দেববাণী ফিরে যাবার আগে হিমাদ্রি বাড়ী তৈরির কথা পাড়ল।

"তুমি একদিন বলেছিলে তোমার কলকাতায় লেকের ধারে একটা বাড়ী তৈরি করার ইচ্ছে।"

দেববাণী হেসে বলল, "সে ইচ্ছে এখনও আছে। আমাদের ছাত্রকালে লেক বড় রোমান্টিক ব্যাপার ছিল। আমরা উত্তর কলকাতার মেয়েরা কালে-ভদ্রে বালীগঞ্জ যেতাম। আমি লেকে বেড়াতে দু'তিনবারের বেশী যাই নি! কিন্তু সে দু'তিনবারের কথা এখনও আমার মনে আছে। সুদীর্ঘ সরোবর, মাঝে মাঝে ছোট ছোট দ্বীপ, নারকেল গাছের সারি, বিস্তীর্ণ সবুজ ঘাস; সব কিছু মিলে এক আশ্চর্য কোমল অনুভূতি। ওখানে যারা রোজ বেড়াবার সুযোগ পেত তাদের বেশ হিংসা হ'ত আমার, এখনও মনে পড়ে। কলেজের মেয়েরা লেক-পারের রোমান্স নিয়ে অনেক গল্প করত। আমি ভাবতাম, জীবনে যদি কিছু করতে পারি, লেকের ধারে একখানা ছোট্ট বাড়ী করব।"

"রোমান্সের লোভে?"

"ছোট্ট একখানা একতলা বাড়ী যার জানলা খুললে লেকের জল দেখা যাবে, নারকেল গাছের ছায়া পড়বে জলে, ঝির্‌ঝির্ হাওয়া বার বার কাঁপিয়ে তুলবে লেকের জল। খুব ভোরে উঠে আমি একবার বেড়িয়ে আসব লেকের ধারে, লোকজন কেউ তখনও আসে নি, রাত্রিশেষে লেক সবে জেগে উঠেছে।"

"সর্বনাশ! তুমি এত রোমান্টিক ছিলে নাকি!"

"কি ভয়ানক রোমান্টিক যে ছিলাম ছোটবেলা তা বুঝি বলার নয়। অসম্ভব রকম রোমান্টিক ছিলাম ব'লেই জীবনে অত বড় ভুল করা সম্ভব হয়েছিল।"

হিমাদ্রি তাড়াতাড়ি বলল, "লেকের ধারে বাড়ী একটা তৈরি ক'রে নাও না কেন?"

নিজের মনেই দেববাণী বলল, "করা হয়ত যায়। কিন্তু সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই।"

হিমাদ্রি বলল, "এস দু'জনে একসঙ্গে একটা বাড়ী কিনে ফেলি?"

চমকে উঠল দেববাণী। হঠাৎ কিছু বলতে পারল না।

হিমাদ্রি বলল, "আমারও ইচ্ছে লেকের কাছাকাছি একটা বাড়ী করার। দু'জনের দু'টি ছোট্ট বাড়ী যোগ দিলে বেশ বড় একটা বাড়ী হতে পারে। বড় বাড়ীর অনেক সুবিধে।"

"কিন্তু সে বাড়ীতে বাস করবে কে?"

"বাড়ী বানালেই যে বাস করতে হবে তার কোনও মানে নেই। তুমি আর আমি একসঙ্গে ত কিছু এখনও করলাম না, এস আগে একটা গৃহ-নির্মাণ করি। যদি-কোনও দিন আমরা বাস না-ও করি আমাদের ভালবাসা ওখানে বাস করবে।"

দেববাণী তক্ষুণি রাজী হয়ে গেল।

"বেশ। কিন্তু কারুর বাড়ী আমি কিনতে রাজী নই। আমরা নতুন বাড়ী তৈরি করব।"

"সে ভয়ানক ঝামেলা।"

"মা সব ব্যবস্থা করতে পারবেন। তুমি মাকে জান না। তুমি এখান থেকেই ভাল কনট্রাকটার ঠিক করতে পারবে। তোমার ত চেনা-জানার অন্ত নেই।"

"টাকা কিন্তু আমি বেশী দেব।"

"কেন?"

"তাই নিয়ম।"

দেববাণী হাসল।

"দিয়ো। যত খরচ হবে তার একান্ন ভাগ তোমার, উনপঞ্চাশ ভাগ আমার। কনট্রোলিং শেয়ার তোমারই থাকবে।"

বাড়ী তৈরি হবার সঙ্গে সঙ্গে দেববাণীর মনে আশ্চর্য পরিবর্তন এল। হিমাদ্রি আলগোছে দায়িত্বের প্রায় সবটুকু তার ওপর ছেড়ে দিল। আরকিটেক্টের প্ল্যান নিয়ে হিমাদ্রির সঙ্গে আলোচনা করতে গেলে হিমাদ্রি বলল, "বাড়ীর আমি কি বুঝি বল? ও-সব তুমি যা ভাল মনে কর তাতেই আমার মত। বরং তোমার ওখানে এদেশী কোনও আরকিটেক্টকে দেখাও।" টাকা হিমাদ্রি দেববাণীর ব্যাঙ্কে তার নামে জমা ক'রে দিল। অর্থাৎ বাড়ী নিয়ে দেববাণীকে, অন্য সব কাজের মধ্যে, যথেষ্ট ব্যস্ত থাকতে হ'ল। মাকে টাকা

পাঠান, মা'র চিঠির উত্তর দেওয়া, কনট্রাক্টরের সঙ্গে পত্রালাপ, সব কিছুই তাকে করতে হ'ল। মাঝে মধ্যে হিমাদ্রি এসে দু'চারবার পরামর্শ দিল, টেলিফোনে অনেকবার তার সঙ্গে দেববাণী আলাপ করল, কিন্তু হিমাদ্রি কেমন অনায়াসে একপাশে স'রে দাঁড়াল।

শুধু তাই নয়, বাড়ী মাত্র কিছুটা তৈরি হয়েছে, এমন সময় হিমাদ্রি আমেরিকা ছেড়ে য়ুরোপ চ'লে গেল।

বোস্টনে হিমাদ্রির পড়ানোর মেয়াদ শেষ হয়ে আসছিল। ইচ্ছে করলে সেখানেই, বা আমেরিকার অন্য কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে, সে আবার চাকরি পেতে পারত। কিন্তু দেববাণীকে সে জানাল, আমেরিকায় থাকবার ইচ্ছে তার আর নেই। সে যাচ্ছে লণ্ডনে।

দুজনে এবার যখন দেখা হ'ল, দেববাণী দেখতে পেল, হিমাদ্রি কেমন অস্থির হয়ে উঠেছে।

"তুমি আমার কাছ থেকে পালাচ্ছ কেন ?" প্রশ্ন করল দেববাণী।

"পাছে তোমার ওপর জুলুম ক'রে বসি, তাই।" পরিষ্কার জবাব দিল হিমাদ্রি।

"তুমি পালিয়ে গেলে কি জুলুম কম করা হবে ?"

"কাছে থাকলে আরও বেশী হবে।"

"এই সব বাড়ীঘরের দায়িত্ব আমার ওপর চাপিয়ে তুমি স'রে পড়ছ ?"

"তুমি অনেক বোঝা বইতে পার, বাণী, এ বোঝাও তোমার সইবে। আমি এমনি ক'রে আর পারছি না।"

বড় ক্লান্ত মনে হ'ল হিমাদ্রিকে। দেববাণীর অন্তর ব্যথিয়ে উঠল। চোখে জল ঘনিয়ে এল। মনে মনে সে বলল, "আমি একাই বুঝি সব পারি ! আমার ক্লান্তি নেই, আমি ভেঙে পড়ি না ?"

হিমাদ্রি লণ্ডনে চ'লে যাবার পর দেববাণী একা তাদের যৌথ গৃহ-নির্মাণের দায়িত্ব পালন করল। বাড়ীটা তৈরি হবার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য হয়ে দেববাণী দেখল, তার নতুন একটা সত্তাও বাস্তব জন্ম নিয়েছে।

হিমাদ্রির সঙ্গে সম্পর্কের এই প্রথম শরীরী প্রতিচ্ছবি দেববাণীর নতুন সত্তা। এর সঙ্গে তার পূর্বেকার জীবনের কোনও সম্পর্ক নেই। এমনকি খোকন পর্যন্ত এর সঙ্গে জড়িত নয়। লেকের ধারে এই না-দেখা গৃহ দেববাণী-হিমাদ্রির

ভালবাসাকে প্রথম বাস্তব রূপ দিল। শুধু যে বাড়ীর প্রতি সুগভীর মমতা দেববাণীর হৃদয় জুড়ে বসল তা নয়, এই প্রথম তার মনে সম্পত্তি-বোধ জেগে উঠল। মনে হ'ল আমার এবার স্থিতি আছে, আমি এবার বাস্তব সম্পত্তির মালিক। শুধু আমি নই, আমি ও হিমাদ্রি। এ আমাদের গৃহ, এর প্রত্যেকটি ইঁট, প্রতিটুকু সুরকি, প্রতি ইঞ্চি দেওয়াল আমাদের একত্র করেছে। লেকের প্রশান্ত জল আমাদের বাড়ীর ছায়া বহন করছে, নারকেল গাছের ছায়া পড়েছে আমাদের বাড়ীর দেওয়ালে ; বুদ্ধ-মন্দিরের ঘণ্টা শোনা যাচ্ছে আমাদের বাড়ী থেকে ; ঘন-সবুজ ঘাস এসে মিলেছে আমাদের বাড়ীর ফটকে।

বাড়ী তৈরি শেষ হলে তার অনেকগুলো ফটো আনাল দেববাণী। নানা দিক্ থেকে তোলা, প্রত্যেকখানায় নতুন গৃহের নবতর শোভা। তিনতলা বড় বাড়ীর স্থাপত্য অনেকখানি মার্কিন, এবং হাল-ফ্যাসানের সুন্দর। কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে দেববাণী লণ্ডনে চ'লে গেল হিমাদ্রিকে ফটোগুলি দেখাতে।

লণ্ডন যুনিভারসিটির কিংস কলেজে হিমাদ্রি তখন পড়ায়। দুজনে তারা লাঞ্চ খেল, বিকেলে বেড়াতে গেল, একসঙ্গে সঙ্গীত, নাটক, ছায়াচিত্র দেখল। আর প্রাণ খুলে কথা বলল।

শুধু তাই নয়। টেম্‌স্ নদীর ধারে হিমাদ্রিকে গান শোনাল দেববাণী। বহু বছর পরে আবার সে গান পর্যন্ত গাইতে পারল।

বাড়ীর ছবিগুলি দেখে হিমাদ্রি মহা খুশি।

"গৃহ ত হ'ল" একদিন সে বলল, "এবার গৃহপ্রবেশ ?"

"আশীর্বাদ কর, তাও যেন একদিন হয়।"

"আর কতদিন এমনি ক'রে কাটবে ?"

বিষণ্ণ মুখে দেববাণী বলল, "জানি না। এখনও জানি না।"

"চল দেশে ফিরে যাই।"

"না। সময় তার এখনও আসে নি।"

"তুমি অকারণ ভয় পাচ্ছ, বাণী। আমি তোমার সমস্যা বুঝতে পেরেছি। খোকনকে তুমি তোমার অতীত জীবন থেকে আলাদা ক'রে দেখতে পারছ না ; তাই তোমার ওকে নিয়ে এত ভয়। যে অতীত মিথ্যা, যার কোনও অর্থ নেই, তার সঙ্গে বেঁধে রেখেছ তুমি খোকনকে। তাতে তার ওপর ভয়ানক অন্যায় করছ তুমি। খোকনকে তোমার নতুন জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পার নি। পারলে তোমার আর কোনও সংশয় থাকবে না।"

"তুমি ঠিকই বলেছ।"

"কিন্তু এভাবে ত চলতে পারে না। তুমি নিজেই কেবল এ অন্যায়ের প্রতিকার করতে পার। প্রতিকার তোমাকে করতেই হবে।"

"করব। আর কিছু সময় দাও আমায়।"

"কত সময়?"

"আরও কিছু দিন। যদি পারি প্রতিকার করতে, তোমার পাশে এসে দাঁড়াব। যদি না পারি, তুমি আমায় ক্ষমা করবে।"

বছর খানেক প'রে হিমাদ্রি হঠাৎ ভিয়েনা য়ুনিভারসিটিতে চাকরি নিয়ে চ'লে গেল। দেববাণীকে লিখল, জার্মান ভাষা শিখেছি, এবার জার্মানভাষী বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে একত্র কাজ করার ইচ্ছে হয়েছে।

দেববাণী বুঝল হিমাদ্রি অস্থির হ'য়ে পৃথিবীর ইতস্তত বিচরণ করছে, কোথাও স্থির হ'য়ে বসতে পারছে না।

ভিয়েনা থেকে একদিন হিমাদ্রির চিঠি এল, তুমি ভারতবর্ষে যাবে? আমার মনে হয় তোমার একবার যাওয়া দরকার। মাকে দেখে এসো, আমাদের বাড়ীটা দেখে এসো। আর—দেশে গিয়ে নতুন ক'রে আমাদের কথাটা ভেবে দেখো।

দেববাণী লিখল, তোমার কথামত কাজ করব, সে কথা তোমাকে দিয়েছি। ছুটি নিয়ে দেশে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছি।

হিমাদ্রি ভাবল, ভারতবর্ষের বাইরে দেববাণী তার সমস্যার সমাধান পাবে না। বাইরের পৃথিবীতে সে খ্যাতি পেয়েছে, স্থিতি পায় নি, পেতে পারে না। আসলে সে ভারতবর্ষের মেয়ে, তাকে নিয়ে এবার দেশে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু হঠাৎ দেববাণী দেশে ফিরে যেতে রাজী হবে না। তাই হিমাদ্রি দেববাণীকে অন্তত কিছুদিনের জন্যে ভারতবর্ষে পাঠাবার জন্যে উদ্যোগী হল।

ভিয়েনায় ব'সে হিমাদ্রি দেববাণীর দেশে আসবার ব্যবস্থা করল। দিল্লী ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণ তারই চেষ্টায় সম্ভব হ'ল। দেববাণী জানতে পারল না।

ভারতবর্ষে রওয়ানা হবার দিন পনর আগে হিমাদ্রি আচমকা আমেরিকা চলে এল। নিউ হয়র্কে দু'দিন কাটিয়ে সোজা ম্যাসাচ্যুসেট্‌স্।

দিল্লীতে গবেষণাগার স্থাপনের প্রস্তাব শুনে প্রথম দেববাণী ভাবল, হিমাদ্রি বুঝি রসিকতা করছে। কিন্তু সে অবাক্ হয়ে দেখল, হিমাদ্রি যে কেবল

আন্তরিক তাই নয়, বেশ কিছুদিন এ নিয়ে সে কাজ ক'রে গেছে, বহু বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে পত্রালাপ করেছে, আমেরিকায় একটি ফাউণ্ডেশনের কাছ থেকে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত আদায় করেছে। দেশে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে চিঠিপত্র লিখে নানা ধরনের খোঁজ-খবর, পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেছে। এমন কি গবেষণাগার-ভবনের প্ল্যান পর্যন্ত জার্মান আরকিটেক্ট দিয়ে তৈরি ক'রে নিয়ে এসেছে।

তিন-চার দিন ধ'রে এ নিয়ে তাদের চলল আলাপ আলোচনা। দেববাণী প্রথমে জোরের সঙ্গে আপত্তি করেছিল, কিন্তু হিমাদ্রি তার প্রত্যেকটি আপত্তি খণ্ডন ক'রে তাকে উৎসাহিত ক'রে তুলল। বিদেশে, সে বলল, দীর্ঘদিন কেটে গেল, আর বেশীদিন কাটান ঠিক হবে না। দেববাণী হয়ত ভাবছে দেশে গিয়ে লাভ নেই, কিন্তু দেশে না গিয়ে লাভ আরও কম। ভারতবর্ষ আমাদের ডাকছে, বাণী: সে তার সব সন্তানদের ডাকছে। মনে ক'রে দেখ, বিরাট আমাদের দেশ, সহস্র বৎসর নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকে, আজ হঠাৎ য়ুরোপ-আমেরিকা-রাশিয়ার সঙ্গে দৌড়তে চাইছে। বিজ্ঞান ভারতবর্ষে যা করতে পারে পৃথিবীর আর কোথাও তা পারে না। এরা বিজ্ঞানের শক্তি নিয়ে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না, এদের বাড়তি উৎপাদনের জন্যে বাজার নেই, বিলাস-আরামের সামগ্রী নিয়ে জীবনটাকেই এরা অন্ধ-অপচয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে; আর আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ গ্রামে এখনও কোরোসিনের লণ্ঠন জ্বলছে। বিজ্ঞানের ব্যবহারিক অবদানের জন্যে ভারতবর্ষ আজ উন্মুখ হয়ে বসে আছে। আমরা যে যা শিখেছি, জেনেছি, বুঝেছি তা যদি দেশের সেবায় না লাগে তা হ'লে সে যে ব্যর্থ!

"দেশকে আমরা কতটুকু জানি? তুমি হয়ত কিছুটা জান, আমি তো একেবারে জানি নে।" দেববাণী ভয়ে ভয়ে বলল।

"বিদেশকেই কি আমরা একটুও জানি? তুমি এতগুলো বছর আমেরিকায় কাটালে, আমেরিকাকে তুমি কতটুকু জান? এদের ভাণ্ডার অপর্যাপ্ত, উপচে পড়া; নিজেদের সব চাহিদা মিটিয়েও এরা আমাদের কিছু দিতে পারছে, তাই আমরা মোটা মাইনের চাকরি করছি, ব্যাঙ্কে টাকা জমছে। কিন্তু এরা কি আমাদের প্রাণ-খুলে গ্রহণ করেছে? সর্বদা কি মনে করিয়ে দিচ্ছে না, মানুষ হিসেবে, দেশ হিসেবে তোমরা ছোট, আমাদের দয়া ও উদারতার প্রার্থী? এদের ব্যবহারে সহৃদয় অনুকম্পা দেখে তোমার গা জ্ব'লে যায় নি? আমাদের

দেশের রাজনৈতিক নেতারা সত্যিকারের বুদ্ধিমান ও দেশপ্রেমিক হলে যে-সব ভারতীয় বিদেশে বিজ্ঞান শিখেছে তাদের সবাইকে দেশে ফিরে কাজে নেমে যেতে বাধ্য করতেন। রাশিয়া তাই করেছিল; কোন কোন আফ্রিকান দেশ আজও তাই করছে।"

"তোমার গবেষণাগারের প্রস্তাব ভারত সরকার গ্রহণ করবেন, ভরসা কি?"

"না করলে ক্ষতি নেই, আমরা একবার চেষ্টা ক'রে ত দেখি। আমিও বহুদিন বাইরে, দেশের বর্তমান গতি-গতি, দৃষ্টি-ধারণা আমার জানা নেই। এমন হ'তে পারে যে, বে-সরকারী মার্কিন সাহায্যে বে-সরকারী গবেষণাগার গঠনের প্রস্তাব গভর্ণমেণ্টের মনঃপূত হবে না। আবার, এমন না-ও হ'তে পারে। তুমি যখন যাচ্ছ দিল্লীতে তখন চেষ্টা ক'রে দেখতে দোষ্ কি? চেষ্টা করতে গিয়ে তুমি অনেক মানুষের সংস্পর্শে আসবে, অন্যথা সে সুযোগ তোমার হবে না। স্বাধীন ভারতের সঙ্গে তোমার বেশ খানিক পরিচয় হয়ে যাবে। হয়ত নিজেই বুঝবে, যেমন আমি মনে মনে নিঃসন্দেহে বুঝেছি, ভারতবাসী বাইরে যত সাফল্যই পাক না কেন, যে স্বাভাবিক শান্ত সাধনায় জীবন সত্যি-কারের সফল, তা সে কেবল পেতে পারে ভারতবর্ষে।"

"অর্থাৎ তোমার ইচ্ছে আমরা দেশে ফিরে যাই।"

"আমার ইচ্ছের সঙ্গে তোমার ইচ্ছে একত্র না হলে তা যে সম্ভব নয়, বাণী! আমার মনে হয়, ভারতবর্ষে গিয়ে তুমিও আমার ইচ্ছেয় শেষ পর্যন্ত সায় দেবে। আমাদের দেশের মাটি-জল-হাওয়ার সবচেয়ে বড় গুণ কি জান? তারা টেনে কাছে আনে। মানুষের মনকে নরম, সিক্ত করে।"

দুঃখের সঙ্গে দেববাণী বলল, "আমার মত কঠিনহৃদয় মেয়েকে তাই বুঝি তুমি দেশে পাঠাচ্ছ?"

"আমি পাঠাচ্ছি না। তুমি যাচ্ছ। আমি তোমায় এ-যাওয়াকে মনে প্রাণে স্বাগত করি। দেশে গিয়ে তুমি দেখবে কত সহস্র অদৃশ্য বন্ধনে তার সঙ্গে তুমি বাঁধা। কলকাতায় গিয়ে দেখবে, তোমার সঙ্গে তার কত যুগের অনুচ্চারিত বন্ধন। অতীতের অনেক কিছু তোমার মনে পড়বে, তুমি বুঝবে কোন্ গভীর ধারায় জন্ম-জন্মান্তর থেকে আমাদের জীবন একসঙ্গে প্রবাহিত। আমরা ভারতবর্ষের লোক, বাণী, জীবনটাকে আমরা হঠাৎ-গজান মাশ্‌রুম ব'লে মনে করি না। আমাদের কাছে জীবন অনাদি-অনন্ত; এক

ঘাটের দেনা-পাওনা নিয়ে সে অন্য ঘাটে উপস্থিত হয়, তার একটা রহস্যময় ধারাবাহিকতা আছে। দেশে না গেলে তোমার মনের অশরীরী ভয়গুলি কাটবে না, দ্বন্দ্বের মধ্যেই যে সমন্বয়ের বীজ লুকিয়ে আছে তার সন্ধান তুমি পাবে না।"

আজ দেববাণী বুঝতে পারছে হিমাদ্রির কথার সত্যতা। যে ভয়গুলিকে হিমাদ্রি 'অশরীরী' নাম দিয়েছিল তারা কেমন স্তিমিত হয়ে পড়েছে। কলকাতায় লেকের ধারে তাদের বাড়ী দেখে দেববাণীর মনে আশ্চর্য বেদনা মোচড় দিয়ে উঠেছিল; সে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল, হিমাদ্রিকে বাদ দিয়ে বাকী জীবনে কোনও আনন্দ পাওয়া তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। কলকাতায় যেখানেই সে গেছে—সায়ান্স কলেজে, নিজের কলেজে, নিজেদের হাতি-বাগানের ছোট্ট সেই প্রাচীন ফ্লাটে—সেখানেই হিমাদ্রির পদচিহ্ন তাকে বিহ্বল করেছে। সঙ্গে সঙ্গে অতীত জীবনের আতঙ্কিত ছায়াও দেখতে পেয়েছে দেববাণী; পথ চলতে মাঝে মাঝে আঁৎকে উঠেছে; এবং আরও বেশী ক'রে অনুভব করেছে হিমাদ্রির সংরক্ষক ব্যক্তিত্বের অভাব। দিল্লী এসে গবেষণাগারের প্রস্তাব নিয়ে গভর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য অনেকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতে আলাপ-পরিচয়ে, বন্ধুত্ব-আত্মীয়তায় দেববাণীর বিস্মিত অন্তর হিমাদ্রির সঙ্গে একত্র হয়ে কোনও বড় কিছু করবার আনন্দের প্রথম আস্বাদে বার বার শিহরিত হয়েছে।

সাবিত্রী আম্মার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও বন্ধুত্ব না হলে, দেববাণী জানে, এই নতুন পরশ-পাথর উপলব্ধি তার হ'ত না। সাবিত্রী আম্মার মধ্যে দেববাণী নিজের জীবনের অপেক্ষাকৃত পুরাতন সংস্করণ দেখতে পেয়েছিল, যেমন তার মধ্যে তিনি নিজেকেই নতুন ক'রে দেখেছিলেন। হিমাদ্রি যে জীবনের ধারা-বাহিকতার কথা বলত, তার অর্থ এতদিনে দেববাণীর কাছে একটু পরিষ্কার হ'ল। যে-পথে এই শতাব্দীর পাদদেশে সাবিত্রী আম্মা বিদ্রোহ করেছিলেন, যে অসামান্য দৃঢ় সাহসে, বলিষ্ঠ বিদ্রোহী আত্ম-বিশ্বাসে তিনি এক থেকে অন্য সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, প্রায় চল্লিশ বছর পরে দেববাণীও সে পথেরই নবতর শাখায় দুঃসাহসে আত্ম-প্রতিষ্ঠায় লেগে গিয়েছিল। তবু, যুগের ব্যবধানে, এই দু'ধারার মধ্যে প্রভেদ অনেক। সাবিত্রী আম্মা দেশের সেবায় স্বাধীনতা-সংগ্রামে নতুন ক'রে বাঁচবার আগুন পেয়েছিলেন। দেববাণীর জীবনে আজ পর্যন্ত ব্যক্তি ও পরিবারের বাইরে দেশ বা সমাজের বৃহত্তর উত্তাপ আসে নি।

বিপিনভাই দেশাই-এর সঙ্গে আলাপ হবার আগে সাবিত্রী আম্মার জীবনের একটা দিক তার অজানা থেকে গিয়েছিল। তাঁর নিঃশৈবিত জীবনে এই নতুন আলোকপাতের পর সাবিত্রী আম্মার শেষ উপদেশ আরও গভীর ভাবে দেৰবাণীর মনকে প্রভাবিত করল।

আঠার

পরের দিন বাসন্তী দেবীকে হরিদ্বারের রেল গাড়ীতে তুলে দিয়ে দু'একটা কাজকর্ম সেরে দেববাণী যখন নিজামুদ্দিনের বাসায় ফিরল তখন দুপুর শেষ হয়ে অপরাহ্ণ শুরু হয়েছে। নিস্তব্ধ বাড়ী—আইরীণদের কেউ বাড়ী নেই। সিঁড়ি বেয়ে দেববাণী ওপরে উঠে বারান্দায় এসে চমকে গেল।

দেখল, বারান্দায় আরাম কুরসিতে ঘুমিয়ে রয়েছে সরোজা।

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল দেববাণী কিছুক্ষণ। সরোজার চুলে তেল পড়ে নি, রুক্ষ কুন্তল কোনও মতে বেঁধে রেখেছিল, এখন খুলে ছড়িয়ে পড়েছে চেয়ার ছাপিয়ে প্রায় মেঝে পর্যন্ত। চোখের কোণে কালি পড়েছে। অমন সোনার মত রং ম্লান। ঘুমন্ত মুখখানায় একবিন্দু কাঠিন্য নেই, বরং ক্লান্ত সৌন্দর্য অব্যক্ত বেদনার সঙ্গে মিশে অপূর্ব সুষমা সৃষ্টি করেছে। দামী কাঞ্চীপুর সিল্কের শাড়ী পরেছে সরোজা, তার সঙ্গে আজ আর ব্লাউজের মিল নেই; শাড়ীটাও অগোছাল ক'রে পরা। কালো কাশ্মীরী শাল গায়ে জড়ান; কিন্তু বুক থেকে সরে গেছে, ঘুমন্ত নিশ্বাস-প্রশ্বাসে তার দুটি সুস্পষ্ট কুমারী বুক উঠছে, নামছে।

ক'দিন ধরেই সরোজার কথা বার বার মনে হচ্ছিল দেববাণীর। সাবিত্রী আম্মার অসুখের সময় তার অনুরূপ দেখে আরও বেশী। পরন্তু সাবিত্রী আম্মার বাড়ীতে তাকে খুঁজে না পেয়ে দেববাণী বিস্মিত ও খানিকটা উদ্বিগ্ন হয়েছিল। বিপিনভাই দেশাই-এর কাছে এ জন্যেই সে সরোজার খোঁজ নিয়েছিল। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও তার চেয়ে বেশী কিছু সে করতে পারে নি।

সরোজা যে এ ভাবে তার ফ্ল্যাটে এসে নিঃসহায় ঘুমিয়ে থাকবে, দেববাণী একবারও ভাবে নি।

তার মনে হ'ল, বেচারা ঘুমুক। কতদিন ভাল ক'রে ঘুম হয় নি নিশ্চয়; কত না ক্লান্তি ওর দেহে জমেছে। বারান্দায় জুতো ছেড়ে খালি পায়ে দেববাণী এগিয়ে এসে সাবধানে ল্যাচ্-কী দিয়ে দরজা খুলল।

কিন্তু সে সামান্য শব্দেই জেগে গেল সরোজা।

সে যে জেগে গেছে, দেববাণী বুঝতে পারল না। দরজা খুলে ঘরে ঢুকবে, এমন সময় সরোজার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, "মাপ করবেন, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

দেববাণী ফিরে এসে তার সামনে দাঁড়াল। সরোজার চোখ রক্তিম। সে নিজেকে যেন চাবুক মেরে চেয়ারে সোজা ক'রে বসাল। দেববাণী বুঝল, আর যাই হোক, এ মেয়ে সহানুভূতির, সমবেদনার প্রার্থী হয়ে আসে নি।

"তাই ত দেখলাম," সে সামান্য হেসে বলল, "অনেকক্ষণ এসেছ বুঝি ?"

হাত-ঘড়ি দেখে সরোজা বলল, "পঁয়ত্রিশ মিনিট।"

"তোমার ঘুম দেখছি খুব হাল্কা। আমার ঠিক উল্টো। একবার ঘুম এলে সহজে ভাঙে না।"

"আমি আপনার কোনও কাজে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি না ত ?" সরোজা প্রশ্ন করল। "তা হ'লে বরং আমি আজ যাই।"

"না, না," দেববাণী জোর দিয়ে বলল, "আমার আজ এখন আর কাজ নেই। মা হরিদ্বার গেলেন। তাঁকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে দু'একটা কাজ সেরে এসেছি, আবার সেই বিকেলে বেরুব।"

ঘরে ঢুকল দেববাণী। ঘর থেকেই বলল, "তুমি বোস। কফি বানাচ্ছি। বড় তেষ্টা পেয়েছে।"

ইলেকট্রিক পারকোলেটরে কয়েক মিনিটে দু'কাপ গরম কফি তৈরি ক'রে নিল দেববাণী। সরোজা কফি পানে আপত্তি করল না। দেববাণী তার মুখোমুখি চেয়ারে পা এলিয়ে বসল।

বলল, "শীত শেষ হয়ে আসছে। দুপুরে ত রীতিমত রোদের তেজ। আজ দেখলাম রাস্তায় গাছ থেকে পাতা ঝরছে।"

কফি পান করল সরোজা কথা না ব'লে। পাত্র নামিয়ে রেখে প্রশ্ন করল :

"আপনার লেবরেটরী কবে তৈরি হচ্ছে ?"

হেসে ফেলল দেববাণী। বলল, "আপাতত বোধ হয় হচ্ছে না।"

"ভেস্তে গেছে তা হ'লে ?"

"একেবারে না গেলেও বোধ করি যাবে।"

"আমি খুব খুশি হয়েছি।"

"হবারই কথা। তুমি ভাবছ, কেমন, যা বলেছিলাম তাই হ'ল ত ?"

ঈষৎ হাসি খেলে গেল সরোজার বাঁকা অধরে।

"মা নেই, আপনার জন্যে দুঃখ করবার লোকের অভাব।"

"সত্যি তাই। দুঃখে অবশ্য আমিও খুব কাতর হচ্ছি না।"

বিশ্বাস করল না সরোজা। বলল, "হলেও স্বীকার করবেন না।"

"তা নাও করতে পারি।" দেববাণী হেসে বলল।

"আপনি কবে ফিরে যাচ্ছেন আমেরিকা?"

"আরও মাস খানেক আছি।"

"মাদ্রাজ যাচ্ছেন কবে?"

"দু'সপ্তাহ পরে।"

"এখানে আবার ফিরে আসবেন?"

"সম্ভবতঃ আসব না। কলকাতা থেকে চ'লে যাব।"

সরোজার কথা ফুরোল। চুপ্ ক'রে জানলার বাইরে তাকিয়ে রইল সে। কিছু দূরে নতুন-তৈরি পথের ধারে ঝুপড়িতে কয়েকটি দোকান বসেছে। বাড়ী ঘর তৈরি করতে রাজস্থানী মজুরদের রোজ আমদানী দিল্লী শহরে। তাদের দোকান। অমনি একটা দোকানের পানে তাকিয়ে রইল সরোজা।

দেববাণী ব'লে উঠল, "তুমি এবার কি করবে?"

বাইরে তাকিয়েই সরোজা জবাব দিল, "এবার মানে?"

"তুমি কি চাকরিই করবে?"

"তবে কি করব?"

দেববাণী কি বলবে বুঝতে না পেরে চুপ করে রইল। সরোজা যেন তার মনের ভাব টের পেল। বলল, "আপনি আমাকে দেখে অবাক্ হন নি?"

"খুশি হয়েছিলাম বেশী।"

"খুশি কেন?"

"তোমার মা মারা যাবার পরের দিন সকালে তোমাদের বাসায় তোমাকে দেখতে পাই নি। খোঁজ ক'রে দেখলাম, তুমি কোথায় কেউ জানে না।"

"কারুর জানবার প্রয়োজন ছিল না।"

"তারপর কাল বিপিনভাই দেশাই-র সঙ্গে দেখা হল। তাঁকে তোমার কথা জিজ্ঞেস করলাম। দেখলাম তিনিও জানেন না।"

"আপনি দেখছি আমার খুব খোঁজ করেছেন। মা-মরা মেয়েটার জন্যে নিশ্চয় আপনার দুঃখ হচ্ছিল।"

দেববাণী সোজা তাকাল সরোজার চোখে।

বলল, "অনেকবার আমার কি মনে হয়েছে জান? মনে হয়েছে তোমার গালে ঠাস ক'রে একটা চড় মেরে দি।"

সরোজা হতভম্ব হয়ে গেল। বড় বড় চোখে চেয়ে রইল দেববাণীর মুখে।

ঠোঁট কেঁপে উঠল। মুখে এক ঝলক আগুন খেলে গেল। তারপর সে হঠাৎ হেসে উঠল।

সরোজা রেগেমেগে বেরিয়ে গেলে দেববাণী আশ্চর্য হ'ত না; তার অস্বাভাবিক দমকা হাসিতে সে হতবুদ্ধি হ'ল।

হাসতে হাসতে সরোজা বলল, "সে মন্দ হবে না। অন্তত নতুন কিছু হবে। কোনও দিন চড় খেয়ে দেখিনি। খুব ব্যথা লাগবে বুঝি? গালে দাগ পড়বে না ত?"

দেববাণীর সহ্য হ'ল না। চেঁচিয়ে ধমক দিয়ে উঠল, "চুপ কর, সরোজা!"

বেহুঁশ হাসি থামিয়ে সরোজা গম্ভীর হ'ল।

দেববাণী বলল, "তুমি আমার কাছে কেন এসেছ? কোনও কাজ আছে?"

অবাক্ হ'ল সরোজা। মনের মধ্যে হাতড়ে দেখে বলল, "না ত!"

"তবে এসেছ কেন?"

"এমনি। যাবার মত আর কোনও স্থান মনে পড়ল না, তাই।"

দেববাণীর দুঃখ হ'ল। বলল, "তোমার বাবা চ'লে গেছেন?"

"আমার মৃত জননীর ভূতপূর্ব স্বামী চ'লে গেছেন।"

"ছিঃ, সরোজা," দেববাণী শাসন করল, "অমন ক'রে বলতে নেই।"

"তবে কেমন ক'রে বলতে আছে, ব'লে দিন। মার হার্টের ব্যারাম হ'ল, হাসপাতালে নিয়ে গেল সবাই। বার বার মাকে জিজ্ঞেস করলাম, বাবাকে খবর দেব? প্রত্যেকবার বললেন, দরকার নেই। অবস্থা যখন খুব বাড়াবাড়ি হ'ল তখন ভয় পেয়ে মা'র সহকর্মীরা মিলে বাবাকে তার করলেন। তিনি যখন এলেন তখন মার আর জ্ঞান নেই। মার শবদেহ চিতায় ভস্ম হবার বারো ঘণ্টা পরে তিনি বিদায় নিলেন।"

তিক্ত হাসির সঙ্গে সরোজা যোগ দিল, "এবার বলুন, কেমন ক'রে বলব।"

দেববাণীর মুখে সহজে ভাষা এল না। কষ্ট ক'রে সে বলল, "তবু তিনি তোমার বাবা।"

"তাই ত মুশকিল। তিনি—তবু—আমার বাবা; স্বর্গগতা সাবিত্রী আম্মা—তবু—আমার মা।" সরোজা 'তবু' কথাটা জোর দিয়ে বেঁকিয়ে উচ্চারণ করল।

দেববাণী চুপ ক'রে রইল। সরোজা এবার একটানা ব'লে গেল: "সব ফাঁকি, জানেন? সব ফাঁকি। মা বারো-তেরো বছর বয়সে বিধবা হয়েছিলেন।

ভাইদের সংসার থেকে পালিয়ে গিয়ে অ্যানি বেসান্তের শরণাপন্ন হলেন। লেখা-পড়া শিখলেন, বড় হলেন, যৌবন তাঁকে সৌন্দর্যে সুষমায় সাজিয়ে তুলল। তাঁকে দেখে ধর্মরাজ নামে একটি যুবকের আদর্শ-প্রবণতা উজিয়ে উঠল। তিনি চেয়েছিলেন বিধবা বিয়ে ক'রে সমাজসংস্কারের পথ দেখাবেন, হাতের কাছে অমন একটি সুন্দরী বিধবা পেয়ে তাকেই বিয়ে ক'রে বসলেন। কিন্তু তাকে সন্তানের জননী করতে পারলেন না। অতৃপ্ত মাতৃত্ব-ক্ষুধা নিয়ে সাবিত্রী আম্মা চরিত্রহীন হতে পারতেন; না হয়ে দেশসেবিকা হলেন। তিনি নামলেন দেশের কাজে, ধর্মরাজ মাতলেন ধর্ম নিয়ে। এমনি ক'রে বছরের পর বছর কাটল। সাবিত্রী ধর্মরাজের কাছ থেকে একেবারে দূরে সরে গেলেন। ধর্ম নিয়ে ধর্ম-রাজের মন ভরল না, তলে তলে ব্যর্থ পৌরুষের অপমানে তিনি দগ্ধ হচ্ছিলেন। সাবিত্রীর যত নামডাক হতে লাগল, ধর্মরাজের ঈর্ষা তত বেড়ে গেল। গোপনে তিনি আয়ুর্বেদ চিকিৎসা করালেন। তার পর একদিন এসে হাজির হলেন গান্ধী-আশ্রমে। সাবিত্রী তখন বিপিনভাই দেশাই নামে আর একজন দেশ-সেবকের প্রেমে পড়েছেন। দু'জনই দু'জনকে ভালবাসেন। গান্ধী-আশ্রমের ভালবাসায় ত 'দেহ' নেই, তাই তার তীব্রতা আরও বেশী। তবু সাবিত্রী তাঁর স্বামীকে সৌজন্য ও ভদ্রতার সঙ্গে গ্রহণ করলেন। কিন্তু এত দীর্ঘ বছর পরে ধর্মরাজ যে স্বামীর সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন তা কি তিনি জানতেন? জোর ক'রে স্বামিত্ব খাটিয়ে ধর্মরাজ বিদায় নিলেন। কয়েক সপ্তাহ পরে আতঙ্ক, লজ্জা, ঘৃণা ও দুঃখের সঙ্গে সাবিত্রী দেখলেন, তিনি মা হবার পথে। এই হ'ল সরোজা-সম্ভব মহাকাব্য।"

দেববাণী কি একটা বলতে গেল, সরোজা তাকে থামিয়ে ব'লে চলল, "মা আমাকে একেবারে চান নি, তবু আমি এলাম। বাবা আমাকে মার ওপর নির্দয় প্রতিশোধ নেবার অস্ত্র হিসেবে মোক্ষম ব্যবহার করলেন। আমি বেড়ে উঠলাম আশ্রমে। মনে আছে, শিশুকালের যে ক'টা দিন মা কাছে থাকতেন, হয় অবাক্ হয়ে আমাকে দেখতেন, যেন আমি অচেনা, অজানা, অনাথা কোনও শিশু, নয়ত আমার দিকে তাকাতেও তাঁর লজ্জা হ'ত। সর্বদাই তিনি জেলে যাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকতেন। এমনি ক'রেই কিন্তু আমি বড় হয়ে উঠলাম। তার পর এক ভদ্রলোক এসে আমায় মাদ্রাজ নিয়ে গেল।"

একগুচ্ছ চুল কপাল বেয়ে চোখে নেমে আসছিল। হাত দিয়ে সরিয়ে সরোজা ব'লে চলল, "তিনি যে আমার বাবা প্রথমে আমি জানতে পারিনি।

মা তখন জেলে। আশ্রমের সেক্রেটারী আমায় ডেকে শুধু বলল, তুমি আজ মাদ্রাজে যাবে, জামা-কাপড় গুছিয়ে নাও। দেখলাম, বলিষ্ঠ এক বৃদ্ধ তার ঘরে ব'সে আছেন। তিনি আমায় একবার তাকিয়ে দেখলেন। কাছে ডাকলেন না, কথা বললেন না। পরে আশ্রমের কেউ একজন আমায় বলল, উনি আমার বাবা। মনে আছে, শুনেই আমি তাকে হাতের কাছে একটা পাথর ছুঁড়ে মেরেছিলাম। সে ভদ্রলোক আমাকে সত্যিই মাদ্রাজে নিয়ে গেলেন। ট্রেনে কয়েকবার খেতে বলা ছাড়া একটা কথাও তিনি আমার সঙ্গে বললেন না আমি ভয়ে কাঠ হয়ে রইলাম। মাদ্রাজে নেমে সোজা আমাকে নিয়ে তিনি স্কুলে গেলেন। বন্দী হলাম আমি কনভেন্টে।"

একটু থেমে সরোজা আবার বলতে লাগল, "মাসে একবার একবার আমার খোঁজ নিতেন। সেদিন বোর্ডিং স্থপারের আপিস [illegible] ডাক পড়ত। গিয়ে দেখতাম আমার 'বাবা' বসে আছেন। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বলতেন, সব ভাল ত? আমি ঘাড় নাড়তাম। আর বলতেন, কিছু চাই? আমি আবার ঘাড় নাড়তাম। প্রত্যেক মাসে একবার এই প্রহসন হ'ত। তবু আমি বড় হতে লাগলাম। এমনি ক'রে যখন আমার বারো বছর বয়স তখন একদিন মা এসে স্কুলে হাজির। আমি কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে খেলছিলাম, একটা চাকর এসে আমায় আপিসে ডেকে নিয়ে গেল। গিয়ে দেখি একজন মহিলা ব'সে আছেন চেয়ারে, চমৎকার দেখতে। তাঁকে চিনতে আমার সামান্য একটু দেরি হ'ল। তিনি চেয়ে রইলেন আমার দিকে। আমি কেমন ভয় পেয়ে গেলাম। ইচ্ছে হ'ল ছুটে পালাই। অথচ পা দুটো কেমন অবশ। কিছুক্ষণ তিনি কোনও কথা বললেন না। আমিও মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। তার পর হঠাৎ তিনি আমাকে কাছে ডাকলেন। ভয়ে ভয়ে আমি এগিয়ে গেলাম। তিনি একখানা অনিচ্ছুক হাত আমার কাঁধে রাখলেন। আমার ইচ্ছে হ'ল কামড়ে দি সে হাত। আমি কেবল দু' পা স'রে গেলাম।"

দেববাণী গম্ভীর মনোযোগে শুনছিল, সরোজা ব'লে চলল, "মাঝে মধ্যে মা আসতেন, যখন তাঁর সুযোগ-সুবিধে হত। তা জানতে পেরে বাবার আসাও বেড়ে গেল। আমি বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে দু'পক্ষের নতুন টানাটানি শুরু হ'ল আমাকে নিয়ে। মা মাঝে মাঝে কাতর চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতেন, হয়ত আমাকে বুঝতে চাইতেন, চিনতে চাইতেন, কাছে টানবার পথ খুঁজতেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে আদান-প্রদানের কোনও রাস্তা ছিল না। আমার

নিজের জীবনের ফাঁকি দিয়ে মার জীবনের ফাঁকি আমি পরিষ্কার দেখতে পেতাম। তখনও কলেজ-জীবন আমার শেষ হয় নি। বাবা একবার এসে আমাকে তাঁর কাছে পণ্ডিচেরীতে নিয়ে গেলেন। তখন তিনি মাদ্রাজ ছেড়ে পণ্ডিচেরীতে বাস করছেন, অরবিন্দ আশ্রমে নয়, কাছাকাছি নিজের আস্তানায়। আমাকে টানতে চাইলেন ধর্মের পথে। আমার প্রচণ্ড হাসি পেল। আমাদের মধ্যে কথা হ'ত না একেবারে, শুধু তিনি ঘণ্টাখানেক আমায় ধর্মোপদেশ দিতেন। দিন চারেক পরে আমার অসহ্য লাগল। চতুর্থ দিন তিনি ধর্মকথা শুরু করেছেন, আমি ব'লে উঠলাম, 'কাল আমি হস্টেলে ফিরে যাচ্ছি।'

"তিনি বললেন, 'কেন?'

"আমি বললাম, 'এমনি। আমার এখানে ভাল লাগছে না।'

"তিনি বললেন, 'ধর্মকথা তোমার ভাল লাগছে না?'

"আমি বললাম, 'না। একেবারে না।'

"তিনি রেগে বললেন, 'মায়ের মেয়ে ত? তারই মত ধর্মে মতিহীন। যাও তবে, রাজনীতি-কর গে।'

"আমি বললাম, 'রাজনীতিও আমার ভাল লাগে না।'

"তিনি বললেন, 'তবে কি ভাল লাগে?'

"আমি বললাম, 'কিছু না।'

"কিন্তু একদিন হস্টেল ছাড়তে হ'ল। কোথায় যাব বুঝতে না পেরে মার কাছে দিল্লীতে চ'লে এলাম। মা তখন লোকসভার সদস্যা। তিনি নতুন নেশায় মশগুল, কিন্তু আমার চোখে প্রচণ্ড ভাবে ধরা প'ড়ে গেল তাঁর জীবনের বিরাট ব্যর্থতা। তিনি দেখলেন না, অথচ আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম, তাঁর একবিন্দু প্রভাব নেই, কেউ তাঁকে মানে না, সবাই তাঁকে নিয়ে হাসে, বড় জোর করুণা করে। কোনও কিছু না-করতে পারার অসহ্য শূন্যতা থেকে বাঁচবার জন্যে তিনি অনেক কিছু করতে চেষ্টা করতেন, অনেক কিছু নিয়ে লড়তে চাইতেন। কিন্তু তাঁর কথা বড় কেউ শুনত না, শুধু মাঝে মধ্যে তাঁর ন্যুইসেন্স ভ্যালুর খাতিরে এক-আধটু খাতির দেখাত। এ ফাঁকি কেবল মা'র জীবনে নয়, মা'র সহকর্মীদের অনেকের জীবনে আমি দেখতে পেতাম। তাঁদের কাজ বহুদিন শেষ হয়ে গেছে, বর্তমান কাজে মন নেই, তবু জীবনের নিষ্ঠুর শূন্য অহমিকা ও দর্প কোনওমতে ঢেকে-ঢুকে তাঁরা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছেন। তাঁদের দেখে-শুনে আমার অসহ্য লাগত, ইচ্ছে হ'ত মুখের ওপর বলে দি,

তোমরা মিথ্যে, ভুয়ো, ফাঁকি ; বলতে না পেরে নিজের মধ্যেই জ্ব'লে মরতাম। মা'র জন্যে মাঝে মাঝে দুঃখ হ'ত। তিনি মানুষ ভাল ছিলেন, দৃষ্টি উদার ছিল, মনে সঙ্কীর্ণতা ছিল না ; জীবনের পরিণত বছরগুলিতে অতৃপ্ত ভালবাসার স্নিগ্ধ বেদনা তাঁকে কোমল, সহানুভূতিশীল, শান্ত করেছিল। জানি, আমাকে নিয়ে তাঁর ভাবনা ছিল অনেক, সরোজা-সমস্যার কোনও সমাধান তিনি খুঁজে পান নি। আমাকে কোনওদিন তিনি বুঝতে পারেন নি, বোঝবার চেষ্টাও বড় একটা করেন নি। বরং আমাকে সর্বদাই ভয় ও আতঙ্কের চোখে দেখেছেন। আমি যে তাঁর জীবনের সবটুকু ফাঁকি জেনে ফেলেছিলাম, এ অপরাধ তিনি ক্ষমা করেন নি। তাঁর প্ল্যাটোনিক প্রেমের খবরও আমার জানা ছিল। এ জন্যেও তিনি আমার ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। বিপিনভাই দেশাই আমাকে দেখতে পারতেন না। ওঁদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখলেই আমার হাসি পেত : দুই বুড়ো-বুড়ী, সারাজীবন একে অন্যকে চেয়ে এসেছে অথচ পাবার মত সাহস রাখে নি, ভাবতে আমি হেসে ফেলতাম, আর সেই হাসির আভাস দেখে বিপিনভাই ভয়ানক চটে যেতেন। কিন্তু সবকিছু সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত মা হয়ত আমাকে ভালই বাসতেন ; মাঝে মাঝে নির্বোধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন আমার দিকে, আমাকে নিয়ে কি করবেন ভেবে পেতেন না, অথচ এটুকু বুঝতেন যে, কিছু একটা তাঁর করা দরকার। অসহায় হয়ে যাকে ভাল লাগত আমার জন্যে তাঁরই শরণাপন্ন হতেন। যেমন আপনার হয়েছিলেন।"

সরোজার কণ্ঠস্বর একবার সামান্য ভারী হয়ে এসেছিল, শেষের কথাগুলি বলবার সময় আবার কঠিন হয়ে উঠল। "যেমন আপনার হয়েছিলেন," ব'লে যে-চোখে সে দেববাণীর দিকে তাকাল, তাতে দুর্বোধ্য প্রতিরোধ।

দেববাণী এতক্ষণে কথা বলল, "যে-সমস্যার সমাধানে তুমি তাঁকে বিন্দুমাত্র সাহায্য কর নি, বরং আরও জটিল করেছ, তাতে তিনি বিশ্বাসযোগ্য কারুর সাহায্য চাইলে তুমি রেগে যাবে কেন ?"

সরোজা বলল, "শুধু এ জন্যে যে বিষয়বস্তুটা আমি। আমি একটা দুর্ঘটনা হয়ে জন্মেছিলাম, দুর্ঘটনা হয়ে বেড়ে উঠেছি, দুর্ঘটনা হয়ে একদিন ম'রে যাব। অনাকাঙ্ক্ষিত, অস্বাগত, অনিমন্ত্রিত জীবনের বোঝা আপনাকে যদি বইতে হ'ত তাহলে বুঝতে পারতেন।"

সাপের আস্ফালিত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মত হেসে উঠল সরোজা।

"এমনি একটি 'বিশ্বাসযোগ্য' বন্ধুর কাছে মা আমাকে সুপথে আনবার ভার

দিয়েছিলেন। তাঁর নাম করতে আমার আজ কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু মুখে আনতে ঘৃণা হয়, তাই করব না। আপনাকে মা একদিন কয়েকজন এম. পি-র. সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন, মনে আছে? সেখানেও তিনি ছিলেন। দেশকর্মী হিসেবে একদিন নাকি তাঁর নাম ছিল, মা তাঁকে খাতির করতেন, কারণ তিনি প্রায়ই এসে মা'র কাছে বসে তাঁর প্রশস্তি করতেন। আমি তখন সবে কলেজ ছেড়ে দিল্লী এসেছি। সে বন্ধুকে মা আমার কথা বললেন। বোধ হয় বললেন, ওকে একটু মানুষ ক'রে দিন। তিনি সোৎসাহে এ দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। আমার নতুন সংরক্ষকের বুদ্ধি ও পন্থায় সূক্ষ্মতা ছিল মানতেই হবে। আমার সঙ্গে তিনি ধীরে আস্তে আলাপ জমিয়ে নিলেন। চুল-পাকা এক ভদ্রলোককে একেবারে সমীহ না ক'রে পারা যায় না। তিনি কক্ষনো আমাকে একটি উপদেশ দিতেন না। সে জন্যেই তাঁর সঙ্গ আমার অসহ্য লাগে নি। আমাকে নিয়ে বেড়াতে যেতেন, সিনেমায় যেতেন, গল্প করতেন—আমাদের কথাবার্তায় সরোজা নামক সমস্যার আমদানী হ'ত না। অথচ আমি জানতাম তাঁর আসল কাজ হচ্ছে আমাকে 'সুমতি' দেওয়া, তাই আমি সতর্ক নজর রাখতাম। দু তিন মাসেও যখন তিনি আমাকে সুমতি দেবার চেষ্টা করলেন না তখন আমার সতর্কতা কমে গেল, বোধ করি আমি একটু সহজ হলাম। অন্ততঃ কলেজ হস্টেলের বাইরে কারুর সঙ্গে এর আগে এতটা সহজ আমি হই নি। এবার সুযোগ বুঝে মার সেই হিতৈষী বন্ধু, আমার চতুর সংরক্ষক, ছোবল মারলেন।"

গা থেকে কাশ্মীরী শাল মাটিতে প'ড়ে গেল। সরোজা জানলার বাইরে তাকিয়ে ব'লে চলল, "একদিন দুপুরে, মা তখন কাজে গেছেন, তিনি এলেন আমাদের বাড়ী। চাকরটা তার ঘরে ঘুমুচ্ছিল। আমিই তাঁকে বসতে দিলাম, কাছে ব'সে কথাবার্তা বললাম। কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর এতদিনের মুখোশ খ'সে পড়ল, তিনি আমায় জোর ক'রে কাছে টেনে নিলেন।"

দেববাণীর দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল সরোজা। "প্রথমটা আমি অবাক্ হলাম, তার পর ভয় পেলাম, তার পর রাগ হ'ল, তার পর আমার ভয়ানক হাসি পেল। পাকা-চুল একটা বুড়ো মানুষ, যে নাকি দেশের সেবায় নাম করেছে, যার হাতে এক নির্বোধ জননী সজ্ঞানে তার একমাত্র কন্যার মঙ্গল-দায়িত্ব সঁপে দিয়েছে, তার এই চমৎকার ব্যবহারে আমার পেটের মধ্যে থেকে হাসি ঠেলে উঠে আসতে লাগল। তিনি ভাবলেন, আমাকে বুঝি অনেকখানি

আয়ত্তে এসেছেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, হে ঈশ্বর, এ সময় মাকে এখানে নিয়ে এস, তাঁকে দেখতে দাও এই ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয়। মার বন্ধু তখন উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন, আমি আস্তে বললাম, 'একটু দাঁড়ান।' তিনি থামলেন। আমি উঠে দরজা বন্ধ করলাম। ফিরে এসে তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে বললাম, 'কি চান?' তিনি রুদ্ধশ্বাসে বললেন, 'তোমাকে!' আমি বললাম, 'কেন?' তিনি উত্তর না দিয়ে আমাকে টানতে গেলেন। আমি বললাম, 'টানবেন না। আমি দেব আপনাকে। শুধু একটা শর্তে।' তিনি নিঃশ্বাস চেপে বললেন, 'কি শর্ত?' আমি বললাম, 'আপনি চ'লে গেলে মাকে ফোন ক'রে ডেকে এনে সব ব'লে দেব। তিনি আঁৎকে উঠলেন। আমি তখন দারুণ মজায় হাসছি; বললাম, 'শুধু তাই নয়, যাঁরা এখানে রোজ আসেন তাঁদের প্রত্যেককে বলে দেব। রাজী আছেন?' তিনি তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলতে গেলেন। আমি বললাম, 'পালাচ্ছেন কেন? এতটুকু সাহস নেই আপনার? আমি কিন্তু রাজী!' তিনি দরজা খুলে দৌড়ে পালালেন। এর দিন তিনেক পরে মা আমাকে কাছে ডেকে বললেন, বিয়ে করবে?"

সরোজা এবার উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল। সে যে এত জোরে হাসতে পারে দেববাণী জানত না। হাসতে হাসতে বলল, "বি-য়ে করবে? আমি কি উত্তর দিলাম জানি নে, পরের দিন চ'লে গেলাম কেপ কমোরিণ। সমুদ্র বাধা না দিলে আরও দূরে চ'লে যেতাম।"

দেববাণী দেখল, তার কিছু বলার মত কথা নেই।

সরোজাই আবার বলতে লাগল—এবার সে যেন থামতে ভয় পাচ্ছে—"ফাঁকি, বুঝলেন, সব ফাঁকি। দেশপ্রেম থেকে মনুষ্যপ্রেম পর্যন্ত সব ফাঁকি। এর মধ্যে যা একমাত্র সত্যি তা হচ্ছে দেহ। দেহের দাবী না মিটিয়ে উপায় নেই। দেহের আহার চাই, গৃহ চাই, পোশাক চাই—এবং যেহেতু দুর্ভাগ্যক্রমে মানুষ আদিম জীবন ত্যাগ করেছে—স্কুল, কলেজ, সব চাই। মার সেই পক্ককেশ বন্ধুর কথা আমি অনেক ভেবে দেখেছি। দোষ তাঁর কিছু নয়, দোষ দেহের। মা যাকে ভালবাসেন নি তাঁকে বিয়ে করেছিলেন, যাকে ভালবেসেছিলেন তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে পারেন নি। তাঁর দেহ, তাই কোনও দিন তৃপ্তি পায় নি। দেহ না থাকলে তিনি কখনও সরোজার জন্ম দিতেন না।"

দেববাণী বলল, "মানুষ ত শুধু দেহ নয়, তার আত্মাও আছে।"

সরোজা সে-কথা কানে তুলল না। বলল, "কেপ কমোরিণ থেকে আমায়

ফিরে আসতে হল। যতই অপছন্দ হোক না, মা ছাড়া যে আমার কেউ নেই এই কঠিন সত্য আমি বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু ফিরে এসেও মিথ্যা আর ফাঁকির মধ্যে আমি হাঁপিয়ে উঠলাম। সব চেয়ে অসহ্য লাগল আমার চতুর্দিকের মানুষগুলির নির্লজ্জতা। সুযোগ পেলেই আমি তাদের দংশন করতে লাগলাম। কিন্তু কারুর একবিন্দু লজ্জা হত না। মা বিব্রত, ক্ষুব্ধ, দুঃখিত হতেন। তাঁর সেই বন্ধুকে তিনি বাড়ীতে ডাকতেন, তিনিও নির্লজ্জ নিঃসংকোচে আসতেন, বার বার তাঁর চোখ আমাকে খুঁজে বেড়াত। আমার মনে হল, এ-ভাবে বেঁচে থাকা অসম্ভব। চাকরির চেষ্টা করতে লাগলাম। মার সাহায্য না নিয়ে। কিছুদিন ঘোরা-ফেরার পর সংবাদপত্রের এ কাজটা জুটেও গেল। আর এই সময় মা আপনাকে পেয়ে বসলেন। তাতে আমার আপত্তি হ'ত না, যদি-না আপনাকেও আমার পেছনে লাগিয়ে দিতেন। আপনার আগে আরও দু-চার জনকে লাগাবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের আমি একটুও এগোতে দিই নি। ভেবেছিলাম আপনাকেও এক-পা এগোতে দেব না। কিন্তু পারলাম না।"

দেববাণী ব'লে উঠল, "আমি তোমার জন্য কিছু করতে চেষ্টা করিনি ; চেষ্টা করবও না।"

সরোজা বলল, "আপনার সৌভাগ্য আপনার বাবা ধার্মিক নন, মা দেশনেত্রী নন, আপনি সুন্দরী নন। আমার সবচেয়ে বড় বিপদ আমার মা, ম'রে গিয়েও তিনি আমায় রেহাই দেন নি। আর বিপদ্ আমার সৌন্দর্য। আমি যদি কুৎসিত হতাম তাহলে বোধহয় আমার পক্ষে বেঁচে থাকা সহজ হত। সৌন্দর্য আমার শত্রু। পুরুষের লোভকে সে ডেকে আনে। কাগজের সম্পাদক, রাজনৈতিক নেতা, ব্যবসায়ী, চাকুরে সব যেন হাঁ ক'রে গিলছে। ক্ষুধার্ত উপবাসী পুরুষের দৌরাত্ম্যে একটা মেয়ে আমাদের দেশে স্বাধীন স্বতন্ত্র ভাবে বাঁচতে পর্যন্ত পারে না। অথচ যত নীতিকথা এদেশে প্রতিদিন উচ্চারিত হয় তার একাংশও আর কোথাও শুনতে পাবেন না।"

দেববাণীকে নীরব দেখে সরোজা আবার বলল, "আমার দেহকে আমি ঘৃণা করি। আমার সৌন্দর্যকে আমি ঘৃণা করি। কেউ যদি আমাকে জোর ক'রে ধর্ষণ করত তাহলে আমি খুশি হতাম। আমার দেহকে শাস্তি দিয়ে, সৌন্দর্যকে অপমান ক'রে আমি তৃপ্তি পেতাম। কিন্তু সে দুঃসাহস পর্যন্ত এদেশের পুরুষ-গুলির নেই। ওরা চুরি করতে পারে, ঠকাতে ওস্তাদ, কিন্তু ডাকাতের দুঃসাহস ওদের নেই।"

নিথর নীরবতা হঠাৎ নেমে এল, সরোজার কথা শেষ হ'ল। দেববাণী উঠে দাঁড়াল। কিছু বলার নেই তার।

তাকে উঠতে দেখে সরোজা কেমন ভয় পেয়ে গেল। ব'লে উঠল, "বলতে পারেন মার এখন মরবার দরকারটা কি ছিল? আমি কোথায় যাই? আমি যে একেবারে একা!"

আচমকা কেঁদে ফেলল সরোজা। কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়ল। তন্বী দেহ বার বার কেঁপে উঠতে লাগল।

দেববাণী কিছু করল না, কিছু বলল না। শুধু তার মনে এক অদ্ভুত্তর প্রশ্ন জাগল। সাবিত্রী আম্মা আর দেববাণী যদি একই জীবনধারার দুটি শাখা, তাহলে সরোজা কি? কোন্ জীবন-নদীর উপশাখা সে? কোথায় কোন্ নদী বা সমুদ্রে, তার মোহানা।

ক্লিওপ্যাট্রা একটি হীরকখণ্ডকে সুরায় গলিয়ে মার্ক এণ্টনীকে পান করতে দিয়েছিল। প্রত্যেক নারীর জীবনে সে হীরের টুকরো থাকে; তার বাসনা, তাকে গলিয়ে পরম দয়িতের ওষ্ঠাধরে তুলে দেয়। কিন্তু সাবিত্রী আম্মার হীরা কে পান করেছিল? সরোজা কেন তার জীবনের হীরা সুরায় গলিয়ে পান-পাত্রটিকে আছড়ে দিয়ে কঠিন প্রস্তর মেঝেতে ভেঙে ফেলতে যাচ্ছে?"

জীবনে বহুবার যে প্রশ্নে দেববাণীর হৃদয় উদ্বেলিত হয়েছে, নীরব কান্নায় কম্পিত সরোজার সামনে দাঁড়িয়ে আর একবার সে প্রশ্ন তাকে অস্থির করল। তার সবটুকু নারী-সত্তা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল: আমি কে, কোথায় আমার পরিণতি, আমার পূর্ণতা? চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে দৃঢ়-প্রত্যয়ে বলেছিল, সে দেবী নয়, সামান্য নারীও নয়; সে কবির পূজা চায় নি, অহংকৃত পৌরুষের অবহেলা চায় নি, দৃঢ়-বলিষ্ঠ পুরুষ-জীবনের সঙ্কট-সম্পদে পাশে থেকে কেবল সহায় হতে চেয়েছিল'। চিত্রাঙ্গদা জানত না, পুরুষ-জীবনের সমভাগী হওয়া সহজ নয়। কোন জীবনই কোনও জীবনের সমভাগী হতে পারে না। এক একটি মানুষ এক-একটি পর্বতচূড়া। তারা একে অন্যকে দেখে, একে অন্যের পানে হাত বাড়ায়, এমনকি হৃদয় পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়; মিলেমিশে এক হতে পারে না। জীবনের পর জীবন পুরুষ নারীকে, নারী পুরুষকে, কোন অজ্ঞাত, অপ্রাপ্য স্পর্শমণির অন্বেষণে বার বার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরম আগ্রহে প্রশ্ন করে—সূর্য যেমন সমুদ্রকে প্রশ্ন করে—তুমি কি সেই? সে প্রশ্নের একমাত্র বিষণ্ণ উত্তর: সে নই, আমি সে নই।

উনিশ

অনেক মানুষের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেববাণী নিজের বুকের কাঁপন শুনতে পায় নি। মহাকায় এরোপ্লেনের গর্জনে সে কম্পন ডুবে গিয়েছিল। নিঃসার, নৈর্ব্যক্তিক মনে হয়েছিল দেববাণীর নিজেকে। আমি দেববাণী নই, সে নিজেকে বার বার বলছিল, আমি দেবী নই, সামান্য নারী নই, আমি কেউ নই। আমি শুধু জীবনের টুকরো ঝিলিক, অনেক ছাই-এর মধ্যেও আমি জ্বলছি; অঙ্গারে আমার কৃষ্ণ পরিণতি জেনেও আমি জ্বলছি। আমি জ্বলছি দেহের তাপে, আত্মার উত্তাপে। যে এক টুকরো আগুন মানুষের জীবনকে পবিত্র ক'রে অমৃতত্বের আস্বাদ এনে দেয়, তাতে আমি পুড়ছি। ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন জীবন-বহ্নির সামান্য ছোঁয়ায়; পৃথিবীর জীবনতৃষ্ণার মৃদুল হাওয়ায় আমি জ্ব'লে জ্ব'লে প্রতি মুহূর্তে ফুরিয়ে যাচ্ছি। এই জ্বলন্ত ঝিলিকটুকু আমার জীবনের একমাত্র হীরক-খণ্ড, ক্লিওপ্যাট্রা যা মার্ক এণ্টনীর মুখে সুরায় গলিয়ে তুলে দিয়েছিল, সাবিত্রী আম্মা যা কাউকে দিতে পারেন নি, সরোজা যার দ্যুতি সইতে পারছে না।

হিমাদ্রি দেবকুমারকে সঙ্গে ক'রে এরোপ্লেন থেকে নামল। দূর হ'তে দেববাণী দেখল, ওরা নামছে। অনেক মানুষের মধ্যে দুটি মানুষ। তবু তাদের সঙ্গে এত মানুষের কোনও যোগাযোগ নেই। দুটি আগুনের ঝিলিক তৃতীয় ঝিলিকের পানে এগিয়ে আসছে। দুটি জলধারা তৃতীয় জলধারার সন্ধান করছে। দেববাণী স্থির অপেক্ষায় নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল। কে যেন তার অন্তরে ব'লে উঠল, তৈরী হও, এবার তোমার অন্তিম মুহূর্তের জন্যে তৈরী হও।

হিমাদ্রি দেবকুমারকে বাহুতে জড়িয়ে দেববাণীর মুখোমুখি দাঁড়াল। দেববাণী দেখল, তার মুখে বিজয়ের সূর্যালোক। একটি কথা না ব'লে হিমাদ্রি শুধু বিজয়ী হাস্যে, জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ব'লে দিল, এই নাও তোমার পুত্র, এই নাও তোমার মিত্র। যে সমস্যার সমাধান তুমি এত দীর্ঘ বছরেও করতে পার নি, মাত্র দুটো দিনে আমি তা মিটিয়ে দিয়েছি। এবার তুমি আমাদের নাও।

দেববাণী সে জ্বলন্ত দৃষ্টি সইতে পারল না। তাকাল দেবকুমারের পানে।

স্নিগ্ধ কিশোর মুখে জীবনের প্রথম অরুণালো ফুটে উঠেছে। দেবকুমার, খোকন, এক হাতে ধরে আছে হিমাদ্রির হাত, অন্য হাতে দেববাণীর। যেন বলছে, আমি ব্যবধান নই, সংযোগ।

দেববাণী চোখ বুজে হীরক-খণ্ডের সন্ধান করল। এই ত সেই অন্তিম মুহূর্ত, কোথায় আমার সে হীরার টুকরো, ক্লিওপ্যাট্রা যা মার্ক এণ্টনীকে পান করিয়েছিল ? অন্তরে ডুব দিয়ে তার সন্ধান পেল না দেববাণী। সে পালিয়েছে।

তার ব্যথিত ব্যর্থ সন্ধান বুঝি টের পেল হিমাদ্রি। যা সে কোনও দিন করে নি, আজ তাই ক'রে বসল। সবার সামনে দেববাণীর মাথায় হাত রাখল হিমাদ্রি। সে নিঃশঙ্ক হাতের স্পর্শ দেববাণীকে বলল, হারায় নি, তোমার স্পর্শমণি হারায় নি ; শুধু এই মুহূর্তে তোমার অন্তর থেকে পালিয়ে সে আমাদের মধ্যে লুকিয়ে আছে।

দেববাণী ভাবল, জীবনে চাওয়ার চেয়ে গ্রহণ করা অনেক কঠিন। যা চেয়েছি, যা গ্রহণ করার ভয়ে বার বার স'রে গেছি, এবার আর তাকে ফিরিয়ে দেবার উপায় নেই। এবার সে দুয়ার ভেঙে ঘরে উঠে এসেছে, আর ফিরে যাবে না।

দুজনকে লক্ষ্য ক'রে সে বলল, "চল।"

হিমাদ্রি মৃদু হাস্যে প্রশ্ন করল, "কোথায় যাব ?"

দেববাণী তার দিকে তাকাল। ভয়ে ভয়ে, নির্ভয়ে, বলল, "ঘরে।"